তিথিডোর

বুদ্ধদেব বসু

মূল্য - ৮·০০

ভুল ক'রে—এ-রকম ভুল দেবতাটি প্রায়ই ক'রে থাকেন—কিছুটা বেশিই মঞ্জুর ক'রে ফেললেন তিনি। স্বাতীর জন্মের কয়েক মাস পর থেকে একটু-একটু ক'রে বোঝা যেতে লাগলো যে শিশিরকণা শুধু-যে আর নতুন প্রাণ পৃথিবীতে আনতে পারবেন না, তা নয়, তাঁর নিজের প্রাণই যেন থরথর করছে ঝ'রে পড়ার জন্য।

মাস কাটলো, বছর কাটলো, শরীর আর সারে না। ডাক্তারে বিরক্ত হ'য়ে রাজেনবাবু ছুটি নিলেন দু-মাসের। অনেক খরচ ক'রে মস্ত পরিবারটি নিয়ে মিহিজামে এলেন। শিশিরকণা অনেকটা সেরে উঠলেন, কলকাতায় ফিরেও বেশ ভালো থাকলেন কিছুদিন। আবার আস্তে-আস্তে খারাপ হ'লো : আবার শয্যা নিতে হ'লো।

এ-অবস্থাতেই কায়েমি হলেন তিনি। মাঝে-মাঝে ডাক্তার আসে, চিকিৎসায় উপকারও হয়, তারপর ডাক্তার যেই বলে, এইবার আপনি ঠিক সেরে উঠছেন, তখনই নতুন কোনো উপসর্গ দেখা দেয়। মাঝে-মাঝে এমনিতেই বেশ ভালো থাকেন, আবার শুয়ে থাকতে হয় দিন পনেরো। রাজেনবাবু নিয়ম ক'রে বছরে একবার কলকাতার বাইরে যেতে লাগলেন সকলকে নিয়ে—সমুদ্র, পাহাড়, শুকনো হাওয়া, দুধকুণ্ডের জল, সবই হ'লো—কিন্তু কিসের কী। হঠাৎ একদিন দেখা যায়—শিশিরকণা কিছুই খাচ্ছেন না, কেমন চুপচাপ হ'য়ে আছেন। আবার বিছানা।

বিশৃঙ্খলা এলো সংসারে, অকুলোন ঘটলো। শুয়ে-শুয়ে অসহায় চোখে শিশিরকণা তাকিয়ে ছাখেন চাকরদের চুরি, মেয়েদের অপব্যয়, ছেলেটার হতচ্ছাড়া চেহারা।—সংসার!

দিনে-দিনে গড়েছন একে, তিলে-তিলে ভরেছেন, সকল গহ্বর পূর্ণ করেছেন তাঁর শরীর দিয়ে—শরীর ছাড়া আর-কী আছে মেয়েদের! পুরুষ কত-কিছু পারে তার শক্তি, তার সাহস, তার অর্থ দিয়ে; মেয়েরা যা পারে শুধু শরীর দিয়েই পারে।—স্বামীর এই আয় আর কবে থেকে; তাঁরা তো গরিবই ছিলেন, অথচ কখনো এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য কি ঘটতে দিয়েছেন, কখনো কি ওরা একটা ময়লা জামা পরেছে, না খারাপ খেয়েছে, না কি ওঁকেই কখনো শুনতে হয়েছে যে হাতে টাকা নেই!

ক্ষীণ কণ্ঠ যথাসম্ভব চড়িয়ে তিনি ডাকলেন, 'মহাশ্বেতা! সরস্বতী! মহাশ্বেতা!'—কী-নামই রেখেছে, বাপু; কোনোরকমে-যে একটু ছোটো ক'রে নিয়ে ডাকবো, এত বছরের চেষ্টায় তা পারলাম না।

মহাশ্বেতা ঘরে এসে বললো, 'কেন, মা?'

'বিজুটা কী-রকম নোংরা হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখিস না তোরা! বাথরুমে নিয়ে গিয়ে দে না ওকে একটু পরিষ্কার ক'রে।'

'বাথরুমে সরস্বতী, মা।'

'তবে নিচে নিয়ে যা কলতলায়। আলমারি খুলে ছাখ তো ওর জামা-কাপড় কী আছে।'

মহাশ্বেতা আলমারি খুলে একটি ভেলভেটের নিকারবোকার বের করলো।

'—বুদ্ধি তোর! এই গরমে—! আর এটা ছোটোও হ'য়ে গেছে ওর। একটা শাদা প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি বের কর।'

কিন্তু খুঁজে খুঁজে গেঞ্জি পাওয়া গেলো না কোথাও।

মহাশ্বেতার মুখ লাল হ'লো, কপাল ঘেমে উঠলো, একটা টানতে গিয়ে তিনটে ফেললো মেঝেতে। শিশিরকণা অনেক ধৈর্য খাটিয়ে বললেন, 'ঐ পপলিনের শার্টটা—আঃ, ভালো ক'রে গুছিয়ে রাখ, আর আঁচলটা তোল না গায়ে!'

ভাইয়ের শার্ট-প্যাণ্ট নিয়ে মহাশ্বেতা একটু দ্রুত ভঙ্গিতেই বেরিয়ে গেলো। একটু পরেই ফিরে এসে বললো : 'বিজু আসছে না, মা।'

'আসছে না আবার কী! জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যা।'

'আমি কি ওর সঙ্গে জোরে পারি নাকি?'

'না, এত বড়ো মেয়ে, ঐটুকু ছেলের সঙ্গে তুমি পারো না!'

'বিজু বড্ড মারে।'

শিশিরকণা হেসে বললেন, 'মার না-খেলে আর দিদি কী! আর এত বড়ো মস্ত মা-র মতো দিদি!'

দুই ঠোঁটে একটা বিরক্তির শব্দ ক'রে মহাশ্বেতা মাথা ঝেঁকে উঠলো।

'কিছু বললেই এ-রকম করিস কেন রে?'

'আমি পড়বো না? পরীক্ষা না আমার?'

মহাশ্বেতার গলা শুনে শিশিরকণা স্তম্ভিত হলেন। মা-র কথার উত্তরে এ-রকম গলা বের করা যায়, সেটা কল্পনাতীত ছিলো তাঁদের ছেলেবেলায়। চুপ ক'রে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা যা, পড় গিয়ে।'

তক্ষুনি অন্তর্হিত হ'লো মহাশ্বেতা। বাঁচলো যেন।

সেদিনই সন্ধেবেলায় শিশিরকণা স্বামীকে বললেন, 'রাজকন্যাদের জন্য রাজপুত্র খুঁজতে লেগে যাও এবার।'

'হবে, হবে, তুমি সেরে ওঠো তো।'

'আমি যা সারবো তা জানি!—একসঙ্গেই ব্যবস্থা করো দু-জনের; খরচও বাঁচবে, আমিও বাঁচবো।'

'এত ব্যস্ত কী! ছেলেমানুষ, ম্যাট্রিক পাশ ক'রে কলেজে পড়বে—আজকাল তো আর সে-দিন নেই যে—'

'সে-দিন নেই মানে,' মৃদু স্বরে কিন্তু খুব স্পষ্ট ক'রে শিশিরকণা বললেন, 'মেয়েদের বিয়ে হ'তে পারছে না, তাই ও নিয়ে কেউ আর কিছু বলছে না আজকাল। কিন্তু যৌবন তো আর দেরি ক'রে আসছে না তাই ব'লে।'

'ও-রোগের একমাত্র চিকিৎসা বুঝি বিয়ে?' একটু হাসলেন রাজেনবাবু।

'ঠাট্টা কী—ঠিকই তো। তোমার মেয়েদের তো আর অন্যদের অবস্থা নয়—রূপ আছে, ত'রে যাবে।'

ঠাট্টার সুরটা বজায় রেখে রাজেনবাবু বললেন, 'তা পাণিপ্রার্থী রাজপুত্রেরাই আসবে ক-দিন পরে।'

'দু-একটি এসে গেছে, মনে হচ্ছে। ও-ঘরে এত হৈ-চৈ কিসের?'

'খুব আড্ডা জমিয়েছে ওরা।'

'কারা?'

'কারা আবার। মহাশ্বেতা? সরস্বতী—'

'আরো কার গলা পাচ্ছি যেন?'

'ও-তো অরুণ।'

'অরুণ?' শিশিরকণা ভুরু কুঁচকোলেন।

জিগেস করলো পাঁচ বছরের স্বাতী। তার ভাব-ভঙ্গি দেখে মুখে আঁচল চেপে লুটিয়ে পড়লো বড়ো দুই দিদি।

'হাসছো কেন তোমরা?'

'না, হাসবে না! ক্যাবলা কোথাকার!'

ফুলকি ছড়ালো স্বাতীর দুই চোখ, বড়ো-বড়ো নিশ্বাস পড়লো, বেড়ালের মতো ফুলে-ফুলে উঠলো ঘাড়, তারপর হঠাৎ তার ডান হাতটি উঠে এলো যেন খাপ থেকে তলোয়ার। ঠাশ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলো তার চেয়ে এক মাথা লম্বা, পাঁচ বছরের-বড়ো শাশ্বতীর গালে।

শাশ্বতী ছাড়লো না, উপযুক্ত উত্তর দিলো। তুমুল লেগে গেলো দুই বোনে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বারান্দা দিয়ে যেতে-যেতে রাজেনবাবু শুনলেন চ্যাঁচামেচি। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে গ্যাখেন, একেবারে রোলারুলি কাণ্ড। শাশ্বতী দাঁড়িয়ে আছে উশকোখুশকো চুলে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে, স্বাতী লাফিয়ে উঠে-উঠে তাকে মারছে, আর বড়ো দুই বোন হেসে গড়িয়ে পড়ছে এ ওর গায়ে, আর মাঝে-মাঝে চেষ্টা করছে ওদের ছাড়াতে।

'কী হয়েছে রে?'

বাবাকে দেখে বড়ো দু-জন হাসতে-হাসতে মুখ ঢেকে ফেললো।

'হয়েছে কী?'

'গ্যাখো বাবা,' শাশ্বতী আরম্ভ করলো, 'স্বাতী বলছিলো—'

'বলেছি তো বলেছি!' ঘামে, রাগে, চোখের জলে গনগনে গরম-লাল ময়লা-কালো মুচড়োনো মুখে গ'র্জে উঠলো স্বাতী।

অরুণদাকে বিয়ে করবে ব'লে কেঁদেছিলো, সেদিন থেকে কনিষ্ঠার জন্য উদ্বেগের অন্ত ছিলো না শিশিরকণার। মেয়ে কিছুতেই শাড়ি পরবে না, মা-ও ছাড়বেন না, জোর ক'রে পরিয়ে দিতেন নিজের ভালো-ভালো শাড়ি, কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার স্বাতীকে দেখা যেতো নির্লজ্জ ফ্রক প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনুরোধ, ক্রোধ, নতুন-নতুন শাড়ির প্রলোভন, কিছুতেই যখন ফল হ'লো না, তখন ঐ মুমূর্ষু শরীরে উঠে ব'সে শিশিরকণা কল চালিয়ে শেলাই করলেন মেয়ের জন্য যৌবন-আবরণী অন্তর্বাস ; রাজেনবাবুকে তাড়া দিয়ে-দিয়ে আনাতে লাগলেন লম্বা-লম্বা ফ্রক—আরো, আরো লম্বা—যে-কোনো ফ্রক স্বাতীর ছোটো হ'য়ে যায় দেখতে-দেখতে, এদিকে তার মাপের ফ্রক কিনতে পাওয়াও দুর্ঘট হ'য়ে উঠলো—শেষটায় কি মেমসাহেবদের গাউন কিনতে হবে! জীবনের একেবারে শেষ মাসটির আগে পর্যন্ত স্বাতীকে বসতে, শুতে, চলতে, বলতে শেখাতে গিয়ে শিশিরকণা তাঁর আয়ুর স্বল্প সম্বলের অনেকটাই খরচ ক'রে ফেলেছিলেন ; শেষটা একটু হঠাৎ হ'লো বোধহয় সেইজন্যই।

তিনটি বিবাহিত মেয়ে তাদের তিনজন স্বামী আর গোনা-গুনতিতে পাঁচটি (কেননা সকলকে আনা হয়নি) ছেলেমেয়ে নিয়ে একে-একে বিদায় নিলো শ্রাদ্ধের পরে। রাজেনবাবু চুপ ক'রে বারান্দায় এসে বসলেন।···তাহ'লে অন্য এক জীবন আরম্ভ হ'লো। যখন বিয়ে করেছিলেন, যখন বেলেঘাটার আঠারো টাকা ভাড়ার বাড়িতে শিশু এসে উঠেছিলো, তখন যে-জীবন আরম্ভ হয়েছিলো, তা তো অনেকদিনই চুকেছে, এতদিন তবু জীবন্ত একটা চিহ্ন ছিলো তার, তাও মুছে গেলো। বেলেঘাটা থেকে শাঁখারিপাড়ার দোতলায়

দুটি ঘর, তারপর হাজরা রোডের দক্ষিণমুখো ফ্ল্যাট—কী ধোঁয়া হ'তো শীতকালে !—তারপর, এই তো সেদিন, যতীন দাস রোডের এই সত্তর টাকা ভাড়ার আস্ত দোতলা বাড়ি। শ্বেতা এলো ছেলে হ'তে। লেক পর্যন্ত খোলা ছিলো তখন, ঝড়ের মতো হাওয়া চৈত্র মাসে, কিন্তু রাত্রে শিশু কাঁদতো মশার যন্ত্রণায়।

'বাবা !'

'স্বাতী !···খেয়েছিস তোরা ?'

'খেয়েছি।'

'বিজু ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোড়দিও।'

'তুই একা জেগে আছিস ? শুবি না ?'

'তুমি চলো, বাবা।'

রাজেনবাবু উঠলেন। বারান্দার অন্ধকার থেকে আলোতে এসে একটু হাসির ধরনে বললেন, 'স্বাতী, শাড়ি যে ?'

'হ্যাঁ বাবা, এখন থেকে শাড়িই পরবো।'

২

কিন্তু শাড়িটা রপ্ত করতে আরো অনেকদিন লেগে গেলো স্বাতীর। শাড়ি প'রে ইশকুলে সে যেতেই পারে না, বন্ধুদের সামনে বেরোতেও লজ্জা করে। তাহ'লে আর কতটুকু সময় বাকি রইলো। কোনো ছুটির দিনে বাথরুম থেকে শাড়ি প'রেই বেরিয়ে আসে গম্ভীরভাবে, কিন্তু ভাত-টাত খেয়ে মেঝেতে যখন উপুড় হ'য়ে শুয়ে পড়ে গল্পের বই নিয়ে, আর পড়তে-পড়তে আস্তে-আস্তে পায়ের আঙুল ঘষে মেঝেতে, শাড়ি তখন শাড়ির মনে হাঁটুতে ওঠে, আর শাশ্বতী শাসন করে, 'স্বাতী, পা-টা ঢাক।'

এক পায়ের দু-আঙুলের সাহায্যে আর-এক পায়ের শাড়ি নামিয়ে দিয়ে স্বাতী আরো গভীর ডুব দিলো বইতে।

—'কী খালি-মেঝেটার উপর গড়াচ্ছিস! ছোটো আছিস নাকি এখনো?'

ঠিক যেন মা, স্বাতীর মনে হ'লো। মুখে বললো, 'কেন, গড়ালে কী হয়?'

'হবে আবার কী! মেঝেটা নোংরা না?'

'বেশ পরিষ্কার তো—'

'ওঠ! উঠে বোস চেয়ারে! না-হয় খাটেই শো।'

শাশ্বতী কয়েক মাস আগে কলেজে ভরতি হয়েছে। বেশ পাকাপোক্ত যুবতীর মতো তার চাল-চলন। স্বাতীর খুব ইচ্ছে করে ছোড়দির মতো হ'তে, কিন্তু ছোড়দির কয়েকটা অভ্যেস তা

একেবারে পছন্দ না : যেমন, বাড়িতে সারাক্ষণ স্যাণ্ডেল প'রে থাকা, রাত্তিরে শোবার আগে নিয়ম ক'রে চুল বাঁধা—ইত্যাদি।

একটি পায়ের উঁচু-করা গোড়ালির উপর আরেকটি পায়ের বুড়ো আঙুল ন্যস্ত ক'রে সে বললো, 'ন্‌না। এ-ই ভালো।'

'বিশ্রী স্বভাব—ঃ!' আর কথা না-ব'লে শাশ্বতী তার অত্যন্ত পরিপাটি ক'রে গুছোনো পড়ার টেবিলে এসে খুলে বসলো পেনসিল হাতে নিয়ে ইনডক্‌টিভ লজিক, স্বাতীর তুলনায় অনেকটা উঁচু দরের জীব মনে হ'লো নিজেকে। একটু পরে ছোট্ট হাই তুলে পাঠ্যবই মুড়ে রাখলো, আর তুলে নিলো বন্ধুর কাছে দু-দিনের কড়ারে ধার-করা হাল আমলের বাংলা নভেল। বইখানা কোলের উপর খুলে টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে চোখ নিচু করলো, তারপর কেমন ক'রে বেলা কেটে গেলো বুঝলো না।

এমন সময় বিজু এসে ডাকলো, 'ছোড়দি।'

'উঁ।'

'ও ছোড়দি।'

'আঃ!' ধ্বনিটা বিরক্তির নয়, নায়িকার প্রতি অনুকম্পার নিশ্বাস। এ-রকম সময়ে কি বই থেকে চোখ তোলা যায়?

'শোনো না—'

'বল না!'

দু-পা এগিয়ে এসে বিজু বললো, 'ছোড়দি, শুভ্রবাবু এসেছেন।' এমন স্বরে বললো যেন মস্ত একটা খবর দিচ্ছে।

'শুভ্রবাবু? সে আবার কে?'

'ও মা!' হাফ-প্যান্ট-পরা ঈষৎ-গোঁফ-ওঠা বিজু কপালে চোখ

তুললো। তারপর, যদিও চীৎকার ক'রে বললেও আগন্তুক ভদ্রলোকের শোনবার সম্ভাবনা ছিলো না, তবু খুব নিচু গলা বললো, 'শুভ্রবাবু! সেই-যে সরস্বতীপুজোর সময় তিনকোণ পার্কে গান করলেন! মনে নেই তোমার?'

'তা—হয়েছে কী?'

অসহিষ্ণু বিজু মেঝেতে একবার পা ঠুকে বললো, 'কী-যে তুমি ছোড়দি! শুভ্রবাবু—কত জায়গায় তিনি গান করেন আজকাল—এই-তো কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকেন—'

'ও, শুবু!', ঘরের অন্য কোণ থেকে হঠাৎ ব'লে উঠলো স্বাতী 'শুবুকে তো সেদিনও দেখেছি গোল-গোল চশমা প'রে এক পাঁজা বই ঘাড়ে ক'রে ইশকুলে যেতে! এর মধ্যে গাইয়ে হ'য়ে উঠেছে আবার শুভ্র-বাবু!'

স্বাতীর দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে বিজু বললো, 'তু দেখেছিস, না? তোর চেয়ে কত বড়ো, জানিস?'

শাশ্বতী তাড়াতাড়ি মধ্যস্থ হ'য়ে বললো, 'তা বেশ তো—এসে কেন?'

'আমি ধ'রে নিয়ে এলাম রাস্তা থেকে', বিজু সগর্বে খবর দিলো 'জানো ছোড়দি, শুভ্রবাবু আমাকে গান শেখাতে রাজী হয়েছেন।'

'তোকে আর গান শিখতে হবে না, দাদা', স্বাতী ফশ ক'রে বললো, 'এমনিই তোর গলা দিয়ে সাত সুর বেরোচ্ছে আজকাল।'

'স্বাতী!' চীৎকার করতে গিয়ে সত্যিই তিন-চার রকম আওয়াজ দাঙ্গা বাধিয়ে দিলো বিজুর গলায়। আর-কোনো প্রতিবাদের চেষ্টা সে করলো না; ঘুরে দাঁড়ালো মূঢ় মেয়েলি স্পর্ধার দিকে পি

ফিরিয়ে এমন একটা ভঙ্গিতে, যেন অগ্রজের গৌরবের আর সমস্ত পুরুষ জাতির গাম্ভীর্যের বর্তমানে সে-ই একমাত্র প্রতিনিধি।—তা কথাটা এমন মিথ্যেই বা কী।

চাপা গলায় ব্যস্তভাবে যে-খবরটা জানালো সেটা অবশ্য জানা কথাই : 'ছোড়দি, শুভ্রবাবু ব'সে আছেন নিচে !'

'ব'সে আছেন তো আমি কী করবো ?'

'তুমি একবার যাবে না ?'

'যাঃ !'

বিজুর মুখ কালি হ'লো। তার এমন যোগ্য কলেজে-পড়া দিদি, দিদির জন্য শুভ্রবাবুর চোখে কত বেড়ে যেতো তার সম্মান !

'তুই ডেকে এনেছিস—তুই যা, গল্প কর গিয়ে।'

নিশ্চয়ই !—কিন্তু শুভ্রবাবু কি সুখী হবেন শুধু তার সঙ্গে গল্প ক'রে ? বাড়ির লোকদের সঙ্গে আলাপ না-হ'লে আর বাড়িতে আসা কেন ?

'আচ্ছা।—একটু চা পাঠিয়ে দিয়ো, কেমন ?'

সন্ধেবেলা আরজি পেশ করলো বিজু : 'বাবা, আমি গান শিখবো'।

'গান শিখবি ?' রাজেনবাবু একটু চুপ করলেন। যৌবনে তাঁরও ছিলো গানের নেশা। কলকাতার মল্লিক, বড়াল, দেবেদের বাড়ির দরোয়ানদের অপমান সহ্য ক'রে কত শুনেছেন বড়ো-বড়ো ওস্তাদ, বাইজিদের গান—কোনো বাড়িতে একান্তই যখন ঢুকতে পারেননি, ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থেকেছেন একটু ভেসে-আসা সুরের প্রার্থনায়।···কিন্তু গানের জগৎটা ভালো না, পদ্মের পথে এত কাদা যে পদ্মের আকাঙ্ক্ষাই ম'রে যায় অনেকের।···তাছাড়া তেমন গান কি আর আছে দেশে।

বললেন, 'বড়ো শক্ত রে। ও নিয়েই পড়ে থাকতে হয় দিনরাত।

'না তো! সপ্তাহে দু-ঘন্টা রেওয়াজ করলেই মডার্ন শেখা যায়,' বিজু তার মনোনীত সংগীত-শিক্ষকের মত উদ্ধৃত করলো।

'মডার্ন কী?'

'মডার্ন জানো না বাবা?' শাশ্বতী ভাইয়ের সাহায্যে এলো, 'রেডিও শোনো না কখনো? আধুনিক গান।'

'ও! নাকি কান্না আবার শিখতে হয় নাকি?'

বাবার এ-কথা শুনে বিজু পালালো, শাশ্বতী গম্ভীর হ'লো, কিন্তু স্বাতী লুটিয়ে পড়লো হেসে।

বিজু ধ'রে পড়লো শাশ্বতীকে।—'ছোড়দি, লক্ষ্মী-তো, বাবাকে ভালো ক'রে বলো। আমি কথা দিয়েছি শুভ্রবাবুকে—এখন যদি না হয়, ওঁর কাছে আর মুখ দেখাতে পারবো না।'

শাশ্বতী হেসে বললো, 'তুই কথা দিয়েছিস কী রে! পুঁচকে ছেলে!'

অপমান লাগলো বিজুর, কিন্তু সেটা চেপে গিয়ে অনুনয় করলো —'না দিদি, না! তুমি ইচ্ছে করলেই হ'য়ে যায়!'

শেষের এই কথাটা মন্দ লাগলো না শাশ্বতীর। কর্তৃত্বের সুরে বললো, 'আচ্ছা, শিখতে থাক তো। শেষ পর্যন্ত কোনোটাতেই তো অমত করেন না বাবা।'

তা-ই হ'লো। সপ্তাহে দু-দিন আসতে লাগলেন শুভ্রবাবু। বিজু হার্মোনিঅম টিপে-টিপে তার চোদ্দ বছরের মোটা গলায় রজনীগন্ধাকে বার-বার প্রশ্ন করতে লাগলো সে আজ রাত ক'রে ফুটলো কেন? এটাই রজনীগন্ধার স্বভাব ব'লে এর কোনো উত্তর সম্ভব নয়, আর

বোধহয় সেইজন্যই প্রশ্নটি করতে হ'লো বার-বার, বড্ডই বার-বার। শুভ্রবাবু না-এলেও মাঝে-মাঝে নিচের ঘর থেকে শোনা যায় বিজুর গীতাভ্যাস।

'বিজু দেখছি গাইয়ে হবেই', রাজেনবাবু মন্তব্য করলেন একদিন।

শাশ্বতী তাড়াতাড়ি. ভাইকে আশ্রয় দিলো : 'ওকে কিছু বোলো না বাবা।'

'মাস্টারটি কে?'

'কে একজন শুভ্রবাবু—'

'তা বিজুর কী হবে গান শিখে? তোরা শিখলেই পারিস।'

'আমি না!' স্বাতী ব'লে উঠলো। 'বাবাঃ! যা বিশ্রী দেখায় দাদাটাকে!'

'তুই?' বাপ তাকালেন শাশ্বতীর দিকে।

'ঐ শুবুর কাছে শিখবে কী!' সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীর জবাব। 'ও নিজে গাইতে শিখলো কবে যে অন্যকে শেখাবে?'

'অসভ্য মেয়ে!' শাশ্বতী আস্তে-আস্তে চ'লে গেলো সেখান থেকে।

বিজু মাথা খেয়ে ফেলতে লাগলো এই ব'লে যে বাড়িতে একদিন শুভ্রদার গান হোক।—'আমি যদি বলি না, তাহ'লে নিশ্চয়ই একদিন সময় ক'রে—'

'থাম-তো চালিয়াৎ!' শাশ্বতী হাসলো। 'তোর শুভ্রদার আবার সময়ের অভাব! বাড়ি-বাড়ি সেধে-সেধে গেয়ে বেড়ানোই তো তাঁর কাজ।'

'জানো তুমি!' বিজু মুখ লাল ক'রে বললো, 'কত নেমন্তন্ন ফিরিয়ে দেন, জানো?'

'তাহ'লে আর নেমন্তন্ন ক'রে কী হবে।'

'না, না!' বিজু ডবল উৎসাহে বললো, 'আমি বললে নিশ্চয়ই গাইবেন এসে। যত শুনতে চাও।'

শাশ্বতীর মনে হলো ছাত্রের চাইতে শিক্ষকের উৎসাহ কিছু কম না। আর ভদ্রলোক যখন এত ক'রে শোনাতেই চাচ্ছেন, তখন নিরাশ করা কি উচিত?

রাজেনবাবু সায় দিলেন সানন্দে। কতদিনের মধ্যে কোনো কোলাহল নেই বাড়িতে—শান্ত, ঝিমোনো, চুপচাপ—কত ক'মে গেছে বাড়ির লোক; যে-তিনজন আছে তারাও এতটা বড়ো হয়েছে যে নিজেদের মধ্যে তেমন টগবগে ঝগড়াও আর করে না। ছেলেমানুষ, মাঝে-মাঝে একটু আনন্দ-উৎসব না-হ'লে চলবে কেন?—বেশ!

একটু লোকজন না-হ'লে গান জমে না, শাশ্বতী বললো দু-চারজনকে। শুভ্রবাবুও সাড়ম্বরে এলেন। সঙ্গে তাঁর নিজের হার্মোনিঅম, বাঁয়া-তবলা, তবলচি, আর জনতিনেক বন্ধু—বন্ধু মানে পরীক্ষিত ও প্রতিশ্রুত ভক্ত। নিচের ছোটো ঘরটি বেশ ভরা-ভরাই দেখালো। হার্মোনিঅমে সুর দিয়ে শুভ্র একবার শ্রোতাদের দিকে তাকালো; শাশ্বতীর কিউটিকুরা পাউডর দু-হাতে মাখিয়ে নিয়ে আস্তিন গুটিয়ে প্রস্তুত হ'লো তবলচি। আর গোছা-গোছা পানের রুপোলি তবক পাখার হাওয়ায় কেঁপে-কেঁপে চিকচিক করতে লাগলো খুব যেন খুশি হ'য়ে।

রাজেনবাবুও এসে বসেছিলেন—শুধুই ছেলেমেয়ের মন-রক্ষার জন্য নয়। কিন্তু প্রথম গানটি হ'য়ে যেতেই আস্তে উঠে উপরে চ'লে গেলেন। ছি, একে এরা গান বলে! হচ্ছে কী দিন-দিন!

ভেবেছিলেন চুপে-চুপেই উঠে আসতে পেরেছেন, কিন্তু গাইয়ের চোখ এড়ালো না। তবে বেচারা-চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতে শুভ্র মুষড়ে পড়লো না; হার্মোনিঅম নিয়ে দু-চার মিনিট কসরৎ করতে-করতে হঠাৎ দ্বিতীয় গানটি ধরলো।

লম্বা ছাঁদের মুখ, চুল পিছনে ওল্টানো, ছোট্ট সরু একটু গোঁফও রেখেছে আবার। যে-ছেলেকে সে দেখেছে বই ঘাড়ে ক'রে স্কুলে যেতে, তার সঙ্গে একে ঠিক মেলাতে পারলো না স্বাতী। মানুষের ছেলেবেলাটা কোথায় প'ড়ে থাকে, বলো তো? হঠাৎ কি ছেলে-মানুষটা মিলিয়ে যায় হাওয়ার মধ্যে, বড়ো একজন তার জায়গায় এসে দাঁড়ায়? আমার এ-আমিটার কী হবে ক-বছর পরে? ছোড়দির মতো হবো, তারপর মা যেমন ছিলেন সেইরকম—এখন যা আছি তা তো বেশ লাগছে আমার, তবে কেন এটাকে ছাড়তে হবে? ইশকুলে-যাওয়া শুবুটা তো মন্দ ছিলো না; হঠাৎ গোঁফ গজিয়ে শুভ্রবাবু হ'য়ে হার্মোনিঅম বাজিয়ে গান ক'রে লাভটা তার কী হচ্ছে?

শুভ্রকে মোটে ভালো লাগছিলো না স্বাতীর। এক লাইনের অর্ধেক গেয়ে, প্রশংসার জন্য তাকায় চারদিকে, তারপর বাকি অর্ধেক গায়, বন্ধু তিনজন সজোরে মাথা নাড়ে; কেমন-একরকম গোল-গোল চোখে তবলচির দিকে তাকিয়ে হার্মোনিঅমের রীডে তিন আঙুলে বাড়ি মেরে-মেরে তাল বুঝিয়ে দেয়; মাঝে-মাঝে বেলো ছেড়ে দিয়ে বাঁ হাতটি উপরে তুলে হা-হা ক'রে ওঠে এমনভাবে যেন পাশের লোকের গায়ে ঢ'লে প'ড়ে যাবে—গান গাইতে হ'লে এ-রকম করতে হয় নাকি? ছোটো-ছোটো হাসির বুড়বুড়ি

উঠছিলো স্বাতীর গলায়, কিন্তু আর-কারো মুখে সে-রকম কোনো লক্ষণ সে দেখতে পেলো না, সকলেই গম্ভীর হ'য়ে শুনছে, বেশ ভালোই লাগছে যেন। স্বাতীও চেষ্টা করলো নিজেকে গুটিয়ে নিতে, শুভ্রকে চোখ দিয়ে না-দেখে কান দিয়ে তার গান শুনতে।

পর-পর তিনটি গান গেয়ে শুভ্র থামলো। রুমালে মুখ মুছে বললো, 'এবার আপনারা কেউ—'

'আপনার পরে কে আর গাইবে এখানে', ব'লে উঠলো শাশ্বতীর এক কলেজ-বন্ধুর দাদা, নিজেও পড়ুয়া, বর্তমানে বোনের এসকর্ট।

কথাটা অমায়িকভাবে মেনে নিয়ে শুভ্র জবাব দিলো, 'তাতে কী। কেউ কিছু করুন।'

ঘরের মধ্যে একটা নড়াচড়া ঠেলাঠেলির ঢেউ উঠলো। চশমার আড়াল থেকে শুভ্রর চোখ একটু ঘুরে-ঘুরে বেড়ালো, তারপর স্থির হ'লো স্বাতীর মুখের উপর।—'তুমি একটা গাও না।'

স্বাতী মাথা নেড়ে বললো, 'না।'

'না কেন? গাও!' শুভ্র উৎসাহ দিলো।

'পারি না।'

'তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হয় পারো', ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটির সঙ্গে একটু কৌতুক করলো শুভ্র।

হঠাৎ চোখ তুলে স্বাতী বললো: 'দেখে তো এ-রকম উল্টোউল্টি কতই মনে হয়।

দু-একজন হেসে উঠলো কথা শুনে। শুভ্র নিজেও হাসলো: সেই হাসির রেশটাই টেনে রেখে মুখখানা বেশ মোলায়েম ক'রে নিয়ে চোখ ফেরালো শাশ্বতীর দিকে।—'আপনি?'

'না—না !' শাশ্বতীর ভাবটা এইরকম যেন কেউ তাকে পেরেক খেতে বলেছে, কি ভাঙা কাচ, কি পাথরের কুচি।

বিজু চেঁচিয়ে উঠলো কোণ থেকে : 'বলুন, ছোড়দিকে ভালো ক'রে বলুন। ছোড়দি নিশ্চয়ই গাইবে।'

ছুটলো বিদ্যুতের মতো দৃষ্টি বিজুর দিকে ; সে-দৃষ্টি কারো-কারো মনে হ'লো পার্থিব রমণীয়তার পরম উদাহরণ।

'একটা গান করতে খুব কি কষ্ট হবে আপনার ?' মিনতি করলো শুভ্র।

'গাও না, শাশ্বতী', পিছন থেকে জোগান দিলো কলেজের বান্ধবীটি।

'একটা !' শুভ্রর তিন বন্ধুর একজনের নিবেদন।

'আপনার গান শুনবো ব'লে কতদিন ধ'রে মনে-মনে আমার ইচ্ছা।' আরো একটু সাহস করলো শুভ্র।

গাইতে হ'লো শাশ্বতীকে। দ্বিধা-ভরা গলায় একবার সুর আর দু-বার কথা ভুল ক'রে একটি রবীন্দ্র-সংগীত। শেষ হওয়া মাত্র বাহবার রব যা উঠলো তাতে ছোটো-ছোটো পোকার মতো ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম নামলো শাশ্বতীর মেরুদণ্ড বেয়ে।

শুভ্র আসন নিলো আবার ; একটি, আর-একটি, তারপর সকলের উপরোধে আরো একটি গেয়ে শেষ ক'রে দিল। তারপর শিঙাড়া, সন্দেশ, গল্প, চা, পান। বেশ ভালো লাগলো সকলেরই।

সকলে চ'লে যেতেই বিজু আনন্দে একবার গড়িয়ে উঠলো পাতা ফরাশে। 'কী গ্র্যাণ্ড হ'লো, ছোড়দি ! উঃ, ওআণ্ডরফুল !'

দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো সোফায় ব'সে জানলা-বাইরের টুকরো

কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো স্বাতী, মুখ না-ফিরিয়েই বললো, 'ওআঙুরফুল বানান কর তো!'

'তুই চুপ কর। তোর সঙ্গে কথা বলছি না আমি।'

'মন্দ না ভদ্রলোকের গান', শাশ্বতী সান্ত্বনা দিলো ভাইকে।

'মন্দ না! হুঁঃ—বলো কী!···আর কী-রকম প্রশংসা করলেন তোমার গানের। রাস্তায় আমাকে কী বললেন, জানো? বললেন, তোমার ছোড়দি যদি ভালো ক'রে একটু মন দেন গানে—'

'থাম, থাম', আবার বললো স্বাতী। 'যেমন বাজে তুই, তেমনি বাজে লোকের সঙ্গে তোর ভাব!'

'কী!' বিজু লম্ফ দিয়ে এসে খপ ক'রে চেপে ধরলো স্বাতীর চুল।

'ঠিক! পান খেয়ে ঠিক একটা বখার মতোই দেখাচ্ছে', ব'লে স্বাতী মাথার এক ঝাঁকানিতে চুল ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে উঠে গেলো ঘর থেকে।

বিজু রাগ ক'রে কথা বন্ধ করলো স্বাতীর সঙ্গে, আর সেটা জানবার জন্য তার গা ঘেঁষে দুমদাম ক'রে চ'লে যেতে লাগলো নাক উঁচু ক'রে। আর সকালে-বিকালে তার গানের রেওয়াজ পাল্লা দিতে লাগলো রেডিওর সঙ্গে। এটাও স্বাতীর উপর প্রতিশোধ।

কিন্তু শ্রেষ্ঠ প্রতিশোধ ঘটিয়ে দিলো স্বাতী নিজেই। হঠাৎ একদিন বিজু শুনলো স্নানের পরে বেরিয়ে আসতে-আসতে স্বাতী গুনগুন করছে সেই নীল সাগরের গান, শুভ্রদা সেদিন যেটা সর্বশেষে গেয়েছিলেন। প্রতিজ্ঞা ভুলে' গিয়ে সে বললো: 'স্বাতী! তবে?'

স্বাতী চোখ দিয়ে একটু হাসলো, গুনগুনানি থামালো না।

'বাঃ ! সুন্দর বসেছে রে তোর গলায় !' মুহূর্তে সমস্ত শত্রুতা ভুলে গেলো বিজু। বোনের গলা জড়িয়ে বললো, 'আয় না একটু আয় আমরা একসঙ্গে গাই ঘাজনার সঙ্গে !'

'যাঃ !'

'লক্ষ্মী-তো, আয় !—ঈশ, স্বাতী, তুই যদি একটু সিরিআসলি—'

'তুই আর ইংরিজি বলিস না তো, দাদা !'

বিজু রাগলো না, বরং আরো গ'লে গিয়ে বললো : 'সত্যি স্বাতী, সত্যি !—আচ্ছা আমি গাইবো না, তুই-ই ভালো ক'রে গা, আমি শুনি।'

কিন্তু স্বাতী ব'সে গেলো তার স্কুলের পড়া নিয়ে। বিজু একটু ঘুরঘুর করলো, তারপর আর টিকতে না-পেরে নিজেই ছুটে গেলো হার্মোনিঅমের কাছে ; সারাটা সকাল হাবুডুবু খেতে লাগলো—নীল সাগরের তরঙ্গে।

'বিজুটার পড়াশুনো হ'লে হয়', আপিশ যাবার মুখে কাঁদো-কাঁদো হার্মোনিঅমটা আর যেন সহ্য হ'লো না রাজেনবাবুর।

'ওর খুব মাথা, বাবা,' শাশ্বতী তাড়াতড়ি বললো।

'তবে আর ভাবনা কী। তুই-ই তো পড়াতে পারিস ওকে।'

স্পষ্ট দ'মে গেলো মেধাবী ভাইকে নিয়ে শাশ্বতীর উৎসাহ। 'বই নিয়ে বসতেই চায় না,' তাকে স্বীকার করতে হ'লো।

'হার্মোনিঅমের দেবীও কি সরস্বতী ?' ব'লে রাজেনবাবু আরেকটি পান মুখে দিয়ে আস্তে-আস্তে রওনা হলেন।

—আশ্চর্য ! আর মাসখানেকের মধ্যেই দেখা গেলো—মানে শোনা গেলো—হার্মোনিঅম আর হাঁ করে না। এত বড়ো একটা

ঘটনা চট ক'রে বিশ্বাস করা যায় না, আর সে-বিশ্বাসের সময় হবার আগেই হঠাৎ এক সন্ধ্যায় নিচের ঘর থেকে কেঁপে-কেঁপে উঠে এলো আর-একটি আর্তস্বর, হার্মোনিঅমের চেয়ে অনেক বেশি কান্না-পাওয়া, গায়ে-কাঁটা-দেওয়া, দাঁতে-দাঁত-লাগানো। আপিশ-ফেরৎ শরীরটাকে বারান্দায় পাটির উপর এলিয়ে দিয়েছিলেন রাজেনবাবু, একটু চমকে উঠেই বললেন, 'এ আবার কী?' তারপর নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলেন :

'বেহালা। বিজু বেহালা শিখছে?'

'কী জানি। জানি না তো,' বললো শাশ্বতী।

'বা ছোড়দি!' স্বাতী ব'লে উঠলো, 'সেদিন সুকোমলবাবুকে দেখলে না বেহালা হাতে নিয়ে আসতে?'

'কী জানি! ও-সব তুই-ই দেখিস!' খোঁপায় একবার হাত দিয়ে শাশ্বতী বললো।

'শুভ্রর বন্ধু সুকোমল! সেই-যে তোমার গান শুনে বলেছিলো—'

'আচ্ছা থাম! বড়ো-বড়ো মানুষদের আর নাম নিয়ে বলতে হবে না তোকে।'

রাত্রে খেতে ব'সে রাজেনবাবু বললেন, 'বিজু, আবার বেহালা কেন?'

মধুর-একটু হেসে বিজু জবাব দিলো, 'গান আমার হবে না, বাবা।'

'একটাতে যখন হ'লো না, আর-একটাতে বুঝি হবেই?'

'বেহালাটা আমি পারবো', বিজু নিশ্চিন্ত।

রাজেনবাবু ভাতের থালার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু যদি পড়িস-টড়িস—'

উৎসাহে মাথা নেড়ে বিজু জবাব দিলো, 'সে আমি ঠিক ক'রে নেবো—তুমি কিচ্ছু ভেবো না, বাবা।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রাজেনবাবু আবার বললেন, 'বেহালা পেলি কোথায়?'

মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'লো বিজুর।—'সুকোমলদাই এনে দিয়েছেন একটা, চল্লিশ টাকা দাম। একসঙ্গে দিতে হবে না—মাসে পাঁচটা ক'রে টাকা দিয়ো, কেমন বাবা?' ব'লে বিজু তাকালো বাবার নিচু-করা মুখের দিকে। বেহালার মতো একটা সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া যায় মাসে মাত্র পাঁচ টাকা খরচে—তবু বাবা সুখী নন। কী যে—!

বেহালার তারে জং ধরলো বেহালার দাম পুরো শোধ হবার আগেই। অবশ্য গান-বাজনার আবহাওয়াটা রইলো বাড়িতে: সুকোমল আসে মাঝে-মাঝে, শুভ্রও আসে, আসে শাশ্বতীর সেই বন্ধু আর তার দাদা, পড়শিনিদের মধ্যে কেউ-কেউ। শাশ্বতীর বন্ধু অনেক, বন্ধুতারই বয়স তার এখন, থাকেও অনেকে কাছাকাছি; দোতলার ঘরে শাশ্বতীর সভা যখন বসেছে সন্ধেবেলায়, ঠিক সেই সময়ে বিজু জড়ো করেছে নিচের ঘরে তার সাংগীতিক অগ্রজদের; হাসির ঢেউ গড়িয়ে যায় উপর থেকে নিচে, গানের কলি উড়াল দেয় নিচে থেকে উপরে। দোতলা মাঝে-মাঝে উতলা হয়, একতলা ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলে; আর লাফিয়ে লাফিয়ে পারাপার করে বীর বিজন। তারপর, ঠিক বোঝা গেলো না কেমন ক'রে হ'লো, নিশ্চয়ই বিজুরই চেষ্টাতে—কবে উঠলো স্বাধীনতার সিঁড়ি, উড়লো সাম্যের নিশান, আর মৈত্রীর তো

এমনিতেই অভাব ছিলো না। এক-একদিন সন্ধেবেলা রাজেনবাবু যখন ক্লান্ত পায়ে ফেরেন, বাড়িতে পা দেয়ামাত্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিচের ঘর থেকে ছেলেবয়সের কলোচ্ছ্বাস।

ব্যাপারটা মন্দ লাগলো না স্বাতীর। সে-যে গান ভালোবাসে, সে-কথা এতদিনে বুঝলো নিজের মনে। আসরে গাইবার সময় শুভ্রকে বড়ো বোকা-বোকা লাগে, কিন্তু ব'সে-ব'সে গুনগুন করে যখন—ভালোই তো। স্নানের সময়, কিংবা ঘরে যখন একা থাকে, অন্তত দাদার শুনে ফেলবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন সে-ও গুনগুন করে—কথা বাদ দিয়ে কেবল সুর। গানটাকে শুধুই গুনগুনানি মনে হয় তার—হার্মোনিঅম, তবলা, আলো, লোকজন--কিছুই যেন মেলে না তার সঙ্গে, শুধু একটা গুনগুনানি, যেমন পাতা কেঁপে ওঠে হাওয়ায়, যেমন শুয়ে-শুয়ে দেখি চাঁদ তাকিয়ে আছে মুখের দিকে—সেই চুপচাপ তাকিয়ে-থাকাটা যদি কোনোরকমে কানে শুনতে পেতুম! এমন গান কি জানে কেউ? না, কেউ জানে না তবু যারাই গান গায়, ঐ-গানই মনে-মনে ভাবে, যারাই শোনে ঐ গানই শুনতে চেষ্টা করে মনে-মনে।

'চুপ ক'রে যদি গান গাওয়া যেতো', মনের কথাটা ব্যক্ত না-ক'রে পারলো না স্বাতী, 'তাহ'লে বেশ হতো ; না, ছোড়দি?'

'সে আবার কী!' জবাব দিলো আঠারো-ধরো-ধরো যুবতী।

'আচ্ছা ছোড়দি, রেলগাড়িতে যেতে-যেতে কখনো তোমার মনে হয়নি আকাশ ভ'রে কে যেন গান করছে?'

'ও!' শাশ্বতী হাসলো। 'রেলগাড়ির আওয়াজ দিয়ে যা খুশি তা-ই বলানো যায়, গাওয়ানো যায়—কে না জানে?'

'না, আমি তা বলিনি—' থাক, আর বলবে না। রেলগাড়ি
চাকা যতই চ্যাঁচাক, কিছুতেই পারে না সেই গানকে চাপা দিতে
আকাশের গান, স্পষ্ট কানে শুনেছে সে, মাইলের পর মাইল
স্টেশনের পর স্টেশনের ঝলসানি পার হ'তে-হ'তে। কিন্তু যেই কোনে
বড়ো স্টেশনে গাড়ি ঢুকলো, উঠলো মানুষের রোল—আর শোন
যায় না। রেলগাড়িতে চড়ে তো সকলেই, আর-কেউ শোনেনি ?

সন্ধেবেলা ছোড়দিকে খুঁজতে-খুঁজতে স্বাতী এলো নিচে
ঘরে। শুভ্র কী-যেন বলছিলো নিচু গলায়, শাশ্বতী তাড়াতাি
ব'লে উঠলো, 'আয়, স্বাতী। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?'

'কোথায় আবার থাকবো।'

'একটু বোস। আমি এক্ষুনি আসছি।' কেমন-একরক
এঁকে-বেঁকে চ'লে গেলো শাশ্বতী।

টেবিলে ছিলো আধ গেলাশ জল, হাত বাড়িয়ে জলটুকু
খেয়ে নিয়ে শুভ্র উঠলো।

'যাচ্ছেন নাকি ?' স্বাতী একটু অবাক হ'লো।

'হ্যাঁ, আজ যাই। কাজ আছে।'

শুভ্র চ'লে গেলো। আর-কেউ এলো না, ছোড়দিও আর
কথাবার্তা বললো না বেশি, একটু মন-মরাই কাটলো সন্ধেটা।

'স্বাতী, শোন,' শাশ্বতী ডেকে বললো দিন দুই পরে, 'এ-বইট
দিয়ে আয় তো শুভ্রবাবুকে।'

'কোথায় দিয়ে আসবো ?'

'নিচে এসে ব'সে আছেন।—আমার শরীরটা আজ ভালো
নেই, বলিস।'

বইখানা হাতে নিয়ে স্বাতী একটু তাকিয়ে বললো, 'কালই না দিয়ে গেলো? কখন পড়লে?'

'ও আমার পড়া বই।'

'ছোড়দি, আর-একদিন রাখো না, আমি পড়বো।'

'না, দিয়ে আয়।'

'পারবো না! তুমি যেতে পারো না—সত্যি-তো আর অসুখ করেনি তোমার!'

'লক্ষ্মী-তো!···আচ্ছা, বইখানা আবার আমি আনিয়ে দেবো তোকে—এখন দিয়ে আয়, কেমন?' দু-আঙুলে কপাল টিপে ধ'রে শাশ্বতী জুড়ে দিলো—'উঃ, মাথা যা ধরেছে।'

স্বাতীর হাত থেকে নিয়েই শুভ্র একবার বইখানা খুললো। শাদা-কালো কাগজের গায়ে নীল রঙের একটা খাম ঝিলিক দিলো স্বাতীর চোখে। তক্ষুনি বই বন্ধ ক'রে শুভ্র একটু হেসে বললো, 'ছোড়দি কী করছে?'

'মাথা ধরেছে বোধহয়।'

'আচ্ছা—' শুভ্র উঠলো; স্বাতীর সামনে হঠাৎ থেমে তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'তুমি গান শেখো না কেন বলো তো? এত সুন্দর গলা তোমার।'

'ছোড়দির চেয়েও?' স্বাতীর মুখ দিয়ে যেন ব'লে উঠলো অন্য কেউ।

'হ্যাঁ, ছোড়দির চেয়েও', তক্ষুনি জবাব দিলো শুভ্র। 'এসো না আমার কাছে—খুব ভালো ক'রে শিখিয়ে দেবো তোমাকে', ব'লে শুভ্র তিন আঙুলে স্বাতীর গাল টিপে দিলো একটু।

উপরে এসে স্বাতী সোজা ঢুকলো বাথরুমে, জলের ঝাপটা দিলো সমস্ত মুখে, সাবান দিয়ে ঘ'ষে-ঘ'ষে লাল ক'রে ফেললো গাল, পারলে চামড়া তুলে নেয় ওখানকার। তারপর তার গোলাপি রঙের অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক ছেড়ে ব্লাউজ আর শাড়ি পরলো; শাদা, কালো-পাড়ের মিলের শাড়ি। আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিতে-নিতে হঠাৎ মনে পড়লো মা-কে—এ-দু'বছরের মধ্যে এমন ক'রে মনে পড়েনি কোনোদিন, কোনোদিন মনে প্রশ্ন ওঠেনি মা কেন নেই, অসুখ দেখে-দেখে ধ'রেই নিয়েছিলো যে একদিন থাকবেন না। আজ মনে হ'লো তাই-তো, অসুখ হ'লেই কি মানুষ ম'রে যায়, আর না-ও তো অসুখ হ'তে পারতো।···কোনোদিন, আর কোনোদিন আমি শাড়ি ছাড়া কিছু পরবো না, মনে-মনে যত বার এ-কথা বললো সে, ততবার তার চোখ জলে ভ'রে ~~উঠলো~~ একা ঘরে আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে।

স্বাতীকে আর দেখা গেলো না একতলার সান্ধ্য সভায়। 'কী রে?' ক-দিন পরে শাশ্বতী জিগেস করলো, 'হয়েছে কী তোর?'

'কী আবার হবে!'

'কী-রকম একা-একা থাকিস।'

'না তো!'

'জানিস স্বাতী,' শাশ্বতী চেষ্টা করলো বোনের মনে ফুর্তি আনতে, 'শুভ্রবাবুরা সবাই মিলে একটা গানের স্কুল খুলছেন পাড়ায়। নাচের ক্লাশও থাকবে—ভরতি হবি তুই নাচে?'

'না!'

'না কেন? ছেলেবেলায় নিজে-নিজেই কত নাচতিস—মনে আছে? শিখলে খুব ভালো হবে। এত সুন্দর ফিগার তোর—'

'চুপ করো, ছোড়দি!' স্বাতী খেঁকিয়ে উঠলো।

শাশ্বতীর মন বেশ ভালো ছিল সেদিন; বোনের পিঠে হাত রেখে বললো, 'কী হয়েছে তোর বল তো? সব সময় রাগ?'

জবাব না-দিয়ে আঁচলটা আঙুলে জড়াতে লাগলো স্বাতী।

'শোন, আর দেরি না—তৈরি হ'য়ে নে।' ব্যস্ত ভাব শাশ্বতীর।

'কেন?'

'বা! মিতালি সংঘে ম্যাজিক না আজ?'

'আমি যাবো না।'

'সে কী রে? সবাই যাচ্ছে আর তুই যাবি না!'

'না।'

'চল না—খুব ভালো ম্যাজিক—চল।' হাত ধ'রে টান দিলো শাশ্বতী।

'আমি যাবো না।'

'থাক তবে!' স্বাতীর হাতটায় জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে শাশ্বতী চ'লে গেলো সাজতে। তার সময় নেই—এক্ষুনি এসে পড়বে বন্ধুরা।

ছাড়া-ছাড়া মেঘ করেছে সেদিন, এলোমেলো হাওয়া। ছাতে পাইচারি করতে-করতে স্বাতী দেখছিলো আকাশে চৌরঙ্গির মতো চওড়া ছাইরঙা রাস্তা, আর সেই রাস্তা দিয়ে ছুটে-আসা টকটকে লাল দমকলের মতো রোদ্দুরের এক-একটি লম্বা-লম্বা

লাইন। আর-কিছু করবার ছিলো না তার: বাড়ির সব বই অন্তত দশবার ক'রে পড়া হ'য়ে গেছে, ধার-করা বইও কিছু নেই, আর ভুলেও সে একটা গানে টান দেয় না আজকাল। আস্তে-আস্তে আলো নিবলো আকাশে, মেঘেরা আরো একটু জায়গা জুড়লো, সত্য-গ্যাস-জ্বলা আবছা রাস্তা দিয়ে স্বাতী দেখতে পেলো বাবা আস্তে-আস্তে আসছেন।

সেও সিঁড়ি দিয়ে নামলো, আর রাজেনবাবুও দোতলায় এসে পৌঁছলেন।—'বাবা, এত দেরি তোমার!'

'চাকরি রে, চাকরি,' নিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে এলেন রাজেনবাবু।

বাবার সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে স্বাতী বললো, 'আর যেন কেউ চাকরি করে না! সবাই তো ফিরেছে সেই কখন!'

'নাকি?' বাথরুমের দরজার কাছে আলনার ধারে দাঁড়ালেন রাজেনবাবু।

বাবার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কোটের বোতামের উঁচু ধারটায় একটি আঙুল গোল ক'রে একবার ঘুরিয়ে এনে স্বাতী বললো, 'বাবা তুমি গলা-বন্ধ কোট পরো কেন? বেশ স্যুট-ট্যুট পরলেই পারো।'

'রক্ষে কর!' রাজেনবাবু কোট খুললেন, শার্ট তুললেন।

'তোমার প্যান্টগুলোই বা কী! প্রত্যেকটা ছোটো!'

'ভালো-তো। ওতেই সুবিধে লাগে আমার।' জুতোর দশ ঘণ্টার জেলখানা থেকে পা দুটোকে ছাড়িয়ে নিলেন রাজেনবাবু।

'না বাবা,' স্বাতীর ঠোঁটের কাছটা কেমন-একটু করুণ হ'লো। 'ভালো দেখায় না।'

'এমনিতেই যারা দেখতে ভালো তাদের কি আর সাজতে হয় !' চোখ টিপে রাজেনবাবু ঢুকলেন বাথরুমে, বেরিয়ে এলেন হাত-মুখ ধুয়ে, খালি পায়ে, ধুতি আর গেঞ্জি প'রে।

'তোমার পাটি পেতে রেখেছি, বাবা।' স্বাতীর চোখে-মুখে হাসি।

'আঃ, কী আরাম।' রাজেনবাবু লম্বা।'

চা এলো, সঙ্গে দুখানা তিন ঘণ্টা আগেকার ভাজা নিমকি।

'বাবা, তুমি কিছু খাও না কেন ?' স্বাতীর প্রশ্ন।

'সে কী রে ?'

'এই যেমন আমরা কত কিছু খাই—তালশাঁস খাই, পেয়ারা খাই, পাটালি খাই—তুমিই তো বাজার থেকে আনো সব, কিন্তু তুমি-তো খাও না ?'

মেয়ের মুখের দিকে কৌতুকের চোখে তাকিয়ে রইলেন রাজেনবাবু। শুধু কৌতুক ?

'লিচু খাবে, বাবা, লিচু ? হ্যাঁ বাবা—লিচু তোমাকে খেতেই হবে !' সম্মতির অপেক্ষা না-ক'রে স্বাতী ছুটে গিয়ে নিয়ে এলো তার পেন্সিল রাখার বাক্সে লুকোনো চারটি বড়ো-বড়ো ম্যাজেন্টা রঙের লিচু। বাপের হাতের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে বললো, 'খাও।'

লিচু একটা খেতে হ'লো।

'কেমন ? ভালো না ?'

'চমৎকার।'—মেয়ের একটি হাত নিজের হাতে নিয়ে রাজেনবাবু তাতে তুলে দিলেন আর তিনটি।

বারান্দার রেলিঙে পিঠ ঠেকিয়ে হাঁটু উঁচু ক'রে ব'সে স্বাতী বললো, 'রোজ তোমার জন্য লিচু রেখে দেবো—কেমন ? খাবে তো ?'

'আজ-যে তুই বাড়িতে ?' রাজেনবাবু জিগেস করলেন।

'ও মা ! আমি-তো বাড়িতেই থাকি রোজ !'

'আজ একা বুঝি ?'

প্রশ্নটা শুনে মনে কোথায় একটু ব্যথা লাগলো স্বাতীর। কিছু বললো না।

'তোদের গান-বাজনা কেমন চলছে ?'

এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর না-দিয়ে স্বাতী বললো 'বাবা, তুমি রোজ আপিশ থেকে এসে বাড়িতেই ব'সে থাকো কেন ?'

'ভালো লাগে ব'লে—আর অভ্যেস ব'লে।'

'মাঝে-মাঝে একটু বেরোলেও তো পারো—'

'কোথায় যাই বল তো ?'

দাঁত দিয়ে একটি লিচুর খোশা ছাড়াতে-ছাড়াতে স্বাতী আস্তে-আস্তে বললো : 'বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি যেতে পারো—কি শনি-রবিবারে সিনেমায়—'

'আচ্ছা আচ্ছা, ঢের হয়েছে ! তা তুই কেন বাড়ি ব'সে থাকিস সন্ধেবেলা ?'

কোমরের উপর থেকে শরীরটি একটু মুচড়িয়ে স্বাতী বললো, 'এ—মনি।'

'তোর দিদিটা বেড়ুনি হয়েছে খুব, আর তোর দাদা-তো বিশ্ববন্ধু। তোর বন্ধুরা আসে না কেউ ?'

'আমার কোনো বন্ধু নেই,' ব'লে স্বাতী খোশা-ছাড়ানো নীলচে-শাদা নিটোল লিচুটি একেবারে পুরে দিলো মুখের মধ্যে।

সন্ধেবেলাটা সম্প্রতি একটু নির্জনই হ'য়ে উঠেছিলো

রাজেনবাবুর, হঠাৎ ভ'রে উঠলো। কত কথা স্বাতীর! রাজেনবাবুর শ্রান্ত শরীরের উপর যেন ফুরফুরে হাওয়া ব'য়ে যায়, আর ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি ঝ'রে পড়ে। কোনোদিন স্বাতী হয়তো বললো, 'শোনো বাবা, আমাদের রাস্তা দিয়ে ঝকঝকে কালো নতুন একটা গাড়ি যায়, দেখেছো তুমি?'

'নাকি?'

'ঐ মোড়ে যে-কম্পাউণ্ডওলা মস্ত বাড়িটা না—ও-বাড়ির গাড়ি। চারটে গাড়ি ওদের। খুব বড়োলোক ওরা, না বাবা?'

'তা হবে।'

'কিন্তু চারটে গাড়িতে তো আর একসঙ্গে চড়া যায় না। কী হয় চারটে দিয়ে?'

রাজেনবাবু একটু ভেবে বললেন, 'অনেক লোক বোধহয় বাড়িতে, আর তারা তোর মতো ঘরে ব'সে থাকে না কেউ—সকলেই খুব বেড়ায়-টেড়ায়।'

'বাবা, তুমি একটা গাড়ি কেনো।'

'তাহ'লে বেড়াবি তুই?'

স্বাতী মুখ টিপে হাসলো।—'তা মন্দ কী। বেড়াতে হ'লে-তো গাড়িই ভালো। মেয়েরা-যে রাস্তায় হেঁটে-হেঁটে বেড়ায়, একটুও ভালো লাগে না আমার।'

রাজেনবাবু হাসলেন কথা শুনে।

স্বাতী বললো, 'হাসবার কী আছে—ঠিকই-তো!—আর গাড়ি হ'লে বেশ তোমাকেও আর ট্র্যামে চ'ড়ে আপিশ করতে হয় না।'

'কেন, ট্র্যাম তো ভালো।'

'বিশ্রী—! কী-ভিড় আপিশের সময়! হ্যাঁ বাবা—একটা গাড়ি কেনো।'

'দেখি।'

'আচ্ছা বাবা,' রাজেনবাবুর সিঁথির উপর দিয়ে একটি আঙুল আস্তে টেনে নিতে-নিতে স্বাতী বললো : 'আমরা তো এর চেয়ে ছোট একটা বাড়িতে যেতে পারি। দুটো ঘর তো খালিই প'ড়ে থাকে।'

'তোর দিদিরা এলে লাগে না?'

'ওঃ, কবে-না-কবে আসবে দিদিরা, তাই জন্যে—আচ্ছা, আর-তো দিদিরা কেউ এলো না একবারও?'

'আসা কি সোজা রে?'

'কেন, মা থাকতে তো কতবার—'

রাজেনবাবু একটু হেসে বললেন, 'মা না-থাকলে বাবার কাছে কি আর আসে মেয়েরা।'

'আসে না? বলো কী তুমি!'

'আসে নাকি?'

'বা রে! আমি! আমি বুঝি আর মেয়ে না তোমার!' ব'লে স্বাতী বাপের গা ঘেঁষে শুয়ে পড়লো উপুড় হ'য়ে। ঘন চুলে ভরা কোঁকড়া কালো মাথাটিকে রাজেনবাবু চোখ দিয়ে চুম্বন করলেন অনেকক্ষণ।

•

—আশ্চর্য ঘটনা! অভূতপূর্ব প্রস্তাব! কোনো-এক শনিবারে

আপিশ থেকে এসেই রাজেনবাবু বললেন, 'কোথায় গো রাজকন্যারা, সিনেমায় যাবে নাকি আজ ?'

স্বাতী ছুটে এসে বাবাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো : 'সত্যি বাবা, সত্যি ?'

শাশ্বতী একটু ফাঁপরে পড়লো। শনিবার গীতায়তনে তার ক্লাশ—শুভ্রদের ইশকুল ওটা—এদিকে বাবাকে নিরাশ করতেও অনিচ্ছা, হঠাৎ একটা শখ হয়েছেই যখন !—'কোনটাতে যাবে ?' ঠাণ্ডা গলায় সে জিগেস করলো।

'যেটাতে ইচ্ছে তোদের।'

' "বন্দিনী"টা মন্দ হয়নি শুনেছি—' বিজ্ঞ মন্তব্য শাশ্বতীর।

'ছাই !' বিজুর শাদা কোঁচাটা দুলে উঠলো দরজার কাছে। দেখতে হয় তো "প্রতিশোধ"—ওঃ, গ্লোরিআস !'

'দেখেছিস নাকি তুই ?' শাশ্বতী যেন যুদ্ধে আহ্বান করলো ভাইকে।

'কঁ—বে !'

'তাহ'লে এখন আর যাবি না তো ?' বললো স্বাতী।

'ব'য়ে গেছে !' ঝিলিক দিয়ে উঠলো দরজার আড়ালে বিজুর বীরদর্প ! 'বললেও যেতাম না আমি—রিহার্সেল আছে না আমার !'

'রিহার্সেল ! নাটক ?' সোজা ছেলেকে জিগেস না-ক'রে রাজেনবাবু শাশ্বতীর দিকে তাকালেন।

'পাড়ার ছেলেরা বুঝি করছে একটা—আর এ-পাড়ায় কিছু কি হ'তে পারবে যাতে বিজু নেই !' একটু গর্বিতভাবেই শাশ্বতী বললো।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত রিহার্সেলের মায়া কাটালো বিজু। ট্যাক্সি চ'ড়ে সবাই মিলে যাওয়া হ'লো, আর সবচেয়ে দামী টিকিট কিনে বসা হ'লো দোতলায়। শাশ্বতী বসলো চেয়ারে ঠেশান দিয়ে অভিজ্ঞ ধরনে, যতক্ষণ-না আরম্ভ হ'লো দর্শকদের মধ্যে ঘুরে বেড়ালো তার চোখ, আর আরম্ভ হবার পর থেকে বিজু অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলো তার পাশে ব'সে—'এইবার মেয়েটা রাগ করে বাপের বাড়ি চ'লে যাবে,' 'ছেলেটার অসুখ করবে, তাই চোখ ছুটো ও-রকম—' শাশ্বতী এমনকি একটা চড়ও মারলো তার কানের উপরে, বেশ জোরেই মারলো, কিন্তু বিজু নাছোড়।

ফিরতি ট্যাক্সিতেও অবিশ্রান্ত বকবকানি তার।—'জানো ছোড়দি, শিবেনের গানগুলি কিন্তু প্লে-ব্যাক। গেয়েছে আর-একজন, ছবিতে শুধু ঠোঁট নেড়েছে।'

'আচ্ছা হয়েছে, তুই থাম-তো এবার!' কিন্তু শাশ্বতীর কথার মধ্যেই ব'লে উঠলেন রাজেনবাবু—'সত্যি?' ফিল্ম দেখে, মানে, দেখে-শুনে, রীতিমতোই চমকেছিলেন তিনি। সেই কোন জন্মে বোবা বায়োস্কোপ দেখেছিলেন—তখনকার দিনে বায়োস্কোপ বলতো—এই প্রথম দেখলেন কথা-বলা ছবি, তাও বাংলা! কী-সব কাণ্ড—অ্যাঁ! কী ক'রে করে!

'বাঃ, সত্যি না!' বাবার উৎসাহে বিজু একেবারে টগবগ করতে লাগলো ফুটন্ত জলের মতো। 'গানগুলি গেয়েছে-তো শশাঙ্ক দাশ—ঐ-তো মনোহরপুকুরে থাকে, নিউ মডেল স্টুডিবেকার আছে একখানা।'

'অনেক-তো খবর রাখিস তুই!'

কথাটা বিজু প্রশংসা ব'লেই ধরলো, আর প্রশংসাটা মেনে নিলো একটুমাত্র হেসে। 'শশাঙ্কর গান কত ফিল্মে-যে থাকে আজকাল—আর সত্যি গায়ও খুব ভালো, না ছোড়দি? শুভ্রদাও প্লে-ব্যাক করবেন শিগগির।'

রাজেনবাবু বিষয়টা নিয়ে একটু-যেন চিন্তা ক'রে বললেন, 'তা যাই বলিস তোরা, গানের সঙ্গে-সঙ্গে ঠিকমতো ঠোঁট নাড়াও কম শক্ত না। আর ছেলেটি দেখতেও—'

'কী হ্যাণ্ডসম।' কথা কেড়ে নিয়ে বিজু বললো। 'ও-তো স্বজিত—এই সেদিন নামলো "স্বপ্ন-পুরী"তে, আর এর মধ্যেই—হবে না! চেহারাখানা কেমন!'

'বিশ্রী!' এতক্ষণে স্বাতী কথা বললো। 'ঠোঁট দুটো বোকা-বোকা!'

'জানিস!' বিজু শাসালো, '"রূপরঙ্গের"র ভোটে স্বজিত ফাস্ট হয়েছে চেহারায়!'

'হোকগে! তার চাইতে ঐ আর-একটি ছেলে, ঐ-যে বন্ধু, সে ঢে—র ভালো দেখতে।'

নায়কের বন্ধুর চেহারাটা একটু চেষ্টা ক'রে মনে এনে রাজেনবাবু বললেন, 'তাকে ভালো লাগলো তোর?'

'হ্যাঁ বাবা, ও বেশ সুন্দর। একটু-একটু তোমার মতো।'

'আমার মতো!' রাজেনবাবু হেসে উঠলেন। 'আমি ও-রকম সুন্দর হ'লে-তো কাণ্ডই করেছিলাম!'

'তুমি সুন্দর না? বলে কী!' স্বাতীর আঁটোসাঁটো সারবাঁধা দাঁত ঝকঝক ক'রে উঠলো হাসিতে।

বাড়ি ফিরেও খানিকক্ষণ চললো সিনেমা-প্রসঙ্গ। ছোড়দিকে

উপলক্ষ্য আর বাবাকে লক্ষ্য ক'রে বিজু উন্মুক্ত ক'রে দিলো এ-বিষয়ে তার অসামান্য জ্ঞানের ভাণ্ডার। স্বাতী চুপ ক'রেই রইলো মোটামুটি, যেন অন্যদিকে তাকিয়ে অন্য কথা ভাবছে। আলো-না-জ্বালা বারান্দায় তার আবছা মুখের দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু হঠাৎ ব'লে উঠলেন, 'স্বাতী, তোর জন্মদিন তো শিগগির।'

স্বাতী দ্রুত ভঙ্গিতে মুখ ফিরিয়ে তাকালো।

'বেশ বড়োসড়ো হলি—এবার তোর জন্মদিন খুব ভালো ক'রে করা যাক।'

'হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ,' শাশ্বতী হাতে তালি দিয়ে উঠলো। 'খুব ভালো হবে! খুব মজা!'

'গানের আসর যা হবে একখানা!' বিজু লাফিয়ে উঠলো। 'ওঃ! শশাঙ্ক দাশকেই নিয়ে আসবো একেবারে। [illegible] লোক ভেঙে পড়বে।'

'বেশ-তো—গানের আসর হবে—আর? বলবি কাকে-কাকে?'

'শোভা-দি, লীলা-মাসি, মিঠু-দা—' বিজু গড়গড় ক'রে আত্মীয়দের নাম ব'লে গেলো।

'তা তো হ'লো। আর? তোদের বন্ধুরা?'

'সে তো—' হঠাৎ থেমে বিজু বললো, 'আচ্ছা ছোড়দি, হারীতবাবু? হারীতবাবুকে বলি?'

'যত তোর—!'

'কী-রকম বক্তৃতা করলেন সেদিন মিতালি-সংঘে! কী স্মার্ট, না? ঈশ, আর-একটু থাকতে যদি, ছোড়দি, তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে যেতো!'

'ও, তুই ছাড়িসনি!' শাশ্বতী খুব জোরে হেসে উঠলো।

রাত্রে শোবার আগে বাবাকে একা পেয়ে স্বাতী বললো, 'বাবা, শোনো—'

'কী রে?'

'জন্মদিন-টন্মদিন কিন্তু কোরো না।'

'কেন?'

'না, ভালো লাগে না।'

'কী ভালো লাগে তোর বল তো?'

কী ভালো লাগে? তা কি সে নিজেই জানে? ছুটির দিনের শাঁ-শাঁ দুপুরবেলায় হঠাৎ মাঝে-মাঝে কী-একটা আশ্চর্য ভালো-লাগা ছড়িয়ে পড়ে—সিনেমা, বেড়ানো, নেমন্তন্ন, হৈ-চৈ, সাব-কিছুতেই তো সে-রকম হয় না—আর তাই-ই যদি না হ'লো, যত ভালোই হোক, কিছুই কি ভালো? আকাশ গান করে তার কানে-কানে, পৃথিবীটাই রেলগাড়ি, স্টেশন নেই, কেবল চলছে, দিনে-রাত্রে কখনো থামে না গান, আমরা শুনি না, কেউ শোনে না, আমি শুধু শুনি, আর শুনি যদি, সব সময় শুনি না কেন?

'বল না, কী তোর ভালো লাগে?'

'বেশ, যা ইচ্ছে কোরো', একটু হেসে স্বাতী চ'লে গেলো শুতে।

জন্মদিনের সকালবেলায় চা খাবার পরে রাজেনবাবু বললেন, 'শাশ্বতী, একটু বেরোবি আমার সঙ্গে?'

স্বাতী তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। বাবা বললেন, 'না, তুমি আজ না, তুমি বাড়িতে থাকো।'

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হ'য়ে গিয়ে স্বাতী দাঁড়িয়ে রইলো একটু,

তারপর আস্তে-আস্তে স'রে এলো সেখান থেকে। বাবা-যে ভাত নিলেন না, তার চেয়েও খারাপ লাগলো বাবার মুখের 'তুমি'; মনে পড়লো না আর-কোনোদিন বাবা 'তুমি' বলেছেন জন্মদিন—তো তার দোষ কী।

সিঁড়িতে ফিরে আসার শব্দ হ'লো ঘণ্টাখানেক পরে; ডাকাডাকি শুনে সে জবাব দিলো বিরক্ত গলায়, 'ক্যা—নো ?'

'শিগগির আয় !'—ছোড়দির আর কী, ফুর্তি ধরে না !

'আমি অঙ্ক করছি !' ব'লে সে দ্রুতবেগে লিখতে লাগলো দশমিকের সংখ্যা। অঙ্ক খুব ভালো, অঙ্ক সবচেয়ে ভালো; মন-খারাপ হ'লে ভুলে' থাকতে এমন আর কিছু না।

'আয় না !'

'না, আমি এখন পারবো না !' তোপের মতো বেরুলো স্বাতীর আওয়াজ।

'এই নে !' ঝুপ ক'রে তার টেবিলের উপর কী-একটা পড়লো, আর বিজু পালালো দৌড়ে। দোকানের নাম-ছাপানো মস্ত চৌকো বাক্স একটা—ঈশ ! এ-রকম একটা বাক্স কতদিন মনে-মনে চেয়েছে সে, কী ভারি, আর কী ভালো, কত জিনিশ রাখা যায়—দেখেই তার আবার পুতুল খেলতে ইচ্ছে করছে। কোথায় পেলো দাদা ? আর বড়ো-যে ভালোমানুষ—নিজে না-রেখে তাকে দিয়ে গেলো ?

পেনসিল রেখে দিয়ে বাক্সটা খুললো স্বাতী। ও মা, শাড়ি ! কী-সুন্দর সবুজের উপর সোনালি বুটি ! আবার ব্লাউজও ! আর একটা পাৎলা ছোটো বাক্সে চিকচিকে কাগজের তলায় ঠিক জ্যামিতির ত্রিভুজের মতো ভাঁজ-করা-করা হলদে, গোলাপি, ফিকে-নীল রুমাল।

বাইরে ছুটে এলো স্বাতী।—ফুল, সন্দেশ, নতুন চায়ের পেয়ালা, চকচকে চামচে—কী-কাণ্ড!

বাবা বললেন, 'কেমন? এখন বেশ জন্মদিন-জন্মদিন লাগছে না?'

বিজু বললো একটু দূরে দাঁড়িয়ে: 'ভাবিসনে শুধু তোর জন্যই সব এসেছে! এই ছ্যাখ আমার ধুতি—আর ছোড়দির শাড়ি। ওঃ, আজ যা হবে!'

স্বাতী চুপ ক'রে রইলো, মুখ তার টুকটুকে লাল। মা থাকতে জন্মদিন হয়েছে তাদের—নতুন ফ্রক-ট্রক এসেছে, পায়েস রান্না হয়েছে, কেউ-কেউ এসেওছে কোনো-কোনো বার—কিন্তু এ-রকম! এত ফুল! ঘাস-রঙের পেস্তা-বসানো শাদা-শাদা ফোলা-ফোলা ঠাণ্ডা নরম এত সন্দেশ! আর এ-সব তার জন্য? তার জন্মদিন ব'লে!

রাজেনবাবু বললেন, 'শাড়িটা কেমন রে? ভালো?'

'সিল্কের তো—'

'সিল্ক ভালো লাগে না তোর?'

চোখ না-তুলে, শরীরটি একটু মোচড়াতে-মোচড়াতে স্বাতী বললো: 'পুতুলদের যে-রকম শাড়ি পরানো থাকে, সে-রকম তো—'

'তা পরবে যে সে-ও তো পুতুল!'

'মোটেও না!' স্বাতী হেসে ফেললো। ছড়ানো জিনিসগুলির দিকে তাকিয়ে বললো: 'আচ্ছা বাবা, সকলের জন্যই আনলে, নিজের জন্য তো কিছু আনলে না?'

'নিজের জন্যই তো সব এনেছি,' বললেন রাজেনবাবু।

পরতে হ'লো সবুজ সিল্কের শাড়ি, সাটিনের ব্লাউজ, শাশ্বতী

জোর ক'রে ধ'রে চুলটা নতুন ধরনে উল্টিয়ে দিলো ঘাড়ের উপর, কপালে চন্দনের ফোঁটাও বাদ দিলো না। দেখে রাজেনবাবুর মনে পড়লো শ্বেতার, মহাশ্বেতার, সরস্বতীর বিয়ের রাতের মুখশ্রী, কত সুন্দর, কত সুখের, আর কত দুঃখে দেখা সেই মুখশ্রী। স্বাতীর কাঁচা মুখের সঙ্গে বেশ-তো মানিয়ে গেছে এই সাজ!—একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন রাজেনবাবু।

স্বাতীরও নতুন লাগলো নিজেকে, যখন সন্ধের পর দোতলার বড়ো ঘরে এসে বসলো। সিঁড়িতে কত জুতো, ঘর ভরা লোক, সকলেই ভালো, সকলেই খুশি। শশাঙ্ক দাসকে বিজু অবশ্য ধরতে পারেনি—তা শুভ্র আর তার দলই আসর জমিয়ে রাখলো রাত ন-টা পর্যন্ত। স্বাতীর মনে হ'লো সমস্ত গান ঘুরে-ফিরে এই কথাই বলছে তাকে, 'তুমি ভালো, আমরা তোমাকে ভালোবাসি।' *যত লোক আছে এখানে, সকলে তাকে ভালোবাসে। ভালো, খুব ভালো, এই পৃথিবী ভালো, পৃথিবীতে যা-কিছু আছে সব ভালো; তা না-হ'লে মানুষ কেন গায়, নাচে, হাসে, আনন্দ করে; তা না-হ'লে এত আনন্দ কোথা থেকে আসে?*

'এবার তুমি', ব'লে শুভ্র হার্মোনিঅম ঠেলে দিলো স্বাতীর দিকে।

তক্ষুনি সুর কেটে গেলো। এতক্ষণের সমস্ত ভালো-লাগাকে থেৎলে দিয়ে অসম্ভব একটা লজ্জা এসে গলা আঁকড়ে ধরলো স্বাতীর, সকলেই যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে, বাঁকা চোখে দেখছে তাকে, তার শাড়ি পরাটা যেন ঠিক হয়নি, কোথায় কী-ভুল বেরিয়েছে।—বিশ্রী! উঠতে পারলে বাঁচে, কিন্তু উঠতে গেলেও তো এতগুলো চোখ!

'আজ একটা গান শুনবোই তোমার,' রাত্তিরে বেড়াল-ডাকের মতো শুভ্রর নরম গলা সে শুনতে পেলো।

হঠাৎ মুখ তুলে, এক মুহূর্ত আগেও কথাটা চিন্তা না-ক'রে, এক ঘর লোককে শুনিয়ে সে ব'লে উঠলো, 'আপনি আমাকে "তুমি" বলবেন না!'

ঘরে উঠলো অস্পষ্ট গুঞ্জন। চশমার পিছনে শুভ্রর চকচকে চোখ দুটি দপ ক'রে নিবে গেলো, মুখে যতখানি সুখ আর যেটুকু লালিত্য তার ছিলো সব মুছে গিয়ে চেহারাটা হ'য়ে গেলো যেন অন্য মানুষের। অনেকেই যেন কিছু বলতে চাচ্ছে, বলতে পারছে না, এইরকম একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে খুব সপ্রতিভ কেউ-একজন স্পষ্ট গলায় ব'লে উঠলো: 'আপনি একটা গান করলে আমরা সকলেই খুব সুখী হই।'

স্বাতী তাকিয়ে দেখলো, কথাটা যে বললো সে বসেছে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে, জিন-প্যাণ্টে ঢাকা হাঁটু দুটো উঁচু ক'রে, খাটো হাতায় আদ্ধেক ঢাকা একটি হাত হাঁটুর উপর, আর-এক হাতে উল্টো-করা পাইপ ধরা। মনে হ'লো না আগে কখনো দেখেছে এঁকে, না-ই বা দেখলো, মুখে জবাব এলো তার: 'গান শুনলে সুখী হন, না আমার গান শুনলে?'

'মনে করুন আপনার গান।' পাইপ-ধরার চোখে-মুখে কৌতুক।

স্বাতীও সকৌতুকে তাকালো কালো রঙের মসৃণ মুখের দিকে। বললো, 'গান আমি জানি না।'

'জানেন না? কিন্তু এঁরা কি আগে কখনো আপনার গান

শোনেননি ? আমিও-তো শুনেছি আপনি গাইতে পারেন', ঠোঁটের কাছে একটু বাঁকা ক'রে হাসলো পাইপ-ধরা মানুষটি।

'আমার গান শোনা বরং সম্ভব, কিন্তু আমি গাইতে পারি এ-কথা শোনা নিশ্চয়ই অসম্ভব,' ব'লে স্বাতী কালো মানুষটির মুখ থেকে চোখ সরিয়ে নিলো। সরু-মোটা গলায় মেশানো হাসি উঠলো ঘরে।

'কী-অসভ্য রে তুই ! ছী-ছি !' বোনের সঙ্গে একা হওয়ামাত্র শাশ্বতী আর সময় নষ্ট করলো না।

'অসভ্য কেন ?'

'ও-রকম ক'রে অপমান করলি শুভ্র—বাবুকে !'

'অপমান ?'

'অপমান না ? তোকে ছোটো দেখেছে—'

'তাই ব'লে এখন-তো আর ছোটো না আমি।'

স্বাতীর ঝলমলে শাড়ির দিকে একপলক তাকিয়ে শাশ্বতী বললো : 'একবার "তুমি" ব'লে আবার নাকি "আপনি" বলা যায় !'

'কেন যাবে না ? একবার "আপনি" ব'লে আবার "তুমি" বলা যায় তো ?'

'অসভ্য !' শাশ্বতী লাল হ'লো।

'বার-বার অসভ্য বোলো না, ছোড়দি !'

'নিশ্চয়ই বলবো। অসভ্য, অভদ্র, উদ্ধত ! হারীতবাবুও তোমার ইয়ার্কির পাত্র, না ?'

'ও, ঐ কালো মূর্তিই তোমাদের বিখ্যাত হারীতবাবু ?'

শাশ্বতী জ্ব'লে উঠে বললো, 'মনে কোরো না, স্বাতী, পঁচিশ টাকা

দামের শাড়ি প'রেই মস্ত বড়ো হ'য়ে গেছো! বড়োদের সঙ্গে সমান-সমান চলবার যোগ্য তুমি এখনো হওনি, মনে রেখো।'

শাশ্বতীর চোখে-মুখে এ-রকম টকটকে রাগ স্বাতী কখনো ভাখেনি। ভয় পেয়ে ডাকলো, 'ছোড়দি।'

'তুমি মনে করেছো পৃথিবীর সব লোকই বাবা। যা করো তা-ই চলবে।—না! মনে করেছো তোমার ছেলেমানুষি দিয়েই জিতে যাবে সব জায়গায়।—না! ভালো হ'য়ে, নম্র হ'য়ে যদি চলতে না পারো, কেউ তোমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারবে না—কেউ না!'

'ছোড়দি, আমি কী করলাম—আমি কী করেছি—অমন ক'রে বকছো কেন আমাকে?' স্বাতী হাত বাড়িয়ে এগোলো, থমকালো, কাঁপলো, পেছোলো; লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে সোনালি-বুটি-আঁচল।

'এখন আর নেহাৎ ছেলেমানুষ নও তুমি,' নিজেই নিজের কথার বিরুদ্ধতা ক'রে শাশ্বতী আবার বললো। 'এখনো যদি তোমার গর্বিত স্বভাব, তোমার দুর্বিনীত ব্যবহার তুমি ছাড়তে না পারো—'

একসঙ্গে এতগুলি শক্ত-শক্ত কথা শুনে স্বাতী প্রায় কেঁদে ফেললো। 'আর বোকো না, আর বোকো না আমাকে' কোনোরকমে এগারো হাত শাড়ি সামলে ছুটে গেলো সে বাবার কাছে, দু-হাতে জড়িয়ে ধ'রে ডেকে উঠলো, 'বাবা!'

'কী রে?'

বাবার শান্ত, সুন্দর, আশ্বাসে ভরা মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতী কান্না গিলে ফেললো।

—'না, কিছু না।'

'হয়েছে কী?'

'কিছু না।'

'ছোড়দি বুঝি বকেছে?'

'না।'

'তবে?'

বাবার কাঁধে মুখ রেখে চুপ ক'রে রইলো স্বাতী। কোঁকড়া কালো মাথাটায় হাত বুলিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'বাঃ, কী-রকম নতুন ফ্যাশনের খোঁপা ক'রে দিয়েছে ছোড়দি!'

'বাবা,' পাঞ্জাবিতে আস্তে মুখ ঘ'ষে-ঘ'ষে স্বাতী বললো, 'বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকবো। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। কোনোদিন না।'

'বেশ-তো! খুব ভালো কথা! খুব সুখের কথা! তাই ব'লে কান্নার কী আছে? এত বড়ো পনেরো বছরের মেয়ে নাকি কাঁদে!'

'ও মা!' স্বাতী মুখ তুলে জলভরা চকচকে চোখে হাসলো, 'বলে কী বাবা! আজ আমার তেরো পূর্ণ হ'লো না—চোদ্দতে পড়লাম।'

ঘাঘেঁষি! বলো কী, ছোড়দি! এদিকটা কী-রকম খোলা—
—গাছপালা—আর কতখানি আকাশ! বাব্বাঃ! যতীন দাস
ড়ের কথা ভাবতে হাঁপ ধরে এখন!'

শাশ্বতী হেসে উঠলো তার ভঙ্গি দেখে। বললো, 'দোতলা
ল না কেন, বাবা?'

'সবটাই আমি ক'রে ফেলবো? বিজুর জন্য কিছু বাকি থাক!'

'দোতলা দিয়ে হবেই বা কী। এই বেশ—ঠিক যেটুকু
ার সেটুকু। বেশি-বেশি আমার ভালো লাগে না!' একহাতে
লার শিক ধ'রে স্বাতী পা দোলাতে লাগলো। তক্ষুনি আবার
দিলো, 'একতলাই সবচেয়ে ভালো লাগে আমার—বাইরেটা
কাছে হয় একতলা হ'লে। কেমন সুন্দর বাগান করি
া না! ছোটো একতলা বাড়ির মতো সুন্দর নাকি
-কিছু?' প্রতিপক্ষকে আর-কিছু বলবার সুযোগই দিলো না
ী, নিজেই জজ হ'য়ে নিজের পক্ষে রায় দিলো; আর নিশ্চিন্ত
় পেয়ারায় কামড় বসালো তারপর।

কিন্তু প্রতিপক্ষ ছাড়লো না; পরে নিরিবিলি ঘরে আবার তর্ক
লো: 'আচ্ছা স্বাতী, তুই কেন ভাবিস যে তোর যা ভালো
গ, সকলেরই তা-ই?'

'বা রে! তাই ব'লে আমার ভালো-লাগাটা বলতেও পারবো
আমি?'

'তোর ভাবখানা এইরকম যেন তোর ইচ্ছেমতোই চলবে
-সংসার।'

'জগৎ-সংসার তো না, শুধু দু-একজন—'

'তুই আর কেন', শাশ্বতী বাধা দিলো কথায়, 'ও-রকম মানুষ একজনের বেশি-তো হ'তে পারে না—আর হ'লেও বিপদ।'

'মানে ?'

'ন্যাকা !—এদিকে নভেল প'ড়ে পেকে ঢোল !'

স্বাতী সত্যিই বোঝেনি কথাটা, বুঝলো ছোড়দির ঠোঁটের বাঁকা হাসি দেখে। হাসির উত্তরে একটু বেশি গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'তা এই বাড়ির কথা নিয়ে ঝগড়া করো কেন—এ-বাড়িতে তুমি-তো আর থাকবে না বেশি দিন !'

'তুই-ই যেন থাকবি !'

'নিশ্চয়ই !'—কথাটা ঠেলে উঠলো ভিতর থেকে, কিন্তু আসতে-আসতে যেন জোর ক'মে গেলো, শেষ পর্যন্ত পৌঁছলোই না। একটু চুপ থেকে কী-একটা অন্য কথা বলতে গেলো : 'ছোড়দি, শোনো—'

'চুপ কর এখন,' ব'লে শাশ্বতী টেবিল থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো।

'শোনো না—' স্বাতীর স্বর ব্যাকুল।

'না !—' শাশ্বতী বই খুললো চোখের সামনে।

'শোনো না একটু !' প্রায় কান্নার সুরে স্বাতী প্রার্থনা জানালো। 'মারকস-এর বই এক্ষুনি না-পড়লে চলবে না তোমার ?'

'মারকস না রে, মার্ক্স,' শাশ্বতী হেসে শুধরে দিলো। 'দেখি একটু পাতা-টাতা উল্টিয়ে, হারীতবাবু আবার-তো আসবেন সন্ধেবেলা।'

অবাক হ'লো স্বাতী ; যে-কথাটা বলবার জন্য ছটফট করছিলো, সেটা ভুলে গেলো।—'তাতে কী ?' খুবই ন্যায়সংগত প্রশ্ন তার।

'হারীতবাবুই দিয়েছেন কিনা বইটা।'

'আজই বুঝি ফেরৎ দিতে হবে? তা আর-ক'দিন রাখতে দেবে না বললে?'

'এ-সব তো আর সত্যি পড়বার বই নয়!' শাশ্বতী মুখ টিপে হাসলো। 'দেখে রাখি একটু—এলে বলতে হবে-তো দু-একটা কথা!'

এমন একটা তাজ্জব কথা স্বাতী তার পনেরো বছরের জীবনে শোনেনি। না-প'ড়েও ভাণ করতে হবে অন্যের কাছে? কেন? ভালো না লাগে না-পড়লেই হয়—মুশকিল আর কী। চোখ ভরা প্রশ্ন নিয়ে ছোড়দির দিকে সে তাকালো, কিন্তু ছোড়দির মুখ আড়াল করেছে দুখানা হলদের উপর কালোতে ছাপা মলাট।

শাশ্বতী উঠলো খানিক পরেই; টেবিলে সারে দাঁড়ানো পাঠ্য বইয়ের মাথায় অপাঠ্য বইখানাকে সযত্নে শুইয়ে রেখে চ'লে গেলো গা ধুতে। ছোড়দির ব্যস্ত ভাব দেখে হঠাৎ মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো স্বাতীর। টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে বইখানা তুলে নিয়ে আস্তে-আস্তে পাতা ওল্টাতে লাগলো। কেমন ভয় হ'লো তার, বুক ঢিপঢিপ করতে লাগলো: কখন কোন পাতার ফাঁক থেকে আবার ঝিলিক দেয় নীল রঙের খাম! কতক্ষণে সব পাতা ওল্টানো!— বইখানা উপুড় ক'রে জোরে ঝাঁকানি দিলো কয়েকবার: না, কিছু নেই। ঠিক জায়গায় আবার শুইয়ে রাখলো মার্ক্সকে, কী-ভালোমানুষের মতোই শুয়ে আছে বইখানা, কিন্তু—কিন্তু—কিন্তু—কী?

মাথায় তোয়ালে চেপে ঘরে আসতে-আসতে শাশ্বতী বললো, 'তুই যা এবার।'

'পরে যাবো।'

'এই তোর এক বদভ্যাস, স্বাতী।' তোয়ালে নামিয়ে শাশ্বতী চিরুনি হাতে নিলো। 'অন্তত বিকেলে তো একটু ফিটফাট হ'তে হয়!'

'আমি সারাদিনই ফিটফাট', স্বাতী ধুপ ক'রে শুয়ে পড়লো খাটে।

'শুলি যে?'

'শুই না।'

'যত অসময়ে—!' কালো চুলে শাদা-শাদা আঙুল দ্রুত ওঠা-পড়া করতে লাগলো শাশ্বতীর।

'আচ্ছা ছোড়দি,' দু-আঙুলে কপালের চামড়া একটু টেনে ধ'রে স্বাতী বললো, 'শুভ্রবাবুর খবর কী?'

'কী-অদ্ভুত! আমি কী ক'রে জানবো?'

'আমাদের এ-বাড়িতে একদিনও আসেননি—না?'

'ও-বাড়িতেও আর আসতো কই শিগগির। খেটে-খেটেই ফুরসৎ নেই! ঐ ফিতেটা দে তো।'

'ওঁর গানের ক্লাশও তুমি ছেড়ে দিলে—'

'বড়ো-যে দরদ দেখছি তার জন্য—দু-চক্ষে দেখতে পারতিস না তো!'

'আমার ইচ্ছায় তো জগৎ চলে না,' স্বাতী পাশ ফিরে একটি হাত রাখলো গালের তলায়। 'আমি দেখতে না-পারলেই তো মন্দ হ'য়ে যায় না মানুষ।'

জবাব না-দিয়ে শাশ্বতী হেজেলিন স্নোর মুখ খুললো। হলদে-আর-কালো মলাটের সেই শোওয়ানো বইটার উপর আবার চোখ পড়লো স্বাতীর।

'ছোড়দি, মার্ক্স কী?'

'মার্ক্স—মার্ক্স একজন মানুষ।'

'তাঁর লেখা বই?'

'তাঁর—তাঁর বিষয়ে।'

'বিষয়ে মানে?'

'মানে—' শাশ্বতীর পাউডর-প্যাডটা থেমে গেলো মুখের উপর। 'এই আরকি—' ইনক্সা আনন-রেণু মুখে বুলোতে-বুলোতে সে কথা শেষ করলো: 'জানতে চাস তো হারীতবাবুকে জিগেস করিস্।'

'তিনি জানেন বুঝি এ-সব?'

'জানেন না! কত বড়ো বিদ্বান! লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সের পাশ-করা!' শাশ্বতী স'রে এসে একখানা শাড়ি পরতে লাগলো যার রং ঠিক কালোজামের ভিতরটার মতো।

'ওঁর কাছে ইক-নমিক্স পড়ো বুঝি তুমি?'

'যাঃ!'

'যাঃ কেন? পড়লেই পারো—প্রায়ই তো আসেন।'

'কী-অদ্ভুত! প্রায়ই আসেন কখন?' শাশ্বতী কোঁচার মতো ক'রে কোমরে গুঁজলো শাড়ি, তারপর পিঠের উপর দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে আনতে-আনতে বললো, 'কী ওঁদের সভা-টভা সব হয়—তারই খবর দিয়ে যান মাঝে-মাঝে। তোকে বলি না কতবার যেতে—যাস না তো ককখনো!'

'কী হয় সভায়?'

'কত রকম হয়! গান, বক্তৃতা, তর্কাতর্কি—'

'বাজে!'—স্বাতী ঠোঁট বাঁকালো।

'বাজে কী রে ? হারীতবাবু চমৎকার বলেন—কত শিক্ষা হয় ওঁর কথা শুনলে।' শাড়িটাকে এখানে একটু কুঁচকে, ওখানে একটু টান ক'রে দিতে-দিতে শাশ্বতী আর-একবার আয়নার সামনে দাঁড়ালো।

স্বাতী তার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'দিদি, তোমার ঐ চৌকো বাক্সের পাউডরটা কিন্তু বিশ্রী।'

'বিশ্রী ?' শাশ্বতী হেসে উঠলো।

'বড্ড কটকটে।'

'ফেস-পাউডর কিনা।' স্বাতীর কথা উড়িয়ে দিলো শাশ্বতী, কিন্তু আয়নায় সূক্ষ্ম চোখে একটু তাকিয়েও দেখলো। খুব কি উগ্র হয়েছে ? না, ঠিকই।…তবু আর-একবার পাউডর-প্যাড হাতে নিয়ে বললো,—'কে-একজন লেখক না তাঁর ফ্যাশনেবেল নায়িকার মুখে কিউটিকুরা পাউডর মাখিয়েছিলেন ? কী বুদ্ধি !'

'কেন ?' আর-একবার তাজ্জব বনলো স্বাতী।

'কিউটিকুরা বুঝি মুখে মাখে ?'

'মাখে না ?' প্রতিবাদের বেগে স্বাতী উঠে বসলো একেবারে। 'আমি-তো মাখি। তুমিও-তো মেখেছো কত।'

কথাটা যেন শুনতেই পায়নি, এমনিভাবে শাশ্বতী বললো, 'সেদিন ঐ লেখককে নিয়ে কী-ঠাট্টা অগ্রণী সংঘে। সবশেষে হারীতবাবু তুললেন ঐ পাউডরের কথাটা—'

'তাঁর কাছে অনেক রকম শিক্ষাই তো হয় তাহ'লে,' স্বাতী যেন অভিভূত হ'য়ে পড়লো হারীতবাবুর জ্ঞানের পরিধিতে।

বোনকে নরম হ'তে দেখে শাশ্বতী সুখী হ'য়ে বললো, 'তুই দেখিস এটা মেখে—কত ভালো, তুলনা হয় না।'

'তা তুমি যা-ই বলো, কিউটিকুরার মতো গন্ধ নয় আর-কিছুরই,' বলতে-বলতে স্বাতী উঠে দাঁড়ালো।

হারীত যখন এলো, তার একটু আগে রাজেনবাবু ফিরেছেন আপিশ থেকে, আর স্বাতী ছোটো পটে ক'রে তাঁর চা নিয়ে এসেছে বসবার ঘরে। বাবার চা ঢেলে দিয়ে স্বাতী হেসে বললো, 'আমি একটু চা খাই, বাবা?'

'রোজ-রোজ আর অনুমতি চাওয়া কেন?'

'তবে রোজ খাবো—কেমন বাবা? এখন-তো বড়োই হয়েছি—না?' বাবার গলা একটুখানি জড়িয়ে ধ'রেই স্বাতী স'রে এলো চায়ের কাছে। 'তুমি একটু খাবে, ছোড়দি?'

একটু দূরে জানলার কাছে ইজিচেয়ারে শাশ্বতী সেজে-গুজে ব'সে ছিলো সেই হলদে-কালো মলাটের বইটা চোখের সামনে খুলে। সংক্ষেপে জবাব দিলো, 'না।'

চামচে দিয়ে চা খেতে-খেতে স্বাতী বললো: 'ঈশ, কী ভালো হয়েছে চা-টা—চমৎকার!'

'স্বাতী, তোর চামচে দিয়ে চা খাওয়াটা ছাড় তো।' ছুটে এলো সুশিক্ষিত শাশ্বতীর মন্তব্য।

'কেন, কী হয়?'

'কেউ খায় না।'

'খায় না আবার! অনেককে আমি দেখেছি—'

'তারা সব ক্যাবলা!'

'চামচে দিয়ে যারা খায় না, তারা বুঝি কেউ ক্যাবলা না?' মুখে ও-কথা ব'লে স্বাতী চামচে রেখে দু-আঙুলে পেয়ালা তুললো

বয়স্ক ধরনে, তারপরেই—'নাঃ, চামচে দিয়েই ভালো!' ব'লে তাকালো ছোড়দির দিকে, কিন্তু শাশ্বতী হঠাৎ কেমন-একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠে গম্ভীরভাবে চোখ ডোবালো বইয়ে। বাইরে জুতোর শব্দ হ'লো, আর মৃদু কিন্তু স্পষ্ট তিনটি বিলেতি টোকা পড়লো দরজায়।

রাজেনবাবু বললেন, 'ছাখ-তো কে' ; কিন্তু স্বাতী ব'সে-ব'সেই বললো : 'আসুন।'

পরদা ঠেলে হারীত ঘরে এলো। ঢিলেঢোলা রকমের একটা পাৎলুন পরা, আর গলা-খোলা শার্ট। ঢুকেই রাজেনবাবুকে দেখে দু-হাত তুলে অভিবাদন জানিয়ে বললো, 'এই যে—ভালো?'

'স্বাতী, চা—' রাজেনবাবুর ব্যস্ত ভাব।

'না, না আমি চা না, এইমাত্র—' হারীত একটু ঝুঁকে স্বাতীর দিকে তাকালো। 'এসে অসুবিধে করলুম কি?' ভাবখানা এই-রকম যেন ঘরের তিনজনের মধ্যে স্বাতীই প্রধান।

স্বাতী হেসে ফেললো। কী-রকম জোর দিয়ে-দিয়ে কথা বলেন ভদ্রলোক, 'চা'-কে বলেন 'চ্চা,' 'এসে'-কে 'এশ-শে'। 'অসুবিধে কী,' একটু থামলো স্বাতী, আবার বললো, 'বসুন।'

স্বাতীর অনুরোধ উপেক্ষা করলো না হারীত, কয়েক পা হেঁটে গিয়ে শাশ্বতীর পাশের চেয়ারটিতে বসলো।—'কী, পড়লেন?'

'সবটা হয়নি,' চোখ আনত শাশ্বতীর, কণ্ঠ ক্ষীণ।

হাঁটুতে হাঁটু তুলে টিপে-টিপে পাইপে তামাক ভরতে-ভরতে হারীত বললো, 'বিষয়টা শক্ত—তবে এ ছাড়া তো আর বিষয় নেই আজকাল।—আমরা অবশ্য দিব্যি খেয়ে-দেয়ে চাঁদের বিষয়ে পদ্য লিখে দিন কাটাচ্ছি, এদিকে একটা বড়োরকমের লড়াই—'

পাইপ মুখে তুলে সে কথাটা শেষ করলো—'বাধলো ব'লে। সেজন্য এখন থেকেই—' দেশলাই জ্বালতে গিয়ে হঠাৎ থেমে, পাইপটা মুখ থেকে হাতে নামিয়ে গেঞ্জি-পরা বাবাটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'I am sorry.'

'না, না, তাতে কী,—আমি বরং—' রাজেনবাবু উঠতে গেলেন।

'আপনি বসুন,' দেবতার বরদানের মতো হাতটি উঁচু করলো হারীত। 'এতে অবশ্য কিছু নেই—তবে আমাদের দেশে একটা নিয়ম যখন আছে—আমি বরং বাইরে একটু পাইচারি—' স্বদেশের প্রথাকে প্রতি পদক্ষেপে সম্মানিত ক'রে হারীত পাইপ হাতে বেরিয়ে গেলো।

একটু পরে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে রাজেনবাবু আস্তে-আস্তে উঠে ভিতরে এলেন। শাশ্বতী ব'সে ব'সে কয়েকটা আঁকাবাঁকা ভঙ্গি করলো শরীরের—আর ব'সেই রইলো।

স্বাতী এলো বাবার সঙ্গে-সঙ্গে।—'একটু বেড়াতে যাবে, বাবা?'

'চল!' রাজেনবাবু তক্ষুনি রাজী।

'চলো ঐ মাঠটায় হাঁটি একটু।'

'বেশ।'

দু-মিনিটে তৈরি হ'য়ে এলো স্বাতী।—'বাবা। শুয়ে পড়লে? যাবে না—' হঠাৎ থেমে বাবার মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'থাক বাবা, না গেলাম।'

'কেন রে? চল—আমি এমনিই শুয়েছিলাম একটু—'

স্বাতী শিয়রে ব'সে বললো: 'না বাবা, তুমি শোও, আমি তোমার পাকা চুল বাছি।'

'আর কি বাছবার সময় আছে ?'

'ঈশ, ক-টাই বা চুল পেকেছে তোমার, তা-ই নিয়ে এত জাঁক !' হাত দিয়ে চুল সরাতে-সরাতে তক্ষুনি আবার বললো, 'উঃ ! কত !' সঙ্গে-সঙ্গে—পট্ !

'লাগে !'—রাজেনবাবু ন'ড়ে উঠলেন।

'কী ছেলেমানুষের মতো করো ! চুপ ক'রে শোও না !' বাবার মাথাটি স্বাতী ঘুরিয়ে নিলো নিজের ইচ্ছেমতো ; চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বললো, 'সুন্দর চুল তোমার, বাবা !'

'হবেই ! স্বাতীর বাবা তো আমি !' আবছা শোনালো বাবার গলা।

বাবার যখন একটা চুলও পাকেনি, কেমন ছিলেন দেখতে ? সে যেন বাবাকে একরকমই দেখেছে বরাবর, মনে হয় এ-রকম ছাড়া আর-কিছুই ছিলেন না কখনো—কিন্তু সত্যি-তো আর তা-ই নয় ! পুরোনো দু-একটা ছবি আছে বাবার, এতই অন্যরকম যে, দেখলে হাসি পায়, কিন্তু যখনকার ছবি তখন-তো ঠিকই ছিলো !

'বাবা', স্বাতী ডাকলো, 'ও বাবা !'

ভারি নিশ্বাসের শব্দ শুনলো উত্তরে। ও মা ! ঘুমিয়ে পড়লো ! কেমন অবাক লাগলো স্বাতীর, বাবাকে এই সন্ধেবেলায় হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়তে দেখে। নড়লো না, চুপ ক'রে ব'সে রইলো সেখানেই, আলো ক'মে-ক'মে রাত নামলো ঘরে।…বাইরে থেকে হঠাৎ ভেসে এলো হাসির শব্দ, সরু.মোটা গলায় মেশানো।

•

সন্ধের পর স্কুলের পড়া নিয়ে ব'সে স্বাতী ব'লে উঠলো, 'ছোড়দি, হারীতবাবুর বইটা !'

'বইটা—কী ?'

'ফিরিয়ে দিলেই পারতে। পড়বে-তো আর না—'

'তোর তাতে কী!' ঝামটা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে শাশ্বতী ভাবতে লাগলো, হারীত-যে ব'লে গেলো রোববার বিকেলে ইউনিভর্সিটি ইনস্টিট্যুটে যেতে, সেটা কেমন ক'রে সম্ভব হবে।

পরের দিনও এই কথাই ভাবছিলো সে, তুপুরবেলা বই হাতে পাড়ার তুটি সহপাঠিনীর সঙ্গে কলেজের উল্টো দিকের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে। অগ্রণী সংঘের যে-ক'টি সভায় সে গিয়েছে, সবই রাসবিহারী এভিনিউর এক বড়লোকের বাড়িতে, একা যাওয়া-আসা করা গেছে সহজেই—কিন্তু কলেজ স্কোয়ার! এদিকে হারীতের কাছে প্রকাশ করেনি তার এই অসুবিধের কথাটা—কী ভাববে সে—কত মেয়ে আজকাল একলা টহল দেয় সারা শহর, আর সে বুঝি—

'উঠে পড়ুন,' ছোট্ট ছাইরঙের একটি গাড়ি এসে থামলো ঠিক তার সামনে।

'উঠে পড়ুন,' হাত নেড়ে আবার ডাকলো হারীত।

'আপনি!'

'আসুন', হারীত হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলো।

শাশ্বতীর চেহারাটা হ'লো মূর্তিমতী দ্বিধা। আমতা-আমতা ক'রে বললো, 'না, আমি ট্র্যামেই—'

পাশের মেয়েটি কানে-কানে বললো, 'কে রে?'

হারীত গলা বাড়িয়ে বললো, 'ও, বন্ধুদের জন্যে বুঝি? তা সকলকে তুলে নিতে পারলে আমি-তো সুখী হতাম খুব, কিন্তু

দেখছেন-তো, একজনের বেশি···অতএব আপনারা অনুমতি করলে—' একটু হেসে সে অন্য মেয়ে দুটির দিকে তাকালো।

'যা,' পাশের মেয়েটি আস্তে একটু ঠেলে দিলো শাশ্বতীকে, 'দয়া-মায়াও নেই তোর?'

'ঐ-যে ট্র্যাম,' ব'লে এগিয়ে গেলো অন্য মেয়েটি।

ট্র্যাম চ'লে গেলো বন্ধু দু-জনকে নিয়ে। কেমন-একটা ট্রেন-ফেল-করা চেহারা ক'রে শাশ্বতী দাঁড়িয়ে রইলো সাড়েদশটা-বেলার বড়ো রাস্তার ব্যস্ততার মধ্যে। হারীত বললো, 'আর ভাবছেন কী—'

শাশ্বতী গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'অনেক ধন্যবাদ মিস্টার নন্দী, কিন্তু—'

'ও-হ্! ডোণ্ট বি সিলি!' এমন-একটা অসহিষ্ণু অথচ সকৌতুক মুখভঙ্গি হ'লো হারীতের যে শাশ্বতী আর দেরি না-ক'রে গাড়িতে উঠে পড়লো।

গাড়ি বেঁকলো ডান দিকে হাজরা রোড ধ'রে।—'এ কী!' শাশ্বতী দরজা ধ'রে চেঁচিয়ে উঠলো, 'এদিকে না!'

হারীত কোনো জবাব না-দিয়ে গাড়িটিকে আস্তে দাঁড় করালো একটি পেট্রল-পম্পে। স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো শাশ্বতীর। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—'ও!'

পকেট থেকে পাইপ বের করলো হারীত, গাড়ির গায়ে ঠুকে-ঠুকে পোড়া তামাক ফেলে দিলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আপনি ভেবেছিলেন আমি আপনাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছি?'

আগুনের রং ছড়িয়ে পড়লো শাশ্বতীর কুমারী মুখে। দৃশ্যটা উপভোগ করতে-করতে হারীত আবার বললো, 'আর সে-রকম

কোনো দুরভিসন্ধি যদি আমার থাকেই আপনি ভয় পাবেন কেন? নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন না?'

শাশ্বতী মুখ ফিরিয়ে দেখতে লাগলো কাচের স্তম্ভে ফিকে-সোনালি পেট্রলের বুড়বুড়ি-তোলা নেমে আসা। একটু পরে গাড়ি চললো রসা রোড ধ'রে বরাবর দক্ষিণে। জ্বলজ্বলে রোদ, ট্র্যাম-বাস ভরতি, প্রত্যেকটি বাড়িফেরা ট্র্যামে তার কলেজের মেয়েরা—কী অস্বস্তি!

'মনে হচ্ছে অপরাধ করলাম,' চিবিয়ে-চিবিয়ে হারীত বললো।

'গাড়িটা--বেশ-তো।' এতক্ষণে শাশ্বতী কিছু বলবার কথা খুঁজে পেলো।

'আমার এক বন্ধুর গাড়ি, আমি ব্যবহার করি। বড্ড ছোটো;—অসুবিধে হচ্ছে?'

'হ'লেই-বা কী করা।'

'বইগুলো অন্তত কোল থেকে নামাতে পারেন।'

'থাক।'

রাসবিহারী এভিনিউর মোড় পার হ'তে-হ'তে হারীত বললো, 'নাঃ, আপনাকে কষ্ট দিলাম। কিন্তু আমি-তো আর আপনার সুখের জন্য আপনাকে আসতে বলিনি।'

'তবে?'

'আমার সুখের জন্য—নিশ্চয়ই!'

শাশ্বতী মুখ নিচু করলো।

'রোববার আসছেন তো?'

'দেখি।'

'দেখি আবার কেন ?'

'এত দূর—'

'দূর ? দূর আবার কী ! আসতেই হবে আপনাকে।'

শাশ্বতী এক হাতে কপালের চুল সরালো। তার ঈষৎ নোওয়ানো আধখানা মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা নতুন কথা ঝিলিক দিলো হারীতের মনে।—'আচ্ছা, ভাববেন না, আমি যাবার সময় তুলে নেবো আপনাকে।'

'না, না—'

'এতে আঁৎকাবার কী আছে ?'

'মিছিমিছি অসুবিধে—'

'অন্তত ট্রাম-বাস্-এর চেয়ে বেশি অসুবিধে না—'

'সে-কথা না—'

'তবে আবার কী। ছ-টায় তৈরি থাকবেন ; আমাকে যেতে হবে একটু আগেই।'

'না, সত্যি দেখুন—'

'সত্যি দেখুন !' মুখে-মুখে ঠাট্টা ক'রে উঠলো হারীত। শাশ্বতী হেসে ফেললো।

বড়ো রাস্তায় গাড়ি থেকে নেমে শাশ্বতী গলিটুকু হেঁটে এলো। কেন, বাড়ি পর্যন্ত গাড়িতে এলে কী হ'তো ? সত্যি, কী বিশ্রী আমার মনের এই—! বাজে সব ! মানে হয় না কোনো ! রোববার যাবো হারীতের সঙ্গে গাড়িতে—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই !

কিন্তু হ'লো না। রাজেনবাবু বললেন, 'তুই একা ওর সঙ্গে যাবি কী রে ?'

'গেলে কী হয় ?'

'হবে' আবার কী—এ-রকম যায় না। তুই ওকে "না" ব'লে আয়।'

'না'! যে-বাবার মুখে কোনোদিন কোনো 'না' শোনেনি, সে-বাবার মুখে 'না'! যেখানে গেলে নানা বিষয়ে শিক্ষা হয়, সেখানেও নিজের ইচ্ছেমতো যেতে পারবে না, এত পরাধীন সে! আর এতদিন ধ'রে সে ভেবে এসেছে তার বাবা অন্য বাবাদের মতো নয়—!

মাথা ঝেঁকে ব'লে উঠলো, 'আমি পারবো না কিছু বলতে।'

'আমিই ব'লে আসি তবে।'

'না, না—' কিন্তু ততক্ষণে রাজেনবাবু অন্তর্হিত। একটু পরে ঢাকাই জামদানি পরা শাশ্বতী শুনলো ছোট্ট গাড়িটির চ'লে যাওয়ার শব্দ।

ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে রাজেনবাবু বললেন, 'কী রে, তোর মন-খারাপ হ'লো নাকি খুব ?'

'কী বললে তুমি হারীতবাবুকে ?'

'বললাম, শাশ্বতী আজ যাবে না।'

'এই বললে তুমি ?' শাশ্বতী আর্ত ভঙ্গিতে হাত তুললো।

'কী বলবো তবে ?'

'বলতে পারলে না অসুখ করেছে ?'

'কেন, অসুখ করেছে নাকি তোর ?'

রাগে শাশ্বতীর ইচ্ছে করলো গায়ের জামা-কাপড় টেনে ছিঁড়তে। ছী-ছি, এর পরে কী ক'রে মুখ দেখাবে সে ? আর বাবা

কী-রকম মানুষ—দিব্যি ব'লে এলেন সে যাবে না! অপমান করলেন একজন উঁচু দরের মানুষকে! আর কি সে আসবে? না, আসবে তো না-ই, আর তার উপর কী ভেবে গেলো তাকে, কী বিশ্রী, কী-রকম একটা জড়ভরত ভূত! যদি কোনোরকমে আজকের সভাটায় সে যেতে পারতো, তাহ'লে—তাহ'লে অন্তত বুঝিয়ে বলতে পারতো—

'তা এতই যদি তোর যাবার ইচ্ছে,' ঠিক তার মনের কথাটাই বাবার মুখে শুনতে পেলো শাশ্বতী, 'বিজুকে নিয়ে বাস্-এ চ'লে যা।'

কিন্তু বিজু রাজি হ'লো না। শার্টের কলারটা উঁচু ক'রে তুলে দিয়ে সে তখন বেরোচ্ছে আড্ডা দিতে। 'বক্তৃতা নাকি? সর্বনাশ! আমি ওর মধ্যে নেই!'

'একদিন না-হয় গেলি একটু ছোড়দিকে নিয়ে,' রাজেনবাবু অনুরোধ জানালেন।

'আমি না!' ত্বরিতে নিষ্ক্রান্ত হ'লো বিজু।

তখন রাজেনবাবু বললেন, 'তাহ'লে চল আমিই—'

বাবার সঙ্গে? তা হোক, তবু-তো যাওয়া হবে। শাশ্বতী উঠলো তার বিপর্যস্ত প্রসাধনের মেরামত করতে। রাজেনবাবু ডাকলেন, 'স্বাতী, যাবি নাকি?'

'কোথায়, বাবা?' স্বাতী ছুটে এলো পাশের ঘর থেকে।

'তোর ছোড়দিকে নিয়ে মীটিঙে যাচ্ছি—'

'তুমি কেন?'

'যাই। একটু বেড়ানোও হবে আমার।'

'না, তুমি যাবে না।...হাসছো কী? একটাই রোববার—এখন আবার বাস্-এর ঝাঁকানি খেতে-খেতে কলেজ স্কোয়ার—পাগল!'

'রোববারটা এমনিই ব'সে-ব'সে—'

'ব'সে-ব'সে না আরো-কিছু!—কেন, দাদা যেতে পারে না?'

'তার সময় হয় না।'

'যত সময় বুঝি তোমার? এমন রাগ হয় সত্যি—!'

ঘরে এলো ব্যাগধারিণী শাশ্বতী। 'ছোড়দি, বাবা কিন্তু যাবেন না!' তাকে দেখামাত্র স্বাতীর ঘোষণা।

শাশ্বতী থমকে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে।

'যাই না', রাজেনবাবু দেখলেন শাশ্বতীর মুখে মেঘ আর স্বাতীর চোখে বিদ্যুৎ। অসহায়ভাবে বললেন, 'যাই, কেমন? তুইও চল।'

'ছোড়দি, তুমি কেমন?' স্বাতী দাঁড়ালো বোনের মুখোমুখি। 'বাবাকে আবার টেনে নিয়ে যাচ্ছো—'

'আহা—ও-তো কিছু বলেনি—'

'স্বাতী!' শাশ্বতী গর্জন ক'রে উঠলো, 'তুই এ-বাড়ির কর্তা হলি কবে থেকে?'

'ককখনো না!' স্বাতীও গলা চড়ালো, 'ককখনো! তুমি যাবে না বাবা—আমি বারণ করছি!'

'চাইনে, চাইনে যেতে—এ-বাড়িতেই আর থাকবো না আমি!' শাশ্বতী ছুটে গিয়ে জানলার শিক ধ'রে ফোঁপাতে লাগলো।

•

মিথ্যে হ'লো না মুখের কথা, একটি মাসও কাটলো না এর পর, হারীত বিয়ের প্রস্তাব জানালো।

সেদিনও রবিবার। বাজার নিয়ে এসে রাজেনবাবু বাইরের ঘরে ব'সে কাগজ পড়ছেন, হারীত ঢুকলো গটগট ক'রে। সেদিন তার পোশাকটা—বোধহয় আইনত শীতঋতু আরম্ভ হয়েছে ব'লেই—একটু আঁটোসাঁটো : পাৎলুনে কড়া ইস্ত্রি, নেকটাইটি পরিষ্কার। শরীরের একটা কুণ্ঠিত ভঙ্গি দিয়ে রাজেনবাবু অভ্যর্থনা জানালেন। 'বসুন,' ব'লে কাগজের পাতাগুলি গুছিয়ে নিয়ে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন, হারীত বললো, আপনি উঠবেন না—আপনার সঙ্গেই আমার কথা।'

রাজেনবাবু শান্ত চোখে যুবকের মুখের দিকে তাকালেন।

'কথাটা হচ্ছে', হারীত চেয়ারে পিঠ খাড়া ক'রে হাতলে দুটো টোকা দিলো, 'আমি শাশ্বতীকে বিয়ে করতে চাই। আপনি নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে শাশ্বতীরও এ-ই ইচ্ছে, এখন আপনার মত হ'লেই হ'য়ে যায়।'

শাশ্বতী নামটা হারীতের মুখে একটুও মধুর শুনলেন না রাজেনবাবু। কেন-যে এই ছেলেটিকে আমার ভালো লাগে না! খারাপ তো কিছু নয়—ভালো ছেলে! শিক্ষিত, বিলেত-ফেরৎও, উৎসাহী, বুদ্ধিমান। তবু—ওর চাল-চলন, হাব-ভাব, কথা বলার ধরন—সব যেন—; অন্য তিন জামাই এসে দাঁড়ালো চোখের সামনে; দিলখোলা ফুর্তিবাজ বড়ো জামাই প্রমথেশ; একটু রাগি হেমাঙ্গ, কিন্তু চাপা ঠোঁটে কম কথায় বেশি বুদ্ধির মানুষ; উশকোখুশকো চুলে দিশেহারা অরুণ;—তাদের পাশে এই—এই—কী? কী জানি! আজকালকার ভালো-ভালো ছেলেরা বুঝি এইরকমই; আমি পুরোনো লোক—আমারই চোখের দোষ।

কন্যাপক্ষকে নীরব দেখে পাণিপ্রার্থী আরো বললো : 'আমার সম্বন্ধে কিছু খবর আপনাকে জানাবার আছে। চাকরি করি ইনশিওরেন্স আপিশে ; এখন পাচ্ছি তিনশো, প্রসপেক্ট আছে। বাবা উকিল—আইনের বই-টই লেখেন, থাকেন ভবানীপুরে ঠাকুরদার আমলের বাড়িতে, দুই কাকাও সেখানে—আমি সম্প্রতি আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছি রাসবিহারী এভিনিউয়ে।'

'কেন ?'

একটুও দেরি না ক'রে, 'আপনার মেয়েরই সুখের জন্য', জবাব দিলো হারীত। চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো, 'তাহ'লে আপনি কী বলেন ?'

'তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলবো।'

'নিশ্চয়ই—ও-সব ফর্ম্যালিটি তো আছেই। তবে এ-বিষয়ে বাবার যখন আলাদা কোনো মত নেই, আপনি আমার সঙ্গেই—' হারীত উত্তরের জন্য রাজেনবাবুর মুখের দিকে তাকালো, উত্তর না-পেয়ে উঠে দাঁড়ালো।—'আচ্ছা, চলি। কাল আবার আসবো এই সময়ে।' দরজার দিকে যেতে-যেতে একটু থামলো রাজেনবাবুর সামনে, গলা নিচু ক'রে চোখে কেমন-একটা উদাস ভাব এনে বললো : 'একটা কথা বলি। এ-বিয়ে হবেই, আশা করি মিছিমিছি একটা গোলযোগ—?'

'দেখি।'

হারীত চ'লে যাবার পর রাজেনবাবু তেমনি ব'সে রইলেন চেয়ারটিতে। কী-দোষ ? হারীতের কী-দোষ ? কেন মনে হচ্ছে না চমৎকার, কেন সুখী হ'তে পারছেন না, কেন তার মুখে দেখতে

পাচ্ছেন না প্রমথেশের ভালোমানুষি, হেমাঙ্গর ধার, অরুণের লাবণ্য ? কেন ওদের পাশে বসাতে গিয়েই মন কুঁকড়ে ফিরে আসছে ?—কিন্তু মেয়ে তাকে পছন্দ করেছে, মেয়ে সুখী হবে, আমি কে ? কিছুই কি নই ? আমার না ওরা ?…না, ফল কি গাছের ? মুকুল গাছের, ফুল গাছের, ফল পৃথিবীর। যে-মুহূর্তে পাকলো, সে-মুহূর্তে দিতে হবে পৃথিবীকে, না-দিলে ফল পচবে, গাছ মরবে।…যদি পড়ে পোড়ো জমিতে, জোলো জমিতে, মরুভূমিতে ?…কে জানে, কেউ কি বলতে পারে ? কাকে জিগেস করবেন ? কার সঙ্গে কথা বলবেন আজ ? বিছানায় শুয়ে, অত কষ্ট পেয়ে, রোগে ধুঁকতে-ধুঁকতে, তবু-তো সে ছিলো। গেলো কোথায় ?…তবে কি সত্যি চ'লে গেলো, আর দেখবো না, তার মেয়ের বিয়েতেও দেখতে পাবো না একবার ?

'বাবা !'

এইমাত্র স্নান করেছে স্বাতী, পরেছে লাল পাড়ের শাদা একটি শাড়ি, ভিজে চুল মেলে দিয়েছে পিঠে। তাকিয়ে রাজেনবাবু কথা বলতে পারলেন না। বলবার কিছু নেই, বললেও কেউ শুনবে না ; দিতেই হবে, আমাকেও দিতে হবে, আমার কাছেও পৃথিবীর পাওনা ছিলো তিনটি, চারটি, পাঁচটি কন্যা।

'বাবা, তুমি যেন বড়ো চিন্তিত ?'

'শোন স্বাতী, তোকে একটা কথা বলি—'

'কী, বাবা ?'

'আচ্ছা, হারীতের সঙ্গে তোর ছোড়দির বিয়ে হ'লে কেমন হয় রে ?'

'ভালো-তো!'

'ভালো? তোর ভালো লাগে হারীতকে?'

'আমার?' স্বাতী আর-কিছু বললো না।

রাজেনবাবু জিগেস করলেন, 'শাশ্বতী বেশ সুখী হবে, তোর মনে হয়?'

'কেন হবে না?' ব'লে স্বাতী ঘুরে দাঁড়ালো, একটু-যেন লাজুক ধরনে। চোখে লাগলো লাল পাড়ের ঝলকানি। এ-রকম তো হয়েছিলো আগে-একবার, হঠাৎ মনে হ'লো রাজেনবাবুর, ঠিক এ-রকম, এমনি এক অঘ্রানের সকালে; ঠিক এই মুহূর্তটি, এই ঘর-আলো-করা লাল পাড়, ভিজে চুলের গন্ধ, ঘুরে দাঁড়ানোর চমক। কবে?···কবে? সে কি এ-জন্মে, সে কি আর-এক জন্মে? সে কি এই জগতে, না আর-এক জগতে? সে কি আমি? সে কি সত্যি আমি? সেই অন্য-একটি পনেরো বছরের মেয়ে, তাকে মনে পড়ে না? আমাকে আর মনে পড়ে না? আমাকে আর মনে পড়ে না তোমার?

'ছোড়দিকে ডাকবো, বাবা?' স্বাতী নিচু হ'য়ে থুতনি রাখলো বাবার কাঁধে। মাথা সরিয়ে নিলেন রাজেনবাবু, দুই চোখ ভ'রে দেখতে লাগলেন যেন স্বাতীকে আগে ছাখেননি। সেই কোঁকড়া কালো মাথাটা, যত মুখ জীবনে দেখেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর মুখ! সে-মুখ তো নেই আর। যে-মুখে শুধু আনন্দ ছিলো, শুধু অমৃত, সে-মুখে কেন আশঙ্কা, যেন অশান্তি? কী-যেন লুকোনো আছে, সেই লুকোনোকে তার ভয়। চোখ এমন বড়ো-বড়ো ছিলো না তার, এমন বাঁকাও ছিলো না। কখনো এমন আশ্চর্য

লাগেনি তার মুখ, এত আশ্চর্য যে অচেনা।···যদিও চারটি মেয়েকে এর আগে বড়ো হ'তে দেখেছেন, তবু রাজেনবাবু যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না যে এ তাঁরই কন্যা।

'কিছু বলছো না যে?' আবার প্রশ্ন স্বাতীর।

'আচ্ছা,' ব'লে রাজেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠলেন, আর সেদিন থেকেই লেগে গেলেন টাকা যোগাড়ের চেষ্টায়। তারিখ পড়লো অঘ্রানেরই শেষে; দেখতে-দেখতে পাড়ায় ছড়ালো বিয়ে-বাড়ির সোর।

—যাকে বলে বিয়ে-বাড়ি! ভিড়, হৈ-চৈ, অফুরন্ত রান্না আর খাওয়া। এ-ক'বছরে যদিও তিন মেয়েই যাওয়া-আসা করেছে দু-একবার, আর পুজোর সময় একবার শ্বেতা আর সরস্বতী একসঙ্গেও এসে ছিলো কিছুদিন—তবু চেষ্টা ক'রেও তিন মেয়েকে একত্র করতে পারেননি রাজেনবাবু। খুব আশা ছিলো যে শাশ্বতীর বিয়ের সময়—কিন্তু হ'লো না। হেমাঙ্গ রেনাল কলিকে ভুগছে, তাকে নিয়ে আসা অসম্ভব, তাকে রেখে আসাও তা-ই। লম্বা একটি চিঠিতে মহাশ্বেতা কাঁদলো বাবার কাছে, পাঠালো সেই খামেই পাঁচশো টাকার ড্রাফট, আর পার্সেলে বর্মি স্যাকরার শিল্পকলার কয়েকটি নমুনা।

নতুন বাড়িতে মেয়ে-জামাইরা এই প্রথম এলো। সবচেয়ে বড়ো পুব-দক্ষিণ-খোলা ঘরটি, শাশ্বতী আর স্বাতী যেটাতে থাকে—মানে থাকতো—সেটি রাজেনবাবু দিলেন শ্বেতাকে, সে বড়ো

ব'লে নয়, তার ছেলেপুলে বেশি ব'লে। তাঁর ঘর হ'লো সরস্বতীর, আর বিজুর ছোটো ঘরে ছোটো দুই মেয়েকে দিয়ে তিনি এলেন বাইরের ঘরে—এলেন মানে আর কী, রাত্তিরের শোওয়াটা দিয়েই-তো কথা।

'আমি ? আমি কোথায় শোবো ?' বিজু গনগন করলো।

রাজেনবাবু বললেন, 'কেন ? বাইরের ঘরে তো কত জায়গা।'

'মেঝেতে ?'

রাজেনবাবু তক্তাপোশ আনালেন। স্বাতী বললো, 'তুমি বুঝি মেঝেতে শোবে, বাবা, আর দাদা তক্তাপোশে ?'

'মেঝেতেই আরাম।'

'আমি পড়বো কোথায় ? আমার আবার পরীক্ষা না ?'

'পরীক্ষা তো স্বাতীরও', রাজেনবাবু মাথা চুলকোলেন, 'তা এ-ক'টা দিন—'

'ঈশ ! এমনিতেই প'ড়ে ভাসিয়ে দিচ্ছিস !' স্বাতী ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, 'খুব সুবিধেই হ'লো তোর, চমৎকার ছুতো হ'লো একটা।'

বিজু রাগ ক'রে দু-তিন খানা বই আর একটি বালিশ নিয়ে চ'লে গেলো তার এক বন্ধুর বাড়িতে। শ্বেতা থেমে-থেমে বললো, 'সত্যি, ওকে কেন—আমরা না-হয়—ওর পরীক্ষা—'

'ভালো-তো !' রাজেনবাবু বললেন, 'যদি রাগ ক'রেও একটু পড়ে-টড়ে, তবে-তো ভালোই।'

'তা—ওকে ডেকে আনবে না ?'

'আসবেই।'

সারাদিন বাইরে কাটিয়ে সন্ধের একটু আগে বাড়ি এসে বিজু হাঁক দিলো : 'স্বাতী, আমার মশারি দে।'

শ্বেতা তাড়াতাড়ি কাছে এসে বললো, 'বেশ ছেলে! কোথায় ছিলি রে সারাদিন? আয়—কী খাবি?'

বিজু মোটা গলায় বললো, 'আমি চ'লে যাবো এক্ষুনি।'

'যা, ঘরে যা'। তোর ঘর ঠিক ক'রে দিয়েছি।'

ঘরে এসে বিজু অবাক। পরিষ্কার গুছোনো টেবিল, নতুন সুজনি দিয়ে ঢাকা বিছানা, আর বোন দুটোর চিহ্নমাত্র নেই। হাত-পা ছড়িয়ে তক্ষুনি শুয়ে পড়লো লম্বা হ'য়ে—উঃ, বড্ড ঘোরাঘুরি হয়েছে সারাদিন।

সন্ধের পর শ্বেতা বললো, 'বাবা, আমি বাইরের ঘরেই বিছানা করতে বললাম, এখানে এক খাটে শাশ্বতী আর স্বাতী, আর-এক খাটে তুমি—'

'কেন?'

'বিজুকে তার ঘরেই দিয়েছি।'

'আর তুই বুঝি ছেলেপুলে নিয়ে এই ঠাণ্ডায়—'

'ঠাণ্ডা কোথায়—কলকাতায় আবার শীত। মস্ত বিছানা হবে মেঝেতে, ছেলেপুলে নিয়ে বেশ ছড়িয়ে শোবো।'

'হ্যাঃ, তাই বেশ! যা গড়ায় ওরা এক-একজন!' ব'লে প্রমথেশ এমনভাবে হেসে উঠলো যেন এই গড়ানোটা খুব একটা আনন্দের ব্যাপার।

'বিজুকে এ-রকম প্রশ্রয় দেয়া কিন্তু ঠিক না', বললো সরস্বতী।

'প্রশ্রয় কী রে?' শ্বেতা জবাব দিলো, 'সকলেরই সুবিধে, আর ওর বুঝি অসুবিধে হবে?'

'অসুবিধে আবার কী—বোনেদের জন্য একটু কষ্ট করতে পারে না! দু-দিনেরই তো ব্যাপার।'

'আহা—ছেলেমানুষ—ওর আবার—'

'আমি-তো দেখছি ওর ছেলেমানুষি ঘুচবে না কখনোই। তোমাকে বললাম, বাবা, ওকে দিল্লীতে আমার কাছে রাখো—ঠিক মানুষ হ'য়ে যেতো ওখানে।'

'সত্যি নাকি রে? তবে আমার ডালিমটাকে রাখি তোর কাছে—একেবারে পড়তে চায় না হনুমান!'

ছাইরঙের গরম স্যুট প'রে অরুণ এসে দাঁড়ালো।—'শোনো, একটা রুমাল দিতে পারো?'

স্যুটকেসেই আছে 'ছাখো না,' স্বামীর দিকে না-তাকিয়েই উত্তর দিলো সরস্বতী।

'খুঁজে পাচ্ছি না তো—'

'তুমি আবার কবে কী খুঁজে পাও! যা তো গীতি, বাবার একখানা রুমাল বের ক'রে দে।'

গীতিও সেজেছিলো বাবার সঙ্গে বেরোবে ব'লে; পুতুলের মতো মাথা নেড়ে বললো, 'আমি পারবো না!'

'পারবি না! কিছুই পারবি না তোরা! সবই যদি আমাকেই করতে হবে তাহ'লে আর ছেলেমেয়ে হ'য়ে আমার লাভ কী হ'লো!'

'আহা—দে না খুঁজে', রাজেনবাবু নিচু গলায় বললেন।

মেয়ের গায়ে ধাক্কা লাগিয়ে মাথায় কাপড় টেনে সরস্বতী উঠে

দাঁড়ালো। শ্বেতা ব'লে উঠলো, 'তোর শাড়িটা দিসরে আমাকে—পাড় লাগিয়ে দেবো।'

'এটা?' সরস্বতী একটু-যেন অবাক হ'লো। 'এগুলো-তো পাড় ছাড়াই পরে।'

'নাকি? পাড়-ছাড়া শাড়ির ফ্যাশন হয়েছে আজকাল? মা গো, মা গো!' শ্বেতার যেন চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না।

'মনে নেই তোমার—সেই মিসেস দে—জজ-সাহেবের স্ত্রী—' ঘর ভ'রে গেলো প্রমথেশের উচ্চহাসিতে।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শাশ্বতী বললো স্বাতীকে: 'বড়দিটা কী-রকম হয়ে গেছে রে!'

'কী হয়েছে?'

'কেমন বাঙাল-বাঙাল!'

স্বাতী একটু ভেবে বললো, 'আমার কিন্তু অন্য রকম লাগে।'

'কী-রকম?'

লেপের তলায় বোনের আরো একটু গা ঘেঁষে স্বাতী চুপি-চুপি বললো, 'ঠিক মা-র মতো।'

'কী গরম রে!' শাশ্বতী লেপ সরিয়ে দিলো পায়ের উপর থেকে।

'ছোড়দি, মাকে তোমার মনে পড়ে?'

'বাঃ, পড়ে না?'

'আমার কিন্তু মনে হয় ভুলেই গেছি। বড়দি যেদিন এলেন না—আমি কী-রকম চমকেছিলাম প্রথম দেখে—ঠিক যেন—।'

'দূর!—মা বুঝি ও-রকম ছিলেন! ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখিস।'

'কী জানি, আমি-তো বড়দিকে বেশি দেখিনি, তাই বোধহয়—'

'জামাইবাবুটাই ক্যাবলা,' একটু পরে শাশ্বতী মন্তব্য করলো। 'সেইজন্যই বড়দি ওরকম হ'য়ে গেছে।'

'যাঃ, জামাইবাবু খুব ভালো—চমৎকার।'

'ভালো সত্যি অরুণদা। কিন্তু কী-রকম বুড়োটে হ'য়ে গেছে রে এর মধ্যে! তোর সঙ্গে আজকাল আর বেশি ভাব দেখি না তার?'

'দেখাই হয় না।'

'তোর মনে আছে, স্বাতী,' শাশ্বতী ন'ড়ে-চ'ড়ে বোনের মুখের কাছে মুখ আনলো, 'সেই-যে কেঁদেছিলি অরুণদাকে বিয়ে করবো ব'লে?'

'যাঃ!'

'কেঁদে একেবারে গঙ্গা-যমুনা! আর কী মেরেছিলি আমাকে—মনে নেই?'

'যাঃ!'

'কাণ্ডই করেছিলি, সত্যি। দিদিরা হেসে খুন!' কথাটা মনে ক'রে সেইরকমই হাসলো শাশ্বতী, যে-রকম দিদিরা হেসেছিলো কথাটা শুনে দশ বছর আগে। কিন্তু ঠিক কি সে-রকম?

একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী যেন আপন মনে বললো, 'আজ এক শুক্কুরবার গেলো, আবার শুক্কুরবারেই তো—'

'নে, ঘুমো এখন।'

'ছোড়দি, একটা কথা বলবে?'

'কী?' একটু লজ্জা শাশ্বতীর মুখে।

'কেমন লাগছে রে?'

'কেমন আবার।' শাশ্বতী এক ঝটকায় পাশ ফিরলো।

দুপুরবেলায় সিনেমা দেখে বিকেলের রোদ্দুরে বেরিয়ে আসতে যেমন লাগে, তেমনি লাগলো হারীতের পরের শুক্রবারের রাত-শেষের শনিবারের সকালবেলায়। লোকজন, চলাফেরা, হাসি, কথা, ব্যস্ততা, রোদ্দুরে মাখা শীতের সকাল, আর সে ঘুম থেকে উঠলো একটা অচেনা বাড়ির অচেনা ঘরের মেঝেতে, পাশে আলপনা, হাতে হলদে সুতো, পরনে গরদ। যেন সিনেমা শেষ, সকলে মিশে গেছে রাস্তার ভিড়ে, সে প'ড়ে আছে সিঁড়িতে একলা। নাঃ—এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়েই বেরিয়ে পড়তে হবে।—গায়ের আড়মোড়া ভেঙে হারীত উঠে দাঁড়ালো।

বাথরুমে হাত-মুখ ধুয়ে, গরদ ছেড়ে সাধারণ কাপড় প'রে ঘরে এসে ছাখে রীতিমতো ভিড়। মেঝেতে মস্ত রুপোর ট্রেতে চা—শুধু কি চা! রুটি-মাখন, ডিমের পোচ, সোনারঙের মোটা-মোটা মর্তমান কলা, আবার ফুলো-ফুলো লুচি, ঝিরিঝিরি আলুভাজা, সন্দেশ, পান্তুয়া, সরভাজা। হারীতের ভির্মি লাগলো।

সরস্বতী বললো, 'কী নন্দী-সাহেব, রাত্তিরে একটু ঘুমিয়েছিলে কি?'

'খুব ঘুমিয়েছিলাম,' হারীত গম্ভীরভাবে বসলো এসে মেঝের বিছানাতেই, যেহেতু ঘরে চেয়ার-টেয়ার কিছু নেই।

'ও মা, বিয়ের কাপড় ছেড়ে ফেললে!' শ্বেতা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। 'বাসিবিয়ে হবে না?'

আরো গম্ভীরভাবে হারীত বললো : 'আমি একটু বেরুবো।'

'এখন ? এখন কোথায় যাবে ?' আঁৎকে উঠলো শ্বেতা। 'কতকিছু আছে এখন—'

'আ—হা।' মোটাসোটা প্রমথেশ খাটে এসে জুড়ে বসলো, 'তোমাদের ও-সব নিয়ম-টিয়ম ছাড়ো-তো একটু। আজকালকার ছেলেদের কি ভালো লাগে ও-সব! দাও, চা দাও ওকে।'

'স্বাতী, যা তো তোর ছোড়দিকে ডেকে নিয়ে আয়।—এটা বোধহয় আজকালকার ছেলেটির ভালো লাগবে ?' সরস্বতী কটাক্ষ হানলো হারীতকে।

'মিছিমিছি লজ্জায় ফেলা বেচারাকে—' মাথার কাপড়টি আরো একটু টেনে দিয়ে শ্বেতা বললো।

কিন্তু না! বেনারসি আর গয়না প'রে শাশ্বতী বেশ হাসিমুখেই ঘরে এসে বড়োজামাইবাবুর কাছে বসলো খাটে ঠেশান দিয়ে।

'এই ভুল করলে! ওখানে ওর পাশে গিয়েই বোসো না— একটু দেখি আমরা!' ব'লে প্রমথেশ অনুমোদনের জন্য আর-সকলের দিকে তাকাতে লাগলো।

'আর জ্বালিয়ো না তো বাপু!' শ্বেতা উব-হাঁটু হ'য়ে ট্রের কাছে ব'সে খাবার-সাজানো-সাজানো থালা এগিয়ে দিতে লাগলো হারীতের দিকে।

'এ-সব দিয়ে কী হবে ?'

'খাও একটু ?'

'একটু ?'

'কাল-তো উপোশ ক'রে ছিলে—'

'না! উপোশ কেন করবো?'

শ্বেতা হেসে ফেললো।—'আচ্ছা, কাল না-হয় উপোশ করোনি। তাই ব'লে আজ করবে নাকি?'

'একটু চা দিন।'

সরস্বতী এগিয়ে এলো চা ঢালতে। হারীত বললো, 'আপনারা?'

হাত নেড়ে জবাব দিলো প্রমথেশ, 'আমাদের হ'য়ে গেছে অনেক আগে। বুঝেছো না, মফস্বলের অভ্যেস, ঘুম ভেঙেই খিদে।'

'আপনি?' প্রশ্নের লক্ষ্য সরস্বতী।

মুখ টিপে হেসে সরস্বতী বললো, 'আগে বললে না—ব'সে থাকতুম তোমার জন্য।'

ঢিলেঢোলা ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা অরুণ ঘরে ঢুকে সোজা ব'সে পড়লো মেঝের উপর, কপাল থেকে চুল সরিয়ে বললো, 'আমাকে একটু চা।'

সরস্বতী চা ঢেলে প্রথমে দিলো জামাইকে, তারপর স্বামীকে।

খাটের দিকে তাকিয়ে হারীত বললো, 'শাশ্বতী, তুমি?'

প্রমথেশ হা-হা ক'রে হেসে উঠলো, শ্বেতা হাসি লুকোলো আঁচলে, আর সরস্বতী সহজভাবে বললো, 'চা খাবি, শাশ্বতী?'

শ্বেতা মুখ তুলে হারীতের দিকে তাকালো—'ওর জন্য ভাবতে হবে না তোমাকে—তুমি খাও-তো এবার!'

একটি ডিম খেলো হারীত, তারপর চায়ে চুমুক দিতে লাগলো।

'তা হবে না! সব খেতে হবে।' লুচির থালা এগিয়ে দিলো শ্বেতা। হারীত শিউরে স'রে এলো।

'খাও!'

'না।'

'খা—ও।'

'না দেখুন—সকালে কিছু খাই না—'

'রোজ-রোজ কি বিয়ে করো যে রোজকার মতো খেতে হবে? চালাকি, না? খাও শিগগির!' অনেকটা আলু-ভাজা একখানা লুচিতে মুড়ে শ্বেতা গুঁজে দিলো হারীতের হাতের মধ্যে।

হারীত কাতরভাবে লুচিখানা খেয়ে উঠলো।—'আর কী খাবে?' আসরে নামলো সরস্বতী।

'আর না।'

'ও, বড়দির হাতই পছন্দ তোমার? দাও, বড়দি, আরো কিছু দাও নন্দীর হাতে। উনি আবার নিজের হাতে নিয়ে খেতে জানেন না।'

কিন্তু সন্দেশের বিরুদ্ধে একেবারে উপুড় হ'য়ে পড়লো হারীত। রীতিমতো সত্যাগ্রহ। শালীরাও ছাড়লো না, হত্যা দিলো দু-দিক থেকে দু-জনে।

শাশ্বতী ব'লে উঠলো খাট থেকে: 'এ কী একগুঁয়েমি! এত ক'রে বলছে—খাও না!'

'ও মা! এর মধ্যে এত!' শ্বেতা হেসে লুটিয়ে পড়লো মেঝেতে, আর সরস্বতী একটু-যেন শুকনো গলায় বললো, 'আমরা-তো ফেল হলুম রে—এবার তুই আয়, ভাখ পারিস যদি!'

দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'খাওয়া নিয়ে জবরদস্তি কী বিশ্রী! যে যে-রকম ভালোবাসে সে-রকম দিলেই হয়।' মৃদুস্বরে বললেন, কিন্তু শুনতে পেলো সকলেই।

'তা—তা—ইচ্ছে করলে আর—' থাকগে! মুখ ভার হ'লো সরস্বতীর।

'সকলের অভ্যেস-তো একরকম না,' ব'লে রাজেনবাবু অন্য দিকে চ'লে গেলেন।

শ্বশুরকে দেখে হাতের সিগারেট নামিয়ে রেখেছিলো অরুণ, ত্বরিতে তুলে নিয়ে বললো, 'স্ত্রী যদি এক মাইল দূরে খাটে ব'সে থাকে, তাহ'লে কি আর খেতে ভালো লাগে কারো! শাশ্বতী এসো না এখানে!'

জমিদারি ধরনে পায়ের পাতায় হাত বুলোতে-বুলোতে একটু দুলে-দুলে প্রমথেশ বললো: 'তুমি-তো বেশ লোক হে! বসেছো-তো গিয়ে নিজের স্ত্রীটির মুখোমুখি, তার উপর আবার—'

'বাঃ, তাই ব'লে অন্যের স্ত্রীর দিকে নজর দেবো না একটুও!—কিছু মনে কোরো না, হারীত।'

সভাস্থল থেকে একটু দূরে জানলার ধারে ব'সে ছিলো স্বাতী, অরুণের কথাটা শুনে চোখ তুলে তাকালো।

'শালীর বিয়েতে খুব-যে রস!' উশকোখুশকো চুলের হাসিমুখ মানুষটিকে তীর ছুঁড়লো সরস্বতী।

'কিছুতেই খেলে না তো।' ব'লে শ্বেতা আঁচলে মুখ মুছে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু দমলো না: দুপুরবেলা নতুন জামাইকে সাজিয়ে দিলো মস্ত রুপোর থালায় বাটি-চেপে-গোল-করা ফুলের মতো ভাত, আর থালাটি ঘিরে হারের লহরের মতো ঝকঝকে কাঁসার ছোটো-বড়ো বাটি—যেন সাতাশ বৌ নিয়ে চাঁদ।

হারীত এসে বসতেই শ্বেতা বললো, 'খেতে হবে না, শুধু দেখবার জন্য দিয়েছি।'

'দেখবার যোগ্যই,' হারীতকে স্বীকার করতে হ'লো। 'ব'লে দিন সবচেয়ে ভালো রান্না কোন-কোনটা।'

শ্বেতা খুশি হ'য়ে বললো, 'সবটাই চেখে ছাখো একটু-একটু।'

'চেখে দেখবো? বাকিটা ফেলা যাবে তো?'

'সে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'কি অপব্যয়! কত খাবার নষ্ট!' সারি-সারি বাটির উপর চোখ বুলিয়ে হারীত স্বগতোক্তি করলো।

'তা না-হ'লে আর বিয়ে কী!' শুক্তোটাকে উপেক্ষা ক'রে ছোলার ডালের ছেঁচকি দিয়ে খাওয়া আরম্ভ করলো প্রমথেশ। 'সেই সি. আর. দাশের গল্প জানো না—মেয়ের বিয়ের সময় খাজাঞ্চি এস্টিমেট দিলো একলাখ টাকার। হেসে বললেন দাশ-সাহেব, "আরে একলাখ টাকা-তো চুরিই হবে, লাগবে কত বলো!" ' ব'লে প্রমথেশ মাথা উঁচু ক'রে হেসে উঠলো।

'এই ক'রে-ক'রেই তো এ-অবস্থা হয়েছে আমাদের!' হারীত মাছের চপের কোণা ভেঙে মুখে দিলো। 'তা দেরি নেই আর—আসছে দিন! এ-যাত্রাও কোনোরকমে ঠেকিয়ে রাখলো চেম্বরলেন, কিন্তু যুদ্ধ হবেই—তখন দেখা যাবে কোথায় থাকে এ-সব!'

'মানুষের আনন্দ-উৎসব বন্ধ হবে ভেবে তুমি যেন বেশ উৎসাহিত?' চুমুক দিয়ে শুক্তোর ঝোল খেয়ে নিলো অরুণ ডাক্তার।

রাজেনবাবু নেবু নিংড়ে নিচ্ছিলেন ডালে, চোখ না-তুলেই আস্তে বললেন, 'তা সত্যিই-তো, অপব্যয়টা আমাদের বড়ো বেশি।'

'অপব্যয় যখন হ'য়েই গেছে, সদ্ব্যবহার করা যাক!' প্রমথেশ পাতে নিলো উচ্ছে দিয়ে রাঁধা মৌরলা মাছ।

'সহজে কি শিক্ষা হবে আমাদের। রাস্তায় না-খেয়ে মরবে মানুষ—তবে-তো!' হারীত বেছে-বেছে হাত দিলো শর্ষে-নারকোলের চিংড়িতে।

'মানুষের যারা উপকার করে তাদের কী মুশকিল!' শাদা-শাদা লাউয়ের তরকারি দিয়ে একটু ভাত মেখে নিয়ে অরুণ বললো, 'মানুষ ভালো থাকলে ভালোই লাগে না তাদের।'

হঠাৎ বাবার কাঁধে মাথা হেলিয়ে জলের মতো ছলছল শব্দে হেসে উঠলো স্বাতী। হারীত চট ক'রে চোখ তুলে তাকালো একবার, তারপর খেতে লাগলো নিঃশব্দে, গম্ভীরভাবে।

'স্বাতী, তুমি যে বসলে না?' প্রমথেশ কথা বদলালো।

'আমি দিদিদের সঙ্গে খাবো।'

'কেন, ওকে আর বিজুকে বসিয়ে দিলেই হ'তো নতুন জামাইয়ের সঙ্গে।'

'বিজু-তো সেই কখন খেয়ে বেরিয়ে গেছে', জবাব দিলো শ্বেতা। 'আর স্বাতী—'

'না, না', অরুণ বলে উঠলো, 'ও-সব একসঙ্গে খাওয়া-টাওয়া হাইজিনিক নয়।'

'তোমার মুখে এ-কথা?' সরস্বতী হাসলো। 'স্বাতী সঙ্গে না-বসলে তোমার-তো খাওয়াই হ'তো না।'

'তার অবশ্য আলাদা কারণ আছে।—কী স্বাতী, মনে নেই?' অরুণ এক ঝলক তাকালো স্বাতীর দিকে।

'তোমাদের এ-সব সেকেলে ঠাট্টা নন্দীর ভালো লাগছে না', রাশ টানলো সরস্বতী।

'তা একেলে ঠাট্টা শুনি না ছু-একটা!' যাকে লক্ষ্য ক'রে শ্বেতার টিপ্পনি, সে একটু লাল হ'লো, কিন্তু থালা থেকে চোখ তুললো না।

স্বাতী উঠে এলো সেখান থেকে। আবছা মনে পড়ে, অরুণদাকে তার কী-ভালো লাগতো ছেলেবেলায়; অত ভালো কাউকেই যেন আর লাগলো না। শুভ্র, শুভ্রর বন্ধুরা, হারীতবাবু—কেউ কি সেই অরুণদার মতো?···কিন্তু সে-রকম আর নেই কেন, সে-অরুণদার কী হ'লো?···বড়ো হ'তে-হ'তে ছেলেবেলার ভালো লাগা আর থাকে না বুঝি? ভাগ্যিশ সে বড়ো হয়েছে—এখন থেকে ভালো লাগা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত, আর-তো বদল হবে না—না কি হবে? সর্বনাশ!—স্বাতীর যেন দম বন্ধ হ'লো মুহূর্তের জন্য তা-ই যদি হয়, তাহ'লে ভালো লাগায় বিশ্বাস কী।

শাশ্বতীর কাছে গিয়ে সে বললো, 'আচ্ছা ছোড়দি, একবার যাকে আমাদের ভালো লাগে, তাকেই কি ভালো লাগে, বরাবর?'

'কী বোকার মতো কথা!'

ছোড়দির সিঁদুর-ভরা মাথার দিকে স্বাতী একটু তাকিয়ে রইলো চুপ ক'রে। হঠাৎ বললো, 'ছোড়দি, আজ চ'লে যাবে?'

'বিজুটা কই রে?'

'জানি না তো।'

'কখন থেকে দেখছি না ওকে।'

'দাদা-তো বাইরে-বাইরেই—'

'দেখে আয় তো, ফিরেছে নাকি।'

স্বাতী ঘুরে এসে বললো, 'না ছোড়দি, দাদা বাড়ি নেই।'

ট্যাক্সিতে ওঠবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শাশ্বতী বিজুর খোঁজ করলো, কিন্তু বিজু ফিরলো রোদে-পোড়া চেহারা আর স্যাণ্ডেল-পরা ধুলো-মাখা পা নিয়ে সন্ধেবেলা। ঢুকেই বাড়ির থমথমে চুপচাপ ভাবটা তার ভালো লাগলো না। এ-ঘরে ও-ঘরে কয়েকবার উঁকিঝুঁকি দিয়ে স্বাতীকে জিগেস করলো, 'ছোড়দি কই ?'

স্বাতী ভারি গলায় বললো, 'চ'লে গেছে।'

কথাটা যেন ধাক্কা দিলো বিজুকে। সামলে নিয়ে বললো, 'কখন গেলো ?'

'বিকেলে।'

'আমাকে আগে বলতে পারলি না ?' বিজুর গলা চড়লো।

'আলাদা ক'রে আবার বলতে হবে নাকি ?'

'কেন বললি না আমাকে ?'

'চ্যাঁচাসনে, দাদা !'

'কত খোঁজ করলো তোর !' শ্বেতা নিশ্বাস ছেড়ে বললো। 'তা এক কাজ কর না—হাত-পা ধুয়ে একবার ঘুরে আয় ওখান থেকে—কত খুশি হবে !'

'ব'য়ে গেছে আমার !'

'ওকে কিছু বোলো না, বড়দি,' স্বাতী বললো। 'ও কি এ-বাড়ির লোক যে ওর কিছু এসে যায়।'

'নই-ই তো ! এ-বাড়ির লোক তো নই-ই আমি !' গলা ছেড়ে চীৎকার করলো বিজু। 'আমি এ-বাড়ির লোক হ'লে কি আর এটাও জানতে পেতাম না যে ছোড়দি কখন যাবে !'

'তবে-তো বুঝিসই,' জবাব দিলো স্বাতী

'বুঝি না!' বিজু যেন চোখ দিয়ে পুড়িয়ে ফেললো স্বাতীকে। 'সবই বুঝি। এ-বাড়ি তোর, এ-বাড়িতে তুই-ই সব, তোর কথায় সবাই ওঠে-বসে—আমার কোনো জায়গা নেই এখানে। এতদিন ছোড়দির জন্য তোর জ্বলুনি-তো কম ছিলো না, এবার সেও বিদায় হ'লো! কেমন! আহ্লাদে নাচ এবার!' মুখ লাল ক'রে গলার রগ ফুলিয়ে ঠোঁটে ফেনা তুলে, বাড়ির বিমর্ষ অবসন্ন প্রত্যেকটি মানুষের কানে বিজু তার মনের কথা সেঁধিয়ে দিলো। একটি কন্যার সম্ভবিচ্ছেদে যা হয়নি, সেই রকম একটা আঘাত হঠাৎ যেন আকাশ থেকে নামলো।

'কিন্তু কেন জানিস?' আবার শোনা গেলো বিজুর গলা, 'কেন আমি এ-বাড়ির লোক নই, জানিস? তোর জন্য! শুনে রাখ, স্বাতী, আমি-যে বাড়ি থাকি না, আমি-যে ঘুরে-ঘুরে বেড়াই, আমার-যে পড়াশুনো হ'লো না—সব তোর জন্য! তোর রাজত্বে আমিও থাকবো ভেবেছিস! আমি আর না—! এই আমি চললাম!' বুকে চাপড় মেরে এক হাত লাফিয়ে উঠে, পায়ের কাছে ঢনাৎ ক'রে একটা কেটলি উল্টিয়ে বিজু বেরিয়ে গেলো বন্দুকের গুলির মতো।

'কী অসভ্য ছেলে!' পাশের ঘরে রাজেনবাবু বললেন চাপা গলায়।

আর-সবাই যেন স্তম্ভিত হ'য়ে রইলো কয়েক মিনিট। তারপর প্রমথেশ ফিশফিশ ক'রে বললো, 'ছাখো না, সত্যি চ'লে গেলো নাকি।'

'কেন-যে যেখানে-সেখানে রাখে সব!' শ্বেতা কেটলিটি তুলে

রেখে বাবার কাছে এলো।—'বাবা, তুমিও-তো ওকে একটু ডাকলে-টাকলে পারো মাঝে-মাঝে। বড়োসড়ো হয়েছে এখন—'

'ওআইল্ড!' এই একটি ইংরিজি শব্দ ছাড়া আর-কোনো কথা সরস্বতীর মনে এলো না। 'একেবারে ওআইল্ড!'

'মা তো নেই,' শ্বেতা তাড়াতাড়ি বললো, 'আর এ-বয়সে সব ছেলেই একটু-না-একটু বিগড়োয়। বাবা যদি একটু ওর সঙ্গে—'

'না,' সরস্বতী বাধা দিলো, 'ও-সব কিছু না। শাসন চাই, কড়া শাসন। বাবা অমন অসম্ভব ভালোমানুষ ব'লেই-তো মাথায় চড়েছে।'

কোনো মেয়ের কথার উত্তরেই রাজেনবাবু কিছু বললেন না। হঠাৎ আবার শোনা গেলো দুমদাম পায়ের শব্দ; যেন রাস্তায় মার খেয়েছে এই রকম একটা চেহারা ক'রে বিজু ঘরের মধ্যে এসে সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বলতে পারলে না? আমাকে বলতে পারলে না তোমরা? কেউ বলতে পারলে না?' ব'লেই ছিটকে শুয়ে পড়লো উপুড় হ'য়ে শাশ্বতীর খাটে, মুখে বালিশ চেপে বিশ্রী বীভৎস আওয়াজ ক'রে ডেকে উঠলো, 'ছোড়দি—ঈ। ও-ও ছোড়দি!' একেবারেই অসভ্যের মতো হাউহাউ ক'রে কাঁদতে লাগলো।

বারান্দার একটি থামে হেলান দিয়ে স্বাতী যেন শীতের ছাইরঙা সন্ধ্যার মধ্যে মিশে ছিলো এতক্ষণ: চমকে উঠলো দাদার অন্যরকম চীৎকার শুনে। বিজু সহজে থামলো না; আর শুনতে-শুনতে স্বাতীর গলা আটকে এলো, ঠোঁট কেঁপে উঠলো, তার মুখ তাকে অমান্য ক'রে বিকৃত হ'লো নানারকম রেখায়, আর ফোঁটা-ফোঁটা গরম শরীর-নিংড়োনো জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো চোখ বেয়ে গালে।

কান্না!—কান্না এইরকম? মাকে যখন নিয়ে গেলো, মাকে রেখে বাবা যখন ফিরে এলেন, তারপর বাড়িতে সেই প্রথম মা-ছাড়া রাত্রি···কেঁদে-কেঁদে মরতে বাকি ছিলো তার। কিন্তু এ-রকম তো লাগেনি। কান্নার জোয়ারে সে ভেসে গিয়েছিলো তখন, যেন অথৈ জলে ডুবছে, কিন্তু যতবার দম আটকে এসেছে কে যেন হাত ধ'রে তাকে তুলে দিয়েছে ঢেউয়ের উপর।···আর এ-কান্না যেন বুক ভেঙে দিয়ে ঠেলে-ঠেলে উপরে উঠলো, তারপর একটু-একটু ক'রে নেমে এলো চোখ জ্বালিয়ে দিয়ে; একে লুকোতে চায়, পারে না; এতে লজ্জা করে, কিন্তু লজ্জা মানে কে? মা-র জন্য কান্নায় শুধু কষ্ট ছিলো, যত কষ্ট তত আরাম; আর এ-কান্নায় সবচেয়ে বেশি মনে হ'লো আমি যেন হেরে গেলাম; আর যেন কী বলতে গিয়ে বলতে পারলাম না, আর সেই মুখের কথাকে মুছে দিলো চোখের জল।

এর পরে দিন কয়েক স্বাতীকে যেন কান্নায় পেলো। ছোড়দির কথা মনে ক'রে যখন-তখন সে কাঁদে; আর বড়দি সেজদি যখন চ'লে গেলেন তখনো কেঁদে ভাসালো সে; আগের চেয়েও নিরিবিলি বাড়িতে কান্না যেন তাকে ধরবার জন্য ওৎ পেতেই রইলো, যেমন, সে শুনেছে, স্বদেশীদের পিছন-পিছন ঘোরে পুলিশের গোয়েন্দা। এক-এক সময় কিছুতেই তার হাত ছাড়াতে না-পেরে গল্পের অ্যালিসের মতো নিজেকেই নিজে ধমকে দেয়: 'চুপ! চুপ

করো বলছি ! এত বড়ো মেয়ে, কাঁদতে লজ্জা করে না ! থামাও এক্ষুনি ।' আর সত্যিই—এ-রকম করলে চলবে কেন ; পরীক্ষা না ?

বিজুকে সে বললো, 'দাদা, আয় আমরা একসঙ্গে পড়ি ।'

বিজু জিভ বের ক'রে ঠোঁটে বুলিয়ে বললো, 'আমার হ'য়ে গেছে সব ।'

'গ্যাখ দাদা, জিওমেট্রি-তো ঢোকে না আমার মাথায়—'

'আচ্ছা, দেবো'খন এক সময় বুঝিয়ে ।—আমার পরিষ্কার ধুতি আছে নাকি রে একটা ?'

'ধোপার তো আসার কথা—আঃ, ঘাঁটিসনে !' স্বাতী বই ফেলে উঠে তোরঙ্গের তলা থেকে আস্তে টেনে আনলো একখানা পাট-করা ধুতি ।

বিজু তাকিয়ে বললো, 'এ তো বাবার ।'

'তা হোক না ।'

'যেমন মোটা তেমনি খাটো ।'

'আ-হা । বাবা পরতে পারেন আর তুই পারিস না !'

'আমি বাবার চেয়ে লম্বা-তো !—আর বাবারই ঠিক হয় নাকি ? বিশ্রী স্বভাব—যেন উনি চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ধুতি পরলেই কত আয় হবে সংসারের ! এদিকে কত দিক দিয়ে কত খরচ হচ্ছে তাতে কিছু না !' কোনো-এক সময়ে কোনো-এক দিদির মুখে শোনা এই কথাটা আওড়াতে পেরে খুব খুশি হ'লো বিজু, খুব হাসলো খানিকটা, তারপর বললো, 'আচ্ছা দে, আর নেই যখন—'

'দাদা, জিওমেট্রি—'

'পরে । খেয়ে-দেয়ে—' ধুতি হাতে চ'লে গেলো নাইতে ।

রাত্রে যখন বোনের সঙ্গে আবার দেখা হ'লো, সে বেশ-একটু গুরুজনের মতোই জিগেস করলো, 'পড়াশুনা তোর হচ্ছে তো ঠিকমতো?'

'এই একরকম—' স্বাতী জ্যামিতিপ্রসঙ্গ আর তুললো না।

'ক'টা "এসে" মুখস্ত করেছিস?'

' "এসে" মুখস্ত মানে?'

'ইংরিজি "এসে" মুখস্ত করিসনি একটাও? এরোপ্লেনটাও না? ওটা নির্ঘাৎ পড়বে এবার—দেখিস!'

'ও মা!' স্বাতী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো। ' "এসে" আবার মুখস্ত করে নাকি! ও তো বানিয়ে লিখতে হয়!'

যেন বোনকে শুনিয়ে-শুনিয়েই বিজু উচ্চস্বরে ইংরেজি পড়তে লাগলো রাত জেগে-জেগে। রাজেনবাবু চমকে বললেন, 'বিজু পড়ছে—আশ্চর্য কথা!'

'ছাখো না!' স্বাতী আশ্বাস দিলো বাবাকে।

কিন্তু বৃথা—বিজু ফেল করলো এবারেও। কোনো-এক সুযোগে রাজেনবাবু কুণ্ঠিতভাবে ছেলের কাছে প্রশ্ন উত্থাপন করলেন: 'এখন কী করবি?'

'আর পড়বো না, বাবা,' দরাজ গলায় জবাব দিলো বিজু।

'তাহ'লে…?'

'তুমি ভেবো না, আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি।'

রাজেনবাবু ছেলের মুখের দিকে তাকালেন।

'আমি আর্টিস্ট হবো, বাবা।'

'আর্টিস্ট!' রাজেনবাবু হাঁ। 'মানে…যারা ছবি আঁকে

'না বাবা', মধুর একটু হেসে বিজু খবর জানালো বাবাকে, 'গাইয়েদেরও আর্টিস্ট বলে আজকাল। অ্যাক্টরদেরও।'

'মাথা-খারাপ হ'লো নাকি রে বিজুর?' পরে, স্বাতীর সঙ্গে একলা হ'য়ে রাজেনবাবু বললেন।

'নতুন কিছু হয়নি,' স্বাতী হাসলো। একটু পরেই আবার বললো, 'দাদার খুব মাথা কিন্তু, বাবা; একটু যদি মন দিতো তাহ'লে কথা ছিলো না।'

রাজেনবাবু জবাব দিলেন না।

কোনোরকমে যে-কোনো একটা কাজে এক্ষুনি ওকে ঢোকাতে না-পারলে পরে কি আর সামলানো যাবে? তাঁর পেনশনের আর দু-বছর মোটে বাকি; যে-রাজত্বে তিনি কাজে ঢুকেছিলেন এখন তার কিছুই আর নেই; তবু উপরওলাদের ধ'রে পড়লে এখনও হয়তো তাঁর ডিপার্টমেন্টে—কিন্তু ম্যাট্রিকটাও—

'আর তাছাড়া', স্বাতী সান্ত্বনা দিলো, 'পরীক্ষা পাশ করাটাইতো আর সব কথা নয়। আরো কত আছে। কোনটাতে হঠাৎ ওর মন লেগে যাবে কে জানে?'

'একটা মূর্খ হ'য়ে থাকলো!' রাজেনবাবুর দীর্ঘশ্বাস।

'মূর্খ আবার কী! কথাবার্তায় চাল-চলনে কার চেয়ে কম! আমাদের সঙ্গে যা করে করে—বাইরের একজন এলে দেখো-তো!'

'শাশ্বতীও কেমন বি.এ. পাশ করলো বিয়ের পরে—'

'পাশ করলেই বিদ্বান হয় বুঝি?'

স্বাতী তর্ক করলো বটে, কিন্তু মনে-মনে দাদার জন্য তারও দুঃখ কম না। আহা—কলেজে পড়বে না কোনোদিন? সে তো

পড়ছে—কী ভালো কলেজ; কী ভালো লাগে—একেবারে অন্যরকম, একেবারে নতুন। কত নতুন কথা, শক্ত-শক্ত কথা—কয়েক মাস আগেও যা ভাবতে পারতো না—সত্যি!

কলেজে ইংরেজির ক্লাশে পিছনের বেঞ্চিতে তার পাশে ব'সে বললো একদিন ইভা গাঙ্গুলি: 'আর ইংরেজী প'ড়ে কী হবে—ইংরেজের রাজত্বই থাকবে না!'

'থাকবে না?' স্বাতী অবাক।

'দ্যাখ না এই যুদ্ধে কী হয়—'

ও মা! যুদ্ধ! হারীত-দার কথাই ঠিক হ'লো!—'সত্যি যুদ্ধ!'

'সত্যি মানে?' ইভা হেসে উঠলো।

এনশেণ্ট ম্যারিনর পড়তে-পড়তে প্রোফেসর একটু থামলেন, চকিতে একবার তাকিয়েই পড়তে লাগলেন আবার। ইভা হাসি চেপে চুপি-চুপি বললো: 'কাগজও পড়িস না?'

উত্তর না-দিয়ে স্বাতী মন দিলো প্রোফেসরের দিকে। বেশ লাগে শুনতে, কিন্তু এমন ক'রে বইখানা ধরেছেন যে মুখ দেখা যাচ্ছে না। নিজের বইয়ে চোখ রেখে স্বাতী অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনিকে মিলিয়ে নিতে লাগলো।

'খুব-যে পড়ায় মন?' পেনসিলের খোঁচা লাগলো স্বাতীর পিঠে।

'আঃ!'

হঠাৎ পড়া থেমে গেলো; স্বাতী চোখ তুলে দেখলো, বইখানা নেমেছে প্রোফেসরের হাত থেকে টেবিলে, আর তাঁর শান্ত দৃষ্টি

পড়েছে তারই মুখের উপর। 'কী হয়েছে?' বাংলায় মৃদুস্বরে তিনি বললেন।

ইভা তাকিয়ে রইলো উদাস দৃষ্টিতে অন্য দিকে ; আর স্বাতীর মুখে ফুটে উঠলো অপরাধের লালরঙা বিজ্ঞাপন। তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললো সামনের মোটাসোটা মায়া সান্যাল, 'পড়ায় আমাদের আজ মন লাগছে না, স্যর।'

'কেন?'

'এই-যে যুদ্ধ লাগলো, সে-বিষয়ে কিছু বলুন আমাদের।'

'সে-আলোচনার এটা-তো জায়গা নয়,' ব'লে অধ্যাপক উঠে দাঁড়িয়ে গভীর গম্ভীর গলায় পড়তে লাগলেন :

'Nor dim, nor red, like God's own head
The glorious sun uprist :
Then all averr'd I had killed the bird
That brought the fog and mist.
'Twas right, said they, such birds to slay,
That bring the fog and mist.'

স্বাতী আর তাকাতে পারলো না, তার দৃষ্টি লেগে রইল আঠার মতো বইয়ের পাতায়, তার শ্রবণ পান করলো প্রতিটি স্বর, তাল, মাত্রা ; কবি-যে বলেছেন তিন বছরের শিশুর কথা, সেইরকম মুগ্ধ হ'য়ে সে শুনতে লাগলো।

'The fair breeze blew, the white foam flew,
The furrow followed free ;
We were the first that ever burst
Into that—'

'স্যর "like God's own head" মানে কী?' শমের মুখে তাল কাটলো হঠাৎ; মেঝেতে বাটিঘষার শব্দে যেমন হয় তেমনি শিউরে উঠলো স্বাতীর শরীর; সামনে দাঁড়ানো মায়া সান্যালের পিঠের দিকে ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টি হানলো সে।

'আরো খানিকটা প'ড়ে নিই,' প্রোফেসর ইংরেজিতে জবাব দিলেন, 'তারপর আলোচনা করবো।'

'"Nor dim, nor red"টাও বুঝলাম না, স্যর,' আপত্তি জানালো অলকা নাগ।

'এতে আপাতত বোঝবার কিছু নেই,' ছাত্রীদের মাথার উপর দিয়ে প্রোফেসর তাকালেন দেয়ালের দিকে। 'প্রথমে কান দিয়ে শোনো, তারপর মন দিয়ে ভাবো।'

'কিন্তু সূর্যকে কেন "God's own head" বললো?' মায়ার নাছোড় জিজ্ঞাসা।

'বড়ো শক্ত কবিতা, স্যর,' বললো আর-একজন, 'ভালো ক'রে বুঝিয়ে না-দিলে ফলো করতে পারছি না।'

প্রোফেসরের নম্র লাজুক মুখে রক্ত উঠে আসতে দেখলো স্বাতী। বিষণ্ণ হ'লো চোখ, একটু বেঁকলো ঠোঁটের কোণ, মুখে যেন কৌতুকের ভাব নিয়ে আস্তে-আস্তে তিনি ব্যাখ্যা করতে লাগলেন—কী দরকার, স্বাতী ভিতরে-ভিতরে জ্বলতে লাগলো, এ-সবের কী দরকার, প'ড়ে গেলেই তো হ'তো।

'বেশ পড়েন কিন্তু উনি,' স্বাতী বললো ইভাকে, ক্লাশের পরে।

কথা ভুল শুনে, কিংবা ইচ্ছে ক'রে ভুল বুঝে, ইভা জবাব

দিলো : 'হ্যাঃ—ও আবার পড়াবে কী, বাচ্চা ছেলে! পাশ ক'রেই তো বেরুলো সেদিন!'

'সত্যি! কী-ছেলেমানুষ রে! আর কী-লাজুক! কারো দিকে তাকায় না কখনো!' যোগ দিলো মোটা মেয়েটি।

'এই তো সত্যেন রায়? খুব নামজাদা ছাত্র না? নাম শুনেছি দাদার মুখে।' এই প্রথম কথা বললো ছোটোখাটো চশমা-চোখের একটি মেয়ে।

'ভালো ছাত্র হ'লেই-তো আর ভালো মাস্টার হয় না!' ইভা উদ্ধৃত করলো তার ভাইস-প্রিন্সিপাল মামার একটি বচন। 'অনাদিবাবুর অসুখ ব'লেই-তো ওকে পড়াতে দিয়েছে মেয়েদের ক্লাশে। ও তো টিউটিরিঅল করায় ছেলেদের, মাইনে পায় পঁচাত্তর। একসঙ্গে এতগুলো মেয়ে দেখে যা অবস্থা বেচারার!'

ইভা বয়সে ক্লাশের সব মেয়ের বড়ো, স্মার্ট, তার উপর আছে তার মামার জোর। অনেকেই হাসলো তার কথা শুনে; সকলের-যে হাসি পেলো তা নয়, কিন্তু না-হাসলে মান থাকে না।

'এ কী অন্যায়!' স্বাতীর তীব্র স্বর হাসি ছাপিয়ে উঠলো। 'পড়াতে তো দিলেই না—এখন আবার ঠাট্টা! কী-সুন্দর পড়ছিলেন, আর কী-সুন্দর কবিতাটা!'

স্বাতীর রং-ধরা মুখের দিকে ইভা একটু তাকিয়ে রইলো, তারপর গম্ভীরভাবে বললো, 'এইজন্যই-তো বাচ্চা মাস্টারদের মেয়েদের ক্লাশে পড়াতে দিতে নেই,' ব'লেই মুখ টিপে হাসলো। আবার কলকল্লানি উঠলো মেয়েদের মধ্যে।

'কেন, বুড়োদের দিয়ে বুঝি বিপদ নেই কিছু?' দ্রুত জবাব দিয়ে স্বাতী হনহন ক'রে বেরিয়ে এলো। বাজে সব!—এইরকম জবাব দিয়েই ঠাণ্ডা করতে হয় ওদের। কী-সুন্দর—কী ভালো লাগছিলো—নষ্ট ক'রে দিলো। হিস্ট্রি ক্লাশ থাক আজ, বাড়ি যাই। ছুটি হ'লেই তো সঙ্গে জুটবে অনুপমা আর চিত্রা আর সুপ্রীতি, বকবক করবে সারাটা পথ—এখন বেশ একা-একা···'we were the first,' ফুটপাতে নেমে হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো স্বাতী, গা ঘেঁষে একটা গাড়ি চ'লে গেলো···'we were the first that ever burst into that silent sea.' ঈশ, কী ক'রে বানায় এ-রকম, কারা বানায়?—'into that silent—' পা বাড়িয়েই স'রে এলো স্বাতী—বাস্! কী মস্ত আর কী আওয়াজ! বাস্-এর আওয়াজ, ট্র্যামের আওয়াজ, বড়ো রাস্তায় পঞ্চাশ গোলমাল, সব পার হ'য়ে তার কানে এসে পৌঁছলো সত্যেন রায়ের ভারি, নরম গলা:

'Nor dim, nor red, like God's own head
The glorious sun uprist:

Nor dim, nor red, like God's own head—' মানে! এর আবার মানে! এ-তো চোখে দেখা যায়।···সমুদ্র, শব্দ নেই, শব্দ নেই, শুধু সমুদ্র; একলা একটা জাহাজ, শুধু সমুদ্র; কালো-কালো কুয়াশা, ছায়া-ছায়া আলো, শুধু সমুদ্র: আর এই সমুদ্রে কিনা মাথা তুললো আশ্চর্য সূর্য—আশ্চর্য, এর চেয়ে আশ্চর্য আর কী—ট্র্যামের তোড়, বাস্-এর সোর, বড়ো রাস্তার পঞ্চাশ গোলমাল; ভিড়, রোদ্দুর, উঁচু-উঁচু বাড়ি, আপিশ-যাওয়া ছুটোছুটি—মুহূর্তের জন্য কিছু দেখলো না স্বাতী, কিছু শুনলো না;

দেখলো সমুদ্র, শুধু সমুদ্র, আর সেই আলোছাড়া কালোছায়ার সমুদ্রে সূর্যের আশ্চর্য মাথাতোলা ; শুনলো শুধু নরম গম্ভীর একটি গলার সেই আশ্চর্য কথা, যেমন আশ্চর্য সে জীবনে আর শোনেনি : 'Nor dim nor red…'

'কী ? রাস্তার মধ্যে দাঁড়িয়ে চাপা পড়বি নাকি ?' তার কাঁধে হাত রাখলো অনুপমা।

'তুমি যে ?' সহপাঠিনীকে সম্ভাষণ করতে একটু দেরি হ'লো স্বাতীর।

'তোর পিছন-পিছন এলুম। ইভাটা বড়ো অসভ্য, সত্যি।…চল।'

বাড়ি এসে সেই লম্বা কবিতাটি স্বাতী আগাগোড়া একবার প'ড়ে ফেললো। ভালো লাগলো' কিন্তু তত না। সবটা যদি সত্যেনবাবুর মুখে শুনতে পেতো! আবার এক মঙ্গলবার তাঁর ক্লাশ। কিন্তু ক্লাশে আর কতটুকু হয়, আর মেয়েগুলো যা—!

পরের মঙ্গলবারে মেয়েরা আরো চঞ্চল, কেননা পুজোর ছুটি দু-দিন পরে। বোধহয় সেটা অনুমান ক'রেই সত্যেনবাবু ক্লাশে এলেন না। আর ছুটির পরে ক্লাশ নিতে লাগলেন আবার অনাদিবাবু : ভারিক্কি চেহারা, প্রচণ্ড গলা, কখন কবিতা পড়ছেন আর কখন বক্তৃতা করছেন বোঝা যায় না ; আর কখন বক্তৃতার মধ্যে হঠাৎ এক ফাঁকে 'Take down' ব'লে নোট দিচ্ছেন সেটাও বুদ্ধি ক'রে বুঝে নিতে হয়। চল্লিশ মিনিট টুঁ শব্দ নেই সমস্ত ক্লাশে।

…মুহূর্তের জন্য একটু ফাঁক হ'য়েই কি বন্ধ হ'য়ে গেলো দরজা ? কিন্তু আমি-যে দেখে ফেলেছি ভিতরে কী আশ্চর্য !

হারীত একটু হেসে মুখ ফেরালো, আর মুখে-চোখে জ্বলজ্বলে উৎসাহ নিয়ে স্বামীর দিকে তাকালো শাশ্বতী।

এদিকে স্বাতী শরণ নিলো কলেজের লাইব্রেরির। একটু ভয়ে-ভয়ে জিগেস করলো : 'কোলরিজের কবিতার বই আছে?' বুড়ো লাইব্রেরিআন না-তাকিয়েই জবাব দিলো : 'না, কোলেরিজ নেই।'

'একখানাও না?'

'না।...উৎপলা সরকার—"গোরা"—'

অনেক আকাঙ্ক্ষায়, অনেক হাতের দাগ লাগা, পেনসিলে কালিতে অনেক বিচিত্র মন্তব্যের উল্কি-আঁকা জীর্ণ মলিন 'গোরা' বইখানা হাতে নিয়ে উৎপলা সরকার স'রে যাবার পর স্বাতী আর-একবার চেষ্টা করলো : 'আর-কিছু আছে? আর-কোনো কবিতার বই?'

চশমার ভিতর দিয়ে গোল-গোল নির্জীব চোখে মুখ তুলে তাকালো লাইব্রেরিআন। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আলমারির বই ঘাঁটতে-ঘাঁটতে অন্য-একজন ব'লে উঠলেন : 'পলগ্রেভের গোল্ডেন ট্রেজরি দিন না।'

'প্যালগ্রেভ টেক্সট-বুক, স্টুডেন্টদের ইশু করা হয় না।'

একটু মুখ ফিরিয়েই আবার বই দেখতে লাগলেন সত্যেন রায়, তারপর দু-খানা বই বের ক'রে নিয়ে টেবিলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। স্বাতী একবার তাকালো, আবার তাকালো, তারপর হঠাৎ সত্যেনবাবুর চোখ পড়লো তার উপর। লাইব্রেরিআনকে তিনি বললেন, 'দেখুন না মেয়েটি কী চায়।'

বই দু-খানার নাম প্রচুর পরিশ্রম ক'রে খাতায় তুলতে-তুলতে লাইব্রেরিয়ান বললো, 'আজ আর ইশু হবে না।'

স্বাতী মন-মর হ'য়ে ফিরে এলো। আস্তে-আস্তে হেঁটে লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত এসেছে, এমন সময় হঠাৎ ঝুপ ক'রে একটা বই যেন ছিটকে তার পায়ের কাছে পড়লো, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিচু হ'য়ে বাঁ হাতে সেটি তুলে নিলেন সত্যেন রায়, ডান হাতে এক পাঁজা বই কোনোরকমে সামলে।—'এত বই!' স্বাতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সলজ্জ একটু হেসে সত্যেনবাবু দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বইগুলি দু-ভাগ ক'রে দু-হাতে নিলেন।

স্বাতীও থেমে গেলো, চোখ দিয়ে বইগুলি একবার স্পর্শ ক'রে বাধো-বাধো গলায় বললো, 'আপনি···আপনি আমাদের ক্লাশ আর নেন না?'

বইয়ের দুইটি স্তূপের উপর প্রোফেসরের দুই হাতের আঙুল একটু চঞ্চল হ'য়ে উঠলো; মৃদুস্বরে বললেন, 'কোন ইআর তোমার?'

'ফর্স্ট ইআর।···এনশেণ্ট ম্যারিনর পড়াচ্ছিলেন আমাদের··· খুব ভালো লেগেছিলো···'

'ভালো কবিতা। ভালো লাগাই উচিত',—ব'লেই সত্যেনবাবু যেন এগিয়ে যাচ্ছিলেন; হঠাৎ থেমে, স্বাতীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কবিতা ভালোবাসো?'

'কবিতা? আমি···' কী-জবাব দেবে, কী-কথা বললে ঠিক হবে স্বাতী ভেবে পেলো না।

'রবীন্দ্রনাথ পড়েছো?'

এ-প্রশ্নেরও কোনো উত্তর দিতে পারলো না স্বাতী। 'রবীন্দ্রনাথ পড়ো', নিজের বই-ধরা হাতের দিকে তাকিয়ে সত্যেনবাবু আবার বললেন। 'আর—এ-কলেজের লাইব্রেরির কোনো আশা রেখো না—' বাঁ হাতের স্তূপ থেকে ডান হাতের দু-আঙুল দিয়ে সুকৌশলে ছোটো একটি বই বের ক'রে আনলেন তিনি—'এ-বইটা প'ড়ে দেখো।' প্রোফেসরের দু-আঙুলের ফাঁক থেকে স্বাতী বইটা নিজের হাতে নিলো। মলাটের ভিতরের পাতায় লেখা নামের দিকে তাকিয়েই মুখ তুলে কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাকে আর সময় না-দিয়ে দু-হাতে দুই বইয়ের বোঝা নিয়ে একটু দুলে-দুলে সত্যেনবাবু বেরিয়ে গেলেন।

গোল্ডেন ট্রেজরির সবগুলি পাতা ওল্টাতেই স্বাতী সাত-আট দিন লেগে গেলো। যে-পাতাই খোলে, সেখানেই চোখ আটকে যায়। কত!···কত! কোনটা ফেলে কোনটা পড়বে! আট লাইনের ছোটো একটি যদি পড়লো, সেটাই পড়তে ইচ্ছা করে বার-বার, আবার সেই সঙ্গে তার পাশেরটিও ডাকে টানে, আর তার পরেরটিও। 'Spring, the sweet spring is the year's pleasant king... the spring time, the only pretty ring time···; mistress mine.... 'Full fathom five...' এ-সব কী?···কী! ছাপার অক্ষর যদি গান করে, তাহ'লে কি মানুষ পাগল হ'য়ে যায় না? কতদিনে সে প'ড়ে উঠবে এ-বই, কত মাসে, কত বছরে?···একটি লাইনই তো সারা দিনে মাথা থেকে নড়ে না—এ-রকম হ'লে সারা জীবনেই শেষ হবে না তো! কবে ফেরৎ দিতে হবে কিছু বলেননি উনি, তাই ব'লে অনেক দিন তো আর রাখা যাবে না। স্বাতী

মাঝে-মাঝে কলেজে নিয়ে যেতে লাগলো ফেরৎ দিতে, কিন্তু কোথায় সত্যেন রায়। তিনি ছেলেদের পড়ান, আর এখানে ছেলেদের আর মেয়েদের ক্লাশ আলাদা ভাগ করা—কেমন ক'রে দেখা হবে ? আর উনিও বেশ, বই দিয়ে ভুলেই আছেন একেবারে, চেয়ে পাঠালেও তো পারেন। কিন্তু চাইবেন কার কাছে, উনি তো আমার নাম জানেন না। এ-রকম দেয়াই ঠিক না, আমি হ'লে দিতাম না কক্ষনো—এখন দরকার হ'লেই বা পাবেন কী ক'রে, আমারই উচিত ফেরৎ দিয়ে আসা, না-দেয়াটা অন্যায় হচ্ছে।...স্বাতী রীতিমতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে উঠলো এ নিয়ে, কিন্তু সত্যেন রায়কে আর ধরাই গেলো না ; একদিন দু-দিন ক'রে-ক'রে শীত কেটে গেলো, গরম পড়লো, পরীক্ষা হ'লো কলেজের, গ্রীষ্মের ছুটি এলো।

ছুটির মধ্যে বাবা একদিন বললেন,—'স্বাতী, আজকাল যেন তুই একটু মন-মরা ?'

'না তো!' ঝকঝকে হেসে জবাব দিলো স্বাতী।

'সারাটা দিন তোর তো একাই কাটে।'

স্বাতী চুপ ক'রে রইলো।

'ছোড়দির বাড়ি যাস না ?'

'যাই তো।'

'দু-চার দিন থাকলেও তো পারিস গিয়ে।'

'না, বাবা—'

'না কেন ? শাশ্বতী আমাকে বলছিলো সেদিন—'

'বাড়িতে ছাড়া আমার ভালো লাগে না কোথাও।'

'বেশ তো, বাড়িতেই বন্ধুদের আসতে বল।'

'বন্ধু পাবো কোথায়?'

'কেন, কলেজে পড়ছিস আজকাল—আমি আরো ভাবছিলাম কত রঙিন শাড়ি পরা-পরা মেয়েরা আসবে বিকেলে—হাসি, গান, গল্প—চমৎকার!'

'এ-বিষয়ে ওস্তাদ ছোড়দি, না বাবা? কী হৈ-চৈ···আর কী-রকম নিশ্চুপ হ'য়ে গেছে বাড়িটা। তোমার নিশ্চয়ই খারাপ লাগে?'

'তোর লাগে বুঝি?'

'আমার না।'

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে রাজেনবাবু বললেন, দিরা তো মস্ত মিশুক এক-একজন—তুই এ-রকম কুনো হলি ন?'

ছেলেবেলার মতো একটুখানি শরীর বেঁকিয়ে স্বাতী বললো; াছি আছি কুনো! কুনোই ভালো।'

'কলেজে একটি মেয়ের সঙ্গেও ভাব হয়নি তোর?'

স্বাতী জবাব দিলো না।

একটু চুপ ক'রে থেকে রাজেনবাবু বললেন; 'তোর দাদার র-টবর কিছু রাখিস?'

দাদার দু-একটা কথার সঙ্গে নিজের অনেকখানি ইচ্ছা মিশিয়ে ী খবর দিলো; 'দাদা বোধহয় কোনো রেডিওর দোকানে শিখছে।'

ভালো।' উদাস মন্তব্য রাজেনবাবুর।

'তোমার সঙ্গে আজকাল বুঝি দেখাশোনাই হয় না দাদার?'

'কোথায় আর।'

'ওর একটা অদ্ভুত ধারণা হয়েছে যে তুমি ওকে ভালোবাসো না।'

'মূর্খের অশেষ দোষ।'

'ঐ তো! ও-রকম যে বলো ও বুঝি আর বোঝে না?'

'মিথ্যে বলি?'

'সত্য হ'লেই বলতে হয় নাকি সব সময়?'

'বলাবলির আর আছেই বা কী—' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে রাজেনবাবু চুপ করলেন।

'বাবা, শোনো,' স্বাতী তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়লো, 'সেদিন একখানা পুরোনো বই খুঁজে পেলাম—"গীতাঞ্জলি"—মা-র নাম লেখা। আগে তো দেখিনি।'

রাজেনবাবু একটু ভেবে বললেন, 'কোন জন্মের বই। আছে এখনো?'

হাতে নিতেই রাজেনবাবুর চোখে পড়লো মলাট-ছেঁড়া বইয়ের প্রথম পাতায় লেখা নামটি। যেন চিনতেই পারলেন না সেই হাতের লেখা, সেই নাম। শাদা কাগজ হলদে হয়েছে, কালো কালি বাদামি—তবু হাতের লেখার সেই সেকেলে ডৌল, পাশাপাশি দুটো তালব্য "শ"র হাসি-হাসি মুখ—সেই নাম···নাম। চোখ সরাতে গিয়েও আবার চোখ রাখলেন রাজেনবাবু।

বাবার চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে স্বাতী বললো, 'মা বুঝি ভালোবাসতেন এ-বই?'

বইখানা উল্টো ক'রে শুইয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'তখন-তো

ঘরে-ঘরে "গীতাঞ্জলি"—কী-কাণ্ড! সকলের মুখে ও-সব গান আমার এক বন্ধু ছিলো হরেন—কত দিন কত গান শুনিয়েছে সে—আর তোর মা—' হঠাৎ একটু থেমে, কেমন-একটু আড়ষ্ট হ'য়ে রাজেনবাবু যেন কোনোরকমে কথাটা শেষ করলেন—'তোর মা খুব খাওয়াতেন-টাওয়াতেন আরকি।'

'বলো, বাবা, বলো,' বাপের গা ঘেঁষে বসলো স্বাতী।

'আর কী বলবো।'

'মা খুব গান ভালোবাসতেন, না?'

'ঐ তো—রান্নাঘরে ব'সে লুচি ভাজতেন, আর দরজার আড়াল থেকে গানের ফরমাশ করতেন মাঝে-মাঝে।'

'আড়াল থেকে কেন?'

'তখন কি মেয়েরা বেরতো নাকি রে কারো সামনে', রাজেনবাবু হাসলেন।

'কী বিশ্রী!' সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীর মন্তব্য। 'ভাগ্যিশ সে-যুগে জন্মাইনি!—তারপর?'

'তারপর কী রে? গল্প নাকি যে তারপর?'

'তোমরা তখন কোথায় ছিলে, বাবা?'

'তখন? শাঁখারিপাড়ায়।'

'শাঁখারিপাড়া কোথায় আবার?'

'আছে কলকাতাতেই কোথাও।'

'আমি তখন জন্মেছি?'

'দূ—র! সরস্বতীই ও-বাড়িতে জন্মালো।'

ছুটি-তিনটি শিশু নিয়ে মা-বাবার সেই গান-শোনা ঘোমটা-মানা

সংসার স্বাতীর মনে হ'লো স্বপ্নের মতো। এত সুখ!—বুকটা যেন টনটন ক'রে উঠলো তার—এ-সুখ আমি কি জানবো কোনোদিন? মা বেরোতে পারতেন না কারো সামনে, রান্নাঘরে ব'সে গান শুনতেন। তবু এত সুখ! আমি-তো স্বাধীন, আমি-তো কত-কিছু পারি, কিন্তু…কিন্তু…এতে কি সুখ বেশি? ছোড়দি কি মা-র চেয়ে বেশি সুখী? সেই শাঁখারিপাড়ার মা-বাবার সঙ্গে তুলনা হয় নাকি ছোড়দি আর হারীতদার?…কেন হবে না? ছোড়দি খুব ভালো আছে, কত নতুন জায়গায় যাচ্ছে, কত নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, মুখে তার ঝ'রে পড়ছে খুশি।…কিন্তু—

'বাবা', স্বাতী একটু ক্ষীণ স্বরে বললো, 'আমাকে সেই শাঁখারিপাড়ার বাড়িটা দেখাবে একদিন?'

কথা না-ব'লে রাজেনবাবু আর একবার তাকালেন কোন জন্মের পুরোনো সেই গীতাঞ্জলির দিকে। আর স্বাতী, উপুড়-করা বইখানার গায়ে আস্তে হাত বুলিয়ে আস্তে বললো, 'সুন্দর গানগুলি, না বাবা?'

রাজেনবাবু চোখ দিয়ে সায় দিলেন।

'বাবা', স্বাতীর কথায় লজ্জার ঢেউ উঠলো, 'আমাকে দশটা টাকা দেবে?'

'কী চাই?' তক্ষুনি বদলে গেলো রাজেনবাবুর চোখ-মুখ।

'রবীন্দ্রনাথের বই আরো কিনলে হয় না?'

'মোটে দশ টাকা তার জন্য?'

'ও মা! তুমি কি ভাবছো আমি সব বই কিনবো? দোকানে বললো যে সব কিনতে দেড়শো-দুশো টাকা লাগবে।'

'তা এমন-কী বেশি। বইও তো বোধহয় দেড়শো-দুশো।'

'বেশ-তো!' আনন্দের আলো জ্ব'লে উঠলো স্বাতীর মুখে, 'মাসে-মাসে আস্তে-আস্তে—'

'ইশ! খুব-যে হিশেবি হয়েছিস।' রাজেনবাবু মেয়ের মাথাটি ধ'রে নেড়ে দিলেন।

…'মানসী', 'চিত্রা,' 'কল্পনা,' 'ক্ষণিকা,' 'বলাকা,' টাটকা নতুন বই ক'খানা বিছানায় ছড়িয়ে স্বাতী চুপ ক'রে শুয়ে ছিলো দুপুরবেলায়। মেঘ করেছে আকাশে; ধোঁয়ারঙের, ছায়ারঙের, রাতরঙের মেঘ, উঁচু-উঁচু নারকোল গাছের মাথা কালো ক'রে দিয়ে, কাঁপা-কাঁপা হাওয়ায় সেতারের মীড় তুলে-তুলে আকাশের মেঘ আস্তে-আস্তে স্বাতীর মনে ছড়িয়ে পড়লো।…কেন মন-খারাপ লাগে? কিসের দুঃখ আমার? কোনো দুঃখ তো নেই। তবে? কবিতা প'ড়ে-প'ড়ে হ'লো নাকি এ-রকম? হারীতদার কথাই কি তবে ঠিক—তবে কি ইভা শোভনা সুপ্রীতিরা বোকা নয়—যা কোনো কাজে লাগে না সেটাই বাজে? 'ঠেশে ইকনমিক্স পড়ো, মাথা থেকে সব ধোঁয়া বেরিয়ে যাবে', হারীতদা তাকে বলেছিলেন। ধোঁয়া…মেঘও-তো ধোঁয়া, কিন্তু মেঘ কি বাজে? যদি মেঘ না-হ'তো, বৃষ্টি না-হ'তো…

—'স্বাতী।'

দাদাকে দেখে খুশি হ'য়ে স্বাতী উঠে বসলো।

'আলমারির চাবিটা দে তো একটু।'

'আলমারি তো খোলাই। শাড়ি বুঝি?'

বিজু জবাব না-দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে শাড়ি বাছতে লাগলো।

'আর কতকাল তুই মেয়ে সাজবি রে দাদা ?'

'বেশিদিন না,' বিজু ঘাড় ফিরিয়ে হাসলো, 'মেয়ে-পুরুষে মিলে যে-রকম নাটক লাগিয়েছে আজকাল—যাকে বলে জীবন-নাট্য।'

কথাটা অগ্রাহ্য ক'রে স্বাতী বললো, 'ছেলেবেলায় তবু একরকম —তাই ব'লে এখন নাকি দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে মেয়ে সাজলে মানায়!'

'দাড়ি-গোঁফ তো এমনিই সবাই কামায় আজকাল,' বিজু জবাব দিলো। 'আর মানাবার কথা কী বলছিস—ঢাকুরেতে ষোড়শী করেছিলাম—তিন দিন পর্যন্ত আর-কোনো কথা বলেনি কেউ।'

স্বাতী হেসে উঠলো।

'দেখলে আর হাসতিস না ও-রকম ক'রে!—ভালো শাড়ি কিছু নেই রে তোর, ছোড়দির কত ছিলো!—এই নীলাম্বরীটা—'

'ওটা নিস না, দাদা, ওটা মা-র,' চেঁচিয়ে উঠলো স্বাতী।

'দেখি না একটু।'

'না, না, দেখতে হবে না—রেখে দে!' লাফিয়ে খাট থেকে নেমে স্বাতী হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো। এক পলক তাকিয়ে বিজু বললে, 'থাক বাবা, থাক। তোরই মা, তোরই বাবা, আমার তো কেউ নয়।'

মা-র শাড়িখানা যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখে স্বাতী বললো, 'তাই ব'লে তোদের ঐ গোলমালের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে—না। সেবার হারালি তো আমার অত সুন্দর ঢাকাই জামদানিখানা!'

'ভারি তো! পাঁচ টাকা দাম!'

'তা যা-ই হোক, কী-সুন্দর কচিপাতা রংটা ছিলো! আর পাঁচ টাকা এমন কমই বা কী!'

'তোর আবার টাকার অভাব! বাবার কাছে চাইলেই তো পাস—'

'তুই পাস না?'

বিজু এ-কথার জবাব দিলো না; বিছানার ধারে এসে ছড়ানো বইগুলির দিকে তাকিয়ে বললো, 'কিনলি? তা আমাকে কেন বললি না, শস্তায় এনে দিতাম।'

'বইয়ের আবার শস্তা আর দাম আছে নাকি?'

'তুই জানিস কী?' জ্ঞানের গৌরবে বিজুর চোখ দুটি চকচকে হ'য়ে উঠলো। 'এই-তো "শেষ রক্ষা" করছি আমরা—ছ' কপি বই লাগবে—এক টাকার বই চোদ্দ আনায় আনিয়ে দিলেন ধ্রুব দত্ত—'

'কে?'

'নামও শুনিসনি? কী তাহ'লে কলেজে পড়িস—এত বড়ো কবি একজন! "ষোড়শী" দেখতে ধ'রে এনেছিলাম ওঁকে। আমার পার্ট দেখে বললেন—'

'কবি? কবিতা লেখে?'

'লেখে মানে?' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আওয়াজ ক'রে বিজু বললো। 'কত বই ওঁর। তাই-তো সব বই কম দামে কিনতে পান। জানিস—আমাদের "শেষ রক্ষা"তেও আসবেন!'

'গোঁফ-কামানো ইন্দুমতীকে দেখতে?'

'রাখ, রাখ—তোরাই যেন ভালো পারিস এর চেয়ে!' পাইচারি করতে-করতে বিজু সগর্বে বলতে লাগলো, 'বিলেতেই অ্যাকট্রেস ছিলো নাকি শেক্সপিঅরের সময়? চিনদেশে তো এখনো নেই। স্বয়ং জ্যোতিরিন্দ্র ঠাকুর নটী সাজেননি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে?'

দাদার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে স্বাতী বললো, 'কার কাছে শুনেছিস এ-সব ?'

'যার কাছেই শুনি না !' বিজু খাটের উপর ব'সে প'ড়ে মনে করবার চেষ্টা করলো এ-বিষয়ে ধ্রুব দত্ত আরো কী বলেছিলেন। একটু পরে চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'একবার দেখে আয় না কেমন—তারপর বলিস !'

'না—'

'তা যাবি কেন ! আমি যেখানে আছি সেখানে কি তুই যেতে পারিস ! জীবনে কখনো যা করলি না, সে-রকম একটা কাজ তোকে করতে বলাই ভুল হয়েছিলো আমার !' বিজু মুখ লাল ক'রে উঠে দাঁড়ালো।

'কথায়-কথায় তোর রাগ ওঠে কেন রে দাদা ?'

'রাগ আবার কী—অন্যেরা যত ভালোই বলুক, আমি যা করি তা-ই তোর কাছে বাজে !'

স্বাতী হেসে ফেললো। '—তোকে ভালো বলতে আমার ভালো লাগে না, কিন্তু অন্যেরা ভালো বললে ভালো লাগে।'

'শুনিস না তো কী বলে সবাই,' বিজু তক্ষুনি নরম হ'লো। 'আমিও ভাবছি রে,' হঠাৎ গ'লে গিয়ে বোনকে সে মনের কথাটা ব'লে ফেললো, 'আর মেয়ে সাজবো না। দু-একবার হিরোর পার্টে নামতে পারি যদি, তাহ'লেই ফিল্মে একটা চান্স পাওয়া যাবে।'

'ফিল্মে···?'

'এখন বলিস না কাউকে কিছু,' বিজু চোখ টিপলো। 'ভাখ-না, একেবারে অবাক ক'রে দেবো !'

'দাদা, তুই-যে সেই রেডিওর দোকানে—'

'হয়েছে, হয়েছে,' বিজু ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, পছন্দ-করা শাড়ি তিনখানা তাড়াতাড়ি কাগজে জড়িয়ে নিতে-নিতে বললো, 'তাহ'লে—কাল যাবি নাকি ?'

'বাবা যদি যান—'

'বাবার দরকার কী রে—এই-তো এখানে সাদার্ন এভিনিউ আর ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে—তাছাড়া ছোড়দিরাও—' কথা শেষ করবার সবুর সইলো না বিজুর !

আবার একা ঘরে মেঘলা দুপুরে স্বাতীর মন-খারাপ লাগলো। চুপচাপ পাড়া ; বড়ো রাস্তার ট্র্যামের শব্দ হঠাৎ শোনা গেলো—ঠিক যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেললো ঘরের মধ্যে। কোথাও তার চ'লে যেতে ইচ্ছে করে, কিছু তার করতে ইচ্ছে করে, কী-যেন দেখতে শুনতে, জানতে ইচ্ছে করে···না, কপালে হাত বুলিয়ে স্বাতী মনে-মনে বললো, কিছু না। জানলা দিয়ে চোখে পড়লো আকাশে মেঘের ফাঁকে নীল, আর গাছের কচি-কচি-পাতা-ভরা সবুজ মাথা, আর সেই নীল আর সবুজের মাঝখানে আস্তে উড়ে-চলা শান্ত, নিশ্চিন্ত, কুচকুচে কালো একটা কাক···কী সুখী ঐ কাক, দেখেও সুখ··· কিন্তু এ কী-রকম সুখ যাতে আরো বেশি মন-খারাপ হ'য়ে যায় !

পরের দিন বেশ তোড়জোড় ক'রেই সে দাদার 'শেষরক্ষা' দেখতে গেলো ছোড়দি আর হারীতদার সঙ্গে। বইখানা প'ড়ে কী হেসেছিলো একবার ! তখন যদি কেউ তাকে বলতো, 'রবীন্দ্রনাথ পড়ো', তাহ'লে এতদিনে···কী হ'তো ? বই প'ড়ে কী হয় ? বই প'ড়েই কি সুখী হয় মানুষ ?—কবিতা প'ড়ে কি পেট

ভরে ?—বিলেত থেকে এই শিখে এলেন হারীতদা ! কবিতা প'ড়ে দুঃখ বাড়ে, তাই তো কেউ কবিতা পড়ে না ।…দুঃখ ?

সামনের দিকে চেয়ারে সসম্মানে ব'সে স্বাতী একবার মুখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দর্শকদের দেখে নিলো। মনে হ'লো, রাজ্যের বাজে ছোকরা আর মোটা-মোটা গিন্নি আর বিরক্ত চেহারার আধ-বুড়ো পুরুষ জড়ো হয়েছে এক জায়গায়। কিন্তু মানুষ তো তার চেহারা—চেহারাটা কিছুই কি নয় তাই ব'লে ? বাবাকে দেখে কে না বলতে পারে যে অমন ভালোমানুষ হয় না ! আর সত্যেন রায়ের মুখ দেখেই বোঝা যায় যে তিনি কবিতা-পড়া মানুষ—তাই তো মেয়েগুলো সাহস পায়—

'ঐ ধ্রুব দত্ত এলেন।' কথাটা কানে যেতেই স্বাতী তাকালো তিন-চার জন ভলন্টিঅর পায়ে-পায়ে বিনয় ঝরিয়ে তাদের প্রধান অতিথিটিকে এনে বসালো একেবারে সামনে, বাচ্চাদের সতরঞ্চির ধারে একটু আড় ক'রে পাতা একটি স্বতন্ত্র চেয়ারে। বোধহয় তাঁর আসবার জন্যেই দেরি হচ্ছিলো : একটু পরেই পরদা উঠে পালা আরম্ভ হ'লো।

স্বাতীর চোখ মাঝে-মাঝেই স'রে আসছিলো নাটক থেকে ধ্রুব দত্তর দিকে। কবি ! একজন কবি !—এই প্রথম একজন জ্যান্ত কবিকে চোখে দেখলো সে। মুখ দেখা যাচ্ছিলো আধখানারও কম, চেয়ারে মধ্যে কেমন এলিয়ে, মাথা নামিয়ে, পা দুটোকে দূরে পাঠিয়ে দিয়ে বসেছেন ভদ্রলোক, অথচ সুস্থির ভাব নেই, ওরই মধ্যে অবিশ্রান্ত নড়াচড়া করছেন, আর সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন ক্রমাগত একটার পর একটা।…ইনি কবিতা লেখেন ? ঐ-রকম

ক'রে সাজাতে জানে কথা? বোবা অক্ষরকে দিয়ে গান গাওয়ান? ···ঐ-রকম দেখতে? ছোটো ক'রে ছাঁটা চুল, মোটা ঘাড়, শক্ত-শক্ত হাত—একেবারেই সত্যেন রায়ের মতো নয় তো!—কিন্তু হবেই বা কেন, সত্যেন রায় কি কবি?—আর হ'লেই বা কী; দু-জন কবি কি একরকম হয় দেখতে? দু-জন মানুষ কি একরকম হয় কখনো?—সে কেন ভাবছিলো—সত্যি, কী বোকার মতো—চোখ সরিয়ে নিলো, নাটকে মন দিলো।

প্রথম অঙ্ক শেষ হবার পর হারীত বললো, 'উঠবে নাকি এবার?'

'এখনই?' শাশ্বতী আপত্তি জানালো। 'বেশ-তো লাগছে—আর বিজুকে সত্যি মেয়ে মনে হচ্ছে।'

'মন্দ কী', দাঁতে পাইপ চেপে হারীত বললো। 'ক্যাপিট্যালিজম-এর রাজত্বে এর বেশি আর কী হবে।'

শাশ্বতী মীইয়ে গিয়ে বললো, 'কেন, ভালো না?'

'কী-রকম ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলছে সবাই!' হারীত ছোটো ক'রে হাসলো। 'জীবনেও যারা কোনো কাজ করে না—'

'সে-তো ঠিকই', ছোড়দির খোঁপার পিছন দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'কাজের লোকেরা কি কথা বলে!'

'অন্তত ইনিয়ে-বিনিয়ে বলে না', হারীত জবাব দিলো।'

'চিবিয়ে-চিবিয়ে বলে', সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীর প্রত্যুত্তর।

হারীত গম্ভীর হ'য়ে চুপ করলো, আর দ্বিতীয় অঙ্কের শেষে একেবারেই উঠে দাঁড়ালো 'নাঃ, আর না' ব'লে।

শাশ্বতী উশখুশ ক'রে বললো, 'কী, স্বাতী, যাবি?'

যে-উত্তর সে চেয়েছিলো তা পেলো না। 'তোমরা গেলেই যাবো', বলতে-বলতে স্বাতীর চোখ ফিরলো ধ্রুব দত্তর দিকে।

স্বামীর মুখের দিকে চকিতে একবার তাকালো শাশ্বতী, কোনো আশা পেলো না। কী-মুশকিল—কে জানতো, 'শেষ রক্ষা' নাটকও সর্বনেশে ক্যাপিট্যালিজম-এরই একটি বিষফল! বেশ লাগছিলো, আর এমন বেশিক্ষণও তো নয়!

হঠাৎ হারীত বললো, 'তোমরা তাহ'লে থাকো, আমি চললাম।'

তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো শাশ্বতী, একটু পরে স্বাতী।

'ইচ্ছে হ'লে থাকো না তোমরা', দু'সারি চেয়ারের ফাঁক দিয়ে একটু এগিয়েই হারীত থামলো।

শাশ্বতী কথাটা শুনলো, মুখ দেখলো না।—'থাকবো?' তার গলার স্বরে খুশি গোপন থাকলো না। 'তুমি কি তাহ'লে ঘুরে আসবে আবার?'

'আমার আর আসবার দরকার কী—ফিরতে পারবে না একা? আর না-ই ফিরলে না-হয়, ও-বাড়িতে থেকো রাতটা', বলতে-বলতে হারীত তাকালো স্ত্রীর দিকে।

শাশ্বতী আর কথা বললো না, মাথা নিচু ক'রে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এলো।...রাগ? এই নিয়ে এত রাগ? আর স্বাতীর সামনে! এ-রকম রাগ করতেও, জানে?—তা মনের কথাটা প্রথমেই খুলে বললে হ'তো, আমি কি জোর করতাম?

রাস্তায় এসে হারীত হাঁটতে লাগলো পুরো পুরুষালি কদমে। স্বাতী বললো, 'একটু আস্তে হারীতদা।'

'তোমার অসুবিধে হচ্ছে ?'

'আমার না, ছোড়দির। মোটা হ'য়ে পড়েছে কিনা।'

'তোমাদের সঙ্গে চলতে আমারই অসুবিধে', ব'লে হারীত দয়া ক'রে একটু ঢিল দিলো হাঁটায়।

'কী আর করবেন—অসুবিধেটা নিজেই ঘটিয়েছেন যখন—' স্বাতী আড়চোখে তাকালো ছোড়দির দিকে, কিন্তু শাশ্বতী কিছু বললো না, হারীতও চুপ ; হনহন হেঁটে কয়েক মিনিটেই তারা দেখতে পেলো টালিগঞ্জের ব্রিজ। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে হারীত বললো, 'আমরা এখান থেকেই ট্রাম ধরি।'

'যাঃ—!' কথাটা উড়িয়ে দিলো স্বাতী।

কিন্তু হারীত শক্ত হ'য়ে দাঁড়ালো ট্রাম-স্টপের কাছে। শাশ্বতীর শরীরে যেন একটা ঢেউ উঠলো, ঢেউ মিলিয়ে গেলো, গলা পর্যন্ত এসে ফিরে গেলো কথা, দুই কণ্ঠার ফাঁকে ছোটো গর্তটুকু যেন কেঁপে-কেঁপে উঠলো ; ঢোঁক গিলে, নেকলেসে একবার হাত রেখে গায়ে-মাথায় আঁচল টেনে স্থির হ'লো সে।

'আসুন—বাঃ!' স্বাতী হারীতদাকে ডাকলো।

'আজ আর থাক।' হারীত তাকালো ট্রামের আশায়।

রাস্তার ইলেকট্রিক আলোর তলায় মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হ'লো দু-বোনে। শাশ্বতী আগে চোখ নামালো, নিচু করলো সিঁদুর-ছোঁওয়ানো মাথা, ফিরিয়ে নিলো ঈষৎ-রং-বোলানো মুখ। বাঁকের মুখে দেখা দিলো আলো-জ্বলা ট্রাম। 'আচ্ছা যাই—' কোনোদিকে আর না-তাকিয়ে স্বাতী তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো বাড়ির গলিতে।

রাজেনবাবু শুয়ে ছিলেন চোখ বুজে, কপালে হাত রেখে ; শব্দ শুনে উঠে ব'সে বললেন, 'ওরা কোথায় ?'

'ওরা বাড়ি গেলো, বাবা।'

'এলো না ?'

একটুও দেরি না-ক'রে স্বাতী জবাব দিলো, 'হারীতদার কাছে কার যেন আসবার কথা সাড়ে-নটার সময় ; জরুরি কাজ, তাই—'

'একটু এলো না !'

'আহা—তোমার আবার সবটাতেই বাড়াবাড়ি—এখান থেকে এখানে—কালই হয়তো আসবে আবার।'

'তুই কার সঙ্গে এলি ?'

'আমি ? আমি···মস্ত দল এলো পাড়ার···দাদা কী-সুন্দর করলো, বাবা—দাঁড়াও, সব বলছি এসে—' এক ছুটে কাপড় বদলে এলো স্বাতী, পিঠের উপর কোঁকড়া কালো ঘন চুল ছড়িয়ে দিয়ে ব'সে ব'সে সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগলো নাটকের, প্রত্যেকের গলার আওয়াজ, বলার ধরন এমন ক'রে নকল করলো যে রাজেনবাবু শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন কয়েকবার।

খুব যেন একটা গোলমালে স্বাতীর ঘুম ভেঙে গেলো রাত্তিরে। বাইরে শোঁ-শোঁ ঝড় ; ঘরের মধ্যে হাওয়ার হৈ-হৈ, আর জানলার ঠকাশ-ঠকাশ শব্দ। একলা অন্ধকারে ভয় পেয়ে হঠাৎ সে ডেকে উঠলো—'ছোড়দি !' তারপরেই পাশ ফিরে ভালো ক'রে চোখ মেলে তাকালো। ঘরের মধ্যে আর-এক কোণে ছোড়দির

খাট প'ড়ে আছে এখনো, খালি-খালি বিশ্রী দেখাচ্ছে, আর জায়গাও জুড়ে আছে মিছিমিছি।···কী ছেলেমানুষ ছিলাম, একা শুতে পারতাম না কিছুতেই, কত বড়ো হ'য়েও বাবার কাছেই শুয়েছি—তারপর মা যখন—তখন থেকেই ছোড়দি আর আমি। বাবা আলাদা ক'রে দিলে কী হবে, আমি ছোড়দির খাটেই বকরবকর করতাম শুয়ে-শুয়ে, ঝগড়া ক'রে নিজের বিছানায় এসে উপুড় হ'য়ে পড়তাম, তারপরেই আবার ডাকতাম, 'ছোড়দি।' নিজের সেই ঘুমে-ভরা ভাঙা-ভাঙা গলার ডাক স্বাতী যেন কানে শুনতে পেলো।···কে ভেবেছিলো একা এক ঘরে—কেন, ভাবতে না-পারার কী আছে, এ-তো জানাই জানা, আর এখনো ছেলেমানুষ আছো নাকি যে রাত্রে ঘুম ভাঙলে ভয় করবে! ওঠো, আলো জ্বালো, জানলা বন্ধ করো!

ভাবতে-ভাবতেই আলো জ্ব'লে উঠলো তার চোখে বাড়ি মেরে, আর স্বাতী তক্ষুনি চোখ বুজে ফেললো, কিন্তু দেখতে লাগলো মিটিমিটি। কাছের জানলাটা বন্ধ ক'রে, দূরের জানলা দুটো ছিটকিনি লাগিয়ে খুলে রেখে বাবা এসে দাঁড়ালেন তার বিছানার ধারে।—'বাবা', চোখ মেলে হেসে উঠলো সে।

'জেগেছিস?'

'তুমি আবার উঠে এসেছো কেন?'

'তবু একটু ঠাণ্ডা হ'লো। বাঁচলাম!'

'বাবা, দাদা ফিরেছে?'

'কই, না।'

'রাত-বিরেতে না-ফেরাই ভালো—কী বলো?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে রাজেনবাবু আলনা থেকে একখানা খদ্দরের চাদর এনে মেয়ের গায়ের উপর বিছিয়ে বললেন, 'ঘুমো এখন।'

'বাবা, একটু বসবে আমার কাছে ?—থাক, শোও গিয়ে।'

রাজেনবাবু ব'সে বললেন, 'বৃষ্টি নামলো। বৃষ্টিটা বেশ, না রে ?'

'খুব ভালো, বাবা, খু—ব ভালো লাগে', উষ্ণ নিশ্চিন্ত আরামে স্বাতীর কথা জড়িয়ে এলো। 'বাবা, শোনো, ঐ খাটটা তো কোনো কাজে আর লাগে না—'

'হ্যাঁ, ওটা সরিয়ে দেবো।' জাজিম-পাতা বিছানাহীন শূন্য খাটটার দিকে রাজেনবাবু একবার তাকালেন, তারপর দুই চোখ ভ'রে দেখতে লাগলেন তাঁর সবচেয়ে ছোট, সবচেয়ে সুন্দর, তাঁর সর্বশেষ, তাঁর একমাত্র কন্যাকে। স্বাতীর চোখে তখন বাসা বেঁধেছে ঘুম, সে দেখছে অনেক ভিড়, লোকজন; নাটক আরম্ভ হবে এখুনি, ধ্রুব দত্ত সিগারেট খাচ্ছেন ব'সে-ব'সে, কিন্তু ছোড়দি নেই, হারীতদাও না, চারদিকে অচেনা মুখ, জায়গাটাও অচেনা—কোথায় এলো সে, কেমন ক'রে এলো—আরে, ঐ-তো বাবা!

'বাবা!' ঘুমে-ভরা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ডাকলো একবার, 'বাবা, এটা তোমার হাত ?' হাত বাড়িয়ে টেনে নিলো বাবার হাতখানা, আঁকড়ে ধ'রে তক্ষুনি ঘুমিয়ে পড়লো। বাইরে বৃষ্টি, বৃষ্টি।

৫

বর্ষার কী জাঁকজমক সেবার! যেন উড়িয়ে নেবে, যেন ভাসিয়ে দেবে। আরো কত বর্ষা তো কেটেছে স্বাতীর, আগে কখনো এমন ছাখেনি। সে যেন চোখে দেখতে পেলো ঘাসের ঘন হওয়া, গাছপালার বেড়ে ওঠা, মাটির সুখ, শিকড়ের খুশি। লম্বা মেঘলা একলা দুপুর, রঙের আহ্লাদে গ'লে-যাওয়া বিকেল, আর রিমঝিম রাত্রি, আর মাঝে মাঝে মেঘ-ছেঁড়া ভিজে-ভিজে জ্যোছনা—এত ভালো লাগে, ভালো লাগে ব'লেই একা লাগে, আবার মানুষের সঙ্গও বেশি ভালো লাগে না—এইরকম একটা আবছায়ার মধ্যে তার যেন দম আটকে এলো; কলেজটা খুললে বাঁচে।

সেদিন সকালে শহর স্নান ক'রে সেজে-গুজে ফিটফাট, যেন সে জানে আজ স্বাতীর কলেজ খুলবে। বই হাতে নিয়ে হালকা পায়ে বেরলো বাড়ি থেকে; সবুজ পৃথিবী, ঝকঝকে রোদ্দুর; তার শরীরে সুখ আর ধরে না, রাস্তায় যদি লোক না থাকতো ঘুরপাক খেয়ে নেচে নিতো একবার। ট্রামে মেয়েদের সীট ছেড়ে গিয়ে সে বসলো একেবারে সামনে এগিয়ে—কী হাওয়া, আর কী সুন্দর সাদার্ন এভিনিউর মোড় পর্যন্ত রাস্তাটি; কত গাছ, কত ঘাস, আর গাছের তলা দিয়ে ছাইরঙের ট্রামগুলি জলের উপর হাঁসের মতো বেঁকে যায়—মিনিটে-মিনিটে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ ছাখে না, কেউ কি ছাখে? ভালো লাগার জন্য কোথায়-না ছুটোছুটি করে মানুষ—সিনেমা, থিয়েটর, খেলার মাঠ; যে-কোনো জায়গায়

যে-কোনো রকম একটা মেলা-টেলা কিছু হ'লে মেয়ে-পুরুষে থইথই, দোকানে-দোকানে ভিড় ধরে না, রেলগাড়ি চ'ড়ে দূর-দূর দেশে চ'লে যায় ;—এদিকে কত ভালো লাগা যে ছড়িয়ে আছে চোখের সামনে, নাম নেই, দাম নেই, টিকিট নেই, এত বড়ো শহরে আর-কেউ তা জানে না ? ভালো লাগার জন্য কোথাও যেতে হয় নাকি, কিছু করতে হয় নাকি ?—এমনি-এমনিই তো ভালো লাগার শেষ নেই, ভালো না-লেগে উপায় আছে মানুষের।

প্রথম ঘণ্টায় অনাদিবাবুর ক্লাশ। অনাদিবাবুকে বেশ তো ভালো দেখাচ্ছে আজ—চশমাটা বদলেছেন ?—না, একরকমই তো —দেখতেই ভালো উনি—কী আশ্চর্য—আশ্চর্য কেন, অনাদিবাবুকে দেখতে ভালো হ'তে নেই ? আর তাঁর পড়ানোই বা এমন মন্দ কী। স্বাতী চোখের সামনে বই খুললো, কিন্তু অনাদিবাবু নাম ডাকা শেষ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে স্বভাবত সুগম্ভীর মুখে আরো গাম্ভীর্য এনে বললেন : 'তোমাদের ক্লাশের উনিশ রোল-নম্বর মেয়ে, মায়া সান্যাল, ছুটির মধ্যে মারা গেছে—'

অ্যাঁ ! অর্ধ-স্ফুট উচ্চারণে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো দশ-বারোটি মেয়ে, মায়া সান্যালের বন্ধুরা, আর অন্যেরা তাকিয়ে রইলো অবাক হ'য়ে।

'—তার স্মৃতির সম্মানরক্ষার্থে আজ তোমাদের ক্লাশ হবে না। তোমরা বাড়ি যেতে পারো।' কথা শেষ ক'রেই অনাদিবাবু চ'লে গেলেন।

—'হাউ শকিং !'

—'কী হয়েছিলো ?'

—'কবে মরলো?'

—'তুই কিছু জানিস, অলকা? তোর বাড়ির কাছেই তো—'

—'মাসখানেক আগেও দেখা হয়েছে আমার সঙ্গে: তারপর মামাবাড়ি গেলুম—'

অন্যদের চেয়ে চড়া গলায় ইভা ব'লে উঠলো, 'একটা কনডোলেন্স মীটিং করা উচিত আমাদের।'

'নিশ্চয়ই!' অলকার সোৎসাহ সমর্থন।

'কবে করবি?' সুপ্রীতির প্রশ্ন।

'আজই! এখনই!' ইভা টগবগ ক'রে উঠলো। 'একটা রেজলিউশন পাস ক'রে ওর বাড়িতে পাঠিয়ে দেবো আজই।'

'কিন্তু অনেকে-যে চ'লে যাচ্ছে—'

ইভা লাফিয়ে উঠলো প্রোফেসরের তক্তায়। আঙুলের গাঁট দিয়ে টেবিল ঠুকে বক্তৃতার ঢঙে বললো, 'বন্ধুগণ, আপনারা যাবেন না। মায়া সান্যালের জন্য কনডোলেন্স মীটিং করবো আমরা। আপনারা যাবেন না—আপনারা বসুন—স্থির হ'য়ে বসুন।'

তবু চ'লে গেলো কেউ-কেউ, অনেকে যেতে-যেতে ব'সে পড়লো। ইভা তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা এতেই হবে।'

একজন আপত্তি তুললো, 'সভাপতি কোথায়?'

'লাগবে না', দ্রুত উত্তর দেয় ইভা। 'এটা আমাদের নিজেদের সভা—ছাত্রীদের সভা—আর এ-যুগে সভাপতি একটা অ্যানাক্রনিজম।' নতুন-শেখা ইংরিজি কথাটা ঠিক জায়গায় বসাতে পেরে ইভা বেশ খুশি হ'লো মনে-মনে—একটা মেয়েও মানে জানে না নিশ্চয়ই?—'আপনারা কেউ কিছু বলুন, আমি রেজলিউশন

ড্রাফট করি—' ইভা গম্ভীরভাবে ব'সে পড়লো প্রোফেসরের চেয়ারে। এতই যদি সভাপতির শখ, তাকেই মনে করুক না।

একটু ঠেলাঠেলির পর অলকা উঠে কিছু বললো, তারপর সুপ্রীতি, তারপর আরো দুটি মেয়ে। বলতে গিয়ে তারা ঠেকে গেলো, ভুল করলো, হেসে ফেললো—অন্যেরাও হাসলো—মোটেও শোকসভার মতো লাগলো না তখন। তারপর ইভা উঠে রেজলিউশন পড়লো, সবাই মিলে দাঁড়িয়ে গ্রহণ করলো সেটি, আর সবশেষে ইভা বক্তৃতা করলো জমকালো ভাষায় অনর্গল বেগে—মেয়েরা অবাক হ'লো শুনে, আর স্বাতীর মনে হ'তে লাগলো যে মায়া মরেছে ইভাকে এই বক্তৃতার সুযোগটা দেবার জন্যই।

তার সামনের বেঞ্চিতে মায়া যেখানে বসতো, সেখানে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিলো স্বাতী। সেই মানে-জানতে-চাওয়া মোটাসোটা মায়া। ম'রে গেলো। ম'রে যাওয়া এতই সোজা? যে-কোনো মানুষ যে-কোনো দিন মরতে পারে?···আমিও? ভাগ্যিশ—কথাটা লাফিয়ে উঠলো স্বাতীর মনে,—ভাগ্যিশ আমি মরিনি! পৃথিবীর কোটি-কোটি মানুষের মধ্যে আমি না-থাকলে কী হ'তো? কিছু না। যদি আমি না-ই জন্মাতাম—তাতেই বা কী হ'তো? কিছু না। এই-তো মায়া সান্যাল হঠাৎ 'হ্যাঁ' থেকে 'না' হ'য়ে গেলো—কী হ'লো তাতে? মা ম'রে গেলেন—তবু-তো আমরা বেঁচে-ব'র্তে আছি; ভালো—হ্যাঁ, ভালোই তো আছি—হঠাৎ হাতুড়ির বাড়ি পড়লো হৃৎপিণ্ডে, মা-র জন্য যে তার আর কষ্ট হয় না, সেই কষ্টে যেন বুক ফেটে গেলো। তবে কি কারো জন্যই কিছু এসে যায় না কোথাও? পৃথিবীকে

না-হ'লে এক মুহূর্ত চলে না আমার, কিন্তু আমাকে না-হ'লে পৃথিবীর তো চলবে চিরকাল। এই-যে বৃষ্টি, হাওয়া, রোদ্দুর —এ কি আমার জন্য? এরা কি আমাকে চায়? কোনোরকমে হঠাৎ জ'ন্মে গেছি পৃথিবীতে, জানি না কেমন ক'রে না-ম'রে আছি—তাই তো সব পাচ্ছি, এই রোদ, বৃষ্টি, হাওয়া, মনে হয় আমারই জন্য সব; চায়, আমাকেই চায় ওরা—কিন্তু না-ই যদি চায়, তাহ'লে আমি কেমন ক'রেই বা হলাম! আমি না-হ'য়ে অন্য কেউ তো হ'তে পারতো, আমি হলাম কেন?

রাস্তায় বেরিয়ে স্বাতী তাকিয়ে দেখতে লাগলো আকাশের দিকে, আলোর দিকে, পাতা-কাঁপা গাছের দিকে—শোনো, তোমরা কি আমার কেউ নও? আকাশের উঠোনে ছুটোছুটি খেলছে বাচ্চা মেঘেরা, বড়ো রাস্তার চকচকে গায়ের উপর দিয়ে লম্বা ছায়া লাফিয়ে-লাফিয়ে এগিয়ে এলো, গাছের চুল ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে হা-হা ক'রে হেসে উঠলো হাওয়া—আমাকে তোমরা চিনতে পারো না? উত্তর নেই—উত্তর নেই—মনে-মনে বানিয়ে নিতে হয় উত্তর, বলিয়ে নিতে হয় ওদের দিয়ে যে-কথা শুনতে চায় মন।

'কী ভাবছিস?' পাশে চলতে-চলতে জিগেস করলো অনুপমা।

'না তো।'

'মায়ার কথা ভাবছিস?'

'মায়ার কথা? না।' মায়ার কথা কেন ভাববো, মায়ার কথা কে ভাবছে আর?

'কিছু-না-কিছু তো ভাবছিসই—' বললো সুপ্রীতি—'তবে বলবি না, এই আরকি।'

'কেমন দেখাচ্ছে তোকে!' রাস্তা পার হ'য়ে চিত্রা ঘুরে দাঁড়ালো স্বাতীর মুখোমুখি। 'হয়েছে কী?'

'কী আবার হবে।'

'প্রেমে পড়িসনি তো?'

হেসে উঠলো সুপ্রীতি আর অনুপমা, আর স্বাতী বললো, 'হাসছিস কেন? প্রেমে পড়া কি হাসির কথা?'

'তাহ'লে সত্যি-ই!' কথাটার রেশ টেনে তিনজনে চেঁচিয়ে হেসে উঠলো এবার।

'সত্যি না?' চাপা হাসির আভা স্বাতীর চোখে মুখে।

'বলবি, কে?'

'আমি কি জানি যে বলবো?'

'ফাজলেমি—!'

'চল, ট্র্যাম—' সুপ্রীতি ঠেললো চিত্রাকে। এমন সুখের চর্চাটায় বাধা পড়লো!— চিত্রা সুখী হ'লো না, কিন্তু ট্র্যাম তো আর দাঁড়াবে না।

লেডিজ সীট সব ক'টি ভরতি। চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো এলুমিনিঅমের হাতল ধ'রে—তাদের-যে খুবই খারাপ লাগছিলো তা হয়তো নয়, কিন্তু পুরুষদের এখনো এটা খারাপ লাগে, তাই পিছন দিকের লম্বা সীট থেকে একজন, তারপর দু-জন, তারপর অনিচ্ছায় মুখ কালো ক'রে আরো দু-জন উঠে দাঁড়িয়ে ছাত্রীদের জায়গা ক'রে দিলো। এ ওর পিঠ ধ'রে ঝাঁকানি সামলে ব'সে পড়লো তারা, তারপর উদাসভাবে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো যেন এ-ব্যাপারটা তাদের কিছু না।

লজ্জাই করে, সত্যি। একটি মেয়ের বসবার জন্য দু-জন পুরুষ সর্বদাই উঠে দাঁড়ায়। মেয়েটি হয়তো সেকে যাচ্ছে হাওয়া খেতে, আর পুরুষরা ফিরছে সারাদিন খেটে-খুটে ক্লান্ত হ'য়ে। কিন্তু উপায়ই বা কী—স্বাতী কপাল থেকে চুল সরালো—সত্যি-তো আমরা দুর্বল, আর তাছাড়া—যতই-না দাপাদাপি করি—তাছাড়া আমাদের অসুবিধেও! সমান-সমান ব'লে চ্যাঁচালে কী হবে—আমাদের শরীরই মেরে রেখেছে আমাদের, ঘেঁষাঘেঁষি ভিড়ের মধ্যে—বিশ্রী! অথচ আমাদের জন্য অন্যেরা দাঁড়িয়ে থাকে, সেটাও—

'ঐ যে—সত্যেন রায়—' অনুপমা কানে-কানে বললো।

'কে?'

'সত্যেন রায়, প্রোফেসর—মনে আছে ইভার সঙ্গে ঝগড়া?'

ফিরে তাকাতেই চোখে পড়লো সত্যেন রায়কে। দাঁড়িয়ে আছেন এক হাতে চামড়ার স্ট্র্যাপ ধ'রে, আর-এক হাতে, মোটা-মোটা দু'খানা বই বেশ কসরৎ ক'রেই সামলাচ্ছেন। নিশ্চয়ই এখানে ব'সে ছিলেন তিনি? আমাদের জন্যই···অন্তত বই দুটো যদি নামিয়ে রাখতে পারতেন—আমার কিছুই অসুবিধে নেই, কিন্তু বলি কী ক'রে? তাকিয়ে আছেন সোজা সামনের দিকে; স্বাতী দেখতে পেলো ঘাড় বেয়ে চুল নেমেছে—এবার ছাঁটা দরকার—পাঞ্জাবির একটা পকেট ছেঁড়া—জানেন তো? না, পয়সা-টয়সা প'ড়ে যায়?—আর দেখলো পায়ের চাপে গোড়ালির উপরের সরু হাড়টা ফুলে-ফুলে উঠছে। কথা বলার আশাই নেই।

ট্র্যামের মিনিট দশেক সময় স্বাতীর ভারি অস্বস্তিতে কাটলো।

সেই বইটার কথা বলতে পারতো না এখন! মেয়ে হবার অসুবিধে কত! ছেলে হ'লে উঠে দাঁড়াতে পারতো, কথা বলতে পারতো কাছে গিয়ে। আবার কবে দেখা হবে!

স্বাতী নামে সকলের আগে। বন্ধুদের কাছে চোখে-চোখে বিদায় নিয়ে উঠেই সে দেখলো সত্যেনবাবুও নামছেন সেই স্টপে। কিন্তু তাতে কী—সে রাস্তায় পৌঁছতে-পৌঁছতে ভদ্রলোক হনহন ক'রে রাস্তা পার হ'তে লেগেছেন, আর সে ট্র্যাম-লাইন পার হবার আগেই ঢুকে পড়েছেন তাদেরই পাশের গলিতে। যেন জানতে পেরে ইচ্ছে ক'রে এড়িয়ে গেলেন। কিন্তু এখানে কোথায়? চেনাশোনা কেউ আছে বুঝি? আসেন নাকি মাঝে-মাঝে? গলির মধ্যে শাদা পাঞ্জাবির মিলিয়ে-যাওয়া দেখতে-দেখতে স্বাতীর মনে কেমন-একটা আশাও হ'লো।

এর ঠিক দু'দিন পরে আবার দেখতে পেলো সত্যেন রায়কে, তাদেরই ট্র্যাম-স্টপে অপেক্ষা করছেন কাঁধে চাদর ঝুলিয়ে, একখানা কাগজ-মলাটের বই এক হাতে উল্টিয়ে চোখের সামনে খুলে। স্বাতী তাকালো, এক পা এগিয়ে এলো, আবার পেছোলো; চোখ নড়লো না বই থেকে। হুশ ক'রে ট্র্যাম এসে দাঁড়ালো, সত্যেনবাবু উঠতে গিয়ে মহিলা দেখে হাতল ছেড়ে দিলেন, স্বাতীও হাত বাড়িয়ে স'রে এলো প্রোফেসরকে সম্মান জানিয়ে—ইতিমধ্যে ট্র্যাম দিলো ছেড়ে। সত্যেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এই রোক্‌কো!' কিন্তু কেজো ট্র্যাম কথা শুনলো না।

'মজা হ'লো', বেরিয়ে গেলো স্বাতীর মুখ দিয়ে।

সত্যেনবাবু এক পলক তাকালেন। মুখের ভাবে স্পষ্ট বুঝিয়ে

দিলেন যে তাঁর দোষেই ট্র্যামটা ধরা গেলো না, কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখে এই মন্তব্যটাও তিনি আশা করেননি।

'আমাকে···আমাকে চিনতে পারছেন না ?'

'আপনি—' প্রোফেসরের চোখ পড়লো স্বাতীর হাতের বইয়ের উপর—থমকে গিয়ে, 'আপনি' 'তুমি' দুটোই এড়িয়ে, অস্পষ্টভাবে বললেন, 'কলেজে বুঝি ?'

'আপনি আমাকে—' স্বাতী কথাটা পাড়তে আর দেরি করলো না, 'আমাকে একখানা বই দিয়েছিলেন অনেকদিন আগে—'

'নাকি ?'

মনেই নেই ? স্বাতী একটু ব্যথিত হ'লো। বইটা ভুলেছেন, আর সেই সঙ্গে যাকে দিয়েছিলেন তাকেও ? ক্ষীণস্বরে বললো, 'কলেজের লাইব্রেরিতে একদিন—'

'লাইব্রেরির বই ?' একটু উদ্বিগ্ন প্রশ্ন সত্যেনবাবুর।

'না, আপনারই। গোল্ডেন ট্রেজরি—'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ', সত্যেনবাবুর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়লো। 'পড়েছো ?'

'চেষ্টা ক'রেও ফেরৎ দিতে পারিনি এতদিন—'

'কেন, ভালো লাগলো না ?'

স্বাতী বুঝতে না-পেরে চোখ তুললো মুখের দিকে।

সত্যেনবাবু আবার বললেন, 'এর মধ্যে হ'য়ে গেলো পড়া ?'

'সাত মাস আট মাস হ'লো—'

'মাত্র সাত-আট মাসেই প'ড়ে ফেললে !'

একটু লজ্জিত, একটু বিব্রত মুখ তুলে স্বাতী তাকালো এবারেও।

'কবিতার বই আমি ধার নিই না কখনো—' স্বাতীর চোখের প্রশ্নের উত্তর দিলেন সত্যেনবাবু—'দিইও না। ও তুমিই রাখো।'

'না, না, আমি কেন—আপনি—কী আশ্চর্য—'

'আশ্চর্য কিছু না', সত্যেনবাবু একটু হাসলেন। 'অন্য বই প'ড়ে শেষ করলেই শেষ হ'লো—কবিতা তো আর শেষ হয় না কখনো, নিজের না-থাকলে চলে !'

স্বাতী অবাক হ'লো কথা শুনে। বাধো-বাধো ভাবটা চেষ্টা ক'রে কাটিয়ে উঠে বললো, 'তাই ব'লে যে-কোনো লোককে যে-কোনো বই দিয়ে দেবেন ?'

'না !—কিন্তু সত্যি যারা ভালোবাসে তাদের তো দিতেই হবে।'

'তাহ'লে আপনার নিজের বই আর থাকবে না।'

'সে-ভয় নেই। সে-রকম মানুষ খুব কমই।'

আমি কি সেই খুব-কমদের একজন ? স্বাতীর প্রশ্ন মনে উঠলো। কী ক'রে বুঝলেন ? আমাকে তো চেনেনও না। কথাটা বলা যায় কিনা, কী-রকম ক'রে বললে ঠিক হয়, তা ভাবতে-ভাবতে আবার ট্র্যাম এলো। অন্য দিনের মতো সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লজ্জা করলো স্বাতীর, ব'সে পড়লো মেয়েদের সীটেই। সত্যেনবাবু-যে পিছনের দিকে ব'সে আছেন এটা মুহূর্তের জন্যও ভুলতে না-পেরে এই ট্র্যামে যাওয়াটুকু অন্যদিনের মতো উপভোগ করতে পারলো না।

ঠিক কলেজের সামনেই ট্র্যাম দাঁড়ায়। নামবার সময় সত্যেনবাবু স'রে দাঁড়ালেন স্বাতীর জন্য, তারপর একসঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতেই ঢুকলেন কলেজে। নানা দিক থেকে মেয়েরা

আসছে তখন, কেউ একা, অনেকে ছোটো-ছোটো দলে, গেট পার হ'য়েই স্বাতী যেন ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলো।—তাই তো! কোনো কথাই তো হ'লো না!···কী-কথা? ভেবে কোনো কথা পায় না; কত যেন কথা আছে মনে হয়।

আবার দেখা হ'লো একদিন।

বৃষ্টির পরে ঝিলমিলিয়ে রোদ উঠেছে সন্ধের একটু আগে; পশ্চিমের মাঠে বেড়িয়ে ফিরছিলো স্বাতী। এখন অবশ্য ঠিক মাঠ বলা যায় না আর; বাড়ি উঠছে, রাস্তা হচ্ছে, মোষের গাড়ি পিষে দিয়েছে ঘাস, চওড়া-চওড়া টাক পড়েছে সবুজে। তবু এখনো মাঠ ছেড়ে গলিতে ঢুকলেই মন-খারাপ লাগে—কিন্তু আর ক-দিন পরে সবই তো গলি হ'য়ে যাবে।

মাঠের গা ঘেঁষে পুরোনো একটি দোতলা, পশ্চিম-মুখো, সূর্যাস্তের মুখোমুখি, তারই একতলায় সরু বারান্দায় রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সত্যেন রায় দেখলেন, বেগনি রঙের শাড়ি পরা একটি কালো চুলের মেয়ে যেন হলদে আলোর নদীতে নেয়ে উঠে এলো। কাছে আসতেই চিনতে পারলেন, পাশ দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ চোখ তুলে থমকে দাঁড়াল স্বাতী। আরে! উনি?—'আপনি!'

কথাটা এমন বেগে তার গলা দিয়ে বেরলো যে নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো, চোখ নামিয়ে নিলো একটু লাল হ'য়ে।

'কেমন? ভালো?' প্রোফেসরের কুশল-প্রশ্ন।

'আপনি এখানে?' এবার খুব মৃদু স্বর স্বাতীর।

'এখানেই থাকি।'

তা-ও তো বটে। নয়তো ট্রামে উঠবেন কেন ঐ স্টপ থেকে?

কী বোকা আমি—আগেই ভাবা উচিত ছিলো, তাহ'লেই তো এমন অস্থায়রকম অবাক হতাম না। নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা ক'রে বললো, 'এ-বাড়িতে অন্য কারা থাকতো যেন ?'

'তাঁরা আছেন।'

'আত্মীয় আপনার ?'

'না না, আত্মীয় হবে কেন', সত্যেনবাবু হাসলেন। 'তাঁরা দোতলায় আছেন, আমি একতলাটা ভাড়া নিয়েছি।—বেশ জায়গা।'

'আপনার ভালো লাগে ?'

'এখান থেকে তাকালে কলকাতাই মনে হয় না।' সত্যেন রায় একবার তাকালেন দূরের আকাশে রঙিন মেঘের দিকে, আর-একবার কাছের কালো চুলে হলদে-ফিতে আলোর দিকে। যেন বুঝতে পারলেন না কোনটা দেখবেন।

স্বাতী বললো, 'আগে আরো সুন্দর ছিলো। কত গাছ কেটে ফেলেছে!'

'এখনই-বা কম সুন্দর কী', সত্যেনবাবু বললেন, কালো চুলের আলোর দিকে তাকিয়ে।

স্বাতী একটু চুপ ক'রে রইলো, তারপর হঠাৎ তার মনে পড়লো যতীন দাস রোডে তাদের পাশের বাড়িতে নতুন কারা এলো একবার, মা রাত্তিরের খাবার পাঠালেন বাড়ি থেকে, কুঁজো ভরতি-ভরতি জল, বাচ্চাদের দুধ, সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে চার-পাঁচবার আনাগোনা বাবার। 'আপনার কোনো', তাড়াতাড়ি সে খবর নিলো, 'কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো ? যদি কিছু দরকার হয়—'

'দরকার হ'লে বলবো', সত্যেনবাবু বারান্দা থেকে সিঁড়িতে নামলেন। 'খুব কাছেই থাকো ?'

'ঐ মোড়ের শাদা একতলাটা', স্বাতী আঙুল দিয়ে দেখালো। 'যদি কখনো—' কথা শেষ করলো না।

'তোমাকে আসতে বলতে পারলাম না, আমার বাড়িতে তো আর-কেউ নেই—'

'কবে আসবেন সব ?'

'আর-কেউ নেই। একাই থাকি।'

'একেবারে একা ?'

ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটলো সত্যেন রায়ের। একেবারে একা! এই একাই স্বর্গ! কী বিশ্রী ছিলো ভবানীপুরের সেই মেসের ভিড়, যেন ট্রাম থেকে নেমে আর-একটা ট্রামে ঢুকলাম।··· কপালগুণে হঠাৎ জুটে গেছে এটা, পাড়াটা জাতে নিচু আর বাড়িটা পুরোনো ব'লে মাত্র আঠারো টাকা ভাড়ায়। আবার তাকিয়ে দেখলেন দূরের দিকে; গোলাপি মেঘ বাদামি হ'লো, আর নিচু-করা মাথাটির উপর ফুলে-ফুলে-ওঠা চুল ছাইরঙা ছায়ায় আরো যেন কালো দেখালো। হঠাৎ জিগেস করলেন, 'নাম কী তোমার ?'

'স্বাতী মিত্র।'

'স্বাতী মিত্র ? স্বাতী ?'

'স্বাতী।'

'সুন্দর নাম।'

সুন্দর !

এর পরে মিনিটখানেক সত্যেনবাবু যখন আর-কিছু বললেন না, স্বাতী একটু চোখ তুলে অস্ফুট একটা 'আচ্ছা—' ব'লে বিদায় নিলো নিচু মাথায় অধ্যাপককে অভিবাদন জানিয়ে।

বাড়ি এসে বললো, 'বাবা, আমাদের এক প্রোফেসর এসেছেন এখানে।'

'কোথায় ?'

'ঐ-যে মাঠের ধারে বাড়িটা—'

'ও, রেবতীবাবুর বাড়িতে ?'

'পাড়ার সক্কলকে তুমি চেনো কেমন ক'রে, বাবা ?'

রাজেনবাবু হেসে বললেন, 'দেখাশোনা হ'লেই চেনাশোনা হয়।—তা ভালো হ'লো রেবতীবাবুর, প্রোফেসর ভাড়াটে পেলেন।'

'ভালো কেন ?'

'ভালো না ? প্রোফেসররা খুব শান্ত ভালোমানুষ হয় তো।'

'নাকি ?'

'বিদ্বান কি আর মিছিমিছি হয় রে।'

'তা তুমি যা-ই বলো, তোমার মতো ভালোমানুষ হ'তে বিদ্বানদের ঢের দেরি এখনো।'

'হয়েছে, হয়েছে—নিজের বাপকে সবাই ভালো বলে!'

'ঈশ!' স্বাতী মাথা ঝাঁকালো। 'বললেই হ'লো!'

রাজেনবাবু আগের কথায় ফিরে গেলেন—'তা তোর সঙ্গে দেখা হ'লো প্রোফেসরের ?'

'হ্যাঁ, বাবা। একা থাকেন ভদ্রলোক—'

'একা কেন ?'

'আমি কী জানি!…আর একা কি কেউ থাকে না?'

'ঐ-তো ছাখ! প্রোফেসর না-হ'লে কি বাড়ি ভাড়া পেতেন?'

'পেতেন না?' স্বাতী অবাক।

'জানিস না বুঝি—কলকাতায় একা কোনো পুরুষমানুষকে সহজে কেউ বাড়িভাড়া দিতে চায় না। স্ত্রী থাকা চাই—কি অন্তত মা বোন-টোন কিছু।'

'কেন?'

রাজেনবাবু একটু ভেবে জবাব দিলেন: 'কোনো মেয়ে না-থাকলে বাড়ি তো আর বাড়ি হয় না।'

কথাটা হঠাৎ ধ্বক ক'রে উঠলো স্বাতীর বুকের মধ্যে। একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গেলো।

রাজেনবাবু বললেন, 'মাঝে-মাঝে খোঁজ-খবর নিস তোর প্রোফেসরের।'

'খোঁজ-খবর আমি আর কী নেবো—তুমি যদি একদিন—'

'বেশ, নিয়ে চলিস আমাকে।'

'পাড়ার সকলের সঙ্গে তোমার তো আলাপ থাকাই চাই—না, বাবা?' স্বাতী হাসলো।

এর পরের রবিবারের সকালে বাজার নিয়ে এসে রাজেনবাবু যথারীতি গায়ের জামা খুলে একটি পান খেলেন ব'সে, আর তার পরেই উঠে জামা পড়লেন আবার।

'আবার বেরুচ্ছো!' স্বাতীর কথাটা অর্ধেক প্রশ্ন, অর্ধেক প্রতিবাদ।

'যাই একটু অনুকূলের বাড়িটা—'

'রাখো-তো তোমার!' স্বাতী গলা চড়ালো। 'রোজ-রোজ দেখতে হবে না অত! ঠিকই আছে—উড়েও যায়নি, চুরিও হয়নি।'

'আহা—বুঝিস না। দূরে থাকে, যদি কিছু গোলমাল হয়—'

'হোক গোলমাল, তোমার কী?' স্বাতী মাথা ঝাঁকালো। রাগ হয়, সত্যি। এক দূর সম্পর্কের কাকা তার, দিল্লি-শিমলের চাকুরে, ঐ মাঠের একটা প্লটে বাড়ি তুলছেন, আর বাবা সময় পেলেই তার দেখাশোনা করছেন রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে। যতীন দাস রোডের বাড়িতে কাকাটি এসেছিলেন একবার—কী খাওয়ার ঘটা সে-ক'দিন, বাবা পারেনও!—অথচ একদিন তাঁর একখানা ধুতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না, চাকর ভুল ক'রে বাবার কাপড়ের সঙ্গে রেখেছিলো, তাই নিয়ে এমন হুলুস্থুল বাধালেন যে মা-র হার্টফেল হবার যোগাড়।

'এক্ষুনি আসছি—' রাজেনবাবু কাচুমাচু মুখে অনুমতি চাইলেন মেয়ের কাছে।

'না, যেতে হবে না কোথাও।'

'তুইও চল না—'

'ব'য়ে গেছে আমার!'

'ফেরবার পথে তোর প্রোফেসরের বাড়িও একবার যাবো না-হয়।'

স্বাতী একটু ভেবে বললো, 'সত্যি যাবে নাকি?'

'বাঃ, কেমন আছে-টাছে একবার দেখতে হয় না?'

স্বাতী হঠাৎ বললো, 'না বাবা, আমি যাবো না।'

'কেন?'

'ন্‌না,' স্বাতী চোখ কুঁচকে মাথা নাড়লো।

'চল না—একটু বেড়ানোও তো হবে, কেমন সুন্দর সকালবেলাটা।'

স্বাতী চ'লে গেলো ঘর থেকে, দু-মিনিটের মধ্যে তৈরি হ'য়ে এসে বললো, 'তোমার ধুতিটা বদলে নাও, বাবা।'

'এই রে!'

'তুমি যে কী!' স্বাতী পাট-করা জামা-কাপড় বের ক'রে দিলো, মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'দাড়িটাও কামিয়ে নিলে পারতে।'

'থাম তো!' দু-দিন-পরা জামার মোলায়েম অন্তরঙ্গতা থেকে টাটকা জামার কড়কড়ে ভব্যতায় বদলি হ'য়ে নিয়ে রাজেনবাবু মেয়ের সঙ্গে রাস্তায় নামলেন।

ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছিলো সেদিন; রাস্তায় ঘাসের আর বাসিবকুলের একটা আবছা ঠাণ্ডা মিঠে-মিঠে গন্ধ। প্রোফেসরের বাড়ি পার হ'য়ে মাঠে নামলো তারা; স্বাতী একবার মাত্র তাকালো একতলার ঘরটার দিকে, তারপর হাঁটতে-হাঁটতে বোঝাতে লাগলো যে সকলের সব দায় ঘাড়ে ক'রে নেবার এই বদভ্যাস বাবাকে ছাড়তেই হবে, আর কান দিয়ে মেয়ের কথা শুনতে-শুনতে মনে-মনে রাজেনবাবু ভাবতে লাগলেন যে অনুকূলের কনট্র্যাক্টর নিশ্চয়ই তাকে ঠকাচ্ছে, দেখা হ'লে কথা বলতে হবে। নিশ্চয়ই কনট্র্যাক্টর আসেই না মোটে; তার একজন ছোকরামতো কর্মচারী ধুতির সঙ্গে শোলা টুপি প'রে সাইকেলে চ'লে যাচ্ছিলো, রাজেনবাবু

তাকে থামিয়ে কয়েকটা কথা বললেন, আর স্বাতী দাঁড়িয়ে রইলো একটু দূরে, অর্ধেক তৈরি বাড়িটার দিকে তাকিয়ে। একটা বাড়ি যতদিন তৈরি হ'তে থাকে, কী কুচ্ছিৎই দেখায়! ভাবাই যায় না যে এর মধ্যে একদিন মানুষ থাকবে, হাসবে, হাঁটবে, চা খেতে-খেতে গল্প করবে, গল্প করতে-করতে ঝগড়া বাধাবে। এখন তাকিয়ে শুধু মনে হয়, দূরে-দূরে ছড়ানো এই আট-দশটা ইটের ঢিপি মাঠের গায়ে বড়ো-বড়ো ফোড়ার মতো লাল হ'য়ে উঠলো। স্বাতীর চোখ গেলো দূরে, মাঠের ওপারে সেই পুরোনো বাড়িটিতে ; চুন শুরকি ধুলোর মধ্যে রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমস্ত পাড়াটাকেই কেমন শান্ত, ছায়াচ্ছন্ন মনে হ'লো। ফেরবার সময় অর্ধেক মনে হ'লো পথ।

রেবতীবাবুর একতলার বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'প্রোফেসর আছে তো বাড়িতে?' আবার কী-রকম একটা অনিচ্ছায় স্বাতীর শরীর যেন ভারি হ'য়ে এলো। বাবার জামায় টান দিয়ে ফিশফিশ ক'রে বললো :

'থাক, চলো।'

'আয়', রাজেনবাবু নিশ্চিন্ত। বারান্দায় উঠে টোকা দিলেন দরজায়।

দরজা খুলে দিলো চাকর।

'বাবু আছেন?'

'বসুন।' হলুদের হাত কাপড়ে মুছে স'রে দাঁড়ালো লোকটি।

ঘরের মাঝখানে বেতের টেবিল ঘিরে খানচারেক চেয়ার। 'বোস', মেয়েকে এ-কথা ব'লে রাজেনবাবু বেশ ঘরোয়াভাবে ব'সে পড়লেন।

'বস্থন, বাবুকে বলি' ; ব'লে লোকটি দু-কাঁধের একটা বিনীত ভঙ্গি ক'রে নীল পরদার ওপারে চ'লে গেলো।

আসামাত্রই যে দেখা হ'লো না তাতে স্বাতী যেন একটু স্বস্তি পেলো। তাকিয়ে দেখলো, একদিকের দেয়াল ঘেঁষে দুটি শেলফ, একটি বড়ো, আর-একটি ছোটো, কিন্তু দুটোই রোগামতো স্থাড়া চেহারার, বড়োটায় ইংরেজি বই, আর ছোটোটায় বাংলা— বইগুলি দাঁড়িয়ে, শুয়ে, কাৎ হ'য়ে, মাথা উলটিয়ে নানা অবস্থায় আছে, হয়তো গোছাবার সময় হয়নি এখনো, না কি বই যারা পড়ে তাদের বই এ-রকমই থাকে ? দুটি জানলার মাঝখানে ছোটো একটি লেখার টেবিল, নীল প্যাডের ফাঁকে কুচকুচে কালো কলম গোঁজা—চিঠি ! কাকে চিঠি ? ও মা, চিঠি লেখার লোকের নাকি অভাব ? এখানে একা থাকেন, বাড়ির লোকদের তো লিখতেই হয়। কিন্তু প্যাডটার বেগনিমতো নীল রংটা বড্ড যেন···হঠাৎ কেমন-একটা রাগ চিড়বিড় ক'রে উঠলো মাথায়, মনে হ'লো অনেকক্ষণ ব'সে আছে এসে, কেন ব'সে আছে, কী দরকার ব'সে থাকবার, আর আসবারই-বা দরকার ছিলো কী ?

'বাবা—' কিন্তু আর বলা হ'লো না, সত্যেনবাবু ঘরে এলেন। স্বাতী চকিতে দেখলো, এইমাত্র স্নান করেছেন ভদ্রলোক, মাথার চুল পরিষ্কার আঁচড়ানো, গায়ে পাৎলা ঢিলে একটা পাঞ্জাবি, আর তিনি কাছে আসতে সূক্ষ্ম একটু সুগন্ধও স্বাতীকে মুহূর্তের জন্য উন্মন করলো। বাইরে থেকে যা মনে হয় ঠিক তা নয়—বাবুগিরি আছে !

ঘরে পা দিয়েই সত্যেনবাবু একটু-যেন থমকে গেলেন অবাক হ'য়ে, আর তার পরেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললেন,

'কী, আশ্চর্য ! তুমি !…আপনি ! আমি স্নান করছিলাম, তাই…' এতক্ষণ ব'সে-ব'সে…কী আশ্চর্য।'

স্বাতী উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমার বাবা।'

'বুঝেছি।' রাজেনবাবুর দিকে তাকাতেই সত্যেন রায়ের ঠোঁটে হাসি ফুটলো।

রাজেনবাবুও হেসে বললেন, 'আমার মেয়ে ধ'রে নিয়ে এলো আমাকে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—মানে, আমারই যাওয়া উচিত ছিলো—আপনি কষ্ট ক'রে—তুমি বোসো, দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি ? কষ্ট ক'রে এই রোদ্দুরে—আর পাখাটাও খুলে দেয়নি, কী কাণ্ড !'

সত্যেনবাবু ছুটে গেলেন দেয়ালের কোণে, চালিয়ে দিলেন টেবল-ফ্যানের সুইচ, অতিথিরা দু-জনেই হাওয়া পাচ্ছে কিনা তা দেখবার জন্য তাকালেন, কিন্তু হাওয়া কই ? প্লগটা খুলে আবার লাগালেন, সুইচটা এদিক-ওদিক করলেন অনেকক্ষণ, কিন্তু পাখা চললো না। মুখ তুলে, হাতের উল্টো পিঠটা কপালে একবার বুলিয়ে আবছা একটু হাসলেন। 'এই ভাড়াটে পাখাগুলো—'

'থাক না', রাজেনবাবু বললেন, 'পাখার কী দরকার—জানলা দিয়েই হাওয়া আসছে খুব। আপনি বসুন।'

'কালই দিয়ে গেলো এটা—' করুণ চোখে পাখাটার দিকে শেষবার তাকিয়ে সত্যেনবাবু বসলেন এসে। রাজেনবাবু জিগেস করলেন, 'ঘোষ কোম্পানি দিয়েছে বুঝি ?'

'কী ক'রে জানলেন ?' প্রোফেসর অবাক।

'ঐ একটাই তো ইলেকট্রিকের দোকান এ-পাড়ায়। আর

সেজন্যই এ-রকম—' কথা শেষ না-ক'রে রাজেনবাবু বললেন, 'আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'অসুবিধে? না, অসুবিধে কী।'

'ওদিকের ঘরটা বুঝি রেবতীবাবু রেখেছেন?'

'হ্যাঁ, ওঁর জিনিশপত্র আছে ওটাতে, আমার তো লাগেও না, দুটো ঘরই মনে হয় বেশি।'

'রান্নাঘর?' রাজেনবাবুর পরের প্রশ্ন।

একটু ভেবে সত্যেন রায় জবাব দিলেন, 'বোধহয় নেই। বোধহয় মানে', নিজেই একটু হেসে তাড়াতাড়ি আবার বললেন, 'মানে, নেই আরকি। আর রান্নাই বা কী, তার জন্য আবার—!'

'চাকর রাঁধতে পারে?'

'রেঁধে তো দিচ্ছে, কিন্তু রাঁধতে পারে কিনা, আমি ঠিক বলতে পারবো না।'

রাজেনবাবু হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন এ-কথায়। ছাত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সত্যেনবাবু বললেন, 'তুমি যে একেবারে চুপ?'

বইয়ের শেলফ থেকে চোখ সরিয়ে আনলো স্বাতী।

'বই দেখবে? ছাখো না', সত্যেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে শেলফের কাছে গেলেন। 'এসো এখানে।'

স্বাতী আস্তে উঠে প্রোফেসরের পাশে দাঁড়ালো। বই কী সুন্দর! কত রকম রং, কত রকম বাঁধানো—আর নাম, কত নাম, আর দুটি মাত্র মলাটের মধ্যে কত কাণ্ড। দু-আঙুলে আলগোছে দু-একটি বই একটু ছুঁলো সে।

'নেবে? নেবে বই?···বলো, কোনটা তোমার ইচ্ছে?'

ফিকে-ধূসর শোওয়ানো একটি বইয়ের উপর স্বাতী আস্তে আঙুল রাখলো, আর-কোনো কারণে নয়, শুধু মলাটের রংটা আশ্চর্য সুন্দর ব'লে।

'চেখভ!' খুশি গলায় ব'লে উঠলেন সত্যেন রায়।

চে—?

না-বলা প্রশ্নটা বুঝে নিয়ে প্রোফেসর আবার উচ্চারণ করলেন, 'চেখভ।' 'খ'-টা খুব কড়া শোনালো আর 'ভ'-টা খুব নরম। 'আন্তন চেখভ। রুশ। কিন্তু অনুবাদ এত ভালো—আর গল্পগুলি—' হঠাৎ থেমে জিগেস করলেন, 'ইংরেজিতে গল্পের বই কী পড়েছো?'

স্বাতী মাথা নাড়লো।

'কিচ্ছু না?'

আবার মাথা নাড়লো স্বাতী। সত্যেন রায় তাকিয়ে দেখলেন তার মেঘ-রঙের চোখ দুটিতে লজ্জার সঙ্গে কৌতূহলের প্রতিযোগিতা, নম্রতার সঙ্গে উৎসাহের লুকোচুরি।—'কিচ্ছু পড়োনি! কত ভালো বই, আর পৃথিবীর প্রায় সব ভালো বইয়ের চমৎকার অনুবাদ!—ইংরেজ রাজত্বের নানা অসুবিধের মধ্যে এই একটা সুবিধেই তো আমরা পেয়েছি।' বলতে-বলতে ফিকে-ধূসর বইটি, আর বেছে-বেছে আরো তিনখানা, নামিয়ে দিলেন তার হাতে।

বইয়ের, লজ্জার, কৃতজ্ঞতার ভারে স্বাতী যেন নুয়ে পড়লো। অস্ফুটে বললো, 'একসঙ্গে এতগুলো—'

'এতগুলো আর কী—বদলে-বদলে তো পড়তে ইচ্ছে করে। প্রথমে ছোটোগল্প দিয়ে অভ্যেস করো, পরে বড়ো উপন্যাস পড়তে পারবে।'

শেষের কথাটা একেবারেই মাস্টারি। স্বাতী চেষ্টা করলো কিছু বলতে, যে-কোনো একটা কথা বলতে চেষ্টা করলো : একটা কথাও বলতে পারলো না।

বাইরে এসে রাজেনবাবু বললেন, 'তোর খুব লাভ হ'য়ে গেলো রে এসে।'

যে-পাতায় বইয়ের নাম-টাম লেখা থাকে, এক-এক ক'রে সেই পাতাগুলি দেখে নিচ্ছিলো স্বাতী। চোখ তুলে বললো, 'সত্যি!'

'চমৎকার মানুষ!'

'এর মধ্যেই বুঝে ফেললে!'

'কী-নরম চেহারা রে! এমন যেন আর দেখিনি।'

'তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি!' স্বাতীর হাসির শব্দটা যেন কুঁজোর জল ঢালার মতো।

'—আর কী-রকম ছেলেমানুষি করলেন পাখাটা নিয়ে!'

'সত্যি!' ঘটনাটা মনে ক'রে স্বাতী আবার হেসে উঠলো।

'পড়াশুনোর মানুষ—এদের দেখবার কেউ না থাকলে চলে! চুরি ক'রে সর্বনাশ করে চাকর!'

'তোমার বুঝি ইচ্ছে করছে রোজ এঁর বাজারটা ক'রে দিতে?'

রাজেনবাবু মুখ টিপে হাসলেন।

একটু পরে স্বাতী ব'লে উঠলো, 'আচ্ছা বাবা, তুমি কী-রকম?'

'কী-রকম বল তো?'

'বেশ ব'লে দিলে আমি তোমাকে ধ'রে এনেছি! এমন রাগ হচ্ছিলো আমার তখন!'

'বাঃ, তোরই প্রোফেসর—'

'আমার তো প্রোফেসর, কিন্তু গরজটা যেন তোমারই !'

'আহা—আমারও তো ইচ্ছে করে একটা ভালো লোকের সঙ্গে আলাপ করতে !' বললেন রাজেনবাবু বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়ে।

'তুমি নিজে কিনা ভালো, তাই সকলকেই ভালো ছাখো ! লাফিয়ে সিঁড়ি টপকে বাবার আগে বাড়িতে ঢুকে পড়লো স্বাতী।

নিজের ঘরে গিয়ে বই ক-খানা রাখলো তার পড়ার টেবিলে, চেয়ারে ব'সে একখানা তুলে নিলো হাতে। কিন্তু খুলতে গিয়েই থেমে গেলো, চোখে ঝিলিক দিলো নীল খাম…নীল প্যাডের ফাঁকে কালো কলমটি গোঁজা…বই খুললেই বিষাক্ত একটা পোকা লাফিয়ে উঠবে, কামড়ে দেবে। কী-সব ভাবছে সে বোকার মতো—কোথায় শুভ্র, আর কোথায় সত্যেনবাবু, শুভ্র তো একটা বাজে—কেন, বাজে কেন ? শুভ্র যদি বাজে হয় ছোড়দিও তো বাজে !… আর, কী-ই বা আছে এতে—ক্লাশের মেয়েদের যা-সব গল্প করতে শোনে—না, না, বিশ্রী, বিশ্রী সব, সব বাজে, পৃথিবীসুদ্ধু লোক বাজে —কিন্তু সেটা কি সত্যেনবাবুর দোষ ?…স্বাতী খানিকক্ষণ ব'সে রইলো শক্ত হ'য়ে, তারপর আস্তে, আস্তে, খুব মন দিয়ে চারখানা বইয়ের প্রত্যেকটির পাতা ওল্টালো। পাতাগুলি খশখশ ক'রে বললো, 'এসো, এসো।' কালো-কালো ইংরেজি অক্ষরগুলি গুনগুন করলো, 'শোনো, শোনো।' একটু আগে তার যেমনই খারাপ লাগছিলো, তেমনি একটা সুখের ঢেউ ছলছল ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে—আঃ, এ-সব বই কি কখনো তার হাতে আসতো সত্যেন রায়ের সঙ্গে দেখা না-হ'লে !

সন্ধেবেলা সে সেজদির চিঠি প'ড়ে শোনাচ্ছে বাবাকে, রামের মা এসে বললো একজন বাবু এসেছেন। বিরক্ত হ'য়ে স্বাতী জিগেস করলো, 'কে ?'

'কে, তা ও জানবে কী ক'রে—আমি দেখে আসছি', ব'লে রাজেনবাবু উঠে পড়লেন।

'পাওনাদার-টার কেউ হবে আরকি—ব'সে থাক না খানিকক্ষণ।'

'পাওনাদারদের কী মুশকীল বল তো—ধারে দিতেও হয়, আবার টাকা চাইতে গেলেও লোকে রাগ করে!' যেতে-যেতে হাসলেন রাজেনবাবু।

একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, 'তোর প্রোফেসর।'

শোনা মাত্র স্বাতী উঠে দাঁড়ালো।

'চলে গেছেন।'

'চ'লে গেলেন!'

'কত বললাম বসতে, বসলেন না, ট্যুশনি আছে-টাছে বোধহয়।'

স্বাতী আবার ব'সে প'ড়ে একটু নির্জীব স্বরে বললো 'কেন এসেছিলেন ?'

কথা না-ব'লে মুখ টিপে হাসলেন রাজেনবাবু।

'এসেছিলেন কেন ?'

'কিছু না···এই—' একটু-একটু অপরাধীর ভাবে রাজেনবাবু বললেন, 'আমাদের সেই টেবল-ফ্যানটা ওঁকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কিনা—'

'পাঠিয়ে দিয়েছিলে ?'

'আমাদের তো কোনো কাজেই লাগে না ওটা—আর সারাটা দিন গরমে কষ্ট পাবেন ভদ্রলোক—ভালো করিনি ?'

'আমি তোমাকে বলেছি না, বাবা, আমাকে জিগেস না-ক'রে ককখনো কিছু করবে না !'

'কেন, এতে দোষ কী ?'

'ভালো ক'রে তো চেনেনও না আমাদের—হঠাৎ এ-রকম—উনি কী মনে করলেন, বলো তো !'

'এতে আবার মনে করবার কী। কত তো ভালো-ভালো কথা ব'লে গেলেন। কথা শুনলে প্রাণ জুড়োয়, সত্যি !'

'তোমার প্রাণ বড়ো সহজেই জুড়োয়', স্বাতী গম্ভীর হ'লো।

'পড় দেখি সরস্বতীর চিঠিখানা আর-একবার', মেয়েকে খুশি করবার চেষ্টা করলেন রাজেনবাবু।

স্বাতী পড়লো, কিন্তু সে একরকমের দায়-সারা পড়া।—চ'লে গেলেন! একটু বসতে পারলেন না! আবার কবে—

কিন্তু আর দেখা হ'লো না শিগগির, আর তাতে যেন মনে মনে আরাম পেলো স্বাতী। ক-দিন ধ'রে এমন হচ্ছে যে রোজই বিকেলের দিকে বৃষ্টি, বেড়াতে যাওয়া আর হয় না; ঘরে ব'সে-ব'সে সেই ইংরেজি বইগুলি পড়ে আর মাঝে-মাঝে চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকায়। আকাশে নীল মেঘ কালো, ছাইরং ছড়ালো, বৃষ্টি ঝমঝম, ঝমঝম। আলো কম, আরো ক'মে আসে, ম'রে যায়, আর পড়া যায় না, দেখা যায় না, বই খোলা, বই কোলে, ব'সে থাকে, ভাবে, আবছা, একলা, চুপ।

২

কঙ্কণ রাঙিন পথ

১

কী ভাবে স্বাতী? বৃষ্টিবিকেলে জানলাধারে ব'সে, ফিকেনীল শাড়িতে, পিঠে চুল ছড়িয়ে, ঠোঁটেমুখে জলছিটে নিতে-নিতে কী ভাবে সতেরো বছরের স্বাতী? কী?···কী আর ভাববে, সব ভাবনা ভেবে রেখেছে অন্যেরা, যে-সব ভাবনা ভাবা যায় ব'লেও সে ভাবেনি কোনোদিন। প্রথমে বাধো-বাধো, ঝাপসা; তারপর যখন খুলে গেলো—কিন্তু কোথায় চলেছে পথ, কী-ভীষণ ভয়ের অন্ধকারে, কোন লুকোনো, হাসিমুখের, সব-তলের পাতালে!···এ-রকম গল্পও আছে পৃথিবীতে! ছেলেবেলা থেকে গল্প তো সে কম পড়েনি—মাসিকপত্রের রাশি-রাশি গল্প, শরৎচন্দ্রের সব, রবীন্দ্রনাথের কত—কিন্তু এ-রকম! পড়তে পাগল-পাগল করে, আর লিখতে গিয়ে মানুষ পাগল হ'য়ে যায় না? হয় কি আর না—ঐ-তো মোপাসাঁ ব'লে একজন—বইতেই লেখা আছে—সত্যি নাকি পাগল হ'য়ে গিয়ে নিজের গলা কেটে মরেছিলো। আর সে-রকম যারা মরেনি, তারাও তা-ই; তবে অনেকেই সেটা লুকোতে পারে বোধ-হয়, কেউ-কেউ পারেই না।···লুকোবে? আর যেটা দপদপ ক'রে জ্বলছে এই শাদা-কালো পাতাগুলিতে—বইয়ের কাগজে-যে পুড়ে যায় না, সেটাই যেন আশ্চর্য লাগে। আশ্চর্য—কী ভীষণ, নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর—আর কী—কী সত্য কথা সব! এরা কি সব জানে, কী ক'রে জানে মানুষের মনের সব কথা, এ-সব তো মুখ ফুটে কেউ বলে না কখনো—বলবে কী, এ-সব কথা যে তারই মনের কথা, তা-ই তো

জানে না কোনো মানুষ, জানতে পারে না…যতক্ষণ-না এ-সব বই পড়ে। আমি-যে আমি, আমারও মনের কত কথা লিখে গেছে এরা —কত কেন, সব কথাই তো, যার কথাই লিখেছে সেই মানুষই যেন আমি—পড়তে লজ্জাই করে এক-এক সময়, কিন্তু সব মানুষই যদি আমি, তবে আর লজ্জা কার কাছে—আর লজ্জাই তো নয় শুধু, তার উল্টোটাও আছে—সেই উল্টোটাও তেমনি আশ্চর্য—আর, শুনতে যেটাই যেমন হোক না, ঠিক, ঠিকই তো এইরকমই তো। এতই ঠিক-ঠিক এইরকম যে আমার কথাই আমি জানবো না এদের মুখে না-শুনলে ;—আমি-যে কী, আমি-যে কেমন, আমি-যে কত মন্দ আর কত ভালো, তা নাকি কোনো জন্মে লিখে রেখেছে কোন দূর-দূর দেশের পাগলরা! আশ্চর্য!—কত আশ্চর্য সেটাও কুলিয়ে ওঠে না সতেরো বছরের স্বাতীর মেঘলা-ঘন ভাবায় : সব ভাবনা মুছে যায় ফিকে, ভিজে, আকাশজোড়া ঘোরবিকেলে।

এমনি এক বিকেলে স্বাতী নিচু হ'য়ে পড়ছিলো টলস্টয়ের নীতি-কথা, রাজেনবাবু আপিশ থেকে ফিরে ডাকলেন, 'স্বাতী।'

স্বাতী শুনতে পেলো না।

রাজেনবাবু কাছে এসে বললেন, 'এই বিকেলবেলায় আর বই কেন?'

স্বাতী চমকে তাকালো, বাবাকে দেখে হাসলো, উঠে দাঁড়ালো বইয়ের মধ্যে আঙুল দিয়ে।

'আজকাল তোকে যখনই দেখি, তখনই পড়ছিস। এত পড়া কি ভালো?'

'ভালো না বুঝি?'

'এ-সব বই—' স্বাতীর টেবিলটার দিকে একবার তাকালেন রাজেনবাবু—'বুঝিস তুই ?'

'কেন বুঝবো না—?' একটু লজ্জা-লজ্জা ধরনে স্বাতী জবাব দিলো।

'সব সময় পড়া কিন্তু ভালো না', রাজেনবাবু আবার বললেন।

'আর-কী করবো, বলো তো ?'

'কেন ?'—রাজেনবাবুর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হ'লো, যেন একেবারে নতুন একটা আবিষ্কার করলেন এক্ষুনি—'সংসারের কাজ-টাজ করতে পারো মাঝে-মাঝে।'

'ঠিক !' ডান হাতের তর্জনী তুলে স্বাতী দাঁড়ালো একটু, তারপরে সে-ও যেন মস্ত একটা আবিষ্কার ক'রে ফেললো হঠাৎ, 'বাবা, ভিজেছো !'

'কই' তেমন—'

'কী-যে তুমি—রোজ-রোজ তোমার ভেজাই চাই !—' নেচে উঠলো পিঠের উপর চুল, এক ছুটে নিয়ে এলো শুকনো জামাকাপড় ; 'চা আনছি এক্ষুনি', ব'লে দৌড় দিলো আবার।—কিন্তু চা খেতে-খেতেও হাতে রাখলো বই।

একে-একে চারখানাই শেষ হ'লো। ফেরৎ দিতে হবে, নতুন বইও চাই, কিন্তু—যেতে ইচ্ছে করে না, আবার কাউকে দিয়ে পাঠানো ভালো দেখাবে কি? এই দ্বিধা থেকে তাকে উদ্ধার করলেন সত্যেনবাবু নিজেই। হঠাৎ একদিন বেলা তিনটের সময় তিনি টোকা দিলেন রাজেনবাবুর দরজায়।

দরজা খুলে দিয়ে স্বাতী যেন তাকাতে পারলো না মুহূর্তের

জন্য। বৃষ্টির পরে দারুণ রোদ সেদিন। টুকটুকে লাল মুখে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছেন সত্যেনবাবু—হাতে এক পাঁজা বই অবশ্য আছেই।

'আপনি!'—স্বাতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

'তোমার জন্য বই আনলাম দু-খানা—'

'আসুন!'

ঘরে এসে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই স্বাতীর হাতে দু-খানা বই দিলেন সত্যেনবাবু। স্বাতী একবার তাকিয়ে আস্তে-আস্তে বললো, '"শানাই," "নবজাতক"। নতুন বই?' বলতে চেয়েছিলো যে নতুন-কেনা মনে হচ্ছে, কিন্তু সত্যেনবাবু জবাব দিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের নতুন-বই। কত ভাগ্য আমাদের এখনো রবীন্দ্রনাথের নতুন বই পাচ্ছি। কিন্তু যে-রকম শুনছি তাঁর শরীরের অবস্থা—'

'অসুখ?'

'সেবারের পর আর সামলে ওঠেননি ঠিক!'

কবে-যে রবীন্দ্রনাথের কী-অসুখ করেছিলো স্বাতী তা জানতো না, তাই একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'বসুন!'

হাতের বইগুলি পাশে রেখে সত্যেনবাবু এমন একটি শান্ত ভঙ্গিতে সোফায় বসলেন যেন ওখানেই কাটাবেন বাকি জীবন। জিগেস করলেন, 'ও-বইগুলো পড়লে?'

আবছা হাসলো স্বাতী। আবছা মাথা নাড়লো।

'হয়নি এখনো?'

স্বাতী তাড়াতাড়ি বললো, 'আপনার কি—'

'আমার কোনো দরকার নেই এক্ষুনি, কিন্তু তোমাকে তো আরো পড়তে হবে। এ-ই তো সময়।'

স্বাতী মাথা নিচু ক'রে আঁচলের প্রান্তটা জড়াতে লাগলো হাতের কব্জিতে।

'কেমন লাগলো তোমার ?'

স্বাতী চোখ তুললো একবার, বললো না কিছুই।

'ভালো লাগলো ?' সত্যেনবাবু আবার জিগেস করলেন।

এ-প্রশ্নের কি কোনো উত্তর আছে ?

তার মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনবাবু বললেন, 'আচ্ছা, আরো দেবো তোমাকে,' ব'লেই উঠে দাঁড়ালেন।

'যাচ্ছেন ?'

'যাই—'

'এক্ষুনি ?'

'বাড়ি গিয়ে একটু পরেই বেরোতে হবে আবার।'

জানলার দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'কী রোদ !'

'ঘরে ব'সে যতটা মনে হয় বেরিয়ে পড়লে আর ততটা লাগে না।—আচ্ছা !'

সত্যেনবাবু চ'লে যাবার পর স্বাতী বাইরের ঘরেই ব'সে রইলো।—একটু চা খেতে বললো না, একটু জল পর্যন্ত না—এই রোদ্দুরে কত যেন ক্লান্ত হ'য়ে এসেছিলেন। তা আর কী হবে—ও-রকম হঠাৎ চ'লে গেলে মানুষের কি আর মনে থাকে কিছু ! তবু নিজের এই ত্রুটিটা স্বাতীর মনে খোঁচা দিতে লাগলো অনেকক্ষণ ধ'রে। সেটা ভুলে যাবার জন্য "নবজাতক" খুলে বসলো, এখানে-ওখানে চোখ বুলিয়ে এলোমেলো পাতা ওল্টালো কয়েকবার, তারপর হঠাৎ অন্য কথা ভুলে গিয়ে পড়তে লাগলো কবিতা, একটির

পর একটি, শান্তি নামলো মনে; যে-সব গল্প এ-ক'দিন ধ'রে সে পড়ছিলো, তার আশ্চর্য পাগলামির পরে এ যেন এক আরো আশ্চর্য শান্তি; ঝড়, অন্ধকার আর অসহ্য বিদ্যুৎ থেকে বেরিয়ে সে যেন চ'লে এলো এমন এক দেশে যেখানে সব আলো, সব ভালো, সব সুন্দর। মনের আরামে চোখ বুজে এলো তার, নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লো, আর সঙ্গে-সঙ্গে মধুর একটি ঘুম মায়ের মতো তাকে কোলে তুলে নিলো।

বই ফেরৎ দিতে স্বাতী নিজেই গেলো দু-দিন পরে। এক আঙুলে আস্তে টোকা দিতেই দরজা খুলে তার মুখোমুখি দাঁড়ালেন সত্যেন রায়। একটু তাকিয়ে থেকে বললেন, 'এসো।'

ঘরে ঢুকে স্বাতী থমকে দাঁড়ালো। বেতের টেবিলে পা তুলে দিয়ে চেয়ারে এলিয়ে ব'সে আছেন একজন, দু-আঙুলে সিগারেট-ধরা একটি হাত চেয়ারের বাইরে ঝুলে পড়েছে, চোখ যেন আদ্ধেক বোজা। আরে! এঁকে তো চিনি, দেখেছি তো আগে! কে?··· কোথায়?···

'এসো!' সত্যেন রায় আবার অভ্যর্থনা জানালেন।

এগিয়ে এসে স্বাতী দেখলো, টীপয়ে দু-পেয়ালা আদ্ধেক-খাওয়া চা, আর মেঝেতে সিগারেটের টুকরো। এঁরা বেশ গল্প-টল্প করছিলেন, এর মধ্যে আমি—আগে জানলে কি আসতুম এ-সময়ে! অন্য ভদ্রলোকটি যেন এতক্ষণে জানলেন যে ঘরে আর-একজন এসেছে; কেমন ঝিমোনো অনিচ্ছুক চোখে একটু তাকিয়েই হঠাৎ সমস্তটা চোখ খুলে ফেললেন—যেন একটা ধাক্কা খেয়ে স্বাতী কাছের চেয়ারটায় ব'সে পড়লো, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মনে হ'লো

যে ইনি তো সেই বিখ্যাত ধ্রুব দত্ত, যাঁর নাম শুনেছিলো দাদার মুখে, আর দাদার নাটক দেখতে গিয়ে যাঁকে দেখে হতাশ হয়েছিলো।

'স্বাতী মিত্র—আমাদের কলেজের ছাত্রী : আর ইনি ধ্রুব দত্ত—কবি,' ব'লে সত্যেন রায় ছাত্রীর নাকের কাছে তোলা মস্ত দুখানা পায়ের দিকে তাকালেন।

ধ্রুব দত্ত পা নামিয়ে নিলেন, কিন্তু ও-রকম এলিয়েই ব'সে রইলেন চেয়ারে। স্বাতীর নরম নমস্কারের উত্তরে মাথাটা অস্পষ্টভাবে একটুখানি নেড়ে হাত বাড়িয়ে পেয়ালার বাকি চা-টুকু শেষ করলেন এক চুমুকে।

'তোমাকে একটু চা দিতে বলি?' ধ্রুব দত্তর অবহেলার ভঙ্গিটা সত্যেনবাবু ঢেকে দিতে চাইলেন ছাত্রীর দিকে একটু বেশি মন দিয়ে।

'না—আমি এক্ষুনি···আমি শুধু এই বইগুলো—'

'একটু বোসো। একটা কবিতা শোনো ধ্রুববাবুর।' টেবিল থেকে রোগা চেহারার একটি পত্রিকা তুলে নিলেন সত্যেন রায়, কবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি পড়ুন।'

'না, না, আমি পড়তে-টড়তে পারি না,' মোটা গলায় জবাব দিলেন কবি।

'পড়ুন না। এই মেয়েটি—ইনিও খুব কবিতা ভালোবাসেন।'

'নাকি?' পুরো চোখ খুলে ধ্রুব দত্ত আবার তাকালেন স্বাতীর দিকে। স্বাতী তাকিয়ে দেখলো, ভদ্রলোকের মুখের চেহারায় একটুও সুখ নেই, মোলায়েম কালো রঙের তলায় একটা অশান্তি

যেন ছটফট করছে সব সময়। সেই নাটকের রাত্তিরে ভালো ক'রে দেখতে পারেনি, আজ দেখলো, দেখে আরো খারাপ হ'য়ে গেলো মন। এই একজন কবি? কী জানি!

'কবিতাটা পড়ুন না,' আবার অনুরোধ করলেন সত্যেন রায়, কিন্তু সিগারেট মুখে তুলতে-তুলতে হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলেন ধ্রুব দত্ত।

'তাহ'লে আমিই পড়ি।' একবার কবির দিকে, একবার ছাত্রীর দিকে তাকিয়ে, আর দেরি না-ক'রে সত্যেন রায় পরিষ্কার গলায়, স্পষ্ট উচ্চারণে সেই পত্রিকার কবিতাটি পড়লেন। পড়ার শেষে জ্বলজ্বলে মুখে বললেন, 'খুব ভালো হয়েছে সত্যি!'

ধ্রুব দত্ত ঠোঁট বাঁকালেন একটু, কিন্তু ওতেই বোঝা গেলো যে তিনি খুশি হয়েছেন।

'তোমার কেমন লাগলো?' প্রোফেসর ফিরলেন ছাত্রীর দিকে।

'ভালো।'—পড়াটা খুব ভালো লেগেছিলো স্বাতীর, কিন্তু কবিতাটার ভালো-মন্দ কিছু বোঝেনি, সেইজন্য কথাটায় খুব বেশি উৎসাহ আনতে পারলো না। হঠাৎ ধ্রুব দত্ত সারা মুখ ভ'রে হেসে ফেললেন, কেমন-একটু মজার ধরনে নাক কুঁচকে বললেন, 'নিজের লেখা সম্বন্ধে ঐ "ভালো" কথাটা শুনলেই আমার যেন পায়ের তলায় শুড়শুড়ি লাগে।—চলি।' লম্বা শরীরটাকে কয়েকটা ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে সোজা ক'রে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, বিদায়ের একেবারেই কোনো ঘটা না-ক'রে বেঁকে-বেঁকে হেঁটে বেরিয়ে গেলেন দরজা দিয়ে। ঘরে হঠাৎ যেন একটা শান্তি নামলো; অনেকক্ষণ চলবার পর রেডিও বন্ধ হ'লে যেমন লাগে, ঠিক সেইরকম।

স্বাতীর অপ্রস্তুত লাগলো। চ'টে গেলেন ধ্রুব দত্ত? আমি কি খুবই বোকার মতো বলেছিলাম 'ভালো'টা? সত্যি, আমি একটা মানুষ, আমার আবার একটা ভালো লাগা! কিন্তু আমার কী দোষ, সত্যেনবাবুই তো—

'প্রথম দেখলে', সত্যেন রায় এতক্ষণে রোগা চেহারার পত্রিকাটিকে হাত থেকে নামালেন, 'ধ্রুববাবুকে একটু কেমন-কেমন লাগে, কিন্তু—সত্যিকার কবি!'

স্বাতী আর কথা বলার উৎসাহ পেলো না।

'হঠাৎ উঠে দুম্ ক'রে চলে গেলেন!' যেন আপন মনেই সত্যেন রায় বললেন আবার। 'আমার সঙ্গেও আলাপ আজই প্রথম।'

'আজই প্রথম!' স্বাতী অবাক হ'য়ে তাকালো। 'যে-রকম ক'রে ব'সে ছিলেন', মনের কথাটা আর লুকোতে পারলো না সে, 'আমি ভেবেছিলুম আপনার কতকালের বন্ধু!'

বসবার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে সত্যেন রায় বললেন, 'তবে কি ভাবছিলে আমার বন্ধু ব'লেই প্রশংসা করছিলাম? অবশ্য বন্ধু হ'লেও প্রশংসা আমাকে করতেই হ'তো—এমনকি শত্রু হ'লেও।'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী বললো, 'যাঁরা ভালো লেখেন তাঁদের সকলের সঙ্গেই বুঝি আপনার আলাপ?'

'সকলের সঙ্গে আর কোথায়', সত্যেন রায় একটু-যেন লজ্জিত হলেন স্বাতীর প্রশ্নে। 'তবে এঁর—এঁর বইয়ের একটা সমালোচনা লিখেছিলাম আমি, সেইটে প'ড়ে—'

'নিজের প্রশংসা প'ড়ে আর টিকতে পারলেন না?'

ছাত্রীর সরল হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে অধ্যাপকের নিজেরও হাসি পেলো। কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে বললেন, 'প্রশংসা শুনতে-যে ভালো লাগে, সেটাই ওঁর ভালো লাগে না। ঠিক শিল্পীর স্বভাব!'

'যারা বই লেখে তাদের চাইতে যারা বই পড়ে তারাই কিন্তু ভালো,' স্বাতী হেসে ফেললো কথাটা ব'লে।

'লেখকের চাইতে লেখকের বই অনেক সময় ভালো হয় বটে,' সত্যেন রায় একটু ভেবে বললেন। 'কিন্তু ধ্রুব দত্তর চোখ-মুখ কী অসাধারণ!'

'নাকি?' মনে-মনে বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবকে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে স্বাতী বললো, 'কিন্তু উনি তো—বুড়ো!'

সত্যেন রায় হেসে বললেন, 'তোমার বয়সে অনেককেই বুড়ো লাগে, আমার বয়সে অনেককেই লাগে না।'

স্বাতীর মুখে এলো, 'আহা—আপনার আবার বয়স!' কিন্তু এ-রকম সুরে কি প্রোফেসরের সঙ্গে কথা বলা যায়? তাই সে বললো, 'আপনার তো অনেক বড়ো উনি।'

'তাই ব'লে বুড়ো নাকি!' একটু পরে আবার বললেন, 'কবিদের বুড়ো হওয়া বুঝি ভালো লাগে না তোমার?'

'কারোরই লাগে না,' স্বাতী স্বীকার করলো।

'রবীন্দ্রনাথকে দেখে তোমার কী মনে হয়?'

'দেখিনি কখনো।'

'রবীন্দ্রনাথকে ছাখোনি! কলকাতায় আছো, এত বড়ো হয়েছো, রবীন্দ্রনাথকে ছাখোনি!'

স্বাতী মাথা নিচু ক'রে অপরাধ মেনে নিলো।

সত্যেন রায় হঠাৎ হেসে বললেন, 'এমন ক'রে বলছি যেন তোমার দোষ। সকলের কি আর সুযোগ হয়—আর মেয়েদের অসুবিধে কত। মা-কে ব'লে শান্তিনিকেতনে যাও না একবার।'

স্বাতী বললো, 'আমার মা নেই।'

মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে সত্যেনবাবু বললেন, 'মা নেই।···তা বাবা তো আছেন—আর এমন চমৎকার বাবা!'

মনে-মনে একটু চিন্তা ক'রে, অনেকটা সাহস ক'রে স্বাতী এতক্ষণে একটা ঘরোয়া প্রশ্ন করলো: 'আপনার মা-বাবা এখানে থাকেন না?'

'আমার মা-ও নেই, বাবাও নেই,' ক্ষীণ একটু হাসলেন সত্যেনবাবু।

স্বাতী অবাক হ'লো কথা শুনে।—কিন্তু অবাক হবার কী, এ-রকম কত লোকই তো আছে পৃথিবীতে। কিন্তু বাবাও নেই! তার বাবাও কি থাকবেন না একদিন?

মুহূর্তের জন্য স্বাতী যেন নিশ্বাস নিতে পারলো না। একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে, একটু সোজা হ'য়ে, যেন নিজের মধ্যে ফিরে এসে জিগেস করলো, 'ভাই-বোন?'

সত্যেনবাবু মাথা নাড়লেন।

'তাও নেই?···একজনও না?···আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য বুঝি?'

স্বাতী কথা বললো না। হঠাৎ মনটা কেমন খারাপ হ'য়ে গেলো তার। এ-বাড়িতে যদি একজন মা থাকতো এখন, কত

ভালো লাগতো। নিজের রুগ্ন মা-র স্মৃতিকে মনে-মনে সাজিয়ে দাঁড় করালো এই ঘরে, দেখলো তাঁর হাসি, শুনলো তাঁর কথা, আর ছায়া-ভরা ঘরে চুপচাপ ব'সে-ব'সে তার যেন মনে হ'তে লাগলো যে-মার কথা সে ভাবছে, সে-মা আর কেউ নয়, সে নিজেই।

উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিলেন সত্যেনবাবু।—'এবারে কী-কী বই নেবে বলো।' উত্তরের অপেক্ষা না-ক'রে নিজেই বেছে-বেছে নামালেন কয়েকখানা ইংরেজি বই, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, 'ধ্রুব দত্তর কবিতা পড়বে নাকি?'

নিজের অজান্তেই একটু কুঁচকে গেলো স্বাতীর কপাল। ঐ এক পেয়ে বসেছেন! সত্যেনবাবুর মুখে একটু যা চেখেছিলো, তাতে ধ্রুব দত্তর কবিতা সম্বন্ধে খুব একটা খিদে চেতিয়ে ওঠেনি তার; তাই কোনো জবাব দিলো না।

'প্রথমেই ভালো লাগবে না হয়তো,' সত্যেনবাবু মুখ দেখে মনের কথাটা বুঝে নিলেন, 'তাই ব'লে যদি ছেড়ে দাও তাহ'লে কিন্তু ঠকবে। ছাখো প'ড়ে!'

স্বাতী উঠে দাঁড়িয়ে বই ক-খানা হাতে নিলো।—'আমি তাহ'লে যাই?'

'খুব ভালো লাগলো আজ বিকেলবেলাটা', স্বাতীর সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে সত্যেনবাবু বললেন। স্বাতী ভেবেছিলো তিনি রাস্তা পর্যন্ত আসবেন, কিন্তু দরজার কাছেই থামলেন, একটু দাঁড়িয়ে থেকেই চ'লে গেলেন ভিতরে।—খুব ভালো লাগলো বিকেলবেলাটা, স্বাতীর মনের মধ্যে বাজতে লাগলো। কেন? বোধহয় ধ্রুব দত্তর জন্য?

রান্নাঘরের দিক দিয়ে বাড়ি ঢুকলো স্বাতী, ঢুকেই দাদার সঙ্গে দেখা। খাবার টেবিলে ব'সে চা খাচ্ছে বিজন, আর সেই সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা অমলেট।

—'দাদা! তুই এ-সময়ে বাড়িতে?'

'কেন, থাকতে নেই একদিনও?'

টেবিলের উপর বইয়ের বোঝা নামিয়ে স্বাতী বসলো দাদার মুখোমুখি, হাত দিয়ে কপালের চুল সরিয়ে বললো, 'সে-কথা আমরাই জিগেস করতে পারি তোকে।'

চামচে দিয়ে অমলেট কেটে নিয়ে মুখে দিলো বিজন, আর বাঁ হাতে কামড়ে ছিঁড়ে নিলে খানিকটা কাঁচা রুটি। চিবোতে-চিবোতে ফোলা-ফোলা গালে একটু হেসে বললো, 'বাড়ির কী খবর-টবর বল।'

'তুই আজকাল কী করছিস বল তো সত্যি ক'রে!' স্বাতী ভুরু কুঁচকে তাকালো দাদার দিকে।

'একেবারে সত্যি কথাটাই শুনবি?' বিজন গলা ভিজিয়ে নিলো চায়ের পেয়ালায়।—'তোর প্রোফেসর কেমন আছেন?'

'প্রোফেসর?' তখনকার মতো স্বাতী যেন ভুলেই গিয়েছিলো যে সত্যেন রায় তার প্রোফেসর।

'ঐ যে—বাবা যাকে আমার টেবলফ্যানটা পাঠিয়ে দিলেন।'

'তোর ঘরে তো সীলিং ফ্যানই আছে আজকাল।'

'তবু—পাখাটা আমার জন্যই এসেছিলো, অন্য কাউকে দেবার আগে আমাকে জিগেস অন্তত করা উচিত ছিলো একবার।'

একটা কড়া জবাব এসেছিলো স্বাতীর মুখে, কিন্তু সেটা বলতে গেলেই ঝগড়া হবে, আর ঝগড়া হ'লে দাদার আর কী—বেরিয়ে

গেলেই নিশ্চিন্ত—তারই মন-খারাপ হ'য়ে থাকবে দু-দিন ধ'রে। তাই একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী অন্য কথা পাড়লো, 'তোর ধ্রুব দত্তর সঙ্গে দেখা হ'লো এইমাত্র।'

'লেখক ধ্রুব দত্ত? ওর নামও আর মুখে আনিস না আমার কাছে।'

'সে কী!' স্বাতীর চোখ কপালে। 'এই না তুই ধ্রুব দত্ত বলতে পাগল!'

'তা পাগল প্রায় হয়েছিলাম ওর পাল্লায় প'ড়ে!' বিজন হ্যা-হ্যা ক'রে হাসলো। আমাকে বললো থিয়েটারের পাশ দেবে—বাড়ি যেতে বললো—তা যেদিনই বাড়ি যাই সেদিনই বাড়ি নেই! বাড়িতে কখনো না-ই যদি থাকবে, তাহ'লে বাড়ি একটা রাখা কেন বাপু!—অভদ্র!'

ধ্রুব দত্তর টেবিলে-তোলা পা দুটোর কথা মনে ক'রে দাদার শেষ মন্তব্যে সায় দিতে লোভ হ'লো স্বাতীর, কিন্তু পাছে ওতে দাদার বড্ড আশকারা হয়, তাই একটু হেসে বললো, 'ধ্রুব দত্তর চেয়ে তোর বুদ্ধি একটু বেশি, দাদা; বাড়িতে কাউকে আসতেই বলিস না কখনো।'

বিজন কথা না-ব'লে মুখ নিচু করে রুটি-অমলেট শেষ করলো। ট্রেন-বদলের আগে লোকেরা যেমন খিদের মুখে রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে খেয়ে নেয়, সেই রকম ক'রে খেলো সে, দ্রুতবেগে, আদ্ধেক চিবিয়ে কোনোদিকে না-তাকিয়ে। শূন্য প্লেটটা ঠেলে দিয়ে চায়ের পেয়ালা কাছে এনে মুখ মুছলো রুমালে, তারপর স্বাতীর কথার জবাব দিলো; 'আমার সঙ্গে নাকি ধ্রুব দত্তর তুলনা! আমি হলাম

দু-বার ম্যাট্রিক-ফেল-করা ভ্যাগাবণ্ড, আর উনি একজন বিখ্যাত মানুষ; বিবাহিত ভদ্রলোক, ছেলে-পুলে চারটা-পাঁচটা; ওঁর কথার একটা ওজন থাকা চাই তো!—বাজে, বাজে সব!'

'সত্যেন রায় তো বলেন উনি কবিতা লেখেন খুব ভালো।'

'তা যত খুশি লিখতে পারেন, তাতে আমার কিছু না।'

'তোরই বা পাশ চাইতে যাবার কী হয়েছিলো!'

'বাঃ, উনিই তো উৎসাহ ক'রে—যাক, যাক, তুই তোর প্রোফেসর আর সাহিত্যিকদের নিয়ে থাক, স্বাতী; আমি ও-সবের মধ্যে নেই! বিদ্যের পিপে তো সব—কিন্তু টাকার মুখ ছাখে কখনো! ও-রকম বিদ্যে দিয়ে লাভ কী, বল, আজকালকার দিনে!'

পিঠ খাড়া ক'রে ব'সে টেবিলের উপর দু-কনুই রাখলো স্বাতী। আঙুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে বললো, 'তোর থিয়েটর আবার কবে?'

'জানিস না বুঝি?' ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বিজন একবার চোরা হাসি হাসলো। 'ছেড়ে দিয়েছি ও-সব।'

এত বড়ো একটা খবরে একটুও চঞ্চল না-হ'য়ে দু-হাতের জড়ানো আঙুলের মাঝখানটায় থুতনি রেখে স্বাতী বললো, 'এখন তাহ'লে? ফিল্ম?'

'ফিল্মে তো ঢুকতে পারি ইচ্ছে করলেই, কিন্তু—'

'আর কিন্তু কেন?'

নিচু-করা চোখে বোনের দিকে তাকিয়ে বিজন বললো, 'হেসে নে, হেসে নে, বেশিদিন হাসবি না।'

'তা বেশ তো, ফিল্মেই ঢুকে পড়,' স্বাতী হাসির রেখা মুছে ফেললো মুখ থেকে।

'নাঃ, আমি বিজনেস করবো।'

'কী করবি ?'

'বিজনেস।' গম্ভীর, সশ্রদ্ধভাবে বিজন উচ্চারণ করলো কথাটা।

'বিজন্স বিজনেস !' স্বাতী আর পারলো না, হাত ছড়িয়ে দিয়ে হেসে উঠলো খিলখিল করে।

বিজনও হাসলো সঙ্গে-সঙ্গে, একেবারেই অপ্রত্যাশিত সেটা।—'সব ঠিক ক'রে ফেলেছি। বি-জন নাম হবে কোম্পানির—ইংরিজি B. John, বুঝলি না ?—কেমন ভেবেছি, বল তো ?'

'আর কদ্দূর ভেবেছিস ?'

'দেখবি !—শোন, স্বাতী,' হঠাৎ বোনের দিকে গলা বাড়িয়ে বিজন নিচু গলায় বললো, 'বাবাকে বল না আমাকে হাজার দু-তিন টাকা দিতে। তাহ'লেই লেগে যেতে পারি এক্ষুনি।'

'তোরই বলা উচিত না ?'

'নিশ্চয়ই ! কিন্তু উচিতটা কি সব সময় হয় রে ? সংসারে বাবাদের যে-রকম হওয়া উচিত—'

'দাদা !' স্বাতীর কণ্ঠে যুদ্ধ-ঘোষণা।

'থাক, থাক,' বিজন বীরদর্পে উঠে পড়লো চেয়ার ছেড়ে। 'তোর বক্তৃতা শোনার সময় নেই আমার। তোকে বলতে হবে না—যা করবার আমিই করবো।' দরজার ধার থেকে মুখ ফিরিয়ে আবার বললো, 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, তোদের বাবা তাঁর একমাত্র পুত্রকে মানুষের মধ্যেই গণ্য করেন না। তা তোরা না দিস,

যে ক'রে হোক যোগাড় ক'রে নেবো। টাকা আমার চাই!' শেষের কথাটা চীৎকার ক'রে বেগে বেরিয়ে গেলো বিজন, দেয়ালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডরটা দুলে উঠলো ধাক্কা লেগে।

একে-একে ক্যালেণ্ডর থেকে খ'সে পড়লো জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বরের পাতা, বেরিয়ে পড়লো লাল তারিখ ভরা অক্টোবর। ছুটি!—কিন্তু তাতে আলাদা ক'রে আনন্দ করবার কী আছে? আনন্দে ভ'রে গেছে স্বাতীর দিন-রাত্রি, তার ঘুমের স্বপ্ন, প্রতিটি জেগে-থাকা মুহূর্ত; নতুন একটা জগৎ পেয়েছে সে, সাহিত্যের জগৎ, দেশ, দৃশ্য, মানুষ; কত হাসির হাওয়া, কান্নার কাঁপন; কত মধুর, নিষ্ঠুর, ভীষণ, সুন্দর বর্ণনা—লজ্জা করে, ভয় করে, বিশ্রী লাগে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত আনন্দ, শুধু আনন্দ। জীবনে এত আছে? কী ভাগ্য সত্যেন রায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো, নয়তো কোথায় পেতো এ-সব, এ-আনন্দ জানতো কী ক'রে?

এত আনন্দ কি একা-একা সহ্য হয়? আর-একজন না-হ'লে চলে? একদিন ছোড়দি এসে তার টেবিলের বইগুলি নেড়ে-চেড়ে দেখছিলো, সুযোগ পেয়ে স্বাতী জিগেস করলো, 'ছোড়দি, তুমি গোগোল পড়েছো?'

'গোগোল!' শাশ্বতী হেসে উঠলো মজার নাম শুনে। 'গোগোল কেন—গোল-গোল হ'লেই পারতো!' মলাট খুলে বললো, 'কে রে এই সত্যেন রায়? অনেক বই এনেছিস!'

'চেনো না তুমি? আমাদের কলেজেই তো প্রোফেসর।'

'সত্যেন রায় ?' শাশ্বতী ভুরু বাঁকালো। 'কী জানি—আমাদের সময় তো ছিলো না, নতুন বোধহয়। অনেক বই বুঝি তাঁর ?'

'অনেক। আর কী ভালো-ভালো সব বই! ছোড়দি—তুমি যদি এটা প'ড়ে ছাখো, এই ওভরকোটের গল্পটা—উঃ!'

পাতা উল্টিয়ে লম্বা-লম্বা ব্যঞ্জনবহুল নাম দেখেই শাশ্বতী বই বন্ধ করলো।

'নেবে, ছোড়দি ?' মিনতি করলো স্বাতী। 'কী-যে অদ্ভুত—'

শাশ্বতী মাথা নাড়লো। '—বাংলা বই নেই ভদ্রলোকের ?'

'কত চাও! কবিতার বই সমস্ত—'

'কবিতা আবার কে পড়ে! গল্পের বই নেই ? নভেল ? তোর হারীতদা আবার বাংলা বই পড়েন না, আর ইংরিজি যা পড়েন—'

'তা কিনে নিলেই পারো বাংলা বই।'

'হ্যাঃ—বই কিনে পয়সা নষ্ট করি আরকি!' দামি শাড়ি ঝলমলিয়ে শাশ্বতী চ'লে গেলো ঘর থেকে।

এর পর স্বাতী একদিন চেষ্টা করলো হারীতদাকে। সেদিন সে শেষ করেছে অস্কার ওআইল্ডের উপন্যাস। লক্ষ টাকা দামের মণিমুক্তোর মতো কথাগুলি সাজানো, যেন রঙের ঝিলিক লাগে চোখে, যেন এক-একটি কথাকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে হাতে ধরা যায়। তীব্র একটা নেশায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ছিলো সে: খুব নিচু গলায়, যেন অত্যন্ত গোপন কিছু বলছে, এইরকম সুরে বললো, 'হারীতদা, আপনি পিকচর অব ডরিআন গ্রে পড়েছেন ?'

'ওআইল্ড!' হা-হা ক'রে হেসে উঠল হারীত। 'এস্কেপিস্টের বাদশা! রোমান্টিসিজম-এর পচা মাল! ওআইল্ড পড়ছো! এদিকে সর্বনাশ যে ঘনিয়ে এলো!'

স্বাতী অবাক হ'লো, আঘাত পেলো, তাকিয়ে রইলো। তবে কি এ-সব ভালো লাগা উচিত না? কিন্তু ভালো লাগার আবার উচিত-অনুচিত আছে নাকি? কী জানি!

অগত্যা দাদার পিছনেই ঘোরাঘুরি করলো স্বাতী। বিজন মাঝে-মাঝে দুপুরবেলাটা বাড়িতে কাটায়, খেয়ে-দেয়ে লম্বা ঘুম দিয়ে বেরিয়ে যায় বাবা আপিশ থেকে ফেরবার ঠিক আগেই।—'বই পড়বি, দাদা, গল্পের বই?'

'কী-বই রে?'

'খুব, খু—ব ভালো বই, ছাখ!' সেই ডরিআন গ্রের গল্পটাই দাদার হাতে দিলো স্বাতী। নিজেকে বড়ো স্বার্থপর লাগে এক-এক সময়—আহা, দাদাও পড়ুক।

বইটার দিকে তাকিয়ে বিজন বললো, 'থাক—পরে পড়বো।' সিগারেট ধরিয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়, বালিশের তলা থেকে বের করলো একটা রঙচঙে বই, মলাটে কালো মুখোশ-পরা দুষমনের দিকে পিস্তল উঁচিয়ে আছে বুক-খোলা জামায় শ্বেতাঙ্গিনী।

'এ-সব বাজে বই পড়িস কেন, দাদা?'

'বাজে! হুঁঃ!' ঠোঁট গোল ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া বের করলো বিজন। 'জানিস না তো, স্পোকন ইংলিশ শিখছি। ওঃ, চোস্ত! কথায়-কথায় ড্যাম!' একটু পরে আবার বললো, 'বিজনেস করতে হ'লে ইংরেজিটা বলতে পারা চাই—বুঝলি না?'

স্বাতী বুঝলো, আস্তে উঠে গেলো তার ভালো-লাগার ভার একলা বহন ক'রে।

দোলের দিনে ছোটো ছেলে যেমন আর-কাউকে বাগাতে না-পেরে ঘরে এসে মা-র পিঠেই রঙের শিশি খালি করে, স্বাতীও সেইরকম বাবাকেই ধ'রে পড়লো একদিন।

—'জানো বাবা, সত্যেনবাবু যে-সব বই পড়তে দেন না আমাকে—কী-যে ভালো-ভালো বই!'

'হবেই! যেমন মানুষ, তেমন তো পছন্দ!'

'তুমি তো বলো আমি দিন-রাত কেবল বই পড়ি, কিন্তু তুমি আরম্ভ করলেও আর ছাড়তে পারবে না।'

'তাহ'লে আমার তো আরম্ভ না-করাই ভালো—আপিশ-টাপিশ আছে তো আবার।'

স্বাতী হেসে বললো, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে গল্পগুলো বলবো। শুনবে, বাবা?'

'বেশ!' রাজেনবাবু তৎক্ষণাৎ রাজী।

'এখন শুনবে?'

'এখন? রাত্তিরে খেয়ে-দেয়েই তো ভালো।—আচ্ছা স্বাতী, সত্যেন তো এত বই দেয় তোমাকে, তোমারও তো ওকে কিছু দেয়া উচিত।'

'ও মা, আমি আবার কী দেবো!'

'নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে পারো মাঝে-মাঝে, ভালো রান্না-টান্না হ'লে পাঠিয়েও দিতে পারো—'

'আমি ও-সব পারবো-টারবো না।'

'পারবো না বললেই তো আর হ'লো না। এখন বড়ো হয়েছো—সবই করতে হবে।'

স্বাতী মুখ তুলে শুধু মাথা নাড়লো উত্তরে।

'আচ্ছা, পুজোর সময় আমিই ব'লে আসবো একদিন। শ্বেতাও এসে পড়বে তদ্দিনে।' খুশির আভা লাগলো রাজেনবাবুর মুখে।

'বড়দি সত্যি আসবে ?'

'লিখেছে তো', রাজেনবাবুর মুখ খুশিতে জ্বলজ্বলে হ'লো।

কিন্তু ছুটি হবার সঙ্গে-সঙ্গে সত্যেনবাবু চ'লে গেলেন কোথায়-যেন বাইরে, আর পুজোর ক'টা দিন দেশের বাড়িতে কাটিয়ে দশমীর দু-দিন পরে শ্বেতা এসে পৌঁছলো স্বামী, চারটি ছেলে-মেয়ে, একটি চাকর আর বিস্তর মালপত্র নিয়ে। এসেই হোল্ডলে বাঁধা মস্ত বিছানা নিজেই টেনে-টুনে খুলে ফেললো, বের ক'রে দিলো এক বাণ্ডিল পুজোর কাপড়, আর বিস্কুটের টিনে-টিনে ভরা ক্ষীরের আর নারকোলের রকমারি খাবার। এক প্লেট ভরতি ক'রে সাজিয়ে স্বাতীর সামনে ধ'রে বললো, 'খা।'

'ও মা! এত!'

'এত কী রে? আমার ওরা তো এ-রকম চার থালা—বাব্বাঃ, বিছানার মধ্যে যা ক'রে লুকিয়ে এনেছি, রাক্ষসরা টের পেলে কি আর রক্ষে ছিলো, পথেই সাবাড় ক'রে দিতো!' আরো দু-প্লেট সাজাতে-সাজাতে বললো, 'আয় বিজু। বাবা?'

রাজেনবাবু হেসে বললেন, 'তুই হচ্ছিস কী রে দিন-দিন? এই তো বাড়িতে পা দিলি!'

'নষ্ট হয়নি তো আবার?' উদ্বেগ ফুটলো শ্বেতার কণ্ঠে, একটা

তুলে নাকের কাছে ধ'রে দু-তিনবার নিশ্বাস নিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো—'না, ঠিক আছে।—কী?' নিজের বাচ্চাদের সে তাড়া করলো এবার। 'এখানে ঘুর-ঘুর কেন? আচ্ছা, নে একটা-একটা—আর কিন্তু না—ভাগ! স্বাতী খাচ্ছিস না?'

'চা হোক।'

'আচ্ছা আচ্ছা, চায়ের সঙ্গে আবার খাবি, এখন এইটে—' বেছে-বেছে একটা মৎস্যাকৃতি মিষ্টি তুলে শ্বেতা গুঁজে দিলো স্বাতীর মুখে।

'আঃ, বড়দি!'

'কেমন, ভালো না?'

সমস্ত মুখে এলাচগন্ধী নরম নারকোলের ছড়িয়ে-পড়া অনুভব করতে-করতে স্বাতী হেসে ফেললো।

'এই ক্ষীরেরটা—বিজু, তুই আর—এই যে,' স্বামীকে দেখতে পেয়ে শ্বেতা আচল তুলে দিলো মাথায়—'তুমিও একটা খাবে নাকি?'

'তোর পাল্লায় পড়লে কি আর রক্ষে আছে?' রাজেনবাবু হাসলেন।

'আর বলেন কেন?' গালের চর্বির ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ফুটিয়ে প্রমথেশ বললো, 'ব্লাড-প্রেসার বেড়ে যাচ্ছে, তার উপর আপনার মেয়ে—'

'আহা—' স্বামীর আর বাবার মাঝামাঝি তাকিয়ে শ্বেতা বললো, 'ইচ্ছে না-থাকলে কেউ যেন জোর ক'রে খাওয়াতে পারে!'

রাজেনবাবু বললেন, 'সক্কলে তো খেলো—তুই ?'

শ্বেতা যেন শিউরে উঠে বললো, 'রক্ষে করো ! এ-সব খেতে-খেতে প'চে গেছে মুখ ! আমার জন্য ডিম-সন্দেশ এনো—আর শোনপাপড়ি—আর কলে-ঠাণ্ডা দই ।'

'বেশ !' রাজেনবাবু উঠে পড়লেন।

'বাবা, চা—'

'চা আর খাবো না এখন।' আর দেরি না-ক'রে রাজেনবাবু চললেন ট্র্যামে ক'রে জগুবাবুর বাজারে। একটু পরেই শাশ্বতী আর হারীত এসে পৌঁছলো ; নতুন ক'রে রোল উঠলো আনন্দের।

চা হ'তে-হ'তে শ্বেতা এলো হাত-মুখ ধুয়ে পরিষ্কার একটি শাড়ি প'রে, কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুর, আঁচলে চাবির গোছা। যদিও পাঁচটি সন্তানের মা, একটু ভাঙেনি তার শরীর, একটু মোটা হয়নি, ঈষৎ ম্লান রঙের মুখখানা যেন লাবণ্য দিয়ে বানানো। স্বাতী দেখে মুগ্ধ।

বসন্তের সকালে পাখি যেমন নেচে-নেচে বেড়ায়, চায়ের টেবিলে শ্বেতার ভাবটা যেন তেমনি। একবার শাশ্বতীকে জড়িয়ে ধরে, একবার হাত রাখে বিজুর টেড়ি-কাটা মাথায়, একবার কোনো-একটা সেকেলে চিরকেলে ঠাট্টা করে হারীতকে। জনে-জনে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে-দিতে স্বাতীর কাছে এসে হঠাৎ একটু থেমে বললো, 'স্বাতী ! তুই বড়ো সুন্দর হয়েছিস রে !'

'আর তুমি !' লাজুক হেসে স্বাতী জবাব দিলো, 'তুমি-যে দিন-দিন আরো সুন্দর হচ্ছো !'

'শোনো কথা !' স্বাতীর প্রকাণ্ড খোঁপাটার উপর দিয়ে শ্বেতার

হাত ঘুরে এলো একবার—'এ-রকম চুলই তো আজকাল দেখি না কোনো মেয়ের!'

নিজের ছোটোখাটো খোঁপাটা আস্তে একটু চাপড়ে শাশ্বতী বললো, 'জানো বড়দি, লম্বা চুল আজকাল আর ফ্যাশনেবল নয়।'

'নাকি রে? তাহ'লে আমার আর দুঃখ কী। আমারও ছিলো তো মন্দ না, কিন্তু যেতে-যেতে এখন—এই দ্যাখ! শেয়ালের ল্যাজ।'

তার কথা শুনে, তার হাসি দেখে, সকলেই হেসে উঠলো একসঙ্গে।

'মেয়েদের চুল আর ক-দিন!' হঠাৎ গম্ভীর গলায় ব'লে উঠলো বিজন, 'যদ্দিন না বিয়ে হয়। বিয়ের পরে একটি-দুটি ছেলেপুলে হ'লেই—ব্যস!' কথাটা সে শুনেছিলো অনেকদিন আগে ধ্রুব দত্তর মুখে, বাড়ির এতগুলি লোকের সামনে এমন লাগসই জায়গায় বলতে পেরে কী-যে খুশি লাগলো।

ধ্রুব দত্ত যখন বলেছিলেন, শ্রোতারা অনেকেই হেসেছিলো, কিন্তু বিজনের শ্রোতারা একটু-যেন গম্ভীরই হ'য়ে গেলো, শুধু প্রমথেশ ব'লে উঠলো, 'ঠিক! ঠিক বলেছো, বিজু! একেবারে খাঁটি কথা!'

শাশ্বতী ন'ড়ে-চ'ড়ে বললো, 'ছেলেমানুষের মুখে বুড়ো কথা কী বিশ্রী!'

'আর কতকাল ছেলেমানুষ ক'রে রাখবি তোরা। মস্ত বাবু হ'লো না?' শ্বেতা একটু হাসলো ভাইয়ের দিকে। 'বিজু, আর চা?'

বয়স্ক মোটা গলায় বিজন জবাব দিলো, 'না, আর না। তোমরা বোসো, বড়দি।' আর কারো দিকে না তাকিয়ে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লো তাড়াতাড়ি। তথাকথিত গুরুজনদের মধ্যে ব'সে থাকা আর সম্ভবও ছিলো না তার পক্ষে: সিগারেটের জন্য আইঢাই করছিলো প্রাণ।

'হারীত, তোমাকে আর?'

'দিন আর-একটু—' হারীত তার পেয়ালাটি ঠেলে দিলো শ্বেতার দিকে।

স্বাতী বললো, 'তুমি এবার বোসো তো বড়দি। খাও!'

'এই বসি', হারীতের পেয়ালা দ্বিতীয়বার ভ'রে দিয়ে শ্বেতা বসলো বিজুর পরিত্যক্ত চেয়ারে, শাশ্বতীর আর হারীতের মাঝখানে। 'দে তো শাশ্বতী, আমাকে একটু চা দে। চিনি বেশি কিন্তু।'

'ক-চামচে?' খুব পরিচ্ছন্ন, নিপুণ, নিখুঁত ভঙ্গিতে চিনির বাটিতে চামচে ডুবিয়ে শাশ্বতী চোখ তুললো।

'তিন।' একটু হেসে শ্বেতা জুড়ে দিলো, 'চারেও আপত্তি নেই।—এ কী রে?' হঠাৎ শাশ্বতীর চামচে-ধরা ডান হাতের কব্জিটা দু-আঙুলে চেপে ধরলো শ্বেতা। 'শাঁখা কই?'

শাশ্বতী জবাব দিলো না, নিচু মুখে চা ঢেলে দিয়ে ব'সে পড়লো।

'বিয়ের শাঁখা ভেঙে গেছে বুঝি? তা পরতে হয় তো আবার!'

ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটিয়ে হারীত বললো, 'ও-সব দাসীত্বের চিহ্ন ধারণ ক'রে আর কী হবে।'

'দাসীত্ব? আহা রে—' শ্বেতা কনুই দিয়ে ঠেলা দিলো শাশ্বতীকে। 'কী রে? দাসীত্ব নাকি?'

কিন্তু শাশ্বতী হাসলো না, মুখ তুললো না। এই শাঁখা নিয়ে একটা দুঃখের খোঁচা আছে তার মনে। শাঁখার বিরুদ্ধে হারীতের জেহাদ বিয়ের প্রথম থেকেই। 'অসভ্য', 'বর্বর', 'মিডিআভল', এ-সব বিশেষণ শেষ ক'রে হারীত বললো, 'ঐ শাঁখা-সিঁদুর-পরা মূর্তি নিয়ে বেরোতে লজ্জা করে আমার!' শাশ্বতীও রাগ ক'রে জবাব দিলো, 'বেশ তো! বেরিয়ো না!' 'কী? একেবারে সতীলক্ষ্মী হ'য়ে অন্তঃপুরে লুকোবে?' 'আমি যা করি না—তোমার তাতে কী!' 'নিশ্চয়ই আমার—কেননা তুমি আমার স্ত্রী। আর এ-যুগে আমরা তো শুধু স্ত্রী চাই না, সঙ্গিনীও চাই।' 'সঙ্গিনীর অভাব কী তোমার!'

এই শেষ মন্তব্যটার একটু ইতিহাস ছিলো। ক-দিন আগে একটা পার্টিতে গিয়েছিলো তারা, কোনো-এক দুঃখী দেশের সাহায্যে চাঁদা তোলা হচ্ছিলো—শাশ্বতীর ঠিক মনে নেই সেটা চিন না স্পেন না চেকোশ্লোভাকিয়া—সেখানে একটি ঠোঁটে-রং-মাখা পাজামা-পরা পাঞ্জাবি মেয়ের সঙ্গে হারীত একটু বেশিক্ষণই কথা বলেছিলো। বাড়ি ফেরার পথে শাশ্বতী একটু গম্ভীর হ'য়ে ছিলো সেদিন, কিন্তু হারীত স্পেন, চিন কিংবা চেকোশ্লোভাকিয়ার দুর্দশার বর্ণনায় এত মগ্ন ছিলো যে স্ত্রীর মুখ দেখে কিছুই তার মনে হয়নি তখন কিন্তু যেই শাশ্বতী ও-কথা বললো, অমনি ঐ পাঞ্জাবি মেয়েটির কথাই মনে পড়লো তার। সে খুব শ্রদ্ধা করে এমন একজন মানুষের বোন। একটু তাকিয়ে থেকে স্ত্রীকে বললো: 'তুমি দেখছি একেবারেই অশিক্ষিত!'

এইরকম কথা-কাটাকাটি হ'তে-হ'তে বিয়ের ছ-মাস পরে

একদিন শাশ্বতীর হাত চেপে ধ'রে মটমট ক'রে তুটো শাঁখা ভেঙে দিলো হারীত রাত্তিরে শুয়ে-শুয়ে খুব কাঁদলো শাশ্বতী—দাম্পত্য জীবনে এই প্রথম কান্না—কিন্তু শাঁখা পরার কথা আর মনেও আনলো না, আর আস্তে-আস্তে তার মনে হ'তে লাগলো যে এ-ই ভালো হ'লো, হারীতের বন্ধুদের স্ত্রীরা কেউই শাঁখা পরে না, একটু বেখাপ্পাই লাগে নিজেকে।

শাশ্বতীর কাছে কোনো জবাব না-পেয়ে শ্বেতা ফিরলো হারীতের দিকে।—'তা দাসীত্ব যদি হয় সে তো তোমারই দোষ বাপু, শাঁখার উপর রাগ কেন?'

মুহূর্তের জন্য একটু-যেন অস্বতি বোধ করলো হারীত, তারপর বললো, 'ও-সব চিহ্ন দূর হ'লে দাসীত্বও যাবে।'

'কেন, চিহ্ন ছাড়া দাসীত্ব থাকতে পারে না?'

'এটা কিন্তু তোমার দিদি ঠিক বলেছেন, হারীত। এই ধরো না আমরা—আমরা তো এঁদের দাসত্বই করি, কিন্তু—চিহ্ন-টিহ্ন কিছু তো নেই!' বলতে-বলতে প্রমথেশের গালে চর্বির ভাঁজে-ভাঁজে যেন হাসির ছোটো-ছোটো ঢল নামলো। সেদিকে তাকিয়ে হারীত মনে-মনে বললো, 'হাফ-উইট!'

কিন্তু মনের কথা যেহেতু কানে শোনা যায় না, তাই প্রমথেশ আবারও একটা রসিকতার চেষ্টা করলো, 'বিয়ের পরে পুরুষেরও যাতে একটা চিহ্ন থাকে, তুমি বরং তাই নিয়ে একটা আন্দোলন আরম্ভ করতে পারো, হারীত।'

'তা অনেক পুরুষের থাকে বইকি। হিরের আংটি, সিল্কের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, আর হাতে একটা চকচকে নতুন ছাতা!'

হারীত ঘোঁৎ ক'রে হেসে উঠলো, কী-রকম শুকনো নিরানন্দ হাসি। 'কারো-কারো কয়েক মাস, কারো-কারো আজীবন।'

ছাতাটা বাদ দিয়ে বর্ণনাটা মিলে গিয়েছিলো প্রমথেশের সঙ্গে, কিন্তু প্রমথেশ সেটা বুঝলোই না ; মাথা নেড়ে-নেড়ে তারিফ ক'রে বলতে লাগলো, 'ঠিক ! ঠিক বলেছো ভাই ! ঠিক ! ঠিক !'

'যা বলেছো, হারীত !' শ্বেতা হেসে উঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিলো হারীতের পিঠে—হারীত ভেবে পেলো না এত আনন্দ কিসের—'একটা কথার মতো কথা বলেছো ! ওঁর সেই বিয়ের আংটি আর বোতাম উনি কিছুতেই ছাড়বেন না তো ! দ্যাখো তো,' শ্বেতা স্বামীর দিকে ফিরলো, 'কী চমৎকার দেখাচ্ছে হারীতকে হাত-কাটা চেন-টানা গেঞ্জি-শার্টে—ভাবিসনে, শাশ্বতী, ঐ চেন ধ'রেই টেনে নিয়ে বেড়াতে পারবি !' শ্বেতা গড়িয়ে পড়লো শাশ্বতীর কাঁধে।

মুখে একটা উঁচু দরের হাসির ভাব রেখে হারীত উঠে দাঁড়ালো ভাঁজ-করা খবর-কাগজটা রাজদণ্ডের মতো হাতে ধ'রে।—'ঘুরে আসি একটু।'

'আরে বোসো, বোসো ; আরো অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে', বললো শ্বেতা।

'পরে হবে। একটা-দুটোর আগে তো খাওয়া হবে না। কাজ সেরে আসি।'

'পুজোর মধ্যেও কাজ ?' প্রমথেশ চমৎকৃত।

'ছুটি-তো আপিশের, আমার ছুটি নেই।' দাঁতের ফাঁকে পাইপ চেপে ধ'রে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেলো কর্মবীর।

গোল-গোল চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে প্রমথেশ মন্তব্য করলো, 'হারীত আমাদের তুখোড় ছেলে !'

'তুইও যেমন !' শাশ্বতীর মাথায় একটা টোকা দিয়ে শ্বেতা বললো, 'পুরুষমানুষের কত সময় কত খেয়ালই হয়, তা নিয়ে আবার ভাবিস ! আজই চলিস তোকে শাঁখা কিনে দেবো কালিঘাটে।'

স্বাতী দেখলো, হারীতদা চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে ছোড়দির সমস্ত ভাবটাই বদলে গেলো যেন। সহজ হ'লো সে, মুখে পরিষ্কার ফুটে উঠলো আরাম। শুধু আজই নয়—হঠাৎ স্বাতীর মনে হ'লো—সব সময়ই এ-রকম হয় ছোড়দির ; হারীতদা যতক্ষণ কাছে থাকেন, তার চলা, বলা, হাসি, সমস্তই যেন আধো-আধো বাধো-বাধো ; আর তাকে এ-বাড়িতে রেখে যেই হারীতদা কিছুক্ষণের জন্যও অন্য কোথাও গেলেন, অমনি সে অন্য মানুষ। এ-রকম মনে হওয়া অন্যায়, হয়তো এটা আমারই ভুল ; কিন্তু যতই সে তাকাতে লাগলো ছোড়দির দিকে, যতই শুনতে লাগলো বড়দির সঙ্গে তার বকরবকর, স্বাতী ততই অবাক হ'লো এ-কথা ভেবে যে এতদিনের মধ্যে আজই প্রথম তার এটা মনে হ'লো। সত্যি, ছোড়দির হয়েছে কী ? মোটাসোটা হয়েছে, শাড়ি-গয়না প'রে দেখায়ও জমকালো ; কিন্তু—কিন্তু মুখে লাবণ্য কই, চোখের তারা আর নাচে না কেন ; তাজা একটা ফুল যেন রোদ্দুর লেগে শুকিয়ে গেলো। হয় নাকি এ-রকম ? এ-রকমও হয় নাকি ? ছোড়দির মুখের পাশেই বড়দির ছলছলে মুখের দিকে তাকিয়ে কী-রকম একটা কষ্ট হ'লো স্বাতীর মনের মধ্যে।

বাবা বাজারসুদ্ধু কিনে নিয়ে এলেন, কোমরে আঁচল জড়িয়ে

বড়দি ঢুকলো রান্নাঘরে। কতবার ডাকলেন রাজেনবাবু, কিন্তু শোনে কে! ঈশ—কী চমৎকার তেলওলা আড়মাছটা—এ আমি নিজের হাতে না-রেঁধে পারবোই না! আর মাথাটা দিয়ে মুড়িঘন্ট—ও মা, বাঁধাকপি! আশ্বিন মাসেই বাঁধাকপি! আর কাঁকড়া কী বড়ো-বড়ো! সত্যি, কলকাতার শহর! এ-রকম হ'লে তবে-না রেঁধে সুখ!

'মেয়েটা যে কী!' বিড়বিড় করলেন রাজেনবাবু।

'আহা—!' প্রমথেশ ব'লে উঠলো, 'যে যেটা ভালোবাসে তাকে সেটা করতে দেয়াই তো ভালো!'

'আসল কথা,' স্বাতী হাসলো, 'বড়দির রান্না ছাড়া রোচে না আরকি আপনার মুখে।'

'ঠিক বললে না! শালীদের রান্না আরো বেশি রুচবে, কিন্তু তারা তো আর—' হা-হা হাসি দিয়ে কথা শেষ করলো প্রমথেশ।

স্বাতী আস্তে-আস্তে রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো। গনগন ক'রে জ্বলছে দুটো উনুন, ছ্যাঁকছ্যাঁক করছে কড়াই, বুড়বুড় করছে ডেকচি। কাছে এসেই গন্ধে হেঁচে ফেললো স্বাতী।

'স্বাতী! কী রে?'

'কী আবার। এমনি।'

'খাবি কিছু? মাছ ভেজে দেবো? না একটা আলুসেদ্ধ?'

'ও মা! এইমাত্র তো অতগুলো মিষ্টি খেলাম। এক্ষুনি আবার খেতে পারে নাকি মানুষ!'

'আমার সব ক-টা আলুসেদ্ধর যম! যত রান্নাই হোক, আলুসেদ্ধ

চাই-ই!' বলতে-বলতে ডালের টগবগে ডেকচিটা হাতা দিয়ে ঘুঁটে একেবারেই তিনটে আলু তুলে আনলো শ্বেতা, এক আঙুলে একটু ছুঁয়ে-ছুঁয়ে পরীক্ষা করলো, তারপর হাতটা নাচিয়ে-নাচিয়ে দুটোকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলো জ্বলন্ত জলে; আর অন্যটিকে নির্ভুলভাবে ফেললো একটা বাটির গর্তে, বাঁ হাতে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিয়ে আঙুলে সইয়ে-সইয়ে খোশা ছাড়িয়ে ফেললো নিমিষে, তারপর সুগোল, হলদে, ধোঁয়া-ওঠা, সুগন্ধি একটি আলু চায়ের প্লেটে নুন-গোলমরিচ সুদ্ধু সাজিয়ে সামনে রেখে বললো: 'এই নে।'

সমস্ত কাণ্ডটি শেষ হ'তে বোধ হয় মিনিটখানেকের বেশি লাগলো না। দেখে-দেখে স্বাতীর মনে প'ড়ে গেলো জাপানিদের টেনিস খেলার কথা—ছেলেবেলায় দেখেছিলো একবার অরুণদার সঙ্গে সাউথ ক্লবে।

'বোস না, ব'সে খা', শ্বেতা ঠেলে দিলো ছোটো একটা জলচৌকি। 'কই, রামের মা, বাঁধাকপি কোটা হ'লো তোমার?'

স্বাতী ব'সে-ব'সে কামড়ে-কামড়ে আলুটা খেতে লাগলো, আর তার মনে হ'লো যে আলুসেদ্ধর মতো সুখাদ্য পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু আলুটা যতই ছোটো হ'য়ে এলো, ততই খাওয়ার সুখ কমিয়ে দিতে লাগলো রান্নাঘরের গরম। কাঁকড়ায় মশলা মাখতে-মাখতে শ্বেতা একবার তাকিয়ে বললো, 'যা এবার এখান থেকে। পালা!'

আলুটা শেষ ক'রে স্বাতী উঠলো। চুপ ক'রে একটু দাঁড়িয়ে থেকে বললো, 'বড়দি, কী ক'রে পারো উনুনের ধারে এতক্ষণ ব'সে থাকতে?'

আঁচলে একবার মুখ মুছে শ্বেতা একটু হাসলো বোনের দিকে তাকিয়ে।—'তুইও পারবি।'

পারবে? সেও পারবে? সকালের বাকি সময়টুকু কেমন ঘুরে-ঘুরে উন্মনা হ'য়ে কাটালো স্বাতী।

দুপুরে খাওয়া হ'তে-হ'তে দুটো বাজলো, আর তারপরে হুশ ক'রে বিকেল হ'য়ে সন্ধ্যা নামলো একেবারে। দিন কি এতই ছোটো হ'য়ে গেলো হঠাৎ?

চা খেয়েই হারীত বললো, 'আমরা চলি এবার।'

'ও মা, এখনই? সঙ্গে-সঙ্গে শ্বেতার প্রতিবাদ। 'রাত্তিরে খেয়ে-দেয়ে—'

'একবেলাতেই দু-বেলার মতো হ'য়ে গেছে! একটু বেশিও। শাশ্বতী, তৈরি হ'য়ে নাও।'

'এত তাড়া কিসের?'

'আমার এক বন্ধু আসবেন সাড়ে-সাতটায়', হারীত তার হাত-ঘড়ির দিকে তাকালো।

'বন্ধু-বান্ধব তো রোজই আছে তোমার', শ্বেতা নরম স্বরে বললো, 'একদিন না-হয়—'

'তা হয় না। অ্যাপয়ণ্টমেণ্ট করেছি।'

'তাহ'লে তো যেতেই হয়, সত্যি—' প্রমথেশ মাথা নাড়লো।

'তা—শাশ্বতী থাক না,' শেষ চেষ্টা শ্বেতার।

'বেশ, বেশ!' সঙ্গে-সঙ্গে প্রমথেশ উৎসাহিত। 'শাশ্বতী থাক, খেয়ে-দেয়ে যাবে, রাত্তিরে; কেমন? বিজু পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে'খন—আর বিজু না যায়, আমি তো আছি হে—ভাবনা কী?'

'বন্ধুটি সস্ত্রীক আসবেন, শাশ্বতীর তাই যাওয়া দরকার,' বলতে বলতে হারীতের ঠোঁটের কোণ বেঁকলো একটু। 'তা ও যেতে না চায়, থাক। রাত্তিরটাই থাক না এখানে।'

একটু গা-মোড়ামুড়ি দিয়ে শাশ্বতী ক্ষীণস্বরে বললো, 'না বড়দি, আমি চ'লেই যাই।'

একবার শাশ্বতীর, একবার হারীতের মুখ-চোখের দিকে পলক ফেলে শ্বেতা বললো, 'আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই ভালো। সত্যি তো, বাড়িতে লোকজন আসবে, গৃহকর্ত্রী না-থাকলে চলে! আবার আসিস। রোজই আসিস,—কেমন? আয় তোর চুলটা বেঁধে দিই', ব'লে হাত রাখলো শাশ্বতীর মাথায়।

চুল বেঁধে শাড়ি পরতে-পরতে দেরি হ'য়ে গেলো একটু; সাড়ে-সাতটার আগে পৌঁছবার জন্য ট্যাক্সি নিতে হলো হারীতকে, আর খামকা এই খরচটা হ'লো ব'লে মন-মেজাজ আরো বিগড়ে গেলো তার। শাশ্বতী ধার ঘেঁষে ব'সে ছিলো মুখ ফিরিয়ে, খানিকটা চুপচাপ চলবার পর হঠাৎ হারীত বললো, 'কী, কাঁদছো নাকি?'

শাশ্বতী কথাও বললো না, মুখও ফেরালো না।

'এতই যদি তোমার বাপের বাড়ির টান, তাহ'লে বিয়ে না-করাই তোমার উচিত ছিলো!'

এবারেও কোনো জবাব পেলো না হারীত।

'Fool!' এই জোরালো ইংরেজি মনোসিলেবল একবার উচ্চারণ ক'রেই হারীত যেন ট্যাক্সি-ভাড়াটা উশুল ক'রে নিলো।

২

শাশ্বতী কাঁদছিলো না ; সোনার দিনটির পরে কালো-হ'য়ে-আসা সন্ধ্যাটার কথা ভাবছিলো শুধু। এখন গিয়ে ড্রয়িংরুম আলো করতে হবে, হাই চেপে-চেপে হাসতে হবে ; আর ভয়ে-ভয়ে থাকতে হবে, পাছে ভুল জায়গায় হেসে ফেলে। যিনি আসছেন, ইকনমিক্সে তাঁর মতো পরিষ্কার মাথা দেশে আর দ্বিতীয় নেই—মানে, হারীতের তা-ই মত। বন্ধুদের প্রশংসায় সর্বদাই পঞ্চমুখ সে। আর সত্যিও, কত খবর রাখে তারা, কত জানে, কত পড়ে, আর কী-কথাটাই বলতে পারে এক-এক জন! সে-সব কথা কিছুই বোঝে না শাশ্বতী, এমনকি তাদের ঠাট্টা-তামাশায় পর্যন্ত তারা নির্দিষ্ট কয়েকজন ছাড়া অন্য কারো হাসি পায় না। আরো মুশকিল এই যে দলে কয়েকজন অবাঙালিও আছে, তারা কেউ এলে কথাবার্তা ইংরেজিতেই চলে, আর শাশ্বতী যদিও সসম্মানে বি. এ. পাশ, তবু ইংরেজিতে কথা বলতে খুবই অসুবিধে হয় তার, দুটো-চারটে বাঁধা বুলির পরেই হাঁপ ধরে। ভদ্রলোকেরা সস্ত্রীক এলেও একরকম—মেয়েদের আলাদা হ'য়ে গল্প করা নিয়মহিশেবে নিষিদ্ধ হ'লেও নিশ্বাস তো ফেলা যায় মাঝে-মাঝে—কিন্তু কত দিন এমন হয় যে প্যাণ্ট-পরা-পরা পুরুষদের মধ্যে সে একটামাত্র মেয়ে—উঠে এলে স্বামীর মান যায়, আর ব'সে থাকতে তার নিজের প্রাণ। সে ইংরেজি বলতে পারে না, ফাশিস্ট রাক্ষসরা কোথায় কী-কী মন্দ কাজ করেছে আর করছে, তার

লিস্টিটা মুখস্তই হ'লো না মোটে ; তারই দোষ এ-সব, লজ্জা করে মনে-মনে, চেষ্টা করে প্রাণপণ ; কিন্তু পরীক্ষার পড়া-তৈরির মতো এই পরিশ্রম ভালো লাগে নাকি বারো মাস ? হারীত আবার আড্ডা ছাড়া টিকতে পারে না ; হয় তাদের কাছে কেউ আসছে, নয় তারা কোথাও যাচ্ছে, প্রত্যেকটি সন্ধ্যা এ-রকম ; এই দু'বছরের মধ্যে, হোক বৃষ্টি, হোক অসুখ, এমন-একটা সন্ধ্যা মনে করতে পারে না শাশ্বতী, যে-সন্ধ্যা তারা দু-জনে নিরিবিলি কাটিয়েছে। প্রথম-প্রথম অভিমান হ'তো তার, রাগ হ'তো, কষ্ট হ'তো···সে-সব পালা পার হ'য়ে এসে এতদিনে ইচ্ছেটাই ম'রে গেছে তার, এখন শুধু মনে হয় কেউ আসুক, অন্য-কেউ, কোনো মেয়ে, এমন-কোনো মেয়ে যার সঙ্গে আর-একজন মেয়ে মন খুলে দুটো কথা বলতে পারে। স্বাতীটার দৌড় তো এখনো নভেল পর্যন্তই, ওর বিয়ে হ'লে বেশ হয়—কিন্তু বিয়ের পরে আবার কী-রকম হবে কে জানে।

আজ বড়দির কাছে একটা জীবন পেয়েছিলো সে। পরিষ্কার, নিষ্প্রাণ, বিমর্ষ সিঁড়ি দিয়ে তেতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটে উঠতে-উঠতে দু-বার তার নিশ্বাস পড়লো।

পরের দিন সকালে হারীত বললো, 'যাবে নাকি ও-বাড়িতে ?'

শাশ্বতী উদাসভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো।

'কী-মুশকিল !' 'কী-'টাকে 'খী-'র মতো উচ্চারণ ক'রে ব'লে উঠলো হারীত। 'আমিও তো কিছু আশা করতে পারি তোমার কাছে। আফট্রল, তুমি আমার স্ত্রী তো !—নাও, ওঠো।'

'তোমাকে যেতে হবে না—আমি একাই পারবো।'

'তোমার বড়দি অবশ্য আমাকে যেতে বলেননি, কিন্তু—যাই একটু।' শাশ্বতী অবাক হ'লো হারীতকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে-দেখে।

দিনের যে-কোনো সময়ে রোজই আসে শাশ্বতী, আর রাত দশটার আগে যে-কোনো সময়ে হারীত এসে তাকে নিয়ে যায়। বাড়ির দিন-রাত্রির চেহারা বদলে গেলো: স্বাতীর মনে হ'লো তার সুখের ছেলেবেলাই বুঝি ফিরে এলো আবার—এমনকি দাদা পর্যন্ত অনেক বেশিক্ষণ বাড়ি থাকে। জামাইবাবুর সঙ্গে ঘন-ঘন গোপন পরামর্শ তার; এক-একবার কথা শেষ ক'রেই বেরিয়ে গিয়ে সে নিয়ে আসে কোনো নাটকের কি সিনেমার এক গোছা টিকিট; দুই ট্যাক্সি বোঝাই হ'য়ে বাড়িসুদ্ধু হৈ-হৈ ক'রে শ্যামবাজারে থিয়েটারে যাওয়া—; কী কাণ্ড, আস্ত একটা রো ভ'রে ফেলেছে তারাই! আর সিনেমা? বাংলা আর হিন্দি তো বাকি রইলো না একটাও, হারীতের অনারে একদিন মেট্রোতেও যাওয়া হ'লো, আর তারপর অবশ্য কলকাতার তখন-তাজ্জবতম লাইটহাউসও বাদ গেলো না। এরপর যেদিন আলগোছে আবার একটা নাটকের নাম করলো বিজু, হারীত শুনে চট ক'রে বললো, 'বিজন, জামাইবাবুকে একবারে ফতুর না-ক'রে ছাড়বে না?'

'আহা—!' ঐটুকুতেই, আর মুখ-চোখের ভঙ্গিতেই মনের ভাব ব্যক্ত করলো প্রমথেশ।

'এ-ক'দিন শুধু আমোদ-প্রমোদে যা খরচ করলেন', হারীত হিশেব করলো, 'তাতে অনেকে এক মাস সংসার চালায়। অনেকে মানে সেই ভাগ্যবান শতকরা চার কি পাঁচজন, যাদের অত বেশি উপার্জন।'

'তা—তা—' আমতা-আমতা ক'রে প্রমথেশ হঠাৎ একটা যুক্তি খুঁজে পেলো, 'নাটক-সিনেমা যারা করে, তাদেরও তো সংসার চলা চাই।'

'সে-তো ঠিকই!' হারীত বাঁকা ঠোঁটে হাসলো। 'বড়োলোক তার সুখের জন্য প্রচুর বাজে খরচ ক'রে ব'লেই-না গরিবরা দু-বেলা দু-মুঠো খেতে পায়।'

'সুখের জন্য হ'লে আর বাজে খরচ কেন?' প্রমথেশের কথাটা শোনালো যেন মাস্টার মশাইর কাছে সুবোধ ছাত্রের প্রশ্ন। 'টাকা তো সুখের জন্যই—না?'

'সুখ ভালো, কিন্তু তার চেয়েও ভালো একটু রাশ টেনে চলা।' গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে হারীত বললো কথাটা, আর ব'লেই এক ঝলক তাকালো স্ত্রীর দিকে;—কিন্তু শাশ্বতী বিজনের সঙ্গে ব'সে নিচুমুখে দেখছে পারিবারিক ফোটোগ্রাফের অ্যালবম, কথাটা তার কানে পৌঁছলো না, অন্তত পৌঁছলো ব'লে বোঝা গেলো না। একটু রাগ হ'লো হারীতের;—কেননা শাশ্বতী যেন ঠিক শিক্ষাটা নিতে পারছে না, না পলিটিক্সে না ডমেস্টিক ইকনমিতে; এই-তো সেদিন তার কাছে এই অদ্ভুত প্রস্তাব করেছিলো যে ও-বাড়ির সবাইকে নিয়ে তারা যদি একদিন কোনো সিনেমা-টিনেমায়—কথা অবশ্য শেষ করতে পারেনি, হারীত আদ্ধেকেই কেটে দিয়েছিলো 'পাগল!' ব'লে, কিন্তু শাশ্বতী প্রশ্ন করতেও ছাড়েনি, 'পাগল কেন?' 'আমার কি অত টাকা আছে?' 'কত আর লাগে', তবু তর্ক করেছিলো স্ত্রী, 'আর এত যাচ্ছি জামাইবাবুর সঙ্গে—' 'তাহ'লে আমি বলবো

না-যাওয়াই তোমার উচিত ছিলো—নিজের অবস্থা তো জানো।' 'কেন, অবস্থা এমন মন্দ কী আমাদের?' 'তোমার ইচ্ছেমতো চললেই মন্দ হবে।' এর উত্তরে শাশ্বতীর আর কথা ফোটেনি।

আহত হয়েছিলো শাশ্বতী, কিন্তু উপায় কী, নিয়মটা ঠিক-ঠিক মেনে নিলেই এ-সব মন-জ্বলুনি আর হয় না। মাইনের সিকি ভাগ নির্ভুল নিয়মে জমিয়ে যাচ্ছে হারীত, মাসের শেষে টানাটানি হ'লে দশটা টাকা বরং ধার করে, কিন্তু ব্যাঙ্কে হাত দেয় না: পাছে হঠাৎ খামকা কিছু খরচ হ'য়ে যায়, সে-ভয়ে চেকবই-ই আনে না বাড়িতে। প্রমথেশের খরচের হাত দেখে তার ভিরমি লাগবার দশা।

'একটু রাশ টেনে···না?' কথাটা যেন মনে লাগলো প্রমথেশের। আমিও তো ভাবি তা-ই, কিন্তু হ'য়ে ওঠে না হে। গ্যাখো তো—ছেলেপুলে—এত বড়ো সংসার—'

'দুর্দিন আসছে, ঘোর দুর্দিন!' হারীতের মুখ-চোখের চেহারা এমন হ'লো যে দেখে প্রায় ভয় করে।

'কেন?' উৎকণ্ঠিত হ'য়ে জানতে চাইলো প্রমথেশ।

কেন? জিগেস করছে কেন! উঃ, এমন মানুষও আছে এখনো!—আর আছে ব'লেই তো দেশের এ-দুর্দশা! সংক্ষেপে উত্তর দিল হারীত: 'যুদ্ধ।'

'যুদ্ধ তো কত হাজার মাইল দূরে—তাতে আমাদের কী?'

হারীত দাঁতে দাঁত চেপে বললো: 'সেটা আমার মুখে না-শুনে বোমার আওয়াজেই শুনবেন শিগগির।'

'অ্যাঁ!' প্রমথেশের চোখ কপালে উঠলো। 'বোমা! অত দূর

থেকে বোমা ফেলবে হিটলার! তা হবে—হিটু আমাদের সব পারে! কী-পিটুনিটাই পেটাচ্ছে আমাদের কর্তাদের—অ্যাঁ!' খুশিতে প্রমথেশের পান-খাওয়া রং-ধরা দাঁত প্রত্যেকটি বেরিয়ে পড়লো।

ফাশিস্ট! পুরো ফাশিস্ট! হারীত আঁৎকে লাফিয়ে উঠলো চেয়ার ছেড়ে। কিন্তু প্রমথেশ কিছুই বুঝলো না, হাসতে-হাসতেই আবার বললো: 'তা কথাটা তুমি ঠিক বলেছো, হারীত। দিনকাল ভালো না।'

'আপনাদের কী!' কী-রকম একটা প্রতিহিংসার রঙে হারীতের মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। 'জমিদার মানুষ!'

'আর জমিদারি!' প্রমথেশ নিশ্বাস ছাড়লো। 'ও এখন গেলেই বাঁচি। কিন্তু কথাটা কী—অভ্যেস ফেরানো তো সোজা না, আর আছে যদ্দিন, খরচ-টরচ ক'রেই যাই—ভালো লাগে তাতে তো সন্দেহ নেই।'

না, তাতে আর সন্দেহ কী। শুধু কি নাটক-সিনেমা, বাজার নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে রীতিমতো একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিয়েছে প্রমথেশ। রাজেনবাবু বাঁধাকপি এনেছেন, প্রমথেশ আনলো বড়োবাজার থেকে এক ঝুড়ি ফুলকপি—এইটুকু-টুকু, টাকা-টাকা দাম। মুরগি আনলেন রাজেনবাবু, পরের দিনই প্রমথেশের আনা চাই হগ-সাহেবের বাজারের সব-সেরা মটন, সঙ্গে টাটকা সবুজ মটরশুঁটি আর আপেলের মতো বড়ো-বড়ো টুকটুকে লাল টম্যাটো। রাজেনবাবু কি ঢাকাই অমৃতি এনেছেন? তাহ'লে আর কথা কী—প্রমথেশ ছুটলো শেয়ালদার কাছে কোন-এক

খাশ-ঢাকাই ময়রার কাছে পাঁচ সের প্রাণহরার ফরমাশ নিয়ে। কিন্তু কালীপুজোর দিন একেবারে বাজি মাৎ ক'রে দিলো সে, যখন বেলা বারোটার সময় ঘামতে-ঘামতে হাঁপাতে-হাঁপাতে বাড়ি ফিরলো, আর তার চাকর এনে রান্নাঘরের সামনে নামালো পায়ে-দড়ি-বাঁধা মস্ত একটা চিৎ-হওয়া কচ্ছপ।

দেখে স্বাতীর চক্ষুস্থির। ছুটে কাছে গিয়ে, কিন্তু বেশি কাছে না-গিয়ে, বললো, 'ও মা! এটা কী?'

'কচ্ছপ', ঘাড় মুছতে-মুছতে প্রমথেশ বললো। 'কচ্ছপ ছাখোনি কোনোদিন?'

'কচ্ছপ কেন? কী হবে?'

'কী হবে?' প্রমথেশ হাসলো একটু, 'খাবে।'

'খাবো!' স্বাতী তাজ্জব বনলো।

'খাওনি বুঝি কোনোদিন? কী ক'রেই বা খাবে—কলকাতায় সব পাওয়া যায়, কিন্তু এ-জিনিশ না! মাঝে-মাঝে কাছিম ওঠে, তা-ই নিয়েই হুলস্থুল! আরে কাছিমের মাংস তো বাতের ওষুধ, ও আবার মানুষে খায় নাকি! এ একেবারে আসল কচ্ছপ—কালী-কচ্ছপ—আমরা বলি কাউঠা, নাম শোনেনি কলকাতার বাবুরা! মুরগি-মটন যা-ই বলো, এ-রকম মাংস আর হয় না।' কচ্ছপের বিবরণ শেষ ক'রে এঞ্জিনের মতো হাঁপাতে লাগলো মস্ত মোটা প্রমথেশ।

'পেলে কোথায়?' জিজ্ঞাসা করলেন রাজেনবাবু।

বিজয়ীর হাসি খেলে গেলো প্রমথেশের চোখে-মুখে।—'তা একটু চেষ্টা না-করলে কি হয় এ-সব! আমার এক প্রজা আছে

বৈঠকখানার বাজারে, তার শ্বশুরবাড়ি কুমিল্লায় নবিনগরে, তাকে পাঠিয়ে—'

'অ্যাঁ! কুমিল্লায় লোক পাঠিয়েছো এ-জন্য?'

'ভালো তো! তারও শ্বশুরবাড়ি বেড়ানো হ'লো, আমাদেরও কলকাতায় ব'সে কার্তিক মাসের নবিনগরি কাউঠা খাওয়া—মন্দ কী!'

'পারোও তুমি, প্রমথেশ!' রাজেনবাবু মুখে হাত চেপে হাসতে লাগলেন।

শ্বশুরের দিকে মিটিমিটি একটু তাকিয়ে প্রমথেশ বললো: 'আমারও অনেকদিন খাওয়া হয় না, আর আপনিও ভালোবাসেন—'

'বেশ—বেশ করেছো—' কচ্ছপের পর্যবেক্ষণ শেষ ক'রে শ্বেতা বললো এতক্ষণে। 'খুব ভালো—খুব তেল হবে! অনুকূল, মারতে পারবি তো রে?'

প্রমথেশের খাশ চাকর অনুকূল হাতে হাত ঘ'ষে জবাব দিলো, 'খুব পারবো, মা, ঠিক পারবো, আপনি ভাববেন না।'

'ইশ্‌শ্‌!' স্বাতী শব্দ ক'রে উঠলো, 'ওকে মেরে খাবো আমরা! কী বিশ্রী!'

'আর-সব মাছ-মাংস বুঝি না-মেরেই খাও?' প্রমথেশ হাসলো।

'আহা', শ্বেতা তাড়াতাড়ি বললো, 'তাই ব'লে চোখের উপর দেখতে-তো খারাপ লাগে! আর যা ক'রে মারতে হয় এদের—' কচ্ছপের শাদা-কালো অসহায় বুকটায় সস্নেহে একটু হাত বুলোলো শ্বেতা, অনুকূলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাইরে থেকে মেরে আনবি, বুঝলি?'

হুকুম পেলে অনুকূল তক্ষুনি কাজে লেগে যায়, কিন্তু হারীতের আবার আপিশ খুলে গেছে, তাই অপেক্ষা করতে হ'লো পরের রবিবার পর্যন্ত। প্রমথেশ নিজে দাঁড়িয়ে কচ্ছপ-বধের তদারক করতে লাগলো: আর শ্বেতা রান্না করলো বেশ-একটু সমারোহ ক'রেই। কিন্তু খেতে ব'সে স্পেশল নিমন্ত্রিতটি হাত গুটিয়ে নিলো।

'খাও!'

'না।'

'আরে খাও, খাও!' প্রমথেশ ওকালতি করলো। 'কাছিম না—কচ্ছপ, কাউঠা। আসল কাউঠা! খেয়েই ছাখো।'

'নাও, খাও!' বাটির গায়ে হাতের উল্টো পিঠ ঠেকিয়ে তাপ অনুভব করলো শ্বেতা: একটু ঠেলে দিয়ে বাটিটা ঠেকিয়ে দিলো হারীতের থালায়।

'আঃ, চমৎকার! কী তেল! কী ডিম! আর রান্নাও খুব ভালো হয়েছে!' প্রমথেশ উচ্ছ্বসিত।

'একটু খেয়ে দেখলে পারো', রাজেনবাবুর মৃদু মিনতি।

ঝকঝকে কাঁসার বাটিতে তেলে-ঝোলে টুকটুকে লাল পদার্থটার দিকে তাকিয়ে হারীত আবার সুদৃঢ় সুস্পষ্ট একটি 'না' উচ্চারণ করলো।

'একটু—একটু মুখে দিয়ে ছাখো! যদি ভালো না লাগে আর খেয়ো না।—একটু!' শ্বেতা উপুড় হ'য়ে পড়লো পাতের উপর, পারলে আঙুল দিয়ে তুলে মুখে গুঁজে দেয়। দু-তিন মিনিট ধ'রে একটা ঝুলোঝুলি চললো রীতিমতো।

'খেলে না তো কিছুতেই!' শ্বেতা ফেল হ'য়ে কেঁদে ফেললো প্রায়।

'খুব-তো তোমার মনের জোর হে! এত ক'রে বললাম সবাই—' তার 'কাউঠা'র এই অভাবনীয় অবমাননায় একটু আঘাতই লাগলো প্রমথেশের মনে।

'সব রকম জানোয়ার কি খাওয়া যায়!' বাঁ হাতে প্লেট ধ'রে টম্যাটোর চাটনি একটুখানি ঢেলে নিলো হারীত।

'সে-তো ঠিকই!' প্রমথেশ মাথা নেড়ে তক্ষুনি সায় দিলো। 'আচ্ছা, বলেতে নাকি ব্যাং-ট্যাং খায়? সত্যি?'

'সে আলাদা এক রকমের এডিবল ফ্রগ,' উত্তর দিলো বিলেত-ফেরৎ।

'এটাও তো বেশ এডিবল মনে হচ্ছে আমার,' একটু মাংস, একটু ডিম আর খানিকটা চর্বি একসঙ্গে মুখে দিলো প্রমথেশ। এ-গাল থেকে ও-গালে বদলি ক'রে বললো, 'বুঝলে হারীত, মাংস আমি প্রায় কিছুই বাকি রাখিনি, শুধু ঐ ব্যাংটা চেখে দেখা হ'লো না, এই একটা আপসোস র'য়ে গেলো হে। ভালো? তুমি খেয়েছো?'

সে-কথার জবাব না-দিয়ে হারীত বললো, 'আপনার কিন্তু মাছ-মাংস বেশি খাওয়া ঠিক না।'

'মাছ-মাংস বাদ দিলে আর রইলো কী?'

'তা ব্লাড-প্রেশার বাড়লে খাওয়া কমানো ছাড়া আর উপায় কী?'

'আরে ও-সব ডাক্তারদের বুজরুকি। ওদের কথামতো চলতে

হ'লে না-খেয়ে মরতে হয়। তার চেয়ে খেয়ে মরাই ভালো।' বাটির বাকি মাংসটুকু প্রমথেশ চেঁছে-পুছে ঢেলে নিলো। 'তোমার হ'য়ে গেলো, হারীত? সত্যি, তোমার সঙ্গে ব'সে খেতে লজ্জাই করে আমাদের। শাশ্বতী, মাংস খেলে? স্বাতী, কেমন লাগলো?'

'খুব ভালো।' সোৎসাহে জবাব দিলো স্বাতী। হারীতদা যখন কিছুতেই মাংস খাবেন না, তখন বড়দির জন্য কষ্টই লাগছিলো তার, জামাইবাবুর জন্যও—তাঁর জন্যই বেশি। বেশ মানুষ—যদিও অবিকল কার্তিকের মতো গোঁফ আর মাঝখান দিয়ে সিঁথি-করা ঘন কোঁকড়া চুল, আর যদিও জামা খুলে হাঁটুর কাছে কাপড় তুলে বসেন, আর খাবার সময় বড্ড শব্দ ক'রে চিবোন—তবু বেশ, কেমন আপন লাগে, কেমন মমতা হয়। খাবার পর স্বাতী জামাইবাবুর কাছেই বসলো, তাঁর ডিবে থেকে পান খেলো, কবে একবার দশ বছর আগে তিনি গারো পাহাড়ে শিকারে গিয়েছিলেন, তার গল্প শুনলো যতক্ষণ-না তিনি নাক ডাকাতে লাগলেন। তারপর উঠে এলো বসবার ঘরে, যেখানে মেঝেতে পাটি পেতে বড়দি শুয়েছেন তাঁর কোলেরটিকে নিয়ে, আর বাবা ইজি-চেয়ারে ঝিমুচ্ছেন।

সে ঘরে ঢুকতেই বড়দি বললেন, 'স্বাতী, তোর চিঠি।' বালিশের তলা থেকে একটি ঘন-নীল খাম বের ক'রে হাতে দিলেন তার। স্বাতী দেখলো খামের উপর সুন্দর হাতের লেখায় জ্বলজ্বল করছে তার নাম। এ-লেখা সে কি চেনে? কে লিখলো? খাম খুলে স্বাতী আগে দেখে নিলো চিঠির তলায় নামটা : সত্যেন রায়। একটু লাল

হ'য়ে উঠলো মুখ, আর সেটা বুঝতে পেরে কাগজটা মুখের সামনে মেলে চিঠি পড়তে লাগলো। পড়া হ'লো না; শুধু উপর-উপর একবার দেখে নিয়ে বললো, 'বাবা, সত্যেনবাবু চিঠি লিখেছেন।'

ঘুম-ঘুম গলায় রাজেনবাবু জবাব দিলেন, 'কী লিখেছে ?'

'এই-যে ছাখো—' স্বাতী চিঠি-ধরা হাত বাড়িয়ে দিলো, কিন্তু রাজেনবাবু বললেন, 'কী ? ভালো আছে তো ?'

'হ্যাঁ—তোমার কথাও লিখেছেন—'

'কে রে সত্যেনবাবু ?' জিগেস করলো শ্বেতা।

'আমার এক প্রোফেসর।'

'প্রোফেসর ! প্রোফেসররা চিঠি লেখে তোকে ! আর চিঠিও লম্বা ! তাদের সমান-সমানই হয়েছিস বুঝি বিদ্যায় ?' বালিশে কনুই চেপে, হাতের উপর মাথা রেখে, বাচ্চাকে বুকের দুধ দিতে-দিতে, সস্নেহে সগর্বে বোনের দিকে তাকালো শ্বেতা।

'বড়দির কথা !' স্বাতী একটু এঁকে-বেঁকে সেখান থেকে পালালো। এসে বসলো বাড়ির ভিতরদিকের বারান্দার সিঁড়িতে। চুপচাপ; রান্নাঘরের বিকেলের পাট শুরু হয়নি এখনো; ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে কার্তিক মাসের বেলা-চারটের। কপালের চুল সরিয়ে চোখ নিচু করলো কাগজে।

'স্বাতী,

খুব ঘুরলাম। দশমীতে নৌকো চড়লাম কাশীর গঙ্গায়, পূর্ণিমায় তাজমহল, দিল্লিতে দেয়ালি ;—আর

ফাঁকে-ফাঁকে ফতেপুর সিক্রিতে একবেলা, জয়পুরে দু-দিন, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, পাটনা—সব শেষ ক'রে ফিরতি পথে এসেছি শান্তিনিকেতনে। কাগজে দেখলাম রবীন্দ্রনাথের খবর—সোজা চ'লে এলাম—না-এসে পারলাম না। কঠিন পীড়া ; দেখা হবার আশা নেই। সোনার তরী ভেসে চলেছে আলোর নদী বেয়ে অন্ধকারের দিকে।—কিন্তু সেটাই হয়তো আরো বড়ো আলোর সমুদ্র।

কবি যদিও দেহযন্ত্রণায় বন্দী, তবু তেমনি সুন্দর শরৎকালের শান্তিনিকেতন। একটু নিষ্ঠুর লাগে, না? কিন্তু এই-তো ঠিক, এর গানই তো কবি গেয়েছেন জীবন ভ'রে। শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, সব কবি, পৃথিবীর সব কবি। পৃথিবী সুন্দর, জীবন ভালো, এ ছাড়া আর-কী কথা আছে, বলো তো?

নানা দেশ ঘুরে, নানা দৃশ্য দেখে এখানে এসে কী-রকম লাগছে, জানো? যেন জমকালো নেমন্তন্ন খেয়ে নিজের ছোট্ট ঘরটিতে ফিরে শুয়ে পড়েছি। শান্তিনিকেতনে এলেই বাড়ি-বাড়ি লাগে আমার—এখানে আমি স্কুলে পড়েছি, মাস্টারিও ক'রে গেছি তিন মাস—এখন ছুটির সময় কেউ নেই ব'লে তুমি কি ভাবছো অভ্যর্থনায় ত্রুটি হয়েছে কোনো? না! আকাশ নীল, কাশবন শাদা, সারাদিন রোদ্দুর, আর সন্ধেবেলা একটু-উঁকি চাঁদ, আর চাঁদের পরে হাজার তারা হাজির ; যত রাত বাড়ে, তত তাদের আলো ছড়িয়ে পড়ে অতি সূক্ষ্ম ধুলোর মতো। এ-সব আশ্চর্য দৃশ্য দেখবার জন্য রাত কাটাতে হয় না রেলের স্টেশনে, দিন কাটাতে হয় না টঙ্গায় ; শুধু একটুখানি চুপ ক'রে থাকতে হয়। সেই চুপ ক'রে

থাকাটা নিজের মধ্যে বানিয়ে নিতে পারলে আর ভাবনা কী—কিন্তু ক-জন পারে তা? বাইরেটা চুপ না-হ'লে নিজেরা চুপ হ'তে পারি না আমরা, তাই মাঝে-মাঝে আমাদের আসতেই হয় এইরকম কোথাও, যেখানে চারদিক খোলা, চারদিক চুপ?—আশ্চর্য চুপ। এত শব্দহীন যে প্রজাপতি ওড়ার শব্দ শুনতে পাবো মনে হয়।

—তাই ব'লে কি সবই চুপ? না তো! গাছের তলায় স্টেজ খাটিয়ে এইমাত্র হো-হো ক'রে লাফিয়ে পড়লো একদল বাচ্চা তীরন্দাজ, চেঁচিয়ে উঠলো ডালপালা, গাছের ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেলো উত্তুরে হাওয়া, শীতের চিঠি এসে পৌঁছলো।

ঐ দ্যাখো, নিজের ভালো লাগার মধ্যেই ডুবে আছি; এই ভালো লাগা শিখেছি যাঁর কাছে, তাঁর রোগশয্যায় আমার দিন তো মলিন হ'লো না একটুও। মানুষ ভারি স্বার্থপর—কী বলো? ব'সে থেকে-থেকে এক-এক সময় ঝিমুনি আসে; তখন মনে করবার চেষ্টা করি যে এ-ই সব নয়: কলকাতা আছে, কাজ আছে, যুদ্ধের খবর আছে, টেস্ট পরীক্ষার খাতা দেখা আছে। হঠাৎ একটু খারাপও লাগে মনটা: পৃথিবীর কাছে আমার যা পাওনা, আমি তার বেশি অ দায় ক'রে নিচ্ছি না তো? এই-যে পাকা ফলের মতো এক-একটি দিন সূর্যের সোনার গাছ থেকে ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে, এ কি আমার জন্য? আমি তো কবি নই, আমি তো ফিরিয়ে দিতে পারি না!—কিন্তু সে-কথাই বা কেন? আমার-যে ভালো লাগে, তার কি কোনো মূল্য নেই? বলতে পারি না ব'লে আমার ভালোবাসা কি মিথ্যা?

তুমি কেমন আছো, কী করছো? নিশ্চয়ই খুব

ভালো আছো, নিশ্চয়ই খুব আনন্দেই কাটালে ছুটিটা ? গিয়ে সব শুনবো। তার আগে একটা চিঠি লিখতে পারো ইচ্ছে করলে—এখানে আছি আরো ক'টা দিন—আর কী, ছুটি-তো হ'য়ে এলো।

তোমার বাবাকে আমার কথা বোলো।

সত্যেন রায়'

পড়া শেষ ক'রে চিঠিখানার দিকে তাকিয়ে রইলো স্বাতী। একটি বড়ো কাগজের এপিঠ-ওপিঠ লেখা: শেষের দিকে অক্ষরগুলোর ঘেঁষাঘেঁষি, কাগজ যেই ফুরুলো, অমনি চিঠিও শেষ—আহা—আর-একটা পাতা যেন আর লেখা যেতো না! কাগজটা উল্টিয়ে আবার পড়তে লাগলো আস্তে-আস্তে; মনটা যেন কেমন হ'য়ে গেলো তার। এতদিনের মধ্যে একবারও তো আর মনে পড়েনি সত্যেন রায়ের কথা; যাবার আগে যে-বই ক'খানা উনি রেখে গিয়েছিলেন তাও তেমনিই প'ড়ে আছে—বড়দি আসার আনন্দে আর-সবই ভুলে গিয়েছিলো। তা উনিও তো মন্দ আনন্দে নেই; খুব-তো দিল্লি-হিল্লি করলেন, তারপর শান্তিনিকেতনে এসে চাঁদ-তারার দৃশ্য দেখছেন। ওখানে কিনা লোকজন কেউ নেই, কিছু করবার নেই, তাই নেহাৎই খানিকটা সময় কাটাবার জন্য চিঠি লিখলেন একখানা! রাগ হ'লো স্বাতীর, হিংসে হ'লো সত্যেন রায়কে; কেমন ইচ্ছেমতো যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কী স্বাধীন, কী সুখী! আর নিজের কথা সাত কাহন লিখে শেষটায় শুকনো একটু ভালো আছো তো! আছিই তো, খুব ভালো আছি, খুবই আনন্দে আছি; সকলের আনন্দ তো একরকম নয় পৃথিবীতে।

একরকম নয়, কিন্তু—আর এটাই স্বাতীর খারাপ লাগলো সবচেয়ে —সত্যেন রায়ের চিঠিতে সে যেন এ-কথাই পড়লো যে সে যা নিয়ে মেতে আছে—এই সব খাওয়া-দাওয়া, সিনেমা-থিয়েটর, হাসিগল্প, এগুলি ভালোই—কিন্তু ছেলেমানুষি ভালো। কেন, ছেলেমানুষি কেন?—আর সে কি এখনো ছেলেমানুষ?

নীল কাগজটি কোলের উপর ফেলে স্বাতী ভাবতে লাগলো: আমি কি এখনো ছেলেমানুষ? তাকিয়ে দেখলো, দুটো কাক বসেছে রাস্তার গাছের ডালে—ভারি সুন্দর তো! সবুজের মধ্যে কালো, আর ফাঁকে-ফাঁকে রোদের হলদে—মানিয়েছে! এখানেও তো আকাশ নীল, গাছ সবুজ, রোদের রং সোনার মতো—তাহ'লে আর অন্য কোথাও যাওয়া কেন? অন্য কোথাও! অন্য কোথাও মানে তো অন্য দেশ নয়, অন্য-এক—কী? কী, তা জানে না, শুধু মনে হয় যে খেয়ে, সেজে, বেড়িয়ে, ফুর্তি ক'রে সবচেয়ে বেশি যা ভালো লাগতে পারে, তার চেয়েও অনেক বেশি ভালো লাগা আছে সেখানে, সে-ভালো-লাগার যেন শেষ নেই—কিন্তু সে ছেলেমানুষ, সে তার কী জানে?—জানে না? যখন গান শোনে, যখন আশ্চর্য কোনো বই পড়ে, যখন হঠাৎ তাকিয়ে ছাখে সবুজের ফাঁকে সোনা, আর সবুজের মধ্যে কালো?

'কী করছিস রে, স্বাতী?'

তাকিয়ে দেখলো, ছোড়দি। এইমাত্র উঠে এলো ঘুম থেকে, মুখ ফোলা-ফোলা, ঢিলে-ঢোলা কাপড়, পিঠে লোটানো এলোমেলো চুল সুগন্ধ দিচ্ছে। পাশে ব'সে প'ড়ে শাশ্বতী বললো, 'চিঠি নাকি? কার?'

স্বাতী জবাব দিলো, 'আমার।'

'লিখেছে কে ?'

'তোমাকে বলেছিলাম-না সত্যেন রায়ের কথা—' স্বাতী চিঠিটা খামে ভরতে লাগলো।

'সেই-যে প্রোফেসর ? সে লিখেছে ? দেখি !' স্বাতীর কোল থেকে খপ ক'রে খামটা তুলে নিলো শাশ্বতী। 'স্বাতী, এক কাজ কর না, একটু তেঁতুলের আচার নিয়ে আয় বড়দির ঘর থেকে।... ব'সে আছিস কেন ? যা !'

স্বাতী উঠলো, যোগান দিলো ছোড়দির ঘুম-ভাঙা জিভ-নাড়ার। ডান হাতের আঙুলে পুরু ক'রে আচার লাগিয়ে যথোচিত শব্দ ক'রে-ক'রে খেতে-খেতে বাঁ হাতে চিঠিটা হাঁটুর উপর চেপে ধরলো শাশ্বতী। স্বাতী উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে থাকলো ছোড়দির হাতের দিকে : এই বুঝি এক ফোঁটা আচার পড়লো চিঠির গায়ে।

চিঠি ফেরৎ দিয়ে শাশ্বতী বললো, 'এ-সব ভাবের কথা তোকে লিখেছে কেন ?'

'তবে আর কাকে লিখবেন', গম্ভীরভাবে জবাব দিলো স্বাতী।

'কেন রে ?' শাশ্বতী হাসলো। 'আর কেউ নেই ওঁর চিঠি লেখার ?'

'আছে হয়তো—কিন্তু এ-সব ভাবের কথা ভালো লাগবে কি আর কারো ?' স্বাতী হাসলো।

'ওরে বাবা !—খুব ভালো আচারটা, না রে ? বড়দি পারেও ! তুই খাচ্ছিস না ?'

'না ছোড়দি ; বড্ড চিটচিটে হ'য়ে যায় আঙুল।'

'যা বোকা!' স্বাতীর এই বোকামি শাশ্বতী যেন হাসিমুখেই মেনে নিলো; বিনা সাহায্যেই সবটুকু আচার তুলে দিলো কয়েক মিনিটে।

সন্ধের পরে, আবছা অন্ধকারে, সেই বারান্দাতেই পাটি পেতে ব'সে শ্বেতা গুনগুন ক'রে কথা বলছিলো বাবার সঙ্গে, আর স্বাতী ব'সে ছিলো চুপ ক'রে দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে। শাশ্বতী চ'লে গেছে, প্রমথেশ বেরিয়েছে আতা তাতা ছোটনকে নিয়ে টাকায় আটখানা ছবি তোলাতে: অনেক হৈ-চৈ, অনেক ফুর্তির পর হঠাৎ কেমন-একটা ঘুম-ঘুম ঠাণ্ডা নেমেছে বাড়িতে, যেন কারুরই কিছু আর করবার নেই। আর সত্যিও তা-ই; ও-বেলা এত রান্না হয়েছিলো যে এ-বেলা উনুন ধরাতে হ'লো শুধু ছুটো ভাত ফোটাবার জন্য; বড়দির নেহাৎ-বাচ্চাটি, যে রোজ এই সময়টাকে চেঁচিয়ে সরগরম রাখে, সে নিজে-নিজেই ঘুমিয়ে পড়েছে হঠাৎ; ফাঁক পেয়ে রামের মা এখনই বিছানা ক'রে রাখছে ঘরে-ঘরে, যেন ঘরে-ঘরে হাতে ধ'রে এগিয়ে আনছে রাত্তিরটাকে। সন্ধেবেলাটা যেন মন-কেমন-করা—এমনিতেই স্বাতীর মনে হয়—যেন মন-খারাপ-করা; যখন আলো নিবে যায়, আবার অন্ধকারও ফোটে না, সেই ছাইরঙের ছায়া-ঝরা সময়টায় কে যেন কাকে ছেড়ে চ'লে যায় চিরকালের মতো—একলা থাকলেই কান্না পায় স্বাতীর তবু ভাগ্যিশ ইলেকট্রিক আলো আছে, আকাশ-ভরা ছায়ার কান্নাকে ঘর থেকে ঝেঁটিয়ে বের ক'রে দেয় আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ।

কিন্তু বারান্দায় আলো জ্বালা হয়নি, পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরের আলো একটি-ছুটি লাইন টেনে দিয়েছে বাবার পায়ের কাছে, আর

স্বাতী যেদিকে মুখ ক'রে-বসেছে, আকাশের ঠিক সেখানটায়, ঠিক তার চোখের সামনে দপদপ করছে মস্ত সবুজ একলা একটা তারা—এই সন্ধ্যাতারা ?—পৃথিবীর এত লোকের মধ্যে যেন তারই দিকে তাকিয়ে আছে আকাশের পলক-না-পড়া-চোখ। মানুষের চোখ যখন জলে ভ'রে-ভ'রে ওঠে, এ-তারা যেন সেই রকম, এত পরিষ্কার যে জল দিয়েই বানানো মনে হয়, ঠিক যেন আকাশের গায়ে লেগে নেই, একটু স'রে এসেছে, এক্ষুনি গ'লে প'ড়ে যাবে, যেমন চোখের জল উপচে পড়ে মানুষের চোখ থেকে মুখে।···হঠাৎ, সে বুঝলো না, কেমন ক'রে, কী হ'লো জানলো না, খুব সহজে, একটুও কষ্ট না-দিয়ে দু-ফোঁটা জল পড়লো স্বাতীর চোখ থেকে—কী-রকম চুপচাপ, আর ঝাপসা কুয়াশা, কেমন-একটা ঠাণ্ডা রং-ছাড়া মন-মরা সন্ধ্যা, ঠিক যেন শীত—তা শীত তো এলো, আর শীত এলো ব'লে মন-খারাপ করবার কী আছে, কাঁদবার হয়েছে কী ? নিজেরই হাসি পেলো স্বাতীর—ভাগ্যিশ অন্ধকার, কেউ দেখতে পায়নি—আর আকাশের ঐ তারাটা কী মজার দেখাচ্ছে চোখের জলের ভিতর দিয়ে ! আঁচলে মুছে চোখ ফিরিয়ে আনলো স্বাতী, কান পাতলো কথাবার্তায়।

বাবা বলছেন : 'তোরা তাহ'লে শুক্কুরবারেই যাবি ?'

'হ্যাঁ বাবা—কোর্ট খুলে গেছে ওঁর—আর অনেক দিন তো থাকা হ'লো।'

বড়দি চ'লে যাবে ? এই শুক্কুরবারেই ?···বাঃ, যাবে না ? যেতে তো হবেই। হবেই ? হ্যাঁ, হবেই তো।···কেমন লাগে না-জানি। প্রথম ছেড়ে যেতে কেমন লাগে ? আর তারপরে ? আরো তারপরে ? ···কী-অদ্ভুত মেয়েদের এই দুই জীবন, তারা জন্ম নেয় ছেড়ে যাবার

জন্য, আর ঐ ছেড়ে যাওয়াটাই তাদের সব পাওয়া।···বড়দির নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে যেতে, আরো খারাপ লাগছে বাবার—কিন্তু তাই ব'লে বড়দি তো বললেন না, 'আচ্ছা থাক, আরো ক-দিন থেকে যাই।'

বড়দি বললেন, 'পেনশনের আর কত দেরি তোমার ?'

'দেরি আর কোথায়। একটা বছর কোনোরকমে কাটাতে পারলেই হ'য়ে যায়।'

'কত কাল চাকরি করলে—অ্যাঁ !···আচ্ছা, কী-রকম একটা গলিতে আমরা ছিলুম না একবার ?'

'মনে আছে তোর শাঁখারিপাড়ার কথা ? তখন তো তুই এক ফোঁটা !'

'আমার যেন আবছা-আবছা মনে পড়ে তুমি আপিশে যেতে, আর রোজ আমি তোমার সঙ্গে যাবার জন্য কাঁদতুম। একদিন প'ড়ে গিয়েছিলুম সিঁড়ি দিয়ে, না ?'

'বাবাঃ ! খুব-তো মনে আছে তোর !'

একটু চুপ ক'রে থেকে বড়দি বললেন, 'জীবন ভ'রে কম তো করলে না ; এবারে পেনশন নিয়ে কিন্তু একেবারে ছুটি।'

'নাকি ?'

'নাকি মানে ? আর তোমাকে কিছু করতে দেবো না আমরা। প্রথমেই আমার কাছে গিয়ে থাকবে কয়েক মাস।'

'বে—শ !'

'শুধু বললে হবে না—সত্যি গিয়ে থাকতে হবে। এর মধ্যে বিজুকে কোনো কাজে-কর্মে ঢুকিয়ে দাও একটু চেষ্টা ক'রে।'

'দেখি।'

'পড়াশুনো ওর হ'লো না ব'লে আর-যে কিছু হবে না তা কি বলা যায়?' বাবাকে উৎসাহ দিলেন বড়দি।

'হ'লেই ভালো।' বেশি উৎসাহ কিন্তু লাগলো না বাবার গলায়।

'আর-একটা কথা তোমাকে বলি, বাবা', বোনের দিকে এক পলক তাকিয়ে মুখ টিপে একটু হাসলেন বড়দি। 'স্বাতীর আর দেরি কোরো না।'

'কিসের?' বাবা যেন চকিত হ'লেন।

'ওর এবার বিয়ে হওয়াই তো ভালো।'

বাবা জবাব দিলেন না। ছায়া পড়লো তাঁর মুখে, স্বাতী অন্ধকারেও দেখতে পেলো।

'কী রে? স্বাতী?' বড়দি মুখ ফেরালেন তার দিকে। 'ঠিক না?'

স্বাতী ঠোঁট কামড়ে উঠে দাঁড়ালো। বড়দি ঠাট্টা করলেন, 'আরে বোস, বোস। অমন এলোকেশে উদাস চোখে চ'লে যেতে হবে না। এখন কি আর সে-দিন আছে নাকি যে—' কিন্তু স্বাতী শেষ পর্যন্ত শোনবার জন্য দাঁড়ালো না, ঘরে চ'লে গেলো।

কাঁপা-কাঁপা পরদার দিকে তাকিয়ে শ্বেতা বললো, 'এ-মেয়ে তোমার সুন্দরী হয়েছে—'

'আমার সব মেয়েই সুন্দরী', রাজেনবাবু অস্পষ্ট একটু হাসলেন।

'কী-যে বলো তুমি, ওর মতো নাকি আমরা কেউ!' শ্বেতা খুশিতে ছলছল ক'রে উঠলো, তারপর গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'সত্যি, আর দেরি না। পেনশনের আগেই এটা করা চাই। তারপর আর ভাবনা কী তোমার- একেবারে ঝাড়া হাত-পা।'

বলতে পারে না, আর পারে না ব'লেই কি গান বানায়, কবিতা লেখে? কতদিন কত মন-খারাপই হয়েছে রবীন্দ্রনাথের যাতে ঐ-রকম সব গান বানিয়েছেন। তা-ই না? জিগেস করবেন দেখা হ'লে?

আমি কেমন আছি? ভালো আছি। কী করছি? কিছুই করছি না। মানে, যা করছি তাকে কিছু করা বলে না। আর যাকে কিছু করা বলে, আমি কি তা পারি নাকি?

স্বাতী'

পরের দিন চিঠি ডাকে পাঠাবার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার উত্তরের আশা জাগলো স্বাতীর মনে। আর কি লিখবেন?—আসবারই তো সময় হ'লো। কিন্তু তা-ই যদি, তাহ'লে আমারই বা লেখবার কী হয়েছিলো? কোনো দরকারের জন্য তো আর চিঠি না, কোনো খবর তো দেবার নেই—তবে? কেন? কিসের জন্য?

তার পরের দিন সকালে চা খেতে-খেতে স্বাতীর মনে হ'লো—এতক্ষণে আমার চিঠি পৌঁচেছে! কথাটা যেই মনে হ'লো, যেই সে মনের চোখে দেখলো সত্যেনবাবু খাম খুলে তার চিঠি পড়ছেন, অমনি তার এমন লজ্জা করলো যে মুখ নিচু ক'রে পেয়ালার চায়ের দিকেই তাকিয়ে থাকলো অনেকক্ষণ, পাছে বড়দি জিগেস করেন কী হয়েছে রে! আর তার পরের দিন তার মনে হ'লো—আজ কি উত্তর আসবে চিঠির?

উত্তর এলো না, নিজেই এলেন সত্যেন রায়। তখন এগারোটা বেলা। রান্না চুকিয়ে বড়দি তাঁর মেজো ছুটিকে স্নানের তাড়া দিচ্ছেন—আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তারা ধেই-ধেই লাফাচ্ছে

আর গলা ছেড়ে চ্যাঁচাচ্ছে—সেটাই নাকি নাচ আর গান!—বড়দিকে সাহায্য করবার জন্য স্বাতী তাদের ধরতে গেছে, তারা ছুটছে, আর স্বাতীও ছুটছে পিছনে—ছুটতে-ছুটতে বসবার ঘরে এসে ছাখে, দরজার ধারে হাসিমুখে দাঁড়িয়েছেন সত্যেন রায়।

স্বাতী থমকে গেলো, অচেনা মানুষ দেখে বাচ্চা দুটিও থমকালো, আর সত্যেন রায় বললেন, 'কী, ভালো তো?'

ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগলো স্বাতীর মুখ, কানে যেন ভালো শুনছে না, গলা পর্যন্ত নেমে এলো মুখের জ্বলুনি। ছুটে পালিয়ে যেতো পারলে, এদিকে পা-ও নড়ে না।

ছাত্রীর এ-রকম উশকোখুশকো উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা সত্যেনবাবু আগে কখনো দেখেননি। মুখ টুকটুকে লাল, ঠোঁটে ফোঁটা-ফোঁটা ঘাম, ছোটো-ছোটো চুল কপালে লোটাচ্ছে। একটু তাকিয়ে থেকে আবার বললেন, 'কেমন আছো? ভালো?'

স্বাতী এবার মনস্থির করলো, পিঠের উপর দিয়ে আঁচলটা ঘুরিয়ে এনে সোজা হ'য়ে মুখ তুলে দাঁড়ালো। চেষ্টা ক'রে বললো, 'কবে এলেন আপনি?'

'কাল রাত্তিরে।'

শুনে আর কথা বলতে ইচ্ছে করলো না স্বাতীর। সারা রাত ঘুমিয়ে তারপর সারা সকাল গড়মসি ক'রে পরিপাটি বাবুটি সেজে এতক্ষণে সময় হ'লো!

'তাতা—ছোটন—' ছেলে-মেয়েকে নাম ধ'রে ডাকতে-ডাকতে শ্বেতা এলো ও-ঘরে। 'এই যে—বাবা, হয়রান্ ক'রে দিলি তোরা আমাকে—' বলতে-বলতে হঠাৎ একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে থেমে গেলো।

'ইনি আমার বড়দি,' স্বাতীকে এবার কথা বলতেই হ'লো, 'আর ইনি—ইনি সত্যেনবাবু, আমাদের কলেজের প্রোফেসর।'

প্রোফেসর মাথা নিচু ক'রে নমস্কার জানালেন ; একটু বেশিই নিচু করলেন মাথাটা। স্বাতীর গা জ্ব'লে গেলো।

'তুই তো বেশ, স্বাতী', মাথার কাপড় টেনে দিয়ে শ্বেতা আবছা হাসলো, 'বসতেও বলিসনি এঁকে!'

'না, না, আমি আর বসবো না—বেরোচ্ছিলাম, ভাবলাম একবার—আর আপনাদেরও স্নান-খাওয়ার সময় এখন,' শ্বেতার দিকে তাকিয়েই সত্যেনবাবু বললেন।

ও, বেরোচ্ছেন! তাই ট্র্যামের পথে একবার! দেড় মাস পরে কলকাতায় ফিরে প্রথমেই আড্ডা দিতে হবে সারা শহর ঘুরে, তবে তো! টেবিলে-পা-তোলা ঐ ধ্রুব দত্তদের সঙ্গে দেখা না-হ'লে ভালো লাগবে কেন, আর-তো নেই কথা বলবার যোগ্য মানুষ!

'তুই কী রে?' ঘরে এসে শ্বেতা বললো, 'ভদ্রলোক এমনি-এমনি চ'লে গেলেন—কিছু বললি না!'

'অমনি-অমনি মানে?' একটু ঝাঁঝ স্বাতীর গলায়।

'আহা—পুজোর পরে এলেন—একটু মিষ্টি-টিষ্টি—'

'হ্যাঃ!' স্বাতী মাথা ঝাঁকালো, 'ব'য়ে গেছে ওঁর এখন তোমার মিষ্টি খেতে! দিব্যি ভাত-টাত খেয়ে আড্ডা দিতে বেরোচ্ছেন!'

শ্বেতা হেসে ফেললো বোনের কথায়, কথা বলার ভঙ্গিতে। একটু পরে বললো, 'তোর প্রোফেসর তো ছেলেমানুষ রে!'

'তুমি তবে কী ভেবেছিলে?'

'ইনিই চিঠি লিখেছিলেন তোকে ?'

'হ্যাঁ—' কেমন-একটু ছটফট ক'রে স্বাতী চ'লে গেলো নাইতে। স্নান ক'রে ছটফট ভাবটা কমলো না : উনুনে আঁচ ধরবার আগে যেমন ধোঁয়া হয়, তেমনি একটা অবস্থার মধ্যে কেটে গেলো দিন। আমি একটা মানুষ, আমার আবার চিঠি, আর সে-চিঠির কথা আবার মুখে বলতে হবে! উনি লিখেছিলেন, ওঁর তখন ভাব উথলেছিলো—ছোড়দি ঠিকই বলেছিলো—ও-সব ভাবের চিঠি আমাকে কেন—তা সত্যি-তো আর আমাকে না, যে-কোনো একজনকে পাঠালেই হ'তো, মাসিকপত্রে ছাপিয়ে দিলেই বা দোষ কী—ওতে চিঠির কী আছে ? আমিও বোকা—আবার জবাব লিখতে গিয়েছিলুম—না-হয় লিখেইছিলুম—ডাকে না-দিলেই হ'তো।···না কী পাননি ? তা-ই যেন হয়, হে ঈশ্বর, তা-ই যেন হয়। কিন্তু কী ক'রে জানবো পেয়েছেন কি পাননি ?

সন্ধেবেলা শ্বেতা বললো, 'বাবা, কাল আমি খাওয়াবো তোমাদের।'

'এই এক মাস ভ'রেই তো খাওয়াচ্ছিস,' হাসতে গিয়ে কেমন করুণ হ'লো রাজেনবাবুর মুখ। 'রান্নার কামাই তো একদিনও দিলি নে রে।'

'একদিনও যখন হয়নি, তখন আর একদিনই বা হয় কেন,' প্রমথেশ হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। 'আর কালই তো শেষ।'

'তা তোমাদের ফেআরওএল পার্টি তো আমারই দেয়া উচিত,' রাজেনবাবু লাজুকভাবে তাকালেন জামাইয়ের দিকে।

'না, না, আরে—আপনার মেয়ের যখন শখ হয়েছে—' প্রমথেশ মুখে-মুখে ভোজ্য-তালিকা তৈরি করতে লেগে গেলো, পারলে তক্ষুনি বাজারে ছোটে।

'সত্যি, প্রমথেশের উৎসাহ!' রাজেনবাবু হাসলেন। 'শ্বেতা থাকতে-থাকতে তোর প্রোফেসর ফিরলো না, স্বাতী, তাহ'লে তাকে বলতে পারতিস—'

'সে তো এসেছিলো আজ!' ব'লে উঠল শ্বেতা।

'না, বাবা, না!' স্বাতী দু-হাত তুলে আপত্তি জানালো।

'কেন রে? আমি তো কবে থেকেই ভাবছিলুম—চমৎকার মানুষ—' শ্বেতার দিকে তাকিয়ে রাজেনবাবু কথা শেষ করলেন, 'আর একা-একা থাকে—'

'একা কেন?' শ্বেতার প্রশ্ন।

'কেন, তা তো জানি না, তবে একাই তো দেখি,' উত্তর দিলেন রাজেনবাবু।

'বিয়ে করেনি?' শ্বেতা যেন অবাক। 'পাশ করেছে, চাকরি পেয়েছে, বিয়ে করেনি!'

রাজেনবাবু শব্দ ক'রে হেসে উঠলেন তার কথা শুনে। প্রমথেশ চোখ বড়ো ক'রে বললো, 'আপনার মেয়ের কথা আর বলবো কী···কেউ বিয়ে করেনি শুনলে উনি আর টিকতে পারেন না—ঘটকালিতেও বেশ হাতযশ হয়েছে এর মধ্যে।'

'হবেই!' রাজেনবাবু চোরা হাসি হাসলেন একটু, 'নিজে সুখী হ'লে অন্যকেও—'

'বাবার কথা!' শ্বেতা মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'স্বাতী, চল,' পরের দিন সকালে রাজেনবাবু উদ্‌যোগী হলেন। 'চল তোর প্রোফেসরকে ব'লে আসি।'

'আমি যাবো না!'

'আহা, চল না—'

'কেন, একা যেতে পারো না তুমি?'

'তুইও চল।'

'না! ওঁকে বলবারই বা কী হয়েছে আমি তো জানি না।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রাজেনবাবু বললেন, 'স্বাতী, তোর হয়েছে কী?'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ের মাথা নিচু হ'লো। জবাব দিলো না।

'এত বিরক্ত কেন?'

এবারেও কথা বললো না স্বাতী।

'থাক তবে, আমিই যাই,' জামা প'রে রাজেনবাবু আস্তে-আস্তে বেরিয়ে গেলেন, আর রাস্তায় এসেই দেখলেন স্বাতী তাঁর পাশে।

'এই শাড়িটা প'রেই—'

'তাতে কী?' স্বাতী হাসলো। 'বেশ ভালো তো শাড়িটা।'

'আমার উপর খুব তো তম্বি, আর নিজে এ-রকম থাকিস কেন?'

'ও মা! কী-রকম আবার থাকি।'

'সকালে উঠে চুলটাও বুঝি আঁচড়াতে হয় না?'

'ও ঠিক আছে,' স্বাতী হাত দিয়ে কপালের চুল উল্টিয়ে দিলো।

ইজি-চেয়ারে আধো শুয়ে খবর-কাগজ পড়ছিলেন সত্যেনবাবু। ভঙ্গিটা এমন আরামের, এমন এলানো অলস যে দেখামাত্র আবার চিড়বিড় ক'রে উঠলো স্বাতীর মাথার মধ্যে। আর

তাদের দেখামাত্র সত্যেনবাবু উঠলেন, উঠে দাঁড়িয়ে রইলেন প্রায় হাত-জোড়া-করা বিনীত ভঙ্গিতে, তাতে চিড়বিড়ানি কমলো না, উল্টে বেড়েই গেলো।

'একটা কথা বলতে এলাম আপনাকে—' রাজেনবাবু কোনো ভূমিকা করলেন না—'আজ রাত্রে আমাদের ওখানে একবার—মানে, একেবারে খেয়ে-দেয়ে আসবেন আরকি।'

বাবা-যে কী! কোনো কথা যদি গুছিয়ে বলতে পারেন!

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—' তিনবার 'নিশ্চয়ই' বলার পর হঠাৎ প্রোফেসরের মুখে অন্য কথা যোগালো—'তা—উপলক্ষ্যটা কী?'

'কিছু না—এমনি।'

'কিছুই না?' কিছু-একটা শোনবার আশায় মুখের দিকে তাকালেন সত্যেনবাবু।

'না উপলক্ষ্য কিছু না,' রাজেনবাবু কিন্তু একেবারেই নিরাশ করলেন।

'তা—তা—' হঠাৎ থেমে, স্বাতীর দিকে তাকিয়ে একেবারে অন্যরকম স্বরে সত্যেনবাবু বললেন, 'ঠিক কথা! তোমার চিঠি—'

ঢিপ ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে।

'—কাল সন্ধেবেলা পেলুম। ওরা পাঠিয়ে দিয়েছিলো ঠিকানা কেটে—ভাগ্যিশ—'

ভাগ্যিশ? ঈশ!

'আপনার মেয়ে লেখে বেশ,' প্রোফেসর ফিরলেন বাপের দিকে।

বেশ। পরীক্ষার খাতা নাকি যে বেশ? স্বাতীর ইচ্ছে

হ'লো, ঐ অলক্ষ্মী চিঠিটাকে কুচি-কুচি ক'রে ছিঁড়ে ফেলে এক্ষুনি ওঁর চোখের সামনেই। চিঠি কি ফেরৎ চাওয়া যায়?

মাঝখান থেকে এই হ'লো যে রাত্তিরের ফুর্তিটাই মাটি হ'লো স্বাতীর। সে শুয়ে থাকলো, এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়ালো, একবার বসলো ছোড়দির কাছে, তক্ষুনি আবার উঠে গিয়ে গল্প জুড়লো আতা তাতার সঙ্গে, কিছুতে যেন মন নেই। সত্যেন রায় যখন এলেন, রাজেনবাবু তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রে বসালেন, তারপর ভিতরে এসে স্বাতীকে খুঁজে বের ক'রে বললেন :

'সত্যেন এসেছে রে—'

'এসেছে তো আমি কী করবো।'

'বাঃ!' বেচারা রাজেনবাবুর এর বেশি কথা যোগালো না।

'একা ব'সে আছেন ভদ্রলোক—' প্রমথেশ ব্যস্ত হ'লো, 'তাহ'লে তো—আচ্ছা, আমি বরং আলাপ করি গিয়ে—'

'জামাইবাবু, একটা পাঞ্জাবি—' স্বাতী চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।

'আরে এতেই হবে—' হাসতে গিয়ে গেঞ্জির তলায় নেচে উঠলো প্রমথেশের সুগোল ভুঁড়িটি।

'না, কক্‌খনো না!' চড়া গলা চাপতে গিয়ে স্বাতীর গলা কাঁদো-কাঁদো শোনাল।

'কোথায় আবার এখন জামা-টামা—'

'থাক তাহ'লে।' কারো দিকে না-তাকিয়ে, দুমদাম পা ফেলে স্বাতী সোজা চ'লে এলো বসবার ঘরে।

শান্ত, নিশ্চিন্ত, পরিচ্ছন্ন, সত্যেন রায় ব'সে আছেন জানলার

ধারে চেয়ারে। তাকে দেখে একটু হেসে বললেন, 'কী, স্বাতী, এখনো কি তোমার মন-খারাপ ?'

স্বাতী মাথা নিচু ক'রে চুপ।

'তোমার প্রশ্নটা আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে পেশ করতে পারিনি, কিন্তু এর উত্তর তিনি হয়তো গানেই দিয়েছেন—দেখো-তো খুঁজে, পাও কিনা,' ব'লে সত্যেন রায় বাড়িয়ে দিলেন ব্রাউনকাগজে জড়ানো একটা প্যাকেট।

'কী ?'

' "গীতবিতান"। রবীন্দ্রনাথের গান তো শুধু কান দিয়ে শোনবার নয়, মন দিয়েও পড়বার।'

স্বাতী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই মোড়ক ছাড়িয়ে বের করলো দু-খণ্ড 'গীতবিতান'। ভিতরে লেখা, 'স্বাতীকে—সত্যেন রায়।'—'কেন আনলেন ?' যেন জবাবদিহি চাচ্ছে, এইরকম শোনালো প্রশ্নটা।

'কেন আবার। তুমি পড়বে ব'লে।' একটু পরে সত্যেন রায় আবার বললেন, 'তোমার জন্মদিনের উপহারও মনে করতে পারো।'

'ও মা! জন্মদিন কিসের ?' স্বাতী হেসে ফেললো।

'না বুঝি ? তা হ'তেও তো পারতো।'

'কী আশ্চর্য! আপনি তা-ই ভেবেছেন ?'

'তা না-ই বা হ'লো জন্মদিন। নতুন বই পেতে যে-কোনো দিনই ভালো লাগে। আর এমন বই!'

একেবারে সোনার বোতামওলা সিল্কের পাঞ্জাবি প'রেই প্রমথেশ এলো ঘরে, আর সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে থেকে এলো হারীত, ফিকে-নীল শার্টের উপর টকটকে নেকটাই। স্বাতী পরিচয় করিয়ে দিলো;

সত্যেন রায়ের নমস্কারের উত্তরে প্রমথেশ বিগলিত হাসলো, আর হারীত সোজা একটি হাত তুললো কপালের কাছে, যেন খাপ থেকে উঠলো তলোয়ার। ব'সে বললো 'কদ্দূর ?'

প্রমথেশ হাঁটু দোলাতে-দোলাতে বললো, 'আরে এই তো এলে, আর এসেই—'

'কী করি, কাজ!' উঁচু দরের একটু হাসি ফুটলো হারীতের ঠোঁটে। 'খাওয়াতে আর খাওয়ানোতে এত সময় যায় বাঙালির যে কাজ করবে কখন!' হারীত তাকালো সত্যেন রায়ের দিকে, ঠিক বোঝা গেলো না, সমর্থনের আশায়, না ভালোমানুষ চেহারার শিক্ষকটিকে শিক্ষিত করতে।

'চিনেদের শুনেছি আরো বেশি,' সত্যেন রায় বললো।

'সে-জন্যই তো এই অবস্থা চিনের। জাপান ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে! তা মার খেয়ে বুদ্ধি খুলেছে এতদিনে, যুদ্ধ করতেও শিখেছে।'

'বুদ্ধি মানেই যুদ্ধ করা ?' জানতে চাইলো ক্ষীণবুদ্ধি প্রমথেশ।

হারীত একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। নাঃ, বোকাদের সঙ্গে কথা ব'লে কিছু হয় না—শুধু সময় পণ্ড, শুধু মেজাজ নষ্ট! এদিকে শ্বশুরবাড়ি—না-এসেও পারা যায় না—মুশকিল!

'চিনেরা যখন ছ-ঘন্টা ধ'রে রাঁধতো আর ছ'ঘণ্টা ধ'রে খেতো,' সত্যেন মৃদুস্বরে বললো, 'তখন কিন্তু কবিতা লিখতো খুব ভালো।'

'কবিতা!' সঙ্গে-সঙ্গে হারীত ঘোড়ার মতো টগবগ ক'রে উঠলো। 'পায়ে পা তুলে ব'সে একটু-একটু ক'রে চিনে কবিতা চাখতে মন্দ লাগে না, কিন্তু চিনকে, চিনের কোটি-কোটি মানুষকে কি তা বাঁচাতে পারলো ?'

'সকলকে বাঁচাতে পারেনি ব'লেই তো মনে হয়,' সত্যেন সায় দিলো কথায়। 'চামড়া-কোট-পরা চিনে যুবক মেঝেতে লাথি ঠোকে তাদের পুরোনো ল্যাণ্ডস্কেপকে লক্ষ্য ক'রে, এবার শান্তিনিকেতনে শুনলুম নন্দলালের কাছে।'

'ঠিক করে! কী হবে আর ও-সব দিয়ে। এই তো—' হারীত হাত বাড়িয়ে খপ ক'রে ধরলো টেবিলে রাখা 'গীতবিতানে'র একটি খণ্ড—স্বাতীর মনে হ'লো যেন একটা বেড়াল লাফিয়ে পড়লো ইঁদুরের ঘাড়ে—'রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই বা কী হবে আর।'

'সে কী! স্বাতীর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'রবীন্দ্রনাথ আবার কী-দোষ করলেন?'

'এই দোষ,' তৈরি জবাব হারীতের মুখে, 'যে তাঁর লেখা প'ড়ে কেউ যোদ্ধা হ'তে পারে না। নিজেই নিজের ভুল বুঝেছেন এতদিনে—এই-তো লিখেছেন সেদিন—' একই সুরে, গড়গড়ে গন্থ ক'রে, কমা-টমা সব উড়িয়ে দিয়ে আউড়িয়ে গেলো, ' "শান্তির বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস, বিদায়ের আগে ডাক দিয়ে যাই দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে প্রস্তুত হতেছে ঘরে-ঘরে।" '

খেতে-খেতে দাঁতে কাঁকর পড়লে যেমন হয়, সেই রকম একটা শিউরানি সহ্য ক'রে নিয়ে সত্যেন বললো, 'বোধ হয় "শান্তির ললিত বাণী" আর বোধ হয় 'বিদায় নেবার আগে তাই"—'

'ও একই কথা, একই কথা।—আসল কথাটা এই যে ও-সব শান্তি-ফান্তি দিয়ে এখন আর কিছু হবে না—এখন যুদ্ধ চাই, যুদ্ধ!' ব'লে হারীত বীরদর্পে পাইপ ঠুকলো চেয়ারের হাতলে।

হারীতের কথা শুনতে-শুনতে হাঁ হ'য়ে গিয়েছিলো প্রমথেশের

মুখ, হুশ ক'রে একটা নিশ্বাস ছেড়ে ব'লে উঠলো, 'তা যুদ্ধ তো হচ্ছেই !'

'যুদ্ধের এখনই কী ! ওৎ পেতে আছে না বনবিড়ালি জাপান !—' হারীত আরো কিছু বলতো, কিন্তু হঠাৎ প্রমথেশ স্বাধীনভাবে একটা মন্তব্য ক'রে ফেললো, 'ওদিকে রাশিয়াও তো—ফিনলণ্ড নাকি লণ্ডভণ্ড— সত্যি ?'

'আত্মরক্ষার জন্য ও-রকম করতেই হয়', ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে গেলো হারীত। 'আপনার বাড়িতে ডাকাত পড়লে আপনি কী করেন ?'

প্রমথেশ ভেবেই পেলো না ফিনলণ্ড কবে ডাকাতি করতে গিয়েছিলো রাশিয়ায়। কী জানি—সে খবরও বেশি রাখে না, বোঝেও না কিছু—আর এসব যুদ্ধ-টুদ্ধ কেনই বা করে মানুষ, মিলে-মিশে সুখে থাকলেই তো পারে। মনের কথাটা মুখেই ব'লে ফেললো, 'যা-ই বলো বাপু, যুদ্ধটা বড়ো বিশ্রী ! মানুষই তো মানুষকে মারে—অ্যাঁ !'

ঐ 'অ্যাঁ'টা হারীতের কানে শোনালো 'ভ্যা'র মতো। ভেড়ার পাল সব ! প্রোফেসরটিকেও তো দিব্যি ভেড়ু-ভেড়ু লাগছে—দেখা যাক। সত্যেনের দিকে ফিরে তর্ক তুললো : 'আপনি কী বলেন ? আর্ট যদি এখন হাতিয়ার না হয়, তবে আর সে আছে কী করতে ?'

'কিসের ?' ভীরু প্রশ্ন সত্যেন রায়ের।

'কিসের আবার ! শিকল ভাঙার হাতিয়ার।'

'কিসের শিকল ?'

'ক্ষুধার, দুঃখের, দাসত্বের শিকল !' এতটা বোঝাতে হ'লো ব'লে হারীত একটু অবজ্ঞার হাসিতে ঠোঁট বাঁকালো।

'ক্ষুধা, দুঃখ, দাসত্ব—মানে ?'

'মানে ?'—হারীত আশা করেনি প্রশ্নটা, কিন্তু ওস্তাদ খেলোয়াড়ের মতো লুফে নিয়ে তক্ষুনি আবার ফেরৎ পাঠালো—'এর মানে কি ঠিক কথায় বোঝানো যাবে ? যদি কেউ আপনাকে হাত-পা বেঁধে অন্ধকারে ফেলে রাখে, আর দিনের পর দিন খেতে না-দেয়, হয়তো তাহ'লে আস্তে-আস্তে বুঝবেন ? হারীত চেষ্টা করলো খোশমেজাজি ধরনে হাসতে—তাতে আরো ধার হ'তো ঠাট্টায়—কিন্তু তা ঠিক হ'লো না, ঘোঁৎ করে খেঁকিয়ে উঠলো তার হাসিটা।

আর সেই রাগি আওয়াজের সামনে যেন ঘাবড়ে গিয়ে আমতা-আমতা করলো সত্যেন, 'ও, খাওয়া-পরার কথা। আমি ভাবছিলাম আপনি আর্টের কথা বলছেন।'

'হ্যাঁ, খাওয়া-পরার কথা!' হারীত গর্জন করলো এবার। 'তা-ই চায় মানুষ—খাওয়া-পরা চায়, চায় কাজ, বিশ্রাম, আশ্রয়, স্ত্রী। আর ও'সব পায় না যারা, তারা দেখছি ভারি বেআদব হ'য়ে উঠেছে আজকাল, বড়োই চ্যাঁচামেচি করছে পৃথিবী ভ'রে—ঋষিদের ধ্যানভঙ্গ হয় আরকি!' কথাটা শেষ ক'রে হারীত জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো, যেন বলতে চায়, 'এইবার ?'

কিন্তু মাস্টারটি আর জবাব দিলো না। থাকলে তো দেবে! হারীত চট ক'রে একবার দেখে নিলো প্রমথেশের আর স্বাতীর মুখ, দু-জনকেই একটু নিস্তেজ লাগলো। •তাহ'লে কাজ হয়েছে তার কথায়! একটু পরে যখন খাবার ডাক এলো, সে সকলের আগে উঠে দাঁড়িয়ে বেশ মোলায়েমভাবেই বললো, 'চলুন, সত্যেনবাবু।'

অন্ধকার থেকে আলোর পথে এদের একটুখানিও এগিয়ে আনতে পেরে মনটা বেশ খুশি লাগলো তার, তাছাড়া কথাবার্তা ব'লে খিদেটিও পেয়েছে চনচনে।

হারীত-শাশ্বতী চ'লে গেলো খাওয়ার পরেই, সত্যেন একটু বসলো। যাবার সময় বার-বার বিদায় নিলো শ্বেতার কাছে।—'কালই চ'লে যাচ্ছেন আপনারা?'

'যাচ্ছি তো।'

'আমিও ফিরে এলুম্ আর আপনারাও চললেন!'

'তবু-তো দেখা হ'লো—কত ভালো লাগলো।'

একটু চুপ ক'রে থেকে, খুব নরম সুরে সত্যেন বললো, 'আর বুঝি থাকা যায় না কিছুতেই?'

শ্বেতা হেসে বললো, 'আবার আসবো।'

'আসবেন তো?' সত্যেন যেন চোখ ফেরাতে পারলো না শ্বেতার মুখ থেকে।

'বড়ো ভালো তো ছেলেটি,' সত্যেন চ'লে যাবার পর শ্বেতা বললো তার বাবাকে।

'তোর হাতে একবার যে খেয়েছে, শ্বেতা,' রাজেনবাবু হাসলেন, 'সে কি আর ভুলতে পারে তোকে।'

'ছেলেটির কেউ নেই বুঝি?'

স্বাতীর যেন ভালো লাগলো না কথাটা; বাঁকা সুরে বললো, 'আ—হা, একজন বড়োসড়ো পুরুষমানুষ—তার আবার কে থাকবে!'

'তবে যে বলেছিলি মা-বাবা ভাই-বোন নেই?'

'তার মানেই বুঝি কেউ নেই হ'লো?'

'আহা—' স্বাতীর শেষ কথাটা লক্ষ্য করলো না শ্বেতা—'এখানে তবু একটা বাড়ির স্বাদ পেলো! পুরুষমানুষ—কত যুদ্ধ সারাদিন—কিন্তু সারাদিনের পর একটা বাড়ি তো চাই।'

হঠাৎ শ্বেতাকে দুই হাতে জড়িয়ে ধ'রে স্বাতী বললো, 'বড়দি, তুমি যেয়ো না।'

শ্বেতা হাত রাখলো বোনের মাথায়।

'না—যেয়ো না—সত্যি—' গলা বুজে এলো, কাঁপতে লাগলো দিদির কাঁধে মুখ লুকিয়ে।

'সে কী! কাঁদছিস নাকি?...এই! বোকা মেয়ে!' ঠেলা দিলো বোনের মাথায়, তার ঝাপসা চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা বোকা তো! কাঁদবার হয়েছে কী...চল, শুবি চল।' উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে স্বাতীকেও কোমরে ধ'রে টেনে তুলে আবার বললো, 'তোর আর কী—কাঁদলেই হ'লো—এদিকে আমার-যে তাতে কষ্ট হয়, সে-কথা ভাবিস? থাম এক্ষুনি, নয়তো আমিও কিন্তু কেঁদে ফেলবো।' এমন মজার মুখভঙ্গি ক'রে বললো যে স্বাতী ভিজে চোখে হেসে ফেললো।

সে-রাত্রে সে বড়দির কাছে শুলো, ফিশফিশে গলায় একটু-একটু গল্প করতে-করতে ঘুমিয়ে পড়লো—এমন আরামে কতকাল যেন ঘুমোয়নি। উঠতে বেলা হ'লো পরের দিন—বড়দি এর মধ্যেই বাঁধাছাঁদা নিয়ে ব্যস্ত। স্বাতীও লেগে গেলো কাজে, খুঁজে খুঁজে জড়ো করলো সারা বাড়িতে ছড়ানো-ছিটানো বাচ্চাদের জামা-জুতো, শাড়ি ভাঁজ করতে লাগলো মেঝেতে হাঁটু ভেঙে ব'সে। শ্বেতা যা

এনেছিলো তার চাইতে নিয়ে যাচ্ছে অনেক বেশি—জামাকাপড়চোপড় কত কেনা হ'লো, বুদ্ধি ক'রে বাচ্চাদের শীতের জামাও কিনে ফেলেছে প্রমথেশ—এখন ধরানোই মুশকিল। বড়ো স্যুটকেসটি এমন আকণ্ঠ হ'লো যে ডালা কিছুতেই বন্ধ হয় না; দু-বোনে দু-দিক থেকে চাপ দিয়ে-দিয়ে নামিয়ে আনে এক-একবার, কিন্তু যেই আটকাতে যায়, অমনি ছিটকে উঠে যায় কট ক'রে—আর একসঙ্গে হেসে ওঠে দু-জনে; শেষটায় স্বাতী চেপে বসলো স্যুটকেসের উপর, তারপর দু-জনে একসঙ্গে ব'সে নিচু হ'য়ে চেষ্টা করলো দু-দিকে—কিন্তু ডালাটা বড়ো অবাধ্য, আর যত অবাধ্যতা করে, তত বেড়ে যায় শ্বেতা-স্বাতীর ফুর্তি। এরই মধ্যে রাজেনবাবু এলেন বড়ো একটা পীসবোর্ডের বাক্স হাতে ক'রে, শ্বেতার সামনে নামিয়ে একটু দূরে আলগোছে বসলেন খাটের উপর।

মেঝেতে হাঁটু তুলে ব'সে, হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে শ্বেতা আস্তে-আস্তে বের করলো আলতা, সিঁদুর, পাউডর, সেন্ট, মাথার তেল, চুলের কাঁটা, চুলের ফিতে, সাবান, হেজলিন স্নো—আর এক বাক্স ডিম-সন্দেশ। কিছু বললো না, একটু দেখলো তাকিয়ে, তারপর একটি-একটি ক'রে, প্রত্যেকটির গায়ে যেন হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে আবার তুলে রাখলো সেই কাগজের বাক্সে, দোকানেরই সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলে এতক্ষণে বাবার দিকে চোখ তুললো। রাজেনবাবু উঠে চ'লে গেলেন অন্য ঘরে।

এর পরে দিনটা কেমন এলোমেলো হ'য়ে গেলো। বাবা আপিশে গেলেন, আর আপিশ থেকে ফিরলেন—মাঝখানকার সময়টা যেন বোঝাই গেলো না, দিনের গাড়ি হুশ ক'রে চ'লে

গেলো রওনা থেকে পৌঁছনোয়। শাশ্বতী এলো, আবার হাসাহাসি গল্প খানিকক্ষণ, আজ যেন হাসিটা কিছু বেশি—ফাঁকে-ফাঁকে এরই মধ্যে কত কাজের কথা মনে পড়লো শ্বেতার, অনুকূল কতবার ছুটলো দোকানে, ঐ দম-বন্ধ-বন্ধ স্যুটকেস খোলা হ'লো দু-তিন বার, বিছানা বাঁধবার সময় বিজু এগিয়ে এলো আস্তিন গুটিয়ে, প্রমথেশ দিবানিদ্রার আশা ছেড়ে দিয়ে কেবলই পান-জরদা খেতে লাগলো। হঠাৎ এক সময় দেখা গেলো বাঁধাছাঁদা সব শেষ, খাবার-ভরতি-ভরতি দুটো টিফিন-কেরিআর কাঠের খাপে-বসানো কুঁজোর পাশে দাঁড়িয়ে, বাচ্চারা ফিটফাট ঘুড়ে বেড়াচ্ছে নতুন জুতোয় খটখট শব্দ ক'রে। রাজেনবাবু শ্বেতার কাছে এসে বললেন, 'এখন আবার পান সাজতে বসেছিস ? ওঠ, সময় হ'লো।'

'স্বাতী, বাবার ডিবেটা—'

'অত পান দিয়ে আমার কি হবে,' রাজেনবাবু বললেন। 'প্রমথেশের জন্য বেশি ক'রে নে, পথে-ঘাটে—'

ওঁরটা নিয়েছি।'

শ্বেতা উঠে গা ধুয়ে প'রে নিলো খয়েরি রঙের খদ্দরের শাড়ি—গাড়িতে ময়লা হবে না—সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলো শাশ্বতীকে, নিজেও পরলো, তারপর এসে বসলো বারান্দার সিঁড়িতে।

শাশ্বতী বললো, 'কী-একটা স্যাণ্ডেল পরেছো বড়দি—সেদিন না বাবা তোমাকে নতুন এনে দিলেন ?'

'হ্যাঁঃ—ঐ লাল টুকটুকে নতুন স্যাণ্ডেল নষ্ট করি আরকি পথে-ঘাটে প'রে! এটা খারাপ কী—বেশ তো।'

'শ্বেতা,' রাজেনবাবু মিটিমিটি হাসলেন, 'এখনো তোর ইচ্ছে করে নাকি রে নতুন জুতো নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকতে ?'

'ইচ্ছে করলেই পারি নাকি বড়ো মেয়েটার যন্ত্রণায়! আমার জুতোগুলো প'রে-প'রে ছারখার ক'রে দেয় না!'

প্রমথেশ গলা-খাঁকারি দিলো, 'তাহ'লে—বিজু ভাই, একটা ট্যাক্সি—না, দুটো—শাশ্বতীও যাবে স্টেশনে, তুমি ফেরবার সময় পৌঁছিয়ে দিতে পারবে না ওকে ?'

'নিশ্চয়!' বিজু চট্‌পট বেরিয়ে গেলো।

'হারীত এলো না রে ?' শ্বেতা জিগেস করলো।

'কথা-তো ছিলো—' ক্ষীণ উচ্চারণ করলো শাশ্বতী।

'সময় পায় না—কত কাজ করে কত দিকে, আর কী কথা বলে, বাঃ!' প্রমথেশ তারিফ ক'রে মাথা নাড়লো। 'আমাদের মতো তো নয় যে শুয়ে-ব'সে আইঢাই!'

'বাবা, সত্যেন তো এলো না আজ একবারও ?'

'সে আসে আর কোথায়—কচিৎ এক-আধদিন—'

'নাকি ? কাছেই থাকে না ? তা—যা লাজুক—আমার ওখানে একবার আসে তো বেশ হয়। ওকে বলিস, স্বাতী। কেমন ?'

শাশ্বতী বললো, 'স্বাতী, তুই যাবি না ?'

স্বাতী চুপ ক'রে ব'সে ছিলো গালে হাত রেখে, যেন চমকে উঠে বললো, 'কোথায় ?'

'স্টেশনে যাবি না আমাদের সঙ্গে ?'

স্বাতী মাথা নাড়লো।

'কেন, চল না।'

'ন্না—'

বিজু এসে মোটা গলায় বললো, 'ট্যাক্সি এসেছে।' সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ স্তব্ধ হ'য়ে গেলো সব ক-টি মানুষ, আর ঠিক যেন সেই মুহূর্তটিতে পৃথিবীতে সন্ধ্যা নামলো। যেদিন সত্যেন রায়ের চিঠি পেয়েছিলো, আর ব'সে ব'সে দেখেছিলো জ্বলজ্বলে জল-ভরা সন্ধ্যাতারা, ঠিক সেইরকম লাগলো স্বাতীর, আবার সেই বুক-ভাঙা সন্ধ্যা, ছাইরঙা, ছায়াভরা, কুয়াশায় ঝাপসা, আকাশ আর পৃথিবী ভ'রে সেই অসহ্য বিদায়। নিঃশব্দে মাল তুললো দু-জন চাকর, নিঃশব্দে রাজেনবাবু একবার দেখে এলেন সব ঠিকমতো উঠলো কিনা, একবার ঘুরে এলেন ঘরগুলি, দরকারি কিছু প'ড়ে রইলো না তো?—ছায়া ছড়ালো, ঘনালো, আর ছায়ার মতোই স্বাতী দেখলো বড়দি প্রণাম করলেন বাবাকে, প্রণাম করার পরিশ্রমে জামাইবাবু হাঁপাতে লাগলেন ছড়িতে ভর দিয়ে, তারপর বড়দি এসে হাত রাখলেন তার পিঠে, গাল রাখলেন গালে; আস্তে হেঁটে-হেঁটে সবাই এলো রাস্তার ধারে, ট্যাক্সিতে ঢুকতে গিয়ে জামাইবাবু স'রে এলেন, মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ বললেন, 'স্বাতী, তাহ'লে যাই?…এত আনন্দ শিগগির করিনি, আবার কবে…যাই, কেমন?'—ব'লে হাসলেন, বড্ড বোকার মতো সেই হাসিটা।

একটু পরে সেই শূন্য, স্তব্ধ, ম'রে-যাওয়া বাড়িটার মধ্যে রাজেনবাবু এসে স্বাতীর কাছে বসলেন।…'স্বাতী, কাঁদিস কেন?'

উপুর হ'য়ে, বালিশটাকে কামড়ে ধ'রে, স্বাতী ফুলে-ফুলে উঠতে লাগলো।

'আর কাঁদে না। লক্ষ্মী, সোনা, আমার স্বাতী-সোনা, আর কাঁদে না।'

কিন্তু কান্না তো থামে না স্বাতীর। কী ক'রে থামবে? কে চ'লে গেলো এই বাড়ি ছেড়ে? বড়দি? না, না, আমি, আমি— স্বাতী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করলো মনে-মনে—এ-তো আমি; রোজ সন্ধেবেলা সমস্ত আকাশ কাঁদিয়ে যে চ'লে যায়, সে-তো আমি; আবছা অন্ধকারে শূন্য মাঠে ছোট্ট ইস্টেশনে রেলগাড়ি যাকে নামিয়ে দিয়ে যায়, সেও তো আমি! বাবা, আমি যাবো না; বাবা, আমি যাবো না!—কিন্তু এ-কথা শোনেই-বা কে, আর তেমন ক'রে বলতেই-বা আর পারে না কেন? আর পারে না ব'লেই তো আরো কান্না পায়।

'স্বাতী···স্বাতী···স্বাতী রে···'

স্বাতী চোখ খুললো না, মুখ তুললো না। বাবা তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলেন মেয়ের বালিশ-জড়ানো সুগোল শাদা হাতের দিকে, কালোচুল-ছড়ানো কেঁপে-কেঁপে-ওঠা পিঠের দিকে। ···তাহ'লে ওর এমন দুঃখও আছে যা আমি বুঝি না, তাহ'লে ওর এমন কান্নাও হয়েছে যা আমি থামাতে পারি না। চুপ ক'রে পাশে বসলেন; আর ডাকলেন না, নড়লেন না, ছুঁলেন না; ব'সে-ব'সে কত কথা মনে পড়লো, কত কথা মনে হ'লো। কোনোখানে কোনো শব্দ নেই, চুপচাপ বুক-ফাটা বাড়িটার মধ্যে ঠেলে-ঠেলে উঠতে লাগলো স্বাতীর বুকের ভিতর থেকে কান্নার হাওয়া, আর জানলা দিয়ে ঝিরিঝিরি কোঁকড়া হাওয়া মাঝে-মাঝে গায়ে তুলে গেলো প্রথম-শীতের শিউরানি।

৩

শীত প'ড়ে এলো পৃথিবী ভ'রে মন-খারাপ ছড়িয়ে। কী মন-মরা রং-ঝরা সন্ধ্যা, আর বিকেলটা ছোট্টো একটুখানি, যেন রোগা, সরু, ভীরু, কোনোরকমে একবার ঝিলিক দিয়েই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই-তো সেদিনও কত রং ছিলো বিকেলে—বেগনি আর বাদামি আর সবুজ, হলদে আর সবুজ আর সোনালি, এক-একদিন সন্ধেবেলাটাকে মনে হ'তো গোলাপি সমুদ্র, টুকরো মেঘগুলি সোনালি গাছ, আর সমুদ্রের তলে সোনালি ঘাস, সোনালি গাছ—দেখতে-দেখতে সব মিলিয়ে গেলো। সন্ধ্যার সিঁদুর-রং হ'লো ইঁদুর-রং, আকাশটা যেন বিধবার কপাল।

ঝিরঝির, শিরশির ক'রে শীত এলো, স্বাতী দেখলো একা ব'সে-ব'সে। রোজ একটু-একটু ক'রে কাছে এলো, আর যত কাছে এলো তত যেন ভালো হ'লো, ভালোবাসলো ; ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু-একটু ক'রে ঝ'রে পড়লো মন-খারাপ, গাছের গা থেকে একটি-একটি ক'রে পাতার মতো ; ঠাণ্ডা জল শান্তি আনলো, আর সকালবেলা স্নানের পর নরম নীল রোদ্দুরের দিনটি যেন পৃথিবীর হাতে ধরা এক আশ্চর্য উপহার। আশ্চর্য লাগলো স্বাতীর—আশ্চর্য এইজন্য যে শীতও সুন্দর, আকাশ এত শান্ত আর দিন এত নরম তো আর-কখনও হয় না—তবে কি যা-কিছু হয় তা-ই ভালো, আর যা-কিছু আছে তা-ই সুন্দর? কত সুন্দর, তা কি লোকে জানে? কই, তাদের মুখ দেখে তা মনে হয় না তো।

রাস্তায় বেরোলে, কি একটা ট্র্যামে উঠলে, কী-রকম সব মুখ চোখে পড়ে? হোমরা মুখ, গোমরা মুখ; ছোকরারা ফুর্তিতে ফাজিল, কেউ চোখা-চোখা, কেউ বোকা-বোকা; কিন্তু কোনো মুখেই এ-কথা লেখা নেই যে—কী? একটু থমকালো স্বাতীর মন, সন্ধের পরে আলো-জ্বলা টেবিলে লজিকের বইয়ের পাতায় আঙুলের চাপ পড়লো একবার, তারপর মনের চোখে সে দেখলো সত্যেন রায়ের মুখ—মুখশ্রী। প্রথম যখন দেখেছিলো মনে হয়নি মানুষটা সুন্দর, মনে হওয়াটাও—যদি তখন এ নিয়ে ভাবতো—সম্ভব মনে হ'তো না, কিন্তু হ্যাঁ, সুন্দরই তো। যা সুন্দর, তা সুন্দর লাগে ওঁর চোখে—আর তাই ওঁর চোখের তাকানো—

হাতের চাপ পড়লো কাঁধে, স্বাতী ফিরে তাকালো চমক-লাগা বড়ো চোখে। শাশ্বতী হেসে বললো, 'বা-বাঃ! অমন আত্মহারা হ'য়ে ভাবছিলি কী?'

স্বাতী উঠে দাঁড়ালো।—'কখন এলে?'

'এক্ষুনি এলাম, আবার এক্ষুনিই যাবো!'

ছোড়দির সাজগোজের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'নেমন্তন্ন বুঝি কোথাও?'

'পিরোজপুরের রাজবাড়িতে।'—একটু থেমে—'অনেক লোকজন, খাওয়ার দেরি আছে; তাই ভাবলাম একবার ঘুরে যাই। কাছেই তো।' শাশ্বতী ন'ড়ে-চ'ড়ে শাড়ির জেল্লা তুললো ইলেকট্রিক আলোয়। তারপর স্বাতী কিছু বললো না দেখে আবার বললো, 'ঐ-যে সাদার্ন এভিনিউতে বিরাট গোলাপি রঙের বাড়িটা!'

ছোড়দিকে নিরাশ করতে খারাপ লাগলো স্বাতীর, মুখে-চোখে ভান করলো যেন সে জানে সাদার্ন এভিনিউতে পিরোজপুরের রাজবাড়ি কোনটা। জিগেস করলো, 'হারীতদা এলেন না?'

'না—যা আড্ডা জমেছে! রাজার ছেলে বন্ধু কিনা—হারীতের', মাত্র একটুখানি চেষ্টা ক'রে খুব সহজেই নামটা উচ্চারণ ক'রে ফেললো শাশ্বতী। 'বিলেতে আলাপ ওঁদের। পাঁচ বছর বিলেতে কাটিয়ে আমেরিকা চিন জাপান ঘুরে এই সেদিন ফিরেছেন মকরন্দ মুখুয্যে। তোকে বলবো কী—' শাশ্বতীর মুখের ভাঁজে-ভাঁজে খুশি ফুটলো, 'অত্ত বড়োলোক, অথচ কী ভদ্র!'

কথাটা নিয়ে একটু-যেন ভেবে স্বাতী বললো, 'বড়োলোকরা ভদ্রলোক বুঝি হয় না?'

কথাটা গ্রাহ্য না-ক'রে, কিংবা লক্ষ্য না-ক'রে, শাশ্বতী একটা বড়ো খবর দিলো, 'জানিস, জাপান নিশ্চয়ই যুদ্ধে নামবে!'

'নাকি?'

'তাহ'লে আর রক্ষে নেই আমাদের—' গলা নামিয়ে, প্রায় কানে-কানে শাশ্বতী বললো, 'ভী-ষ—ণ বদ জাপানিরা!'

স্বাতী আবার বললো, 'নাকি?'

'কিছুই-তো জানতে পারি না আমরা, চিনদেশে যা কাণ্ড—' পিরোজপুরের রাজপুত্রের মুখে এইমাত্র যা শুনে এসেছে, সেগুলি গরম-গরম উগরে তুললো শাশ্বতী, আর স্বাতী শুনলো যেন হারীতদাই কথা বলছেন, কথার উচ্চারণ পর্যন্ত সে-রকম হ'য়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো ছোড়দিকে; কত মোটা হয়েছে, ফুটফুটে ফর্শা, টুকটুকে লাল, সুন্দরী বলবে সবাই, কিন্তু সুন্দর?

'কী রে?' জাপানি জন্তুর বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ শাশ্বতী সচেতন হ'লো। 'কী দেখছিস? নেকলেসটা?' খুশি হ'য়ে, অথচ একটু লজ্জার ভঙ্গিতে নিজের গলার দিকে চোখ নামালো ঘাড়ে স্পষ্ট দুটো রেখা ফুটিয়ে। 'কেন, এটা প'রে এসেছি তো আগে—আমার শ্বশুর দিয়েছিলেন বিয়ের সময়—' মোহরের মতো গোল-গোল চাকতি-বসানো লাল সোনার ফাঁসটিকে শাশ্বতী মোটা-মোটা আঙুল দিয়ে ছুঁলো একবার—'সুন্দর না?'

স্বাতী ক্ষীণস্বরে বললো, 'ছোড়দি, সুন্দর কাকে বলে?'

'নাঃ!' শাশ্বতী হা-হা ক'রে হেসে উঠলো যেমন ক'রে পুরুষরা হাসে। 'তুই বড্ড ভাবুক হ'য়ে উঠছিস দিন-দিন। তা তোর বয়সে ও-রকম একটু হ'য়ে থাকে কোনো-কোনো মেয়ের—আবার সেরেও যায়—,' চোখে একটুখানি হাসি চিকচিক ক'রে উঠলো, বিশুদ্ধ মেয়েলি হাসি এবার, 'সময়মতো।'

বাবার সঙ্গে মিনিট দশেক গল্প ক'রেই শাশ্বতী উঠলো। রাজেনবাবু মেয়েকে এগিয়ে দিলেন প্রায় রাজবাড়ির গেট পর্যন্ত, স্বাতীও গেলো সঙ্গে। ফেরবার পথে বললো, 'বাবা, লেকের ধারে একটু বসবে?'

'বেশ!'

কৃষ্ণপক্ষের রাত, তার উপর ঠাণ্ডাও পড়েছে একটু; লেকের ধারে লোক কম, কিন্তু যতটা কম হ'তে পারতো তার চেয়ে বেশি। একেবারে খালি বেঞ্চি একটাও নেই। একটু ঘোরাঘুরি ক'রে স্বাতী বললো, 'এসো বাবা, ঘাসেই বসি।' ক-দিন একেবারেই ঘর থেকে বেরোয়নি, আজ দৈবাৎ রাস্তায় পা দিয়ে খোলা হাওয়ায় আকাশের তলায় ভালো লাগছিলো তার।

জুতো থেকে পা বের ক'রে ভিজে ঘাসের গায়ে একবার ঠেকিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'না রে,—'

এমন সময় জলের ধারের বেঞ্চি থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আপনারা এখানে বসুন।'

'আপনি—!' স্বাতী ব'লে উঠলো একটু জোরেই।

'বোসো, স্বাতী।' সত্যেন রায় এমন সুরেই কথা বললেন, যেন এটা তাঁর বাড়ির বসবার ঘর আর স্বাতী নিমন্ত্রিত।

স্বাতী বসলো ধারে, আর রাজেনবাবু তার পাশে বসতে-বসতে বললেন, 'তিনজনেই তো বসা যায় এখানে।'

'আমিও বসছি,' বেঞ্চির আর-এক ধার দখল করলেন সত্যেন রায়।

হাঁটুতে কনুই আর হাতে থুতনি রেখে সামনের দিকে মুখ বাড়িয়ে স্বাতী বললো, 'আপনি-যে লেকে ?'

'কেন, আসতে নেই ?'

'লেকে তো সবাই আসে।'

'তাতে কী ?'

'সবাই যায় ব'লেই আপনার যেতে ইচ্ছে করে না বলছিলেন ?'

'কবে বলেছিলাম ?'

স্বাতী ঠিক বুঝতে পারলো না এ-রকম কোনো কথা সত্যেন রায় কি সত্যিই বলেছিলেন, না কি সে-ই নিজের মনে ভেবে নিলো এইমাত্র। আর এই একটু চুপ-থাকার ফাঁকে, 'তা এসেছিলাম ব'লেই তো তোমার সঙ্গে দেখা হ'লো', ব'লে পিঠ টান ক'রে বেঞ্চিতে হেলান দিলেন তিনি।

আহা! দেখা করতে চাইলে আবার—তু-মিনিট দূরে তো থাকেন! অনেক কথা টগবগ ক'রে উঠলো স্বাতীর মনের মধ্যে কিন্তু কোনো কথাই কি বলা যায় ছাই! শুধু বাজে কথা ব'লেই জীবন কাটাতে হয়। স্বাতী হাত সরালো না থুতনি থেকে, কনুই আরো শক্ত করলো হাঁটুর উপর, টনটনে পিঠে তাকিয়ে রইলো তারার আলোয় ঝিলিমিলি জলের দিকে, এক-এক জায়গায় ইলেকট্রিকের আলো যেন কালো জলের ছাল ছাড়িয়ে নিচ্ছে, অথচ জল যেন চলে না, আর সেইজন্য সমস্তটা কেমন মরা-মরা। এতখানি জল, জলের মধ্যে ঘন গাছের দ্বীপ, আবার দূরে একটা সাঁকো; তবু সবটাই যেন সাজানো, বানানো, যেন সত্যি নয়—বাঃ, বানানো জিনিশ তো বানানোই হবে! যা-কিছু বানানো তা-ই বুঝি এ-রকম, আর যা নিজে-নিজে হয় তা-ই সুন্দর? কিন্তু কবিতাও তো বানানো, তবু বানানো যে লাগে না?

সোজা হ'য়ে ব'সে বাবার পিঠের উপর দিয়ে প্রোফেসরের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'আপনি কোনো লেক দেখেছেন?'

'এই-তো দেখছি।'

'না—সত্যি-লেক, হ্রদ?'

'তাও দেখেছি।'

'কেমন?'

'কেমন?' সত্যেন রায় মুখ তুললেন সামনের দিকে, মনে হ'লো বেশ বিস্তৃত একটা বর্ণনা দেবেন, কথা ভাবছেন মনে-মনে, কিন্তু মিনিট তুই ধ'রে মন আর কান এক ক'রে ফেলেও আর-কিছু শুনতে না-পেয়ে স্বাতীর যখন তেমনি অপ্রস্তুত লাগছে, যেমন লাগে

গুরুজনের সভায় বালকের হঠাৎ গম্ভীরভাবে এমন-কিছু ব'লে ফেলে যেটা একটু পরেই সে বুঝতে পারে বোকামি ব'লে, তখন, যেন অনেক ভাবনার পরে, সত্যেন রায় আস্তে বললেন, 'পৃথিবীতে সবই সুন্দর।'

স্বাতী আবার হেলান দিলো বেঞ্চিতে, কথাটা যেন শুনলোই না, মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চেষ্টা করলো দূরের দ্বীপটাকে প্রকাণ্ড পাহাড় আর ঝোপ-ঝাপ গাছগুলোর ঘোরকালোকে ভীষণ জঙ্গল ব'লে কল্পনা করতে, আর হঠাৎ একটা মোটরগাড়ির হেডলাইট আলো ফেললো ঠিক তার মুখের উপর, চোখে হাত চাপা দিলো সে, কিন্তু দরকার ছিলো না, আলো দূরে স'রে গেছে তক্ষুনি।

চুপচাপের মধ্যে জোর আওয়াজে হেঁচে উঠলেন রাজেনবাবু। হাতের উল্টো পিঠ ঠোঁটে বুলিয়ে বললেন, 'যাবি নাকি এখন? বেশ ঠাণ্ডা।'

'হ্যাঁ বাবা, চলো।' স্বাতী উঠলো, জলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, আর তার পিছনের জল আর আকাশ থেকে সত্যেন রায়ের চোখ আস্তে-আস্তে স'রে এলো তার মুখের উপর।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় একটু-যেন কেঁপে উঠে স্বাতী হঠাৎ বললো, 'আচ্ছা, সুন্দর কাকে বলে?'

একটু চুপ ক'রে থেকে, একটু হাসির সুরে, আর খুব মৃদু স্বরে প্রোফেসর জবাব দিলেন, 'সে-কথা এখন ভাবতে হবে না তোমাকে, এখন পরীক্ষা সামনে।' তারপর উঠে দাঁড়ালেন রাজেনবাবুর দিকে ফিরে।—'লেকের ধারের রাস্তায় কেন-যে গাড়ি চলতে দেয়!'

বাড়ি ফেরার পথে আর একটি কথা বললো না স্বাতী ; হঠাৎ ক্লান্ত লাগলো তার ; ক্লান্ত, ফাঁকা-ফাঁকা, কাঁপা-কাঁপা।

বেশ-তো ; তাহ'লে ইন্টারমিডিএট পরীক্ষার জন্যই তৈরি হওয়া যাক। জানুয়ারি থেকে কলেজ ছুটি হ'লো, সারাদিন বাড়ি ব'সে পড়াশুনো ছাড়া করবারও কিছু নেই। কিন্তু পরীক্ষার পড়া কতটুকুই বা। বাকি সময় অন্য নানারকম বই পড়ে ; দুপুরে খেতে-খেতে ভাবে, খাওয়ার পর রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসবে আরম্ভ-করা কোন বইটি নিয়ে, বইয়ের তো অভাব নেই সত্যেন রায় থাকতে। পড়তে-পড়তে রোদ স'রে আসে তার পিঠ থেকে মাথায়, রোদের বাঁকে-বাঁকে বেতের চেয়ারটি ঘুরিয়ে নেয় ; তারপর ঘর থেকে রোদ যখন চ'লে যায়, অথচ ঘরভরা তাতটুকু থাকে, তখন ছাপার অক্ষরগুলো একটার গায়ে আর-একটা লাফালাফি করে তার চোখের সামনে, একটুখানি ঘুমিয়েও পড়ে হয়তো—কিন্তু তক্ষুনি টান ক'রে চোখ মেলে কল্পনার জগৎ ছেড়ে বাইরের দিকে তাকায়, সামনের ছোটো রাস্তাটি ফাঁকা, রা নেই পাড়ায়, কর্পোরেশনের বাচ্চা-গাছটার সঙ্গে শীতবিকেলের সোনারোদের একা-একা খেলা।

এইরকম সময়ে বিজু একদিন এসে বললো, 'স্বাতী, কী করছিস?'

দাদাকে দেখে স্বাতী খুশি হ'লো, হেসে বললো, 'কী আর করবো।'

'তুই দেখি নভেল প'ড়েই দিন কাটাস। পরীক্ষার পড়া?'

'তাও পড়ি।'

'নিজের মনে কী পড়িস না-পড়িস তুই ছাড়া কেউ জানে না।'

'আমি ছাড়া আবার কে জানবে—আর জানবার দরকারই বা কী।'

'আহা—এমনি-এমনি পড়াই এক কথা, আর পরীক্ষার জন্য পড়াই আর,' দু-বার ফেল করার অভিজ্ঞতা নিয়ে বিজন বললো। 'ঠিক হচ্ছে কিনা সেটা জানা তো চাই। আর তোর তো সুবিধেই আছে মস্ত।'

'কী ?'

'সত্যেনবাবুকে বলতে পারিস মাঝে-মাঝে এসে—'

'ও মা!' স্বাতী বাধা দিলো কথায়। 'এর জন্য নাকি আবার—'

'কেন? উনি প্রোফেসর, ওঁর কাজই তো পাশ করানো। চাই কী হয়তো কোশ্চেনও ব'লে দিতে পারেন।'

'সে কী! পরীক্ষার কোশ্চেন নাকি কেউ কাউকে বলে!'

'বলে না!' বিজন হাঃ ক'রে হাসলো একটু। 'দিন-রাত বলে! ম্যাট্রিকে তো দু-বারই আমি "এসে"টা জেনে গিয়েছিলুম—'

'তাতে সুবিধে হয়েছিলো কিছু?'

বিজু গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'তা বলতে হ'লে নিজে তো জানা চাই। সত্যেন রায় বাচ্চা-মাস্টার—উনি আর কোত্থেকে জানবেন।'

'বেশ রং তোর শার্টটার,' স্বাতী কথা বদলালো।

'ভালো?' বিজন চোখ নামিয়ে দেখলো একবার, তারপর হেলাফেলার মতো ভাব ক'রে বললো, 'করালাম কয়েকটা নতুন। কাজ বাগাতে হ'লে কাপড়চোপড়ের চটকটা চাই সকলের আগে।'

ফিকে-ছাই রঙের পাৎলুন আর শাদা-কালো জুতোর দিকে তাকিয়ে স্বাতী জানতে চাইলো, 'চটক হ'লেই কাজ বাগানো যায়?'

'দেখবি, দেখবি', বিজন একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো সিগারেটের। ঘরের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে বোনের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ বললো, 'শোন—সত্যেন রায়কে বলবি আমাকে তুটো চিঠি ড্রাফট ক'রে দিতে? বুঝলি না, ইংরিজিটা তো আমার তেমন—'

'চাকরির অ্যাপ্লিকেশন?'

'আরে না, না, চাকরির অ্যাপ্লিকেশন হবে কেন? বিজনেস-লেটর। গবর্মেণ্টে লিখতে হবে কিনা, তাই একটু ভালো ক'রে—বলবি সত্যেন রায়কে?'

'আমি কিছু বলতে-টলতে পারবো না।'

এ-উত্তরটাই বিজন আশা করেছিলো, আর এতে চটবে না এটাও আগেই স্থির করা ছিলো তার। তক্ষুনি বললো, 'আচ্ছা থাক, থাক, ও আমি চালিয়ে নিতে পারবো। আর বিদ্বান উনি হ'তে পারেন খুব—কিন্তু কমার্শল করেসপনডেন্সের কী জানেন?—কমিশন বানান কী রে?'

স্বাতী মুখে আঁচল চেপে হেসে উঠলো।

'হাসবার কী আছে?' পাৎলুনের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বিজন বুকটাকে চেতিয়ে দিলো একটু। 'ভীষণ নটখটে ওটা। কত মুখস্থ করেছিলুম কমিশন অমিশন, তবু লিখতে গেলেই শর্ষে ফুল। একটা এম, তুটো এস, না রে? না একটা এস, তুটো এম?'

•

তা বানানের জন্য কি আর কাজের লোকের কাজ ঠেকে থাকে। ক-দিন পরেই দেখা গেলো, জমকালো একটি লেটর-বক্স

শোভা পাচ্ছে বাড়ির দরজায়, তার গায়ে গোট-গোট শাদা অক্ষরে লেখা : B. JOHN & CO.

দেখে রাজেনবাবু হকচকালেন। তবে কি তাঁর বাড়ি ভাড়া নিয়ে নিলো অন্য কেউ, আর তিনিই জানলেন না? ঘরে এসে স্বাতীকে বললেন, 'ব্যাপার কী রে?'

'কী?'

'লেটর-বক্সটা কাদের?'

'কাদের আবার। আমাদেরই! দাদা লাগিয়েছে সেদিন।'

'কী কোম্পানি লেখা দেখলাম যে?'

'ও মা! বুঝলে না তুমি! B. JOHN—মানে, বিজন।'

'ও-হোঃ-হো!' হেসে উঠলেন রাজেনবাবু। এমন গলা ছেড়ে, আর এতক্ষণ ধ'রে হাসলেন অনেকদিন পর।

'তা বুদ্ধিটা মন্দ বের করেনি,' স্বাতী দাদার পক্ষ নিলো।

'হ্যাঃ, খুব বুদ্ধি! আবার কোম্পানিও!' রাজেনবাবু হাসির ধাক্কায় মাথা হেলিয়ে দিলেন পিছন দিকে।

স্বাতী বললো, 'দাদা কিছু-একটা করছে ঠিকই—কী-রকম সুন্দর চিঠির কাগজ ছাপিয়েছে সবুজে আর কালোতে—আর বিল-টিল কত-কী—'

'ওঃ! তাহ'লে আর কী!'

স্বাতী চোখ দিয়ে হাসলো বাবার সঙ্গে, কিন্তু মুখে বললো, 'অত ঠাট্টারই বা কী হয়েছে—জানো, মাঝে-মাঝে চিঠিপত্রও আসে বি-জন কোম্পানির নামে, খাকি রঙের খামে, একটা এসেছিলো ও. এইচ. এম. এস. ছাপানো—জানো?'

'ভালো।'

স্বাতী একটু ভাবলো, তারপর আবার বললো, 'নিশ্চয়ই দাদা কিছু করছে এবার—টাকাও পাচ্ছে খুব।'

'বলেছে বুঝি তোকে?'

'বলতে হবে কেন—দেখে বোঝা যায় না? কত নতুন কাপড়-চোপর করাচ্ছে, আর দাড়ি কামাবার ব্লেড যে কত কিনছে তোমাকে বলবো কী, বাবা!'

'কী বললি? ব্লেড কিনছে!'

'ক—ত্ত! একটা বিস্কুটের টিন ভরতি!'

হাসি মিলিয়ে গিয়ে এবার রেখা পড়লো কপালে। শেষটায় কি উন্মাদ হ'য়ে গেলো ছেলেটা? না স্বাতীরই ভুল?—'তুই দেখেছিস?' রাজেনবাবু জিগেস করলেন।

'লুকিয়েই রাখে স্যুটকেসে কাপড়ের তলায়—সেদিন বের ক'রে গুনছিলো, আমি হঠাৎ গিয়ে পড়েছি তখন ওর ঘরে। দেখে বললুম, "অত ব্লেড দিয়ে কি হবে রে?" বললো, "জমাচ্ছি। ক-দিন পরে তো আর পাওয়া যাবে না।" ব'লে হাসতে লাগলো খুব। সত্যি নাকি, বাবা, ব্লেড আর পাওয়া যাবে না একেবারেই? দাড়ি রাখতে হবে সবাইকে? মা গো, কী কুচ্ছিৎ!'

গভীর হ'লো কপালের রেখা, ফ্যাকাশে হ'লো মুখের রং। মিনিটখানেক চুপ ক'রে থেকে আপন মনেই বললেন, 'টাকা পায় কোথায়?'

'বাঃ! স্বাতী বাবার দুশ্চিন্তা দূর করলো, 'আমি বললুম না তোমাকে, ও টাকা পাচ্ছে খুব। আমাকে বললো, "এখানে কত

টাকার ব্লেড বল তো?" আমি অনেক ভেবে, অনেক বাড়িয়ে-টারিয়ে বললুম, "পঁচিশ?" হো-হো ক'রে হেসে উঠলো শুনে। 'দু-শো টাকার ব্লেড কিনেছি। আরো কিনবো।" অনেক টাকা না-থাকলে কি দু-শো টাকার ব্লেড কিনতে পারে কেউ! তা ভালোই করলো দাদা—যখন আর পাওয়া যাবে না, আমাদের চেনাশোনা সকলকে দিতে পারবো তো—' বলতে-বলতে স্বাতীর চোখের সামনে ফুটলো সত্যেন রায়ের পরিষ্কার কামানো গালের নীলচে আভা— 'ও বাবা, আমার কথা শুনছো না তুমি!—' বাবার মুখে ঠেলা দিলো স্বাতী।

'হ্যাঃ! মস্ত এক ভাবনা ঘুচলো!' রাজেনবাবু হাসলেন মেয়ের দিকে তাকিয়ে।

বিজুর সঙ্গে কথা বলবার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন মনে-মনে। বাপ যখন বাড়ি থাকেন, ছেলে তখন প্রায়ই থাকে না, সুযোগ ঘটতে তাই দেরি হ'লো। আর দেরি হ'লো ব'লে রাজেনবাবুর উদ্বেগ যেমন বাড়লো, তেমনি আবার কোথায়-যেন একটু আরামও পেলেন—কিছু বলতে গেলেই তো রুখে উঠবে, চ্যাঁচাবে, আর স্বাতী যদি কিছু-একটা ব'লে ফেলে তবে-তো আর রক্ষে নেই—পদ্মা-পার ক'রে ছাড়বে মেয়েটাকে। অথচ না-ব'লেই বা কী করি, কার টাকা নিয়ে কী-পাগলামি করছে, সেটা আমাকে জানতে-তো হবেই।

দেখা হ'য়ে গেলো পরের রবিবার বিকেলবেলা। 'ছাখ তো আমার নতুন স্যুটটা কেমন—' বলতে-বলতে ঘরে এসে বিজন দেখলো স্বাতী তার চেয়ারটিতে ব'সে নেই, বাবা চশমা এঁটে কী-যেন হিশেব লিখছেন সেখানে। থমকে দাঁড়ালো।

পলকের জন্য রাজেনবাবুর মনে হ'লো—এখন থাক। কিন্তু তক্ষুনি আবার জোর করলেন মনে, হাতের পেন্সিলটা নামিয়ে, খুকখুক কেশে, একটু লাল হ'য়ে বললেন, 'বিজু, তোর সঙ্গে একটা কথা—'

'আমার সঙ্গে?' গটগট ক'রে বিজু এগিয়ে এলো, এই সপ্রতিভ স্বচ্ছন্দ ভাবটার পিছনে কতখানি চেষ্টা আছে তা বুঝতেই দিলো না।

ঝকঝকে নাবিক-নীল স্যুট-পরা ফ্যাশনেবল যুবকটির দিকে নিষ্প্রভ বুড়ো-চোখ মেলে একটু তাকালেন রাজেনবাবু। তারপর মিনমিন ক'রে বললেন, 'কথাটা হচ্ছে—মানে—কী করছিস-টরছিস আজকাল—'

'ওঃ!' বিজন অস্ফুট অধৈর্যের আওয়াজ করলো, হ্যানো-ত্যানো পঞ্চাশ কথা এখন! তার চেয়ে একেবারেই সব ব'লে দেয়া ভালো— মানে, যতটা বলা যায়। মুখে একটু হাসি এনে বেশ স্পষ্ট ক'রে বললো, 'বিজনেস-এর খুব একটা সুবিধে পেয়েছি, বাবা—বি-জন কোম্পানি নিশ্চয়ই দাঁড়িয়ে যাবে, তুমি দেখো।'

'আর-কাকে নিয়ে কোম্পানি?'

'আর-তো কেউ না—আমি একাই। পার্টনার হ'তে অনেকেই চাচ্ছে অবশ্য, বোলচাল দিচ্ছে খুব, কিন্তু আমি ওতে ভুলি না! আমি একাই পারবো, একাই করবো।'

'কী পারবি? কী করবি?'

বিজন মুচকি হাসলো।—'তুমি কি ভুলে যাচ্ছো, বাবা, যে পৃথিবীতে একটা যুদ্ধ চলেছে?'

রাজেনবাবু একটু অবাক হলেন। এ-রকম ক'রেও বলতে

শিখেছে বিজু ? তা হবে—কত কাল তো ওর সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলি না—আর নেহাৎ ছেলেমানুষ তো নেই আর।—'তা—তা,' আমতা-আমতা করলেন তিনি, 'যুদ্ধ ব'লেই তো আরো ভাবনা। দুর্দিন।'

'দুর্দিন না সুদিন দেখা যাক।' তারপর বাপের চোখের চকিত প্রশ্নের উত্তরে বললো, 'এ নিয়ে খামকা তুমি ভেবো না, বাবা, ঠিক আছে সব।'

'টাকা পেলি কোথায় ?'

'টাকা কিছু পেলাম ব'লেই তো—'

'কোথায় পেলি ?'

'আমাকে দিয়েছে একজন।'

'কে ?'

দু-বার চোখের পলক ফেলে বিজন উত্তর দিলো, 'নাম বলতে পারবো না।'

মুখ-কান গরম হ'য়ে উঠলো রাজেনবাবুর। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কত টাকা দিয়েছে ?'

বিজন এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলো না।

বড়ো-বড়ো নিশ্বাস নিতে লাগলেন রাজেনবাবু, খক ক'রে কেশে উঠলেন একবার। তারপর খুব নিচু গলায় বললেন, 'এ-সব ছাড়। টাকাটা ফিরিয়ে দে। চাকরি কর।'

'চাকরি আমি করবো না, বাবা। আর টাকাটা ফিরিয়ে দেবার কথা ওঠে না। আমাকে ধার দেয়নি—দিয়েই দিয়েছে।'

শুনে রাজেনবাবু হাঁপরের মতো হাঁপাতে লাগলেন। ঘরে

এলো স্বাতী, ধুপ ক'রে খাটের উপরে ব'সে প'ড়ে বললো, 'ক-টা গেঞ্জি নিয়ে এলুম, বাবা, তোমার জন্য। সব তো ছিঁড়ে গেছে।'

বোনের সওদায় দুটি অভিজ্ঞ আঙুল ন্যস্ত ক'রে বিজু একটু নিচু গলায় বললো, 'বাজে।'

'আমারও তা-ই মনে হচ্ছিলো', স্বাতী তাড়াতাড়ি বললো। 'এই মনোহর স্টোর্স দোকানটাই বাজে, কিন্তু পাড়ায় তো নেই আর। তুই শহরে নানা জায়গায় যাস, নিয়ে এলেই পারিস।'

'আনবো,' বাবার দিকে আর না তাকিয়ে বিজন বেরিয়ে গেলো একটু-যেন তাড়াহুড়ো ক'রেই।

স্বাতী বললো, 'স্যুটটায় বেশ মানিয়েছে দাদাকে, না বাবা?'

রাজেনবাবু চুপ।

'গেঞ্জিগুলো কি খুবই খারাপ?' স্বাতী যেন আপন মনেই বললো। 'তবে না-হয় ফিরিয়ে দিয়ে আসি।'

'কিসের?' প্রতিবাদটা, স্বাতীর মনে হ'লো, বাবার পক্ষে বড়োই প্রবল। 'খুব ভালো! খুব সুন্দর! এত ভালো গেঞ্জি আমি পরেছি নাকি কোনোদিন!'

'না বাবা,' স্বাতী হাসলো। 'তুমি বড্ড খুশি-করা কথা বলো! রাগ ধরে!—তা', একটু থেমে, একটু ভেবে আবার বললো, 'কথাটা এমন মিথ্যেই বা কী। নিজে কিনলে সবচেয়ে শস্তাটার উপর আর উঠতে নাকি তুমি!'

'নিজে তো ক'রে-কর্মে ভাসিয়ে দিচ্ছেন,' রাজেনবাবু গজর-গজর করলেন, 'আর অন্যেরটা বাজে!'

'ও মা! এর জন্য দাদার উপর রাগ করছো তুমি!' স্বাতীর ঠোঁটের ফাঁকে দাঁতের সারি চিকচিক ক'রে উঠলো।

'যুদ্ধে বড়োলোক হবেন!' তীব্র একটা নড়াচড়া হ'লো রাজেনবাবুর শরীরে। 'যত—!'

তাহ'লে রাগের অন্য কারণ আছে? বাবার কুঁচকোনো কপালের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'কী হয়েছে, বাবা?'

'যুদ্ধে বড়োলোক হবেন তোর দাদা!' রাজেনবাবু আর মনের ধোঁয়া চাপতে পারলেন না। 'দেখছিস না প্যান্ট-কোট প'রে গটমট।'

'তাতে কী। বড়োলোক হওয়া তো ভালো।'

'যুদ্ধে বড়োলোক হয় কারা? যারা ঠকায়!' বলতে-বলতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন—স্বাতী অবাক হ'লো বাবার উত্তেজনা দেখে—'দেখেছি না আগের বারের যুদ্ধে! চোরে-জোচ্চোরে মিলে সোজা লুঠ করেছে গবর্মেণ্টের তহবিল!'

'হারীতদা তো বলেন সব বড়োলোকই চোর কিংবা ডাকাত', স্বাতী বাবাকে জানালো। 'হয় সে নিজে, নয় তার বাপ-ঠাকুরদা কেউ—' আর বলতে-বলতে তার মনে পড়লো ছোড়দির মুখে শোনা মকরন্দ মুখুয্যের কথা—হারীতদার বন্ধু? তা মুখে তো লোকে কতই বলে, তাব'লে সত্যি-সত্যি—

'ছেলেটা চোর হবে, চোর!' দম বন্ধ হ'য়ে গলা আটকালো রাজেনবাবুর।

ঘন-নীল স্যুট-পরা চুল-ওল্টানো দাদাকে স্বাতী কিছুতেই চোর ব'লে ভাবতে পারলো না। চোর! সে-তো নোংরা, বিচ্ছিরি—

কোমরে দড়ি বেঁধে পুলিশ নিয়ে যায় রাস্তা দিয়ে, আর ছোটো ছেলেরা হাত-তালি দেয় পিছনে। তা ছাড়া আবার চোর হয় নাকি? সত্যি, বাবার বড্ড বেশি-বেশি সবটা নিয়ে! কিছুর মধ্যে কিছু না—ফশ ক'রে ব'লে বসলেন চোর! চোর না আরো কিছু!

'টাকা পেলো কোথায়?' রাজেনবাবু বিড়বিড় করলেন।

'কিসের টাকা বাবা?'

'ঐ গেঞ্জি একটা দে তো।' গেঞ্জির কথায় স্বাতী খুশি হ'লো, কিন্তু তার উপর পাঞ্জাবি পরতে দেখে বললো, 'বেরুচ্ছো নাকি বাবা?'

'হ্যাঁ, ঘুরে আসি একটু।' আর কথা না-ব'লে রাজেনবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

এলেন ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে বালিগঞ্জ। পরের তিন-চার দিনে সারলেন অন্য সব পাড়া—কোথায় বেহালা, কোথায় মৌলালি, আর কোথায় মানিকতলা—হাঙ্গামা কি সোজা! আত্মীয় বলা যায়, বন্ধু মনে করা যায় এমন একজনকেও বাদ দিলেন না। বিজু কি কোনো টাকা নিয়েছে তোমার কাছ থেকে? বিজুকে আপনি কোনো টাকা দিয়েছেন? না! না তো! বিজু কেন টাকা নেবে? কেন, হয়েছে কী?

চেনাশোনা কেউ বাদ পড়লো কিনা ভাবতে গিয়ে রাজেনবাবু চমকে উঠলেন। আরে! বিজুর দিদিরা! নিজের মেয়েদের কথাই তাঁর মনে পড়া উচিত ছিলো সকলের আগে—তা তো নয়, এদিকে রাজ্যি তল্লাশ ক'রে হয়রান! ওকে আর কে টাকা দেবে যদি-না তার দিদিরা কেউ দেয়? দিদিদের মধ্যে কে? শাশ্বতীকে

প্রথমেই সরিয়ে দিলেন মন থেকে—কেননা হারীতের মুঠো একটু আঁটো, আর শাশ্বতীর সাধ্যি নেই লুকিয়ে দেয়। আর-তিনজনের মধ্যে কোনজন? মহাশ্বেতা? সরস্বতী? একজন রেঙ্গুনে, একজন দিল্লিতে—এত দূর থেকে শুধু চিঠিপত্রে এ-রকম একটা ঘ'টে গেলো, আর আমি কিছুই জানলাম না?···না, এ শ্বেতারই কাণ্ড! এই-যে সেদিন এসেছিলো; এর মধ্যেই বিজু মন গলিয়েছে বড়দির—আর মন তো ওর গ'লেই আছে, ওকে জল করতে কতক্ষণ!···তা-ই! নিশ্চয়ই শ্বেতা। রাজেনবাবু নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন যেন,—যাক, তবু-যে বাইরের কারো কাছে নেয়নি, কি অচেনা কাউকে ঠকাতে যায়নি! শ্বেতাকে চিঠি লিখলেই জানা যাবে, আর জানতে পারলেই ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন।

তিন মেয়েকেই চিঠি লিখলেন রাজেনবাবু। উত্তর এলো সকলের আগে সরস্বতীর।···'বাবা, তোমার চিঠি পেয়ে অবাক হলাম। তোমাকে না-জানিয়ে বিজুকে আমি টাকা দেবো ব্যবসার নামে নষ্ট করার জন্য, তুমি কি আমাকে এইরকম ভাবো? আমি তো তোমাকে কবে থেকেই বলেছি, ওকে শাসন করো, নয়তো বুড়ো বয়সে নাকাল হ'তে হবে তোমাকেই। দেখলে তো এখন! এখনো যদি—' এর পরে অনেকখানি আক্ষেপ আর উপদেশ। মহাশ্বেতা কত কালের মধ্যে আসে না, ভাইয়ের উপর তার বিশ্বাস তাই বেশি, আর ব্যবসায় তার ভক্তি তো থাকবেই; সে অল্প কথায় জানালো যে টাকা সে দেয়নি, দেবার কথাও হয়নি কোনো; কিন্তু এ নিয়ে এত দুশ্চিন্তারই বা কী আছে, ব্যবসা করা তো ভালোই, বিজু-যে পারবেই না সেটা প্রথম

থেকেই ধ'রে নিয়ে লাভ কী—হয়তো পারবে। শ্বেতার চিঠি এলো সবশেষে, যদিও তার রাস্তাই সব-কাছের। 'চিঠির উত্তর দিতে দেরি হ'লো, ছেলেপুলের তাড়নায় পাঁচটা মিনিট সময় পাই না, বাবা। বিজুকে আমি তো টাকা দিইনি—আমার কি আলাদা টাকা আছে নাকি?—দিলে তোমার জামাই-ই দেবেন—তা ওঁকে জিগেস করাতে উনি বললেন, "পাগল নাকি!" কথায়-কথায় আরো বললেন যে এবার বিজু ওঁকে প্রায়ই বলতো ব্যবসা করার কথা, ওর মন যখন ঝুঁকেছে ওদিকে, দেখা যাক না। তোমার বাবাকে লিখে দাও—উনি বললেন—এ নিয়ে মিছিমিছি অস্থির হ'য়ে উনি যেন শরীর খারাপ না করেন। আমি তা-ই ভালো মনে করি, বাবা। তোমার এত ভাববার কী আছে বলো তো আমরা থাকতে?'

মহাশ্বেতার আশ্বাস, সরস্বতীর উপদেশ, শ্বেতার সান্ত্বনা, কিছুই কোনো কাজে লাগলো না; মাঝে একটু উপশম হয়েছিল ব'লেই দুশ্চিন্তায় দ্বিগুণ কালো হ'লো মন। তবে কোথায় পেলো? আর টাকাও তো নেহাৎ অল্পস্বল্প হবে না—যা সাজপোশাকের ঘটা—আর দু-শো টাকার ব্লেড! কে সেই পণ্ডিত, যে বিজুকে বিশ্বাস ক'রে টাকা দিলো? আবার বলে ফেরৎ দিতে হবে না! আর-কিছু না; টাকাটা নিয়ে ও যা ইচ্ছে তা-ই করুক; ওড়াক, পোড়াক, হারাক—যার টাকা, তাকে ফেরৎ দিতে পারলেই বাঁচি। কোনো বিধবাকে ফতুর করেনি তো? তেমন কি কেউ আছে আত্মীয়ের মধ্যে, জানাশোনার মধ্যে? কই, না! ভেবে-ভেবে দিশে পান না, আরো ভাবেন। দিনে-রাত্রে কাঁটার মতো বিঁধে

রইলো কথাটা, পানচিবোনো অবসরটুকু ফুটো হ'য়ে গেলো, চিড় ধরলো রাত্তিরের গভীর ঘুমে।

'বিজু,' আবার একদিন সুযোগ পেয়ে তিনি বললেন, 'শুধু এইটে বল যে কার টাকা আর কত টাকা। আর তোকে কিছু বলবো না আমি।'

'কেন বলো তো এ নিয়ে এত ভাবছো?' বিজু হাসিমুখে বললো।

সত্যি, কেন? শ্বেতাও তা-ই লিখেছে, আর মহাশ্বেতাও। সত্যি তো, আমার কী? নিজের উপরেই রাগ হ'লো রাজেনবাবুর, নিজেকে যখন বলতে শুনলেন, 'বল না আমি তাকে ফিরিয়ে দিই টাকাটা।'

'বলেছি তো, ফেরৎ দিতে হবে না।'

'না হোক, তবু আমি দেবো।'

'ফেরৎ দিতে হ'লে আমিই দেবো,' বিজু গম্ভীর।

'বল না, বল,' প্রায় হাতে ধ'রে মিনতি করলেন বাবা। 'যদি ম'রে যাই, এই একটা অশান্তি—'

'কী বাজে—!' বিজু অস্ফুটে উচ্চারণ করলো। তারপর মাথা উঁচু ক'রে সোজা বাপের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আচ্ছা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি যে তার টাকা আমি ফিরিয়ে দেবো—অনেকগুণ দেবো। হ'লো তো?'

উঃ! উনি আমাকে কথা দিচ্ছেন! কী কথা দেবার মানুষটা। রাজেনবাবুর বুকের মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হ'লো ছেলের ভাবভঙ্গি দেখে। চোখ নামিয়ে নিলেন, যেন তিনিই অপরাধী।

ছেলে তার হাত-সাফাইয়ের হাতে-খড়ি কার উপর করলো,

সেটা জানবার আশা ছেড়ে দিতে হ'লো। তা ছাড়া আর উপায়ই বা কী।...রাজেনবাবুর সমস্ত ছুটোছুটি, লেখালেখি, পীড়াপীড়িকে টিটকিরি দিয়ে বাড়ির দরজায় বুক ফুলিয়ে রইলো বি-জন কোম্পানির লেটর-বক্সটা, একেবারে বেকারও না, চিঠিপত্র সত্যি পড়ে মাঝে-মাঝে।

স্বাতীর ইণ্টরমিডিএট পরীক্ষা যতদিনে শেষ হ'লো, ততদিনে দেখা গেলো বিজুর কাছে লোকজনও আসছে, কেউ-কেউ আবার গাড়িতে। তারা বিজুকে বলে মিস্টর মিত্র, জনে-জনে সিগারেটের টিন তাদের হাতে, দরজা-বন্ধ ঘরে নিচু গলায় তাদের পরামর্শ। রাজেনবাবুকে দেখলে তারা যেন দেখতেই পায় না, আর স্বাতীর সামনে পড়লে অসাধারণ সৌজন্য দেখিয়ে স'রে দাঁড়ায় টান-টান বুকে। ক্লাইভ স্ট্রিটের সিঙ্গি-বাঘের পিছন-পিছন এরা ঘুরে বেড়ায়, প্রসাদ পায় গণ্ডার-ভাণ্ডারের, আর মাঝে-মাঝে স্বাধীনভাবে ছোটো শিকার মারে :—এক পলকেই ঠিক চিনলেন রাজেনবাবু।

একদিন স্বাতীকে ব'লেই ফেললেন মুখ ফুটে : 'বিজু আর যা করে করে—ওসব বাজে লোকদের বাড়িতে আনে কেন। বলিস তো ওকে।'

'বললেই যেন শুনবে।'

'ব্যবসা করতে হয় তো আপিশ-পাড়ায় বসুক,' রাজেনবাবু চোখের চামড়া কুঁচকোলেন, 'বাড়িতে আবার কোম্পানি লটকায় কে ?'

স্বাতী তখন আর-কিছু বললো না, কিন্তু বিকেলে বাবা আপিশ

থেকে ফেরামাত্র ছুটে এসে দু-হাতে গলা জড়িয়ে ব'লে উঠলো, 'বা-বা—!'

'কী রে? কী?'

'আজ যা অবাক ক'রে দেবো তোমাকে!'

বাবা দম নিয়ে বললেন, 'পরীক্ষার রেজল্ট বুঝি বেরিয়েছে?'

'সে কী! এখনই!'

'আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না,' আপিশের পোশাকেই খাটে লম্বা হলেন রাজেনবাবু।

'এই নাও—!' স্বাতী ছুটে গেলো টেবিলের ধারে, হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া খুলেই 'আরে—কী হ'লো?' ব'লে টেনে আনলো তার তলা থেকে ভানুসিংহের পত্রাবলী, আর তার ভিতর থেকে তক্ষুনি বেরোলো পাৎলা নীলচে-সবুজ একশো টাকার নোটখানা। বাবার কাছে এসে হাত বাড়িয়ে বললো, 'নাও।'

'কী রে?'

'নাও না! ছাখো না!'

মেয়ের খুশি উপচে-পড়া মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকলেন বাবা, তারপর তার হাতের দিকে তাকালেন।—'টাকা? পেলি কোথায়?'

'দাদা দিয়েছে তোমাকে,' ব'লে স্বাতী নোটটা বাবার হাতের মধ্যে গুঁজে দিলো। 'কেমন? তুমি তো ভাবছিলে দাদার সবই বাজে! এখন?'

নোটটা হাতে ধ'রে রাজেনবাবু উঠে বসলেন। আস্তে-আস্তে বললেন, 'কেন? আমাকে দিয়েছে কেন?'

'বাঃ, তোমাকে দেবে না তো কাকে দেবে? মুখোমুখি তো লজ্জা করে, তাই আমার হাতে দিয়ে বললো, "বাবাকে এটা দিস, কেমন?" ও তোমাকে খুব ভালোবাসে, বাবা।'

'ভালোবাসার টাকাই বুঝি প্রমাণ?'

'নাঃ—তুমি যে কী—সত্যি!' স্বাতী ভাষা পেলো না মনের ভাব বলবার।

রাজেনবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'ওর টাকা দিয়ে আমার কোনো দরকার নেই। ওকেই দিয়ে দিস—এই নে।'

কিন্তু স্বাতী হাত বাড়ালো না; অবাক হ'য়ে বললো, 'তুমি নেবে না? ফিরিয়ে দেবে?'

'যার কাছে টাকা নিয়েছে তাকেই ফেরৎ দিতে বলিস,' বলতে-বলতে রাজেনবাবু খাট ছেড়ে উঠে টেবিলের উপর নোটটি রেখে দিলেন বই চাপা দিয়ে।

'টাকা আবার কার কাছে নিয়েছে?' কথাটা শোনালো প্রশ্নের মতো না, প্রতিবাদের মতো।

'তা যদি জানতাম তবে তো—' হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, 'বলিস ওকে এ-কথা। যার টাকা নিয়েছে তাকে যেন ফিরিয়ে দেয়।'

স্বাতী সারা দিন ধ'রে আশা ক'রে ছিলো। কত খুশি হবেন বাবা; দাদা-যে সত্যি অপদার্থ না, সত্যি-যে কাজে-কর্মে মন গেছে এবার—ভেবেছিলো বাবা বলবেন, 'বিজু তাহ'লে একজন হ'য়ে উঠলো!'—আর তার এই মন-বানানো রঙিন ছবির গায়ে কালি ঢেলে দিয়ে বাবা কিনা টাকাটা ফিরিয়ে দিলেন! কেমন লাগবে দাদার? কত উৎসাহ ক'রে দিয়ে গেছে!

'দাদার সঙ্গে তুমি এ-রকম করো কেন, বাবা?' স্বাতী না-ব'লে পারলো না।

'কী করি?'

'কী আবার—এই-তো—টাকাটা নিলে না—আমি যদি দিতাম আর তুমি যদি এ-রকম না-নিতে, জীবনে কি আর তোমার সঙ্গে কথা বলতাম!'

'তা বিজু যদি বলে বাবার সঙ্গে আর কথা বলবো না, তাহ'লে খুব তফাৎ হবে তোর মনে হয়?'

'না বাবা, না! কোন 'না'-টাকে সে 'হাঁ' করতে চায়, তা নিজেই ভালো বুঝলো না, শুধু ভিতর থেকে একটা প্রতিবাদ উঠতে লাগলো।

'তা ছাড়া,' রাজেনবাবু সান্ত্বনার সুরে বললেন, 'আমার তো টাকার দরকার নেই কোনো—যদ্দিন আছি, আমারটা আমি চালাতেই পারবো।'

'শুধু দরকারের জন্যই বুঝি টাকা?'

'থাম তো পাকা বুড়ি!' বাবা উড়িয়ে দিলেন মেয়ের কথা।

কী আর করা, একশো টাকার নোটটা ফিরিয়েই দিতে হ'লো দাদাকে। স্বাতী কথাটা বললো ভয়ে-ভয়ে, অনেক ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে মোলায়েম ক'রে, কিন্তু কী আশ্চর্য!—একটুও মর্মাহত মনে হ'লো না দাদাকে, দুঃখিতও না, দিব্যি হাসিমুখে চামড়া-বাঁধানো পকেট বইয়ে নোটটি ভ'রে নিয়ে বললো, 'থাক; ভালোই হ'লো!···তোর চাই কিছু টাকা?'

'ও মা? আমি টাকা দিয়ে কী করবো!' স্বাতী হেসে উঠলো।

'ভালো! ভালো! যদ্দিন টাকার দরকার না হয় তদ্দিনই ভালো,' ব'লে ফুর্তিসে গুনগুন করতে-করতে প্রস্থান করলো বিজন।

স্বাতী অস্ফুটে বললো, 'দাদাটা কী রে!'—সত্যি-তো, বাবার আর দোষ কী, দাদাটাই বাজে, ছেলেবেলা থেকেই তা-ই, এখনো সারলো না। কী-রকম চলে, আর কী-যে বলে···সত্যি! ব'সে-ব'সে যত ভাবলো, ততই রাগলো মনে-মনে, কিন্তু পরের দিন রাগ জল হ'য়ে গেলো তার, অনুশোচনায় ভিজে গেলো মন, যখন বিজন এসে তার টেবিলে রাখলো আটটি-দশটি চকোলেটের পাতা।

'নেসলে!' স্বাতী চেঁচিয়ে উঠলো খুশিতে। 'ঈশ—এই লাল পাতাগুলি আজকাল আর চোখেই দেখি না! পেলি কোথায়?'

'আছে! আছে!' বিজন মুখ টিপে হাসলো। 'কী চাই তোর বল না!'

স্বাতী আর কথা বললো না, একটা পাতা খুলে প্রথমে একটুখানি ভেঙে মুখে দিলো, তারপর সমস্ত মুখে অনেকদিনের ভুলে-যাওয়া সুখের ছড়িয়ে-পড়া অনুভব করতে-করতে একটি পাতা শেষ ক'রেই ফেললো আস্তে-আস্তে। হঠাৎ বললো, 'দাদা, খা!'

'নাঃ, আমার ও-সব ভালো লাগে না।'

'আমারও আর তত না,' স্বাতী তাড়াতাড়ি বললো। 'সত্যি, ছেলেবেলায় কী ভালোইবাসতুম চকোলেট! তুই একটুও খাবি না, দাদা?'

'তুই আর একটা খা।'

'মা গো! একটা খেয়েই ঢিশঢিশ!' ব'লে স্বাতী আর-একটি পাতার কাগজ ছাড়ালো দু-আঙুলে।

বোনের জন্য এটা-ওটা উপহার বিজন মাঝে-মাঝেই আনতে লাগলো। ডিমের ছাঁদের নীল বাক্সে প্যারিসের সেন্ট, সোনালি বাক্সে চিকরি-চিকরি কাগজে ঢাকা বিলেতি সাবান—স্বাতী ভেবেছিলো এ-সব আর পাওয়াই যায় না, আর দাদা কিনা বলে কত চাস!—কাণ্ড! আর, কোনোদিন তো হাতে ক'রে কিছু আনেনি আমার জন্য—কারো জন্যই আনেনি—সেই টাকাটা তো নেননি বাবা, মুখে না-বলুক, মনে কি আর না-লেগেছে!—তাই আমাকে এ-সব দিয়েই···স্বাতীর হৃদয় দ্রব হ'লো কথাটা ভেবে। ···তারপর, পরীক্ষার খবর যখন জানা গেলো, ঐ একটা পাশের ছুতোয় দাদা এনে দিলো টিয়ে-রঙের শাড়ি, আর হাতে দু-খানা দশ টাকার নোট দিয়ে বললো, 'খুব-তো পাশ করলি—এবার একটু খরচ কর স্বাধীনভাবে।'

স্বাতী একটু লাল হ'য়ে বললো, 'পাশ করেছি তো কী হয়েছে, পাশ আবার কে না করে!'

'কেন, আমি!' বিজন খোশমেজাজে হাসলো—'শাড়িটা কেমন রে?'

'খু—ব সুন্দর! সুন্দর রং।'

'আমি তো শাড়ি-টাড়ির কিছু বুঝি না—মজুমদার পছন্দ ক'রে দিয়েছে।'

'সে আবার কে?'

'আমার কাছে আসে মাঝে-মাঝে—সেই লম্বামতো—'

স্বাতী কিছু বললো না।

'মজুমদার বললো তোকে খুব মানাবে রংটায়।'

'সে কী! আমাকে দেখলো কবে?'

'কেন, তুই কি অসূর্যস্—অসূর্যপ্—ঐ হ'লো আরকি—তুই কি তা-ই?'

স্বাতীর ভালো লাগলো না কথাটা। মজুমদারকে চিনলো মনে-মনে—আগে কখনো গ্যাখেনি ও-রকম পালিশ-করা জুতো। এ-সব বাজে লোকদের ডাকিস কেন বাড়িতে? বাবাও পছন্দ করে না, জানিস?' কথাটা উঠে এলো ঠোঁটে, কিন্তু বলতে গিয়ে থেমে গেলো। থাক—শখ ক'রে এই একটা জিনিশ আনলো—এক্ষুনি আবার—এখন থাক্—আর-একদিন কথা উঠলে ছাড়বে না।

কুড়ি টাকায় স্বাতী ছু-খানা কাঁচি ধুতি কিনে আনলো বাবার জন্য। কিছু বাঁচলো—তা দিয়ে আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে নতুন রবীন্দ্র-রচনাবলী কিনলো পাড়ার দোকানে। বিকেলে শাড়ি, ধুতি, বই একসঙ্গে বাবার সামনে রাখলো।

'গ্যাখো, বাবা!' তারপর বাবা কিছু বলবার আগেই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলো।—'ধুতি ছুটো তুমি পরবে কিন্তু!'

'মস্ত বহর—হোঁচট খাবো রে!'

'আগেই জানি তুমি এ-কথা বলবে! কিন্তু কী করবে—ছেলে যখন দিয়েছে পরতেই হবে!'

'বইটা বুঝি সত্যেনের জন্য?'

এ-প্রশ্নটা স্বাতীর একেবারেই ধারণার বাইরে: যেন ধাক্কা খেয়ে ব'লে উঠলো, 'কেন?'

'তা-ই উচিত না?'

'হ্যাঃ—!' কপালে-পড়া এক গোছা চুল আঙুলে জড়াতে-জড়াতে স্বাতী বললো, 'এ-বই কিনতে এখনো ওঁর বাকি আছে কিনা!'

'তাতে তোমার কিছু না; তোমার ভাগ তুমি দেবে। সে-তো কত বই দিয়েছে তোমাকে। পাশ-টাশ করলে, এখন—'

'আ-হা!' যেন আরো কিছু বলতে গিয়ে স্বাতী হঠাৎ থেমে গেলো।

রাজেনবাবু জিগেস করলেন, 'সত্যেন আছে কেমন? অনেকদিন দেখা হয় না আমার সঙ্গে।'

'আমার সঙ্গেই যেন হয়!'

'আসে না মাঝে-মাঝে?'

'ক—ই!' হাসির মতো সুরে স্বাতী বললো। 'পরীক্ষা হ'য়ে যাওয়ার পর দু-দিন এসেছিলেন—না, তিন দিন।'

'এবার ওকে একদিন খেতে-টেতে বল।'

'ঐ তুমি এক জানো, বাবা! কেবল খাওয়া! ওঁর অত সময় নেই নেমন্তন্ন খাবার—ভালোও বাসেন না ও-সব!'

'শ্বেতার খাওয়ার দিন তা তো মনে হ'লো না।—তুই এখন শেখ এ-সব—লোককে খাওয়ানো, যত্ন-টত্ন করা—'

'আমি ও-সব পারি না!'

'পারবি, পারবি!' রাজেনবাবুর চোখের স্নেহ মেয়েকে স্পর্শ করলো।

বড়দিও বলেছিলেন ঠিক এই কথাই। পারবো, আমিও পারবো? বড়দির মতো, মা-র মতো…? মা-র কথা যেন আস্তে-আস্তে আবছা হ'য়ে আসছে মনে, বাবারও কি তা-ই? বাবা

কখনো বলেন না মা-র কথা, কিন্তু সেই না-বলাই সবচেয়ে বেশি বলা নয় তো? এটাই কি সত্য যে মা-র কথা বাবা কখনো বলেন না, না কি যে-কথাই বলেন সে-কথাই মা-র কথা? 'ওকে একদিন খেতে-টেতে বল—' মা থাকলে এ-কথা বলতেও তো হ'তো না ছেলেবেলার ছবি ফিরে এলো মনে; কত দিকের কত আত্মীয়, বাবার কত বন্ধুরা সস্ত্রীক, কত রান্না খাওয়া হাসি গল্প আনন্দ— বড়দি বইয়েছিলো ঠিক সেই ছেলেবেলার হাওয়া। বড়দি চ'লে গেলো—বাবা আবার যে একা সেই একা—মা-র মরবার পরে লোকজনের আসা-যাওয়া অনেক ক'মে গেছে বাড়িতে—এখন দেখে মনে হয় বাবার আত্মীয় নেই, বন্ধু নেই, কেউ নেই; তিনি সকালে উঠে বাজার করবেন, আপিশ করবেন সারাদিন, তারপর সন্ধেবেলায় হয় কিছু কিনতে-টিনতে ছুটবেন আবার, নয়তো ব'সে থাকবেন আলো নিবিয়ে চুপ ক'রে—এ ছাড়া আর-কিছু নেই তাঁর জীবনে। —কেন, আমি আছি!...আমি? প্রশ্নের তীক্ষ্ণ চিহ্নটা বুকে বিঁধলো স্বাতীর, যেন দম নিতে পারলো না মুহূর্তের জন্য। এই সেদিন পর্যন্ত ছোড়দিও তো ছিলো। আর এখন? বড়দি চ'লে যাবার পর ক-দিন এসেছে ছোড়দি?

স্বাতী উঠে এলো বাবার কাছ থেকে। হঠাৎ তার মনে হ'লো যে বাবা তার সমস্ত ইচ্ছার অফুরন্ত পূরণ ক'রে চলেন, সে তো বাবার ইচ্ছেমতো কিছুই করে না। বাবার ইচ্ছা সত্যেন রায়ের খোঁজ-খবর নেন মাঝে-মাঝে—মা থাকলে সবই হ'তো—কিন্তু মা থাকলে যা হ'তো, এখন কি তা কিছুতেই হবে?...তা আমিও তো ওঁকে আসতে বলি না, এলেও বেশিক্ষণ বসতে বলি না—বাঃ, আমি

কেন বলবো—আমি ছাড়া আর বলবেই বা কে—আমার চেনাতেই তো বাবা ওঁকে চেনেন, বাবার তো উনি কিছু না। সত্যি-তো—আমাকে উনি যে-রকম—যে রকম—মানে, আমার সঙ্গে ভদ্রতা যে-রকম করেন, আমি তো তার তুলনায়—যাঃ, ও-রকম হিশেব ক'রে কেউ বুঝি কিছু করে?

স্বাতী চুপ ক'রে ব'সে ভাবলো একটু। মনে হ'লো, এখনই একবার যায় সত্যেন রায়ের কাছে, ঐ রচনাবলীটা দিয়ে আসে। কথাটা মনে হ'তেই একটা সুখের ছলছলানি ব'য়ে গেলো তার বুকের মধ্যে। দিতে যত ভালো লাগে নিতে কি তত?···কিন্তু রাত হ'য়ে গেছে—রাত কোথায়, ভালো ক'রে তো সন্ধেও হয়নি এখনো—গিয়ে হয়তো পাবে না, কি হয়তো দেখবে আড্ডা দিচ্ছেন বন্ধুদের নিয়ে—কিন্তু যদি থাকেন, যদি, ধরো, একলাই ব'সে থাকেন ঘরের মধ্যে—?

আবার খোঁচা লাগলো প্রশ্নের। এত প্রশ্ন কখনো ছিল না স্বাতীর মনে, এত কাঁটা ছিলো না মনে-মনে ভাবায়। অবাধ ছিলো সে, কে কেড়ে নিলো তার স্বাধীনতা; সহজ ছিলো, কে তাকে নিয়ে এলো এই আঁকাবাঁকায়। এপ্রিলের রেশমি সন্ধ্যা মখমলের রাত হ'লো আস্তে-আস্তে, আর স্বাতীর মনও সেই অনুপাতেই ভারি হ'য়ে উঠলো।

এর দু-এক দিন পরে সত্যেন রায়ই এলেন। স্বাতী ঘরে এসে দাঁড়াতেই বললেন, 'কেমন আছো, স্বাতী?' এর মধ্যে যে-ক'দিনই দেখা হয়েছে, প্রথম কথাই এই: কেমন আছো, স্বাতী? আর

স্বাতীও ঠিক-ঠিক জবাব দিয়েছে, 'ভালো আছি,' কিন্তু আজ আর না-ব'লে পারলো না, 'রোজই এ-কথা জিগেস করেন কেন?'

'রোজ? রোজ দেখা নয় নাকি তোমার সঙ্গে?'

স্বাতী জবাব দিলো, 'আপনার ইচ্ছা।'

'তাছাড়া,' এক সেকেণ্ড চুপ ক'রে থেকে স্বাতীর কথাটাকে টপকে পার হলেন সত্যেন রায়: 'আমি সত্যি জানতে চাই তুমি কেমন আছো।'

'তা বুঝি এক কথায় বলা যায়?'

'অনেক কথাতেই বলো।'

'অত কথা শোনবার সময় হবে না আপনার।'

'এতই কথা?'

স্বাতী জবাব দিলো না।

'শুনি না!'

স্বাতী একটু পরে বললো, 'এবার যাচ্ছেন না কোথাও ছুটিতে?'

'যাচ্ছি।'

যাচ্ছেন!' ব'লেই লজ্জা পেলো স্বাতী, কেননা তার নিজের কানেই ধরা পড়লো যে সে উল্টো উত্তরটা আশা করেছিলো।

'কেন, যেতে নেই?'

একটু-যেন ঠাট্টার সুর সত্যেন রায়ের কথায়, যেন ছুটিতে বাইরে যাওয়ার পরামর্শ চাচ্ছেন স্বাতীর কাছে, আর স্বাতী যদি 'না' বলে তাহ'লেই তিনি আর নড়েন না। মনে-মনে স্বাতীর কেমন মাথা নিচু হ'লো, গলা বুজে এলো, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আঠারো বছর তাকে ঠেলে এগিয়ে দিলো সাহসের সীমান্তে, যেন ঠাট্টার

উত্তরে ঠাট্টা ক'রেই ব'লে ফেললো, 'ছুটি হ'লেই বাইরে বুঝি যেতেই হবে?'

'যেতে হবে না এমন-কোনো কারণ কি আমার আছে?' সত্যেন রায়ও প্রশ্নের উত্তরে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু প্রশ্নটা স্বাতীকে নিশ্চয়ই নয়, যেন নিজেকেই, যেন জানলার পরদা-ফাঁকে দেখা চিলতে-রোদটুকুর কাছে জেনে নিচ্ছেন নিজের অদৃষ্ট। তক্ষুনি চোখ সরে এলো, চোখ পড়লো স্বাতীর চোখে, যেন একটা দম-আটকানো মিনিটকে হেসে উড়িয়ে দিয়ে খুব ভালোমানুষের মতো বললেন, 'তুমিও তো কোথাও ঘুরে এলে পারো একবার।'

'আমি আর কোথায় যাবো,' স্বাতীও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো।

'কেন, তোমার বড়দির কাছে,' সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলেন সত্যেন রায়।

'বড়দি আপনাকে একবার যেতে বলেছিলেন।'

'তোমাকে বলেননি?'

'আমাকেই তো ব'লে গিয়েছেন আপনাকে বলতে।'

'তোমাকে যেতে বলেননি?'

'আমাকে আবার আলাদা ক'রে বলতে হবে নাকি?' স্বাতী হাসলো।

'তাহ'লে—'

'বাবার তো ছুটি নেই, তাই—'

'নিতে পারেন না ছুটি?'

'কী জানি।'

'তোমার বড়দি তো আসতে পারেন আবার?'

'তাঁরও আসা কি সোজা! আপনার মতো স্বাধীন তো নয় সবাই।'

'স্বাধীন মানে?'

'স্বাধীন মানে স্বাধীন।'

'স্বাধীন হওয়া খুব ভালো বুঝি?' মনে-মনে নিজের স্বাধীনতা উপভোগ ক'রে সত্যেন বললো।

'আমি কী ক'রে বলবো!'

সত্যেন রায় আবার তাকালেন জানলাফাঁকের চিলতে রোদের দিকে, আর সেদিকে চোখ রেখেই উঠে পড়লেন।

খাপছাড়া লাগলো, বড্ড হঠাৎ মনে হ'লো উঠে-পড়াটা। 'যাচ্ছেন?' 'এখনই যাবেন?' 'একটু বসুন না।'—কোনটা বললে ভালো হয়, কী-রকম ক'রে বললে ভালো শোনায়, না কি কিছু না-বলাই ভালো—এই দুর্ভাবনার হাত থেকে স্বাতীকে উদ্ধার করলেন আপিশ-ফেরৎ রাজেনবাবু ভারি পায়ে ঘরে ঢুকে। সত্যেনকে দেখে তাঁর ক্লান্ত মুখে হাসি ফুটলো—'এই যে, কতক্ষণ?'

স্বাতী বললো, 'উনি এইমাত্রই এলেন, এইমাত্রই চ'লে যাচ্ছেন।'

'কেন? একটু বোসো—আমি আসছি।'

'একটু বসছেন তাহ'লে?' বাবা ভিতরে যাবার পর স্বাতী বললো। এত সহজে রাজি হওয়াটা ভালো লাগলো না তার; একটু পরে আবার বললো, 'আজ আপনার তেমন তাড়া নেই মনে হচ্ছে?'

'কিসের তাড়া?'

'বলুন তো কিসের?'

'আমি কি তাড়াহুড়ো করি সব সময় ?'

'সব সময়ের কথা জানি না।'

'তবে ?'

'আমি যতটুকু দেখি, তা-ই তো দেখি।···যা-ই হোক, অন্তত বাবার কথাটা-যে রাখলেন—'

'কথা রাখতে খুব ভালো লাগে আমার।'

'সকলের কথাই ?'

'কারো-কারো কথা।'

'কার-কার ?'

তোমার বাবার কথা তো নিশ্চয়ই।'

স্বাতী একটু চুপ ক'রে থাকলো : তারপর :

'তাহ'লে মুখের কথাই আপনার কাছে কথা ?'

'ঠিক মুখের কথাই নয়।'

'কিন্তু মুখ ফুটে না-বললেও তো হয় না।'

'সেটাই তো ভালো।'

'সেটাই সাধারণ।'

'তুমি বুঝি সাধারণ ভালোবাসো না ?'

'আপনি কি বাসেন ?'

'সাধারণ হ'তে বেশ ভালো লাগে।'

স্বাতী আবার একটু ভাবলো।—'আমার মনে হয়—'

একটু অপেক্ষা ক'রে সত্যেন রায় বললেন, 'কী মনে হয় তোমার ?'

স্বাতী অন্য দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি চা নিয়ে আসি, বাবা ?'

ধুতি-গেঞ্জি-পরা রাজেনবাবুকে দেখে সত্যেনের মুখের ভাবটা যেন সহজ হ'লো, যেন আরো আরাম ক'রে বসলো চেয়ারে। রাজেনবাবু বললেন, 'কেমন আছো? ভালো?'

সত্যেন জবাব দিলো মৃদু হেসে।

'কোনো—কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'অসুবিধে? কেন?'

'খোঁজখবর নিতে পারিনি অনেকদিন—তা—ভালো আছো বেশ?'

'ভালো আছি।'

দু-জন দূর-বয়সী লাজুক মানুষের কথাবার্তা এখানেই ঠেকে গেলো। এর পরে দু-জনে ব'সে রইলো দু-দিকে তাকিয়ে, যতক্ষণ-না চা এলো, আর চা শেষ ক'রেই রাজেনবাবু পালালেন। প্রায় সন্ধে ততক্ষণে, কিন্তু রাত নামতে দেরি তখনো, বৈশাখের সবচেয়ে সুখের সময়টি শহর ভ'রে ছড়িয়ে পড়ছে।

সত্যেন রায় বললেন, 'বলো, স্বাতী, কী মনে হয় তোমার?'

চায়ের বাসনগুলি ট্রের উপর সাজিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো স্বাতী। তার পিছনের নীল রঙের পরদায় আর ঘরের আবছা আলোয় তাকে অসাধারণ ফর্শা লাগলো সত্যেনের চোখে, অনেকটা লম্বাও, আর বয়সের চেয়ে বড়ো।

'কী, বলো।'

'কী?'

'কী মনে হয় তোমার, বলো।'

'কী আবার মনে হয়।'

'কী বলতে-বলতে থেমে গেলে তখন—'

'নাকি ?'

স্বাতী দেখলো, সত্যেন রায় মুখে হাত বুলোলেন একবার, রুমাল বের করলেন পকেট থেকে, কিন্তু রুমালের কোনো ব্যবহার না-ক'রে আবার ফিরিয়ে রাখলেন। তারপর আস্তে-আস্তে উঠলেন, দু-পা কাছে এসে আস্তে বললেন, 'স্বাতী, চলি।'

স্বাতী সঙ্গে-সঙ্গে এলো দরজা পর্যন্ত, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলো সত্যেন রায় সিঁড়ি তিনটে নামলেন, ছোট্ট জমিটুকু আস্তে পার হলেন, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচু ফটকটায় হুড়কো লাগালেন, তারপর হাঁটতে লাগলেন তাড়াতাড়ি, মিলিয়ে গেলেন মোড় নিয়ে। আর সেই সন্ধ্যার ছায়া আনন্দ হ'য়ে নামলো স্বাতীর মনে, বৈশাখের সমস্ত হাওয়া আনন্দ হ'য়ে তার বুকের মধ্যে ব'য়ে গেলো।

চিঠি এলো ক-দিন পরে সিলেট থেকে। ছোট্টো চিঠি: 'উঠেছি এক বন্ধুর বাড়িতে···সুন্দর শহর, কিন্তু এ শুধু খিদে-জাগানো শুক্তো, ভোজ আরম্ভ হবে যখন রওনা হবো শিলং।···' পড়তে-পড়তেই জবাব জন্মালো মনে, কিন্তু লিখবে কী ক'রে, চিঠি আর চিঠির খাম উল্টে-পাল্টে ঠিকানা মিললো না কোথাও। ফোঁশ ক'রে উঠলো রাগ, কিন্তু তক্ষুনি তাকে পোষ মানালো— রাগ কার উপর ?—মানে, রাগ জানাতে না-পারলে রাগ ক'রে লাভ ? আবার যখন চিঠি এলো তিন দিন পরে, খাম দেখেই স্বাতী বললো, না—লিখবো না!—কিন্তু মুখ গম্ভীর ক'রে, এমনকি খামটা দু-তিন মিনিট না-খুলে ফেলে রেখেও, নিজেকে বিশ্বাস করাতে

পারলো না যে চিঠি না-পেলেও ক্রমাগত লিখতেই থাকবেন সত্যেন রায় ; আর খাম খুলে, পড়বার আগেই, শুধু কোঁকড়া কালো হাতের লেখায় ভরা চওড়া কাগজটা চোখে দেখেই তার এত ভালো লাগলো যে প্রথম বারে সব কথা পড়াই হ'লো না, শুধু এটুকু বুঝলো যে শিলং পৌঁচেছেন, আর সিলেট থেকে শিলঙের রাস্তায় দৃশ্য দেখতে-দেখতে দম বন্ধ হয়।···চিঠি রেখে দিয়ে ঘুরিয়ে প'রে নিলো শাড়ি, খামকা খানিকটা ঘুরে এলো বাইরে, রাস্তায় দেখা কলেজ-বন্ধু চিত্রার সঙ্গে, তত বোকা আর লাগলো না—বেশ ভালোই তো!—ফিরে এসে আবার পড়লো, বিকেলে আরো একবার, আর যতক্ষণ পড়লো না, ততক্ষণ চিঠির কথাই ভাবলো, আবার যখনই নিজের কাছে তা ধরা পড়লো তখনই ধমক দিলো নিজেকে, অন্য-কোনো ভাবনাকে ধাওয়া করলো—বড়দি, হারীতদা, ক-দিন পরে বি. এ. ক্লাশে ভরতি হওয়া—কিন্তু মন পেছিয়ে পড়লো একটু পরেই, ফিরে এলো ঠিক সেখানেই, আর তারপর যেন হাসি পেলো এই খেলায়, মেনে নিলো মনের বায়না, যেমন প্রথমে বিরক্ত হ'লেও খানিক পরে আমাদের ভালোই লাগে দুষ্টু কোনো মিষ্টি ছেলের আবদার।···রাত জেগে-জেগে জবাব লিখলো, আবার চিঠি, আবার জবাব ; লম্বা জ্বলজ্বলে গ্রীষ্মের গুনগুন-দিনগুলির অনেকখানি ভ'রে গেলো চিঠি পাওয়ায় আর চিঠি লেখায় আর চিঠি ভাবায়।

সেদিন দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলো, জেগে উঠে ঘড়িতে চারটে ; তবু দুপুর, আস্ত দুপুর, মস্ত দিন রাজার মতো জুড়ে আছে, উজোড় ক'রে দিয়েও ফুরোয় না। একা বাড়িতে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরলো একটু, জানলা-বন্ধ বসবার ঘরটায় তাত যেন হাতে ছোঁয়া যায়—স্বাতী

পাখা খুলতে গিয়ে স'রে এলো, খুলে দিলো সামনের দরজা, সঙ্গে-সঙ্গে হৈ-হৈ হাওয়া পরদা উড়িয়ে ঝলসে দিলো চোখ-মুখ—ভালো লাগলো, ভালো লাগলো ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, ঝাপসা ধুলো, কাঁকরের চরকি ; ভাজা-ভাজা সিঁড়ির আগুন-গরমে পা কুঁকড়ে গেলো, তবু চেপে ধরলো ইচ্ছে ক'রে, জোর ক'রে—পা থেকে মেরুদণ্ডে, মেরুদণ্ড থেকে মগজে তাপের পিন ফুটলো ঝিমঝিম—সেটাও ভালো লাগলো। বাইরের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে পা সরালো, ফিরলো ঘরের দিকে, ফিরতেই চোখ ঠেকলো বি-জন কোম্পানির চিঠি-বাক্সটায়, চোখে পড়লো কাচের খোপে চিঠি, রোদ-রঙের শাদা একটি খাম স্বাতীর নাম দেখিয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্তে।

দাদার আজকাল নতুন এক ফ্যাশন হয়েছে : চিঠি-বাক্সে তালা, সুটকেসে তালা, এমনকি বেরিয়ে যায় ঘরে তালা দিয়ে চাবি পকেটে নিয়ে।...উপায়? কিচ্ছু উপায় নেই, চুপ ক'রে ব'সে থাকতে হবে যতক্ষণ-না দাদা দয়া ক'রে বাড়ি ফেরে, হোক সন্ধেবেলায় কি রাত-দুপুরে কি কাল সকালে। শাদার উপর কালোতে আঁকা খামটিকে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলো স্বাতী, একবার এদিক থেকে, একবার ওদিক থেকে—কিন্তু মিছিমিছি রোদে পুড়ে কী হবে, চিঠি কি পাখি যে উড়ে আসবে, আর পাখ হ'লেও কি ঐ খাঁচা থেকে বেরোতে পারতো?...ঘরে এসে জানলাগুলি খুলে দিলো, বসলো চুপ ক'রে, ব'সে-ব'সে শুনলো দূরে রাস্তায় জল দেবার শব্দ, দূর থেকে আস্তে-আস্তে কাছে, আর তারপর—কতক্ষণ পর সে ঠিক বুঝলো না—দাদাকে ঘরে ঢুকতে দেখে, সব দিনের চাইতে অনেক আগে বাড়ি ফিরতে দেখে সে একটুও অবাক হ'লো

না, বরং তার মনে হ'লো সে-ই দাদাকে ধ'রে এনেছে তার ইচ্ছার অসীম-লম্বা দড়ি দিয়ে টেনে।

'কি রে? উশকোখুশকো হ'য়ে ব'সে আছিস এখানে?'

স্বাতী বললো, 'চিঠির বাক্সের চাবিটা দে।'

বিজন চাবি দিলো না, বাক্স খুলে চিঠি নিয়ে এলো। স্বাতীর হাতে দেবার আগে একটু তাকিয়ে বললো, 'কে লিখেছে রে?' যেন প্রশ্ন করার কারণ দেখিয়ে আবার বললো, 'বেশ ভারি।'

চিঠি হাতে নিয়ে স্বাতী বললো, 'সত্যেন রায় লিখেছেন।'

'ও! তোর সেই বাচ্চা-প্রোফেসর! চাকরি গেছে বুঝি?'

'মানে?'

'তবে-যে কলকাতার বাইরে?'

'গ্রীষ্মের ছুটি না এখন? শিলং গেছেন বেড়াতে,' স্বাতীকে বোঝাতে হ'লো।

'ও, ছুটি!' বিজন ঠোঁট বাঁকালো। 'ও-সব ছুটি-ফুটির কথা মনেই থাকে না আমাদের!—তা এই কলেজের মাস্টাররা আছে মন্দ না—মাইনেতে ছক্কা হ'লেও ছুটিতে টেক্কা, যদিও এত ছুটি কী ক'রে কাটায় আমি সত্যি বলতে ভাবতেই পারি না!'

'কী ক'রেই বা পারবি,' দাদাকে যেন সান্ত্বনা দিয়ে স্বাতী চ'লে এলো তার ঘরে।

খানিক পরে বিজনও এলো।—'হ'লো চিঠি পড়া?' বোনের সঙ্গে আলাপ জুড়লো ঠোঁটে একটু হাসি টেনে।

চিঠিটা খামে ভ'রে রেখে স্বাতী বললো, 'বাড়ির চিঠিও তোর কোম্পানির বাক্সে দিয়ে যায়—চাবিটা আমার কাছে রাখিস।'

'পিয়নকে ব'লে দিলেই হয়।'

'তা ব'লে দেবো, তবু চাবিটা আমার কাছেই থাকা ভালো,' স্বাতী চোখ তুললো দাদার দিকে। বিজন পাৎলুনের পকেট থেকে চাবির রিং বের করলো, উঁচু ক'রে চোখের সামনে ধ'রে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখলো একটু, দু-আঙুলে টিপে-টিপে একটা ছোট্ট চাবি খুলে নিয়ে, 'ডুপ্লিকেটটা রাখ তবে,' ব'লে এমনভাবে স্বাতীর হাতে দিলো যেন বোনের মন যোগাতে গিয়ে নিজের একটি মহামূল্য সম্পত্তি হাতছাড়া করলো। তারপর, এদিক-ওদিক তাকিয়ে, যেন বেছে-বেছে ভেবে-চিন্তেই বসলো কুশন-আঁটা বেতের চেয়ারটিতে ; পিঠ এলিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে, আয়েসি ধরনে বললো, 'মজুমদারকে একদিন চায়ে বলবো ভাবছি।'

স্বাতী কথা বললো না।

সিগারেটের মাথার ছোট্টো ছাইটুকুতে চোখ রেখে বিজন আবার বললো, 'বিজনেসে যদি দাঁড়িয়ে যাই তো মজুমদারেরই জন্য। ওকে মাঝে-মাঝে খাওয়ানো-টাওয়ানো উচিত।'

'বেশ তো ; হোটেলে নেমন্তন্ন কর।'

'হোটেলে ? ওঃ, হোটেল প'চে গেছে !—আর তাছাড়া,' বিজন একটু থামলো, যেন ভাবলো, 'তাছাড়া বাড়িতে বললে খুশি হয়।'

'কে খুশি হয় ?'

'কে আবার ! আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছিস না তুই ?'

'তা—বাবাকে বলিস—বাবা যদি মত করেন—'

'হোঃ ! এর জন্য আবার বাবাকে বলতে হবে ?'

'উচিত তো।'

'উচিত কেন? আমার একজন বন্ধুকে খাওয়াতে পারি না ইচ্ছে করলে?'

'বন্ধু!' স্বাতী হেসে ফেললো।

'হাসলি যে?'

'ঐ চল্লিশ বছরের ঢেঁকিটা তোর বন্ধু!'

'চল্লিশ?' এবার হাসলো বিজন। 'চল্লিশ কী রে—এই—তিরিশ-বত্রিশ হবে। চমৎকার মানুষ—আর পয়সাও করেছে খুব।'

'সেজন্যই চমৎকার?'

'তা যা-ই বলিস,' বিজন কবুল করলো, 'পয়সা করতে হ'লে মাথা চাই, আঠা চাই কাজে। কিছু ছিলো না মজুমদারের, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়েছে—একেবারে সেলফ-মেইড ম্যান! বিয়ে করেনি, বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই, দিনরাত কাজ—কাজ—আর কাজ!' বন্ধুগৌরবে প্রদীপ্ত হ'লো বিজন।

'বাঃ! তাহ'লে ইনিই তোর আদর্শ পুরুষ এখন?'

'মন্দ আদর্শটা?'

'তুই-ই জানিস।'

'আমার জন্য কেন-যে মজুমদার এত করে তা ভেবেই পাই না,' বিজন যেন আপন মনেই কথাটা বললো। 'ওর কাছে কত লোক এসে ধন্না দেয় রোজ, কিন্তু আমাকে বলতেও হয়নি কিছু, শুধু দেখেই—'

'—দেখেই লোক চিনেছে!' দাদার কথা শেষ করলো স্বাতী।

'তা-ই বোধ হয়!' বিজন আড়মোড়া ভেঙে উদাসভাবে উঠে দাঁড়ালো। বোনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললো, 'তুই এত শ্যাবি থাকিস কেন রে?'

'আজ বড্ড ইংরিজি বলছিস, দাদা!'

'এ আর কী—যা ইংরেজি বলে বিজনেস সার্কল-এ—"Blast your bile!" "Oh my left foot!"—শুনেছিস কখনো? ঘরে ব'সে-ব'সে বই গিললে কি আর—তা এ-রকম বিচ্ছিরি থাকিস কেন বল তো? ভালো শাড়ি-টাড়ি নেই?'

'ও মা!' স্বাতী তার আঁচলের বাড়তি অংশটা দু-হাতে টান ক'রে সামনে ধরলো। 'এ-শাড়িটা নাকি মন্দ! কী-সুন্দর ধনেখালির শাড়ি—একটু ময়লা হয়েছে—তা একটু-ময়লাই তো প'রে আরাম।'

'রটন! যা-সব বম্বে প্রিণ্ট উঠেছে আজকাল—।' আরো-কী বলতে গিয়ে হঠাৎ-যেন থেমে গেলো বিজন, পাৎলুনের পকেটে হাত দিয়ে চাবি আর খুচরোয় রিনঝিন আওয়াজ ক'রে বললো, 'তাহ'লে শনিবার বলবো মজুমদারকে—খাবার-টাবার কিছু তৈরি রাখিস।'

'আমি পারবো না!'

'কেন? পারবি না কেন?'

'কেন আবার কী—পারবো না জেনে রাখ।'

বিজন চোখ সরু ক'রে একটু তাকিয়ে রইলো বোনের দিকে, যেন মনস্থির করতে পারছে না, এর পর কী বলবে। তার চোখের চকচকানির দিকে তাকিয়ে স্বাতীর মনে লাফিয়ে উঠলো বাবার কথাটা, ফশ ক'রে ব'লে ফেললো, 'তোর ব্যবসার দলবল বাড়িতে আনিস কেন?'

'ও, এই কথা!' এতক্ষণের চেপে-রাখা রাগ এবার ফেটে পড়লো।—'এই কথা!'

'বাবা পছন্দ করেন না, জানিস? ও-সব বাজে লোক—'

'বাজে!' বিজন এক লাফে এগিয়ে এলো কাছে, স্বাতীর মুখের সামনে হাতের মুঠি নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগলো, 'এত আস্পর্ধা তোর! এত অসভ্য হয়েছিস তুই! তা বাপ যে-রকম, মেয়ে তো সেইরকমই হবে—!'

'ছেলে সে-রকম হ'লে তো বাঁচা যেতো,' বিজনের তোড়ের মধ্যেই ব'লে উঠলো স্বাতী।

'হ্যাঁ—পুরুষরা সব ভেড়া বনলে তোদের খুব সুবিধে—না?'

'যত খুশি তুই চ্যাঁচাতে পারিস, কিন্তু তোর ও-সব আড্ডা চলবে না বাড়িতে!'

'চলবে না? কার কথায় চলবে না, শুনি?'

'যার বাড়ি তার কথায়।'

'বাড়ি কি তোমার?'

'তোমারও নয়!'

'নিশ্চয়ই আমার!'

'ঈশ!'

'শোন, স্বাতী—তোর সঙ্গে আর তর্ক করবো না—শুনে রাখ—এ-বাড়ি আমার, এখানে আমি যা ইচ্ছে তা-ই করবো, পছন্দ না হয় আমাকে বলুক না এসে রাজেন মিত্তির, তোর কাছে গুজগুজ করে কেন?'

'করে এইজন্য যে তুই একটা ষাঁড়, আর তোর সঙ্গে কোনো ভদ্রলোক কথা বলতে পারে না।'

'ভদ্রমহিলা তো খুব পারে!'

'পারতেই হয়! আমি যদি বাবার দিক না দেখি, তাহ'লে তুই তো বাড়ি থেকে তাড়াবি বাবাকে!'

'চুপ!' বিজন সত্যিই ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচালো এবার, 'আর-একটি কথা বলবি তো তোকে তাড়াবো বাড়ি থেকে—এই এমনি ক'রে—ঘাড়ে ধ'রে!' হাতের আঙুলগুলিকে সাপের ফণার মতো ছড়িয়ে স্বাতীর ঘাড়ের কাছে নিয়ে এলো—'এমনি ক'রে বুঝলি? ঘাড়ে ধ'রে রাস্তায় বের ক'রে দেবো—হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখবে রাজেন মিত্তির! আমার বন্ধুদের নিয়ে এত তাঁর জ্বলুনি, আর হন্তদন্ত হ'য়ে পঞ্চাশবার নেমন্তন্ন করতে ছোটেন তোর ঐ মিনমিনে মেয়েলি মিরকুট্টে সত্যেন রায়কে!'

ছাইয়ের মতো হ'লো স্বাতীর মুখ, তারপর গনগনে কয়লার উনুনের মতো হ'লো। কথা বলতে গিয়ে বেধে গেলো গলায়, বড়ো-বড়ো চোখে তাকিয়ে দেখলো, দাদার মুখটা বদরাগি বেড়ালের মতো হ'য়ে গেছে, আর, একটু পরে বিজন যখন আবার কথা বললো, তখন তার গলার আওয়াজটাও শোনালো ফ্যাশফেশে, ছেঁড়া-ছেঁড়া, বেড়াল-মতো :

'বাবা একটা হাবা—কিন্তু আমি—তোমার অসভ্যতা টিট ক'রে ছাড়বো আমি!' বিজনের লিকলিকে আঙুলটা স্বাতীর নাকের একেবারে কাছে এসে কেঁপে-কেঁপে স'রে গেলো, স্বাতীও পিছনে সরলো একটু, আরো একটু, কিন্তু চোখ সরালো না দাদার মুখ থেকে, আর বিজন দাঁতে দাঁত ঘ'ষে বলতে লাগলো, 'টিট ক'রে ছাড়বো!—শুধু তোকে না—ঐ—পুঁচকে প্রোফেসরটাকেও! চিঠি

লেখার আর লোক পান না!—রাস্কেল! আসুক এবার, মেরে তাড়াবো এই পাড়া থেকে!'

সরতে-সরতে স্বাতী দাঁড়িয়েছিল তার পড়ার টেবিলে ঠেশ দিয়ে, চোখের কোণ দুটি লাল, চোখের তলায় একটি শিরা উঁচু, একটু-খোলা ঠোঁটে আর একটু-ফোলা নাকে নিশ্বাস নিচ্ছে জোরে-জোরে ;—বিজনের কথা শেষ হবার পরেও চুপ ক'রেই থাকলো, কিন্তু বিজন আবার যেই মুখ খুললো আরো কিছু বলবে ব'লে, তক্ষুনি লম্বা শাদা হাতে ছুঁড়ে মারলো ঠিক তার মুখের উপর শক্ত একটা মোটা বই। শব্দ হ'লো বেশ জোড়েই, আর বইটা যখন পাতা-খোলা কাৎ হ'য়ে মেঝের উপর প'ড়ে গেলো, তখন স্বাতী বললো, 'বেরো!'

বিজন ডান হাতটি একবার গোল ক'রে ঘুরিয়ে আনলো মুখের উপর, চুল উল্টিয়ে দিলো বাঁ হাতে, বইটার দিকে একটু তাকিয়ে থেকে জুতো-পরা পায়ের এক লাথিতে পাঠিয়ে দিলে একেবারে ঘরের বাইরে, তারপর বুক টান ক'রে উঁচু মাথায় বেরিয়ে গেলো নিজে। যাবার সময় ব'লে গেলো, 'তোরও একদিন ঐ-দশা হবে।'

৪

কী-দশা হবে? ঐ বইয়ের মতো? কিন্তু ও-বই তো বিশ্বজয়ী। ঘর ছাড়িয়ে, বারান্দা পেরিয়ে, উঠোনের সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপে আটকে গেছে কীটসের কবিতা; মলাটের দুই ডানা ছড়িয়ে, মুখ থুবড়ে, শিকার-করা পাখির মতো; বিকেলের বাঁকা রোদ্দুরে চিকচিক করছে কবির নাম, সোনালি অক্ষর, সোনালি স্বাক্ষর। স্বাতী তুলে নিলো তাকে, কোলে তুলে আঁচলে মুছলো, মলাট খুলে একবার দেখলো যেখানটায় সত্যেন রায়ের নাম লেখা, তারপর কান-দুমড়োনো পাতা ক-টিতে আঙুলের চাপ দিতে-দিতে ভাবলো যে কখনোই, কোনো কারণেই এতখানি রাগা উচিত না, যাতে কোনো বই ছুঁড়তে গিয়ে লেখকের নাম চোখে প'ড়ে হাত থেমে না যায়।...দাদাটা একটা চাঁড়াল। তবু ভাগ্যিশ বাবা বাড়ি ছিলেন না, জানবেনও না কিছু!

পাছে বাবা এক্ষুনি এসে পড়েন, এসে তাকে দেখেই জিগেস করেন, 'কী রে? কী হয়েছে?' আর সেও ঝোঁকের মুখে সব ব'লে ফ্যালে, স্বাতী তাড়াতাড়ি তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলো, স্নানের জলে ধুয়ে ফেলবার চেষ্টা করলো সব ঝাল, ঝাঁজ, জ্বালা; নিজেকে দোষ দিলো বার-বার, দাদার পক্ষ নিয়ে অনেক কথা বললো মনে-মনে। সে-সব কথায় বাঁধুনি এত সুন্দর, যুক্তি এত নিখুঁত যে মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তার নিজেরই বিশ্বাস জন্মালো তাতে; সে দেখতে পেলো যে দাদার উপর একটা অন্যায় আছে এই বাড়ির, অবহেলার অন্যায়; ছেলেবেলা থেকে সকলের অবহেলার চিমটি

খেয়ে-খেয়ে দাদা এইরকম খ্যাপা-মতো হ'য়ে গেছে: এখন উঠে-প'ড়ে লেগেছে টাকায় টেক্কা দিতে—বেচারা! স্বাতী দেখলো—সাপের মতো লিকলিকে আঙুল আর দেখলো না, বেড়াল-মতো দাঁতে-নখে ছিঁড়ে-খাওয়া রগ-ফাটা রাগ আর দেখলো না—দেখলো, দাদা হাত পেতেছে তার কাছে: বাড়িতে আর-কারো কাছে, বোধহয় বাইরেও কারো কাছে, যে-পাত্তা সে পায় না, তারই জন্য হাত পেতেছে বাড়ির সেই একমাত্র মানুষের কাছে, যে তার বয়সে আর সম্পর্কে ছোটো। গায়ে প'ড়ে যেমন ঝগড়া করে, গায়ে প'ড়ে কথাও বলে ও-ই আবার; নানা ছুতোয় এই কথাই যেন বলতে চায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে—আমাকে মানো, দাদা ব'লে না হোক, মানুষ ব'লে মানো, বয়স্ক ব'লে, ভদ্রলোক ব'লে, পুরুষ ব'লে মানো।

স্বাতীর অনুশোচনা হ'লো। সত্যি-তো, দাদার উপর তারও তাচ্ছিল্যের শেষ নেই, যখন-তখন যাচ্ছেতাই বলে, কোনো কথায় আমলেই আনে না ওকে। হয়তো—সে যদি ওর সঙ্গে আড়ে চলতে পারতো; যদি, ধরো, সে বড়দির মতো হ'তো, ঐ-রকম ঠাণ্ডানরম ঝিরিঝিরি, তাহ'লে দাদা হয়তো ভালোই হ'তো—[illegible]ন সুখী হ'তো, আর বাবাও সুখী হতেন তাতে, বাড়িতে এই অশান্তিটাই থাকতো না। দাদার সুখী হওয়ার—মানে, ভালো হওয়ার দায়িত্ব ছিলো তারই উপর—হয়তো এখনো আছে, হয়তো সময় আছে এখনো। কথাটা ভেবে, নিজেকে হঠাৎ এ-রকম একটা বড়ো পার্টে জ্বলজ্বলে দেখে স্বাতী অবাক হ'লো, মনে-মনে একটু রোমাঞ্চিতও; বাথরুম থেকে বেরোবার আগেই, ফোঁটা-ফোঁটা জল গায়ের ওপর চিকচিকে থাকতে-থাকতেই প্রতিজ্ঞা করলো যে এবার, জীবনে এই

প্রথম বার দাদার কাছে সে হার মানবে। প্রতিজ্ঞা করলো, কিন্তু স্নান ক'রে বেরিয়ে, পাট-ভাঙা ফিকেনীল শাড়ি প'রে, পাউডর-কৌটো খুলে নিশ্বাস নিতে-নিতে, তবু যেন ঝগড়ার দুর্গন্ধ তার নাক থেকে গেলো না, বচসার বিস্বাদ মুখে লেগে রইলো।···কিন্তু এই ভালো-না-লাগাকে আমল দিলে চলবে না, নিজে কষ্ট ক'রেও দাদাকে ভালো করতে হবে—মুখে পাউডর দিতে-দিতে স্বাতী তার বড়ো পার্টের জন্য তৈরি হ'লো।

বারান্দায় পাটি পেতে ব'সে বিকেলের চা খেতে-খেতে স্বাতী বাবার কাছে কথাটা পাড়লো।

বাবা বললেন, 'বেশ।'

স্বাতী হেসে বললো, 'কাউকে খাওয়ানো হবে, এর চাইতে সুখের কথা তোমার কাছে আর-কী আমি কিন্তু ভাবছিলাম এ-সব ব্যবসার বন্ধুদের—' কথা শেষ না-ক'রে বাবার মুখের দিকে তাকালো।

'তা হোক—বিজুর যখন ইচ্ছে হয়েছে—'

বাবা এত সহজে কথাটা বললেন যে স্বাতীর মনে হ'লো বাবার পক্ষ নিয়ে দাদার সঙ্গে তার লড়াইটা বড্ড বেশি হ'য়ে যায়নি তো? চোখ নামিয়ে বললো, 'দাদাকে আমি বলেছিলাম, বাবা।'

'কী?'

'এই-যে—বাড়িতে ও-সব বাজে লোকের যাওয়া-আসা পছন্দ করো না তুমি—'

'আমার পছন্দ-অপছন্দে ভারি-তো এসে যায় বিজনচন্দ্রের।'

'না বাবা,' স্বাতী গম্ভীর হ'লো, 'আমি ও-কথা বলাতে দাদা

কেমন কিন্তু-কিন্তু হ'য়ে গেলো ; মাথা চুলকে বললো, "তাহ'লে থাক।" আমি তখন বললাম, "আচ্ছা, বাবাকে জিগেস ক'রে দেখি—" '

'ব্যাপার কি ?' রাজেনবাবু হাসলেন। 'হঠাৎ সুপুত্র ! কী চায় ?'

বাবার কথার সুরে আবার স্বাতীর খটকা লাগলো। তবে কি সে ভুল বুঝেছে, ভুল ভেবেছে ? দাদাকে শাসন করতে গিয়ে যেমন বেশি-বেশি করেছিলো তখন, তার এখনকার ভালোমানুষিটাও তেমনি ছেলেমানুষি ?···কিন্তু এখন তো আর পেছোনো যাবে না, দাদার কাছে ভালো হ'তেই হবে, দাদা তাতে ভালো হোক আর না-ই হোক।

পরের দিন সকাল ন-টা পর্যন্ত দাদাকে দেখতে না-পেয়ে স্বাতীই অগত্যা পা বাড়ালো তার ঘরের দিকে। দরজার কাছে আসতেই শুনলো ভিতর থেকে ঠুকঠুক শব্দ, আর ভিতরে তাকিয়ে দেখলো, দাদা টাইপ করছে ব'সে-ব'সে, আর সেই টাইপ করার সাংঘাতিক চেষ্টায় তার চোখ গোল হয়েছে, ঠোঁট বেঁকে আছে, আর তিনটে মোটা-মোটা লাইন স্পষ্ট ফুটেছে কপালে। স্বাতীর হাসি পেলো, কিন্তু না—হাসবে না তো !—মুখে মন-খারাপের হালকা ছায়া এনে ডাকলো, 'দাদা।'

বিজন চোখ তুললো লাল-কালো ফিতে পর্যন্ত, তক্ষুনি নামালো চাবিতে।

স্বাতী আবার ডাকলো, আরো নরম ক'রে, 'দাদা, শোন !'

এবার চোখ না-তুলে বিজন মোটা গলায় জবাব দিলো, 'কী ?'

স্বাতী এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে, একটু দাঁড়িয়ে থেকে আনাড়ি

আঙুলের অসহায় আঁকুপাঁকু লক্ষ্য করলো, তারপর পাখির মতো গলায় ব'লে উঠলো, 'কী সুন্দর ছোট্ট টাইপরাইটর!'

বিজন হাত সরিয়ে তার নতুন সম্পত্তির দিকে তাকালো—ঈষৎ গর্বিতভাবেই।

'কিনলি?'

'হ্যাঁ।'

'তা নিজেই টাইপ করিস—কত সময় নষ্ট হয়!'

বিজনের চোখ কোণাকুণি একবার ঝলসালো বোনের উপর।—'দু-দিনেই অভ্যেস হ'য়ে যাবে,' ব'লেই ভুরু কুঁচকে ঝকঝকে কালো-শাদার সারির মধ্যে 'S' অক্ষরটা খুঁজতে লাগলো।

'তা নিশ্চয়ই হবে,' স্বাতী আস্তে-আস্তে বললো, 'কিন্তু এ-সবের জন্য তো কেরানি থাকে মানুষের।

এ-কথায় বিজন খুশি না-হ'য়ে পারলো না, মানে, খুশি না-দেখিয়ে পারলো না, কেননা খুশি হয়েছিলো সে আগেই, হ'য়েছিলো আগে থেকেই; স্বাতীর ক্ষমা-চাওয়া-চাওয়া মন-মরা চেহারার চাইতে বেশি খুশি তাকে করতে পারে, এমন-কিছুই পৃথিবীতে ছিলো না আজ সকালে। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আলগোছে বললো, 'আমারও থাকবে।'

স্বাতী একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'আমিও পারি মাঝে-মাঝে তোর চিঠিপত্র টাইপ ক'রে দিতে।···দেখে এক্ষুনি ইচ্ছে করছে রে।'

'করবি?' বিজন খুবই চেষ্টা করলো মনের গ'লে-যাওয়া ভাবটা মুখে না-ফোটাতে, কিন্তু বৃথা!

এক পা এগিয়ে, এক পা পেছিয়ে স্বাতী বললো, 'না—থাক—ভুল হবে।'

'ভুল তো আমারও হয়!'—বিজন আর পারলো না, হেসে ফেললো—'এই ছাখ না, "এস"টাকে খুঁজতে-খুঁজতে চোখের ডিম বেরিয়ে এলো!'

স্বাতী হাসিতে যোগ না-দিয়ে বললো. 'অভ্যেস হ'য়ে যাবে।'

এই প্রথম স্বাতীর মুখে বিজন তার নিজের মুখের কোনো কথার পুনরুক্তি শুনলো, যাতে ঠাট্টা কি অবিশ্বাস নেই, উড়িয়ে দেয়া কি এড়িয়ে যাওয়াও না। এক ঠেলায় চেয়ার সরিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো, এতক্ষণে পুরোপুরি, মুখোমুখি চোখ বোনের মুখে ফেলে বললো, 'এখনই একটু ক'রে ছাখ না।'

'নাঃ! দুপুরবেলা যদি রেঁখে যাস আমার কাছে, একটু-একটু প্র্যাকটিস ক'রে রাখবো—' হঠাৎ থেমে, টাইপরাইটরের গোল-করা ধারটিতে আঙুল রেখে বললো, 'কবে কিনলি রে? বলিসনি তো কিছু।'

'এ আর বলবো কী!' গালের মধ্যে জিভটাকে একবার ঘুরিয়ে এনে বললো, 'আমি কিনিনি। অন্য একজনের।'

'নতুন তো!'

'নতুনই তো। যে কিনেছে সে-ই আমাকে দিয়েছে ব্যবহার করতে।'

'সে-ই দিয়েছে? লোক ভালো, বলতে হয়।' সেই ঠাট্টার সুর আবার যেন লাগলো স্বাতীর গলায়, কিন্তু এত ক্ষীণ যে বিজন তা বুঝলো না—না কি বুঝলো?—আর তাই মুখের হাসি মুছে

ফেলে গম্ভীর হ'লো হঠাৎ, সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললো, 'হ্যাঁ, লোক সে খুবই ভালো।'

দাদার ভঙ্গির বদলটা স্বাতী যেন লক্ষ্যই করলো না, সহজভাবে বললো, 'তার নিজের লাগে না?'

'তার?...তার আপিশেই কত মেশিন চলছে সারাদিন!'

স্বাতী ভেবে দেখলো, মজুমদারের নামটা দাদার মুখ দিয়ে বের করাই ভালো। তাই একটু হেসে বললো, 'তোর বন্ধুভাগ্য খুব, দাদা।'

'তা কোনো-একটা ভাগ্য থাকা চাই তো!' বিজন এমনভাবে কথাটা বললো যেন প্রতিপক্ষের কোনো-একটা আক্রমণের আভাস পেয়েই সে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত; কিন্তু তখনই যেন স্থির করলো যে আক্রমণই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায়। চড়া গলায়, কড়া আওয়াজে বললো, 'অনেক ভাগ্যে মজুমদারের মতো বন্ধু হয়, আমি এ-কথা বলবোই।'

মনে-মনে নিশ্বাস ছাড়লো স্বাতী, একটু দেরি করলো, দাদা যদি আরো কিছু বলে, তাকে আরো কম বলতে হবে। আর হ'লোও তা-ই: একটু পরে বিজনই আবার বললো, 'আর এই মজুমদারকে তোরা কিনা অপমান করিস!'

'ও মা!' এবার কথা বলার চমৎকার সুযোগ পেলো স্বাতী, 'অপমান আবার কে করলো, আর কখনই বা করলো!'

'অপমান না!' ফোঁশ ক'রে নিশ্বাস ফেললো বিজন।

'তুই এক কাজ কর, দাদা,' স্বাতী মোলায়েম গলায় বললো, 'তোর বন্ধুকে বল একদিন চা খেতে।'

'নাঃ!'

'না কেন? বাবাকে বলেছিলাম—তাঁর কোনো আপত্তি নেই। আর বাবার আপত্তি না-থাকলে আর আমার কী।'

'তার মানে,' বিজন ঠোঁটের ফাঁকে একটা সিগারেট রেখে, যেন তারই সাহায্য নিয়ে কথাটা শেষ করলো, 'তোর আপত্তি আছে এখনো?'

'থাকলে তোর কিছু এসে যায় না তো?'

মুখে-মুখে জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো বিজন; সিগারেট ধরিয়ে, ঠোঁটের ফাঁক থেকে আঙুলের ফাঁকে এনে বললো, 'কিন্তু আপত্তি কেন?'

'তোর বাড়িতে তোর বন্ধুকে তুই নেমন্তন্ন করবি, আমার তাতে আপত্তি হবে কেন? আমি বললাম তো—এখন তোর যা ইচ্ছে কর।'

'আচ্ছা, তা-ই করবো,' ব'লে বিজন সিগারেট নামিয়ে রাখলো অ্যাশট্রেতে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আবার টাইপ করতে ব'সে গেলো। স্বাতী দাঁড়িয়ে রইলো আরো মিনিটখানেক, আর সেই এক মিনিট বিজনের কেটে গেলো 's'-এর পরে 'e' খুঁজতে-খুঁজতেই।

কিন্তু সন্ধেবেলা নিজেই এসে স্বাতীকে খবর দিলো, 'মজুমদারকে বললাম—শনিবার সুবিধে হ'লো না, শুক্কুরবারে।'

'বেশ তো।'

'তা তুই—তুই একটু ভদ্রতা অন্তত করিস।'

'আমি কি ভদ্রতা জানি তোর মনে হয়?'

'না-জানলেও শিখতে হবে—বাড়িতে তুই ছাড়া কেউ নেই

যখন!' কথাটা ভালো লাগলো স্বাতীর, আর সেইজন্যই মুখে কিছু বললো না।

'শুক্কুরবার হ'লো পরশু—মনে রাখিস তাহ'লে,' বিজন হাত নেড়ে বিদায় নিলো।

শুক্রবারে ভদ্রতার পার্টে স্বাতী ফেল তো হ'লোই না, ভালোই উৎরোলো। চা ঢেলে দিলো, স্পষ্ট বুঝতে দিলো যে নিমন্ত্রিতেরা আরো-একটু চিঁড়েভাজা, আরো-একটা শিঙাড়া খেলে তার সুখের আর সীমা থাকবে না; নিজেও খেলো, কিন্তু তার খাওয়াটা যেন বোঝাই গেলো না; কথা-যে বেশি বললো তা নয়, কিন্তু যখনই কথাবার্তা মিইয়ে এসেছে, আস্তে ফুঁ দিয়ে জীইয়ে তুলেছে আবার; কী কথায়, কী চোখে-মুখে, নড়াচড়ায় একবারও যেন বোঝা গেলো না যে সে বয়সে এত ছোটো আর অভিজ্ঞতায় এত কাঁচা—কিন্তু কাঁচাই বা কেন, এত সে পড়েছে, সেটাও একটা অভিজ্ঞতা তো?

বিজন আশাই করতে পারেনি তার শুক্রবারের এতখানি জৌলুশ। স্বাতীকে বিশ্বাস কী—নিশ্চিন্ত হবার জন্য সে ব'লে এসেছিলো ছোড়দি-হারীতদাকেও; ভেবেছিলো, হয়তো আশাই করেছিলো যে হারীতদা আসতে পারবেন না; কিন্তু অনেকদিনের পাওনা এবং অনেকদিনের না-পাওয়া একটা ইনক্রীমেণ্টের খবরে তার মন-মেজাজ একটু বিশেষ খোশ ছিলো সেদিন, তাছাড়া শহরে তেমন উত্তেজক সভা-টভাও ছিলো না; তাই শ্যালকের প্রথম পার্টিতে শ্বশুরবাড়িতেই সে এলো।...তা পার্টি এমন মন্দই বা কী; তিনজন ভদ্রলোক আর দু-জন মহিলায় বেশ ভরা-ভরাই দেখাচ্ছিলো, আর

বন্ধুমহলের তুলনায় এখানকার কথাবার্তা যদিও ফ্যাকাশে, তবু নতুন একজন মানুষ পেয়ে তাকে দলে ভরতির চেষ্টা তো করা যাবে।

হারীত প্রথম গুলি ছুঁড়লো তার পুরোনো টার্গেটেই : 'স্বাতী, এ কী করেছো ! এত খাবে কে ?'

স্বাতী বললো, 'আমরা।'

'কিন্তু এটা তো ঠিক হ'লো না—চায়ের সঙ্গে চিংড়ি-কটলেট !'

'চায়ের সঙ্গে কটলেট খায় না বুঝি ?' স্বাতী লজ্জা পেলো। 'আমার কিন্তু বেশ ভালোই লাগে।'

প্রবীর মজুমদার হেসে উঠলো এ-কথায়।

'এই এক খাওয়ার ব্যাপার নিয়ে কত সময় আর কত খাটুনি যে নষ্ট হয় আমাদের দেশে—' হারীত বিশেষভাবে মজুমদারকেই বিঁধলো চোখ দিয়ে—'আর খাবার যা নষ্ট হয় তার তো কথাই নেই !'

'সত্যি !' মজুমদার সোৎসাহে বললো, 'আর, সবই বাড়ির তৈরি ! কখন-যে এত-সব করেছেন !' ব'লে তাকালো স্বাতীর দিকে।

আবার লজ্জা পেলো স্বাতী। সে অবশ্য কিছুই করেনি : বাজার ক'রে দিয়েছেন বাবা, বানিয়েছে সারা দুপুর ব'সে-ব'সে মা-র আমলের পুরোনো চাকর হরি, সাজিয়েও এনে দিয়েছে আলাদা-আলাদা থালায়—সে শুধু সেজে-গুজে এসে হাতে-হাতে তুলে দিয়েছে—আর নাম কিনা তারই হ'লো ! অথচ ও-রকম একটা ধরা-বাঁধা ভদ্র বুলির উত্তরে এ-কথা কি বলা যায়—'না, দেখুন, আমি কিন্তু কিছু করিনি !' অথচ ও ছাড়া আর কী বলা যায় তাও ভেবে পেলো না স্বাতী, একটু লাল হ'য়ে মাথা নিচু করলো

তাই, আর দেখতে তাকে ঠিক সেইরকম হ'লো, যে-রকম হ'তো প্রশংসাটা তার পাওনা ব'লে মেনে নিলে।

শাশ্বতী বাঁকা হেসে বললো, 'কোনটা তুই করেছিস বল তো, স্বাতী; সেইটে খাই।'

'আমাকে যদি জিগেস করেন, মিসেস নন্দী,' মজুমদার এবারেও কথা ভুল বুঝলো, 'আমি ঐ কটলেটটাই রেকমেণ্ড করবো। কলকাতায় প্রন-কটলেট খেতে হ'লে চাং-আনেই যেতে হয়, এ কিন্তু তাকেও হারিয়েছে!'

স্বাতী মুখ তুললো এবার, আর তুলতেই ছোড়দির সঙ্গে চোখোচোখি হ'লো। হেসে ফেলে বললো, 'আমি কিন্তু করিনি।'

'ঐ হ'লো!' মজুমদার ব্যস্ত হ'লো কটলেটের গুণ কার্যত প্রমাণ করতে।

বিজু বললো, 'কলকাতার কোথায় কী ভালো খাবার পাওয়া যায়, সে-বিষয়ে কিন্তু মিস্টর মজুমদার একজন বিশারদ।'

'নাকি?' ঈষৎ শ্লেষ ফুটলো হারীতের ভুরু তোলায়।

'কোনটা পুঁটিরামের সন্দেশ আর কোনটা জলযোগের, তা ইনি চোখ বুজে চেখেই ব'লে দিতে পারেন। আর তাছাড়া—'

'আঃ, মিস্টর মিত্র!' মজুমদার বাঁ হাত তুলে নিজের গুণপনার বিজ্ঞাপনে বাধা দিলো, তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বুঝেছেন না—বাড়িতে ব'সে বাঁধা সময়ে খাওয়া আমার কপালে তো লেখেনি—সারাদিন সাত রাজ্যি ঘুড়ে বেড়াচ্ছি, তাই বাধ্য হ'য়েই—' কথা শেষ না-ক'রে মজুমদার হাসলো ঝকঝকে বড়ো-বড়ো দাঁত বের ক'রে।

'এঁর কারখানা দমদমে, আপিশ ক্যানিং স্ট্রীটে,' বিজন সুযোগ পেলো বন্ধুর পরিচয় বিশদ করার, 'আর কাজ ছড়ানো ব্যারাকপুর থেকে ডায়মণ্ড হার্বর।'

'তার মানে—আপনি একজন ক্যাপিট্যালিস্ট!' হারীত নাকের বাঁশি কুঁচকোলো।

'হইনি এখনো, হবার চেষ্টায় আছি।'

অভিজ্ঞতা থেকে শাশ্বতী বুঝলো যে হারীতের যুদ্ধের বিউগিল বেজে গেছে, তাই তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলো: 'কিসের কারখানা আপনার?'

'বাজে-বাজে জিনিশ সব!' মজুমদার অমায়িক হাসলো। 'পাট, নারকোলের ছিবড়ে—'

সত্যি নিরাশ হ'লো শাশ্বতী। ভদ্রলোকের কারখানায় শাড়ি-টাড়ি তৈরি হ'লে বেশ হ'তো, দেখতে যাওয়া যেতো একদিন। আড়চোখে ছোড়দির দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'বাজে আর এমন-কী। নারকোলের ছিবড়ে দিয়ে কত-কিছু তো তৈরি হয়। পা-পোষ—'

'পা-পোষ!' বিজন হোঃ ক'রে হেসে উঠলো।

'ঠিক কথা! ঠিক বলেছেন আপনি!' মজুমদার গম্ভীরভাবে স্বাতীর দিকে তাকালো। 'আপনারা পা মুছবেন ব'লেই তো আমরা খাটছি সারাদিন।' তারপর, একই রকম সুরে হারীতের দিকে ফিরে বললো, 'আপনার কী মনে হয়? যুদ্ধটা বেশ জ'মে উঠেছে, না কি ফেঁশে যাবে হঠাৎ?'

'Wage-slave-driver!' হারীত মনে-মনে আওড়ালো;

তারপর লোকটাকে বাগে পাবার জন্য বাঁকা চোখে পাল্টা প্রশ্ন করলো, 'আপনার কী মনে হয়?'

'কী জানি—যে-রকম চটপট কাৎ হ'য়ে পড়ছে সব—প্যারিসও গেলো—এখন হিটলার ইংলণ্ডটিকে জলযোগ ক'রে ফেললেই না গোলযোগ মিটে যায়।'

লোকটার হাসিমাখা বোকামিতে হারীতের পিত্তি জ্ব'লে গেলো; ধৈর্য ধ'রে বললো, 'তা'হলেই মিটে যায়?'

'আর লড়বে কে?'

'কেন, রাশিয়া?' হারীত সিংহনাদ ছাড়লো।

'রাশিয়া?' মজুমদার আরো কিছু বলতো বোধহয়, কিন্তু হারীতের আর তর সইলো না, ঝপ ক'রে কোপ বসালো, 'রাশিয়াই তো পৃথিবীর আশা।'

এ-কথা শুনে মজুমদার স্পষ্ট চমকালো, চায়ের পেয়ালা মুখে তুলতে গিয়ে থেমে গেলো, আর তার মস্ত, লালচে, ঠোঁট-মোটা মুখের দিকে তাকিয়ে হারীত বুঝলো যে আজকের দিনে পৃথিবী ভ'রে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ যা বিশ্বাস করে, সে-কথাটাই জীবনে এই প্রথম শুনলো বাংলাদেশের এই গবুচন্দ্র হবু-ক্যাপিট্যালিস্ট। 'রাশিয়াই তো পৃথিবীর আশা!' কথাটা আবার আওড়াতে খুবই ভালো লাগলো তার।

'ভাগ্যিশ আপনার মুখে শুনলুম কথাটা, নয়তো আর-সবার মতো আমিও ভাবতুম যে আদ্ধেক পৃথিবী যদ্দিনে ছারখার হ'লো, তদ্দিন স্টালিন-সাহেব দিব্যি গোঁফে তা দিলেন ব'সে-ব'সে!' ব'লে চায়ে চুমুক দিলো মজুমদার।

'হোক ছারখার', হারীত মুখ লাল ক'রে বললো। 'রাশিয়া যদি বাঁচে, তবে পৃথিবী বাঁচবে।'

'ও, বুঝলাম! পৃথিবী মানেই রাশিয়া, আর সেইজন্যই রাশিয়া পৃথিবীর আশা?'

লাল রং কালো হ'লো হারীতের মুখে। ইচ্ছে হ'লো, ঐ মাংসপিণ্ডটাকে সাফ দু-কথা শুনিয়ে দিয়ে এক্ষুনি উঠে পড়ে—কিন্তু তক্ষুনি মনে পড়লো দলের পাণ্ডাদের উপদেশ: ধৈর্য চাই, মেজাজ যেন খারাপ না হয় কখনো; শেখাতে হবে, বোঝাতে হবে, বশ করতে হবে মানুষকে, জায়গা বুঝে সূক্ষ্ম একটু চাটুকারিতাও চাই—দেখেওছে এক-একজনকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁরা তর্ক করেন জাত-বুর্জোআ, পাতি-বুর্জোআ, পচা-বুর্জোআর সঙ্গে, যদি তাদের কোনো-একজনকে টানতে পারলে কিছুমাত্র সুবিধে হয় দলের—আর তাই হারীত মুখ ফিরিয়ে চুপ ক'রে থাকলো, আর অন্যমনস্কভাবে একটু-একটু ক'রে খেয়ে ফেললো সেই চিংড়ি-কটলেটেরই সমস্তটা, চায়ের সঙ্গে যার আমদানি দেখে প্রথমে সে শিউরেছিলো। তার চেহারা দেখে মজুমদার অপ্রস্তুত, শাশ্বতীর মাথা নিচু, শুধু বিজন বুক চেতিয়ে চকচকে চোখে তাকিয়ে রইলো—এমন-যে বিদ্বান আর বাক্যবাগীশ তার হারীতদা, তার সঙ্গেও সমানে-সমানে কথা চালাতে পারে তার বন্ধু, সে কি ফ্যালনা!

সেই চুপচাপের মধ্যে ছলছল ক'রে উঠলো স্বাতীর গলা: 'রাশিয়া আমি খুব ভালোবাসি। লোকেরা কেমন সারাদিন ধ'রে চা খায় আর তর্ক করে, আর স্টেশন-মাস্টাররা সব সময় ঘুমোয়, আর মেয়েরা রাত জেগে-জেগে—'

'পাও কোথায় এ-সব খবর?' হারীত নাকের ভিতর দিয়ে আওয়াজ ক'রে উঠলো।

'কেন, টুর্গেনিভের—'

'টুর্গেনিভ!' স্বাতীর ভিতু-ভিতু কথা কচ ক'রে কেটে দিলো হারীত। 'বাবুগিরি ক'রে বিদেশেই তো জীবন কাটিয়েছে—রাশিয়ার সে কী জানে? কী করেছে সে তার দুঃখী দেশের জন্য? আর তাই-তো রাশিয়ায় এখন টুর্গেনিভ কেউ পড়ে না!'

'পড়ে না!'—আহা, অমন বই, অমন ভালো বই পড়ে না!—রাশিয়ার লোকেদের জন্য বড়ো কষ্ট হ'লো স্বাতীর; বললো, ব'লে ফেললো—'তবে তো রাশিয়ার লোকেরা এখনো খুব দুঃখী!'

হারীত বলবার জন্য এমন টগবগ করছিলো যে স্বাতীর কথা তার কানেই গেলো না, শুধু ঐ 'দুঃখী' কথাটা শুনতে পেয়ে তক্ষুনি গ'র্জে উঠলো, 'না, রশিয়ার লোকেরা এখন আর দুঃখী না। এখন আর সেখানে স্টেশন-মাস্টাররা ঘুমোয় না, মেয়েরা রাত জেগে-জেগে দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, এখন সেখানে—' একটানা পাঁচ মিনিট ধ'রে হারীত বর্ণনা করলো ভূস্বর্গ রাশিয়ার, বলতে-বলতে মোটাসোটা মাংসালো মজুমদারকে ঘাড় কাৎ ক'রে নেতিয়ে পড়তে দেখে বুঝলো যে তার কথায় কাজ হচ্ছে; আর তার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে শাশ্বতী ব'লে উঠলো, 'সত্যি, আশ্চর্য দেশ!'

'আশ্চর্য!' মজুমদারের প্রতিধ্বনি।

হারীতের কথা, সত্যি বলতে, শেষ হয়নি, শুধু দম নিতে থেমেছিলো একটু, কিন্তু চারদিকে তাকিয়ে সকলের মুখেই

এমন-একটা হার-মানা ভক্তির ভাব দেখতে পেলো যে খুশি হ'য়ে ব'লে ফেললো, 'স্বাতী, আর-একটু চা।'

চা শেষ হ'লো, বাসন সরানো হ'লো ; মজুমদার তার সিগারেটের টিন হারীতের সামনে ধ'রে সন্ধির প্রস্তাব করলো, 'আসুন—'

'থ্যাঙ্কিউ, আমি পাইপ—' ব'লেই হারীতের চোখে পড়লো টিনটা স্টেট এক্সপ্রেসের। উদারভাবে একটু হেসে বললো, 'আচ্ছা, নিই একটা।'

এর পরে মজুমদার টিন ধরলো বিজনের সামনে।

বিজন মুচকি হেসে চোর-চোর তাকালো হারীতের দিকে, শাশ্বতীর দিকেও। 'অনুমতিটা দিয়ে দিন না আপনারা,' মজুমদার চোখ টিপলো, 'মিছিমিছি আর—'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!' পাঁচ মিনিটে রাশিয়াকে জিতিয়ে দিয়ে হারীতের মেজাজ এখন আগের চেয়েও খোশ, দরাজ হেসে বললো, 'আরে বিজন, তুমি আবার এ-সব—'

বাড়িতে ব'সে, বড়োবয়সির সামনে, প্রকাশ্যে, সসম্মানে এই প্রথম সিগারেট ধরালো বিজন, আর তাতে এতই গৌরব লাগলো যে ভালো ক'রে টানতেই পারলো না। শাশ্বতী মনে-মনে বললো, 'কী অসভ্যতা! ঐটুকু ছেলে—!' কিন্তু মুখে কিছু বললো না, পাছে হারীতের আবার মেজাজ বিগড়োয়।

দেশলাই ধরিয়ে হারীতের মুখের কাছে এনে মজুমদার বললো, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টর নন্দী ; বোকার মতো তর্ক করেছি আপনার সঙ্গে।'

হারীত হা-হা ক'রে হেসে উঠলো, তারপর কেশে উঠলো

সিগারেট ধরাতে গিয়ে। হাত নেড়ে চোখের সামনে থেকে ধোঁয়া সরিয়ে বললো, 'না, না, কিছু না—'

'আপনাদের মতো মানুষের কাছে কত শেখবার আছে আমাদের! কিন্তু সময় কই!'

'একদিন আসুন না আমাদের কোনো মিটিঙে।'

'মিটিং!' মজুমদার হাত জোড় করলো; 'মিটিং জিনিশটাকে বড়ো ডরাই।'

'সে-রকম না—এই কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব মিলে—'

'পণ্ডিতের মেলায় আমি মূর্খ গিয়ে কী করবো, বলুন তো?'

মজুমদারের কথাটা নিশ্চিন্তে মেনে নিয়ে হারীত বললো, 'গান শুনতে তো আসতে পারেন।'

'গান? কী-গান?'

'গণ-সংগীত।'

'রণ-সংগীত?'

'ঠিকই বলেছেন—গণ-সংগীতই রণ-সংগীত হবে একদিন। চাষিদের মুখের গান—ওঃ, সে-যে কী!'

'কী-রকম বলুন তো?' মজুমদার জানতে চাইলো।

'শুনলেই বুঝবেন—এক ভদ্রলোক শিখে এসেছেন নানা জেলায় ঘুরে—চমৎকার গলা—'

'আঃ!' আধো চোখ বুজে মজুমদার যেন মনে আনলো কোনো মনে-পড়ার সুখ—'শশাঙ্ক দাশের মতো গলা আর শুনলাম না!'

'কোন শশাঙ্ক দাশ বুঝলে তো, ছোড়দি?' বিজন ন'ড়ে-চ'ড়ে উঠলো।

'যার গাড়ির নম্বর মুখস্ত ছিলো তোর—সে-ই তো?' শাশ্বতী ভাইকে ঠাট্টা করলো, কিন্তু নিজেও সচকিত হ'লো মনে-মনে। কী ভালোই লেগেছিলো ভদ্রলোকের গান—সেই 'প্রতিশোধ' ফিল্মে—সেই একবারই বাবা নিয়ে গিয়েছিলেন সিনেমায়—অমন যেন আর লাগলো না। আর তারই ক-দিন পরে স্বাতীর জন্মদিনে হারীতের সঙ্গে প্রথম দেখা!...

একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়েছিলো শাশ্বতী, আবার যখন কথা কানে গেলো, শুনলো মজুমদার বলছে: 'দুর্ভাগ্য আমাদের, দুর্ভাগ্য এই দেশের যে শশাঙ্ক দাসকে ফিল্মের গান গাইতে হয় টাকার জন্য!'

'আজকাল তো ফিল্মেও শুনি না ওঁর গান?' শাশ্বতী এমনভাবে কথাটা বললো যে দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে মজুমদারের সঙ্গে তাকে একমত মনে হ'লো না।

'বম্বেতে আছে এখন—ফিল্ম ছাড়া যদি উপায়ই নেই, তবে টাকা যেখানে বেশি সেখানেই ভালো!—কিন্তু আমি চেষ্টা করছি ওকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনতে।'

'আপনি ওঁকে চেনেন?' শাশ্বতী শিহরিত।

'চিনি-? আমার ওল্ড ফ্রেণ্ড শশাঙ্ক!'

'ওল্ড ফ্রেণ্ড' কথাটা শুনে হাসি পেলো স্বাতীর—মানে, হেসেই ফেললো, আর সেই হাসির যে-কোনো একটা কারণ দেখাবার জন্য তাড়াতাড়ি বললো, 'ছোড়দি কিন্তু খুব ফিল্মের ভক্ত।'

'আমিও!' সঙ্গে-সঙ্গে বললো মজুমদার। 'ফিল্ম ভালো না তা তো না, তবে শশাঙ্ক যা দিতে পারে, ফিল্ম তা নিতে পারে না।'

'তা ভালো-ভালো লোকেরা না-এলে,' বিজনের বিচক্ষণ মন্তব্য, 'ফিল্মই বা ভালো হবে কী ক'রে।'

'তাও সত্যি—'

'বম্বের কোন ফিল্মে উনি গেয়েছেন?' জিগেস করলো শাশ্বতী।

ফিল্মের কথাই চললো এর পর। বললো মজুমদারই মোটামুটি, বিজন মাঝে-মাঝে মতামত না-দিয়ে ছাড়লো না, আর মুখে মৃদু একটু হাসি রেখে হারীত সহিষ্ণুতার একটা রেকর্ড রাখলো প্রায় দশ মিনিট ধ'রে, তারপর ঢুঁ মারলো রুশ ফিল্মের কথা উঁচিয়ে, আইজেনস্টাইনের নিশেন ওড়ালো দু-একবার, কিন্তু কথা গড়িয়ে-গড়িয়ে আবার ফিরে এলো দিশি ছবির সমতলেই; কথায়-কথায় জানা গেলো যে মজুমদার অনেক অভিনেতাকেই চেনে—শুনে শাশ্বতী মুগ্ধ, অভিনেত্রীদের কাউকে চেনে কিনা জানতে ভীষণ ইচ্ছে করলো, কিন্তু থেমে গেলো জিগেস করতে গিয়ে—না, সেটা—সেটা ঠিক হবে না। হয়েছে কী, শাশ্বতীর ইচ্ছে যত, ফিল্ম দেখতে পায় না তার আদ্ধেকও; মাসে দুটোর বেশিতে হারীত নিয়ে যায় না, সে-দুটোই আবার ইংরেজি, শ্বশুরবাড়ির জা-ননদের দলে ভিড়তে না-পারলে বাংলা ছবি দেখা হ'য়েই ওঠে না তার, মজুমদারের কথা শুনে-শুনে সে তাই রুদ্ধ ইচ্ছা মেটাতে লাগলো যতটা সম্ভব।

আরো খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থাকার পর হারীতের আর সহ্য হ'লো না, কব্জি-ঘড়িতে তাকিয়ে বললো, 'আমি উঠি এবার।'

'আমাকেও যেতে হবে!' কথা থামিয়ে একেবারে উঠেই দাঁড়ালো মজুমদার।

'আমি—আমি থাকি একটু,' ঈষৎ ম্লানভাবে শাশ্বতী বললো।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই—আমি তো বাড়িও যাচ্ছি না এখন—'

'কোনদিকে যাবেন ? শহরের দিকে হ'লে আমার সঙ্গেই—'

'চলুন।'

'মিস্টর মিত্র, কাল তাহ'লে সকাল ন'টায় দেখা হচ্ছে আপনার সঙ্গে ?'

'নিশ্চয়ই।'

'অনেক ধন্যবাদ ; মিসেস নন্দী, অনেক ধন্যবাদ ; মিস মিত্র, অনেক ধন্যবাদ,' মজুমদার জনে-জনে বিদায় নিতে লাগলো। 'আশা করি আবার দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে।'

বিজন আবার 'নিশ্চয়ই' বললো।

'হ্যাঁ, একটা কথা—' মজুমদারের হঠাৎ-যেন মনে পড়লো, *'পুল মুনির নতুন ফিল্ম আসছে মেট্রোতে, যাবেন আপনারা কালকের পরের শনিবার ? মানে—' কথাটা স্পষ্ট করলো তক্ষুনি—'আমি খুবই সুখী হবো আপনারা যদি আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন।'*

'তা—গেলে হয়,' সকলের আগে জবাব দিলো হারীত। সে নিজেই ভাবছিলো এটাতে যাবে—ভালোই হ'লো—এঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়ে ক-টাকা বাঁচলো, তার একটা হিশেব চটপট খেলে গেলো তার মনে।

'আপনি যাবেন তো ?' মজুমদার দাঁড়ালো স্বাতীর সামনে।

'দেখি—'

'দেখি কেন ?' স্বাতীর দিকে মাথা নোয়ালো মজুমদার।

স্বাতী উঠে দাঁড়িয়েছিলো বিদায় দিতে, কাছাকাছি দাঁড়িয়ে ভালো ক'রে তাকালো একবার। মাঝখান দিয়ে সিঁথি-করা চুল দু-দিকে ঢেউ-তোলা ; ছোটো-ছোটো চোখ দূরে-দূরে বসানো, মস্ত মুখ, মোটা লাল ঠোঁট, চিকচিকে সিল্কের পাঞ্জাবি প্রায় হাঁটুতে ঠেকেছে, কুঁচোনো ধুতির জরি-পাড় লুটিয়ে পড়েছে শ্যাওলা-রাঙা লপেটায়। হঠাৎ-যেন উল্টো দিকে ধাক্কা খেলো স্বাতী, একটা বিশ্রী-লাগার কাঁপুনি উঠলো মনের মধ্যে ; তার এতক্ষণকার ভদ্রতা, ভব্যতা, দাদার মনরক্ষার চেষ্টা, সব ভেসে গিয়ে আবার নাখ-মুখ ভ'রে গেলো সেই বিশ্রী, বিস্বাদ, বদগন্ধে।

'এত দিন আপনাকে দেখেছি,' মজুমদারকে সে বলতে শুনলো, 'কিন্তু দেখা পাইনি। আজ যদি দয়া ক'রে দেখাই দিলেন, তাহ'লে আরো-একটু দয়া কি করতে পারেন না ?'

শাশ্বতী মনে-মনে হাসলো কথাটা শুনে, আর ভাবলো যে সব মেয়েরই দিন আসে জীবনে, কিন্তু সে-দিন আর ক-দিন ! ঈশ্বর যদি মেয়েদের আস্ত এক-একটি বোকা ক'রে না-বানাতেন, তাহ'লে তারা ভুলতো না কোনো কথাতেই, আবার ভুলতো না কোনো কথাই ; চুপ ক'রে সব শুনতো, আর উশুল করে নিতো মাশুল।...স্বাতীর পাশে এসে বললো, 'কী, স্বাতী বুঝি যেতে চাচ্ছে না ? ঐ ওর স্বভাব !...তা যাবি না কেন, আমরা সবাই যাবো, আর তুই যাবি না তা কি হয় ?'

আর মজুমদার যখন হারীতকে পাশে বসিয়ে গাড়ি রওনা করলো, তখন ভিতরে এসে স্বাতীকে প্রথম কথা বললো, 'কী রে ? ঐ মজুমদারের অবস্থা তো কাহিল !'

'দেখছি তো,' স্বাতী হাসলো উত্তরে। 'ছোড়দি, সাবধান!'

'আমার আর সাবধানের কী—'

'বাঃ! সাবধান হবার তো তোমারই আছে!'

'অসভ্য!' শাশ্বতী এক কিল বসালো স্বাতীর পিঠে—একটু লালও হ'লো।

একটু লাল হ'লো স্বাতী, লাল হ'লো ব'লে রাগ হ'লো নিজের উপর, আর সেই রাগের রঙে আরো লাল হ'লো—তবু ভাগ্যিশ ছায়া, আবছায়া, অন্ধকার। নল-ডোবানো গ্লাশ হাতে নিয়ে মজুমদারকে সামনে দাঁড়ানো দেখে একটু চমকেছিলো সে, কেননা তেষ্টা তার সত্যি পেয়েছিলো, অথচ বলেনি, যেহেতু সিনেমায় এসে তেষ্টা পায় শুধু বাচ্চাদের আর অনভ্যস্ত মেয়েদের। ও-দুয়েরই এক দলে কি ইনি মনে-মনে ঠাওরালেন তাকে, নয়তো কী ক'রে জানলেন···?

'নিন!' মজুমদার নিচু মাথায় হাত বাড়িয়ে দিলো।

'আর কেউ···?' ছোড়দির দিকে তাকাতে গিয়ে স্বাতী দেখলো, ছোড়দি এক চেয়ার স'রে গিয়েছে, গল্প করছে দাদার সঙ্গে।

'সকলেরই আছে—আপনি নিন।'

তখন স্বাতীর চোখে পড়লো মজুমদারের পিছনে দাঁড়ানো পাগড়ি-বাঁধার হাতে-ধরা ট্রে।—ছি! কী ক'রে সে ভাবতে পারলো তার একার জন্য, তারই তেষ্টার কথা বুঝে নিয়ে—ছি! কিন্তু এই লজ্জাটা জানতে দেয়া তো আরো লজ্জা; তাই সাহস ক'রে চোখ সরিয়ে আনলো জগৎ-বিখ্যাত ঘড়ির বিজ্ঞাপন থেকে;

একটু চড়া গলায়, ইংরিজি শব্দ ব্যবহার না-করার কৃতিত্বে একটু সচেতনভাবেই বললো, 'ঠাণ্ডা পানীয় ?'

'আপনার ভালো লাগে না ?'

'পানীয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো জল', যদিও একটু সাজানো ধরনে, তবু তার সত্যিকার মতটাই বললো স্বাতী, আর মজুমদারের মুখে হাসি লক্ষ্য ক'রে আবার বললো, 'আর সিনেমার মধ্যে সবচেয়ে ভালো মেট্রো, কেননা একমাত্র এখানেই খাবার জলের ব্যবস্থা আছে।'

'এখন আর নেই। কাগজের গ্লাশ এমন চুরি হ'তে লাগলো—'

'চুরি কেন ?' শাশ্বতীর কানে গেলো কথাটা। 'ও তো আর কিনতে হ'তো না—'

'সেইজন্যই তো!' কথা লুফে নিলো হারীত। 'বিনিপয়সায় কিছু পাওয়া গেলে কি আর কথা আছে এ-দেশে! মাখনের দাম নেয় না ব'লে বাঙালি ছেলেরা চেটেপুটে সবটুকু মাখন খেয়ে নেয় লণ্ডনের রেস্তোরাঁয়!' হারীত হেসে উঠলো পিছনে মাথা হেলিয়ে।

'তা জল যখন নেইই, আপাতত এইটে—'

এতক্ষণে সহজ হ'তে পেরে স্বাতী ঠাণ্ডা গ্লাশটি হাতে নিলো, আর মজুমদার এগিয়ে গেলো শাশ্বতীর দিকে।—'না, দেখুন, আমি না!' শাশ্বতী কাঁচুমাচু।

'তাহ'লে অন্য-কিছু—'

'না, কিছু না, দেখুন—' শাশ্বতীর আবার ঐ ঠাণ্ডাই-যন্ত্রটা অপছন্দ ; এমনিতেই এত ঠাণ্ডা যে তার উপর আর-কোনো ঠাণ্ডার কথা ভাবতেই যেন শীত-শীত করে।

'কেন, খাও না!' বিজনের পিঠ পেরিয়ে হারীত গলা বাড়ালো স্ত্রীর-দিকে।

শাশ্বতীর চোখে মিনতি ফুটলো, কাতর মিনতি; কিন্তু অন্ধকারে হারীতের বোধহয় তা চোখে পড়লো না, আর পড়লেই বা কী?—'কেনা হ'য়ে গেছে, তুমি না-খেলে ফেলা যাবে,' এই চরম যুক্তির মায়া কাটাতে কি পারতো সে?

'আপনি, মিস্টর নন্দী?' মজুমদার হাত বাড়ালো হারীতের দিকে।

এমনিতে কোল্ড ড্রিঙ্কের কথা উঠলেই হারীত পুরুষোচিত ঠাট্টা করে; কিন্তু পুরুষের পয়সা-খসানো মেয়ে-মজানো এই বস্তুটার উপর আজ তার দয়া হ'লো—কেননা ভদ্রতার উত্তরে ভদ্রতা তো করতে হবে—গ্লাশ নিয়ে নলে ঠোঁট ঠেকালো একবার, তারপর শাশ্বতীর দিকে মুখ তুলে একটু জোর দিয়েই বললো, 'বেশ ভালো তো!'

শাশ্বতী অবাক হ'লো কথা শুনে। স্বামীর সঙ্গে রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে কখনো তার হয়তো ইচ্ছে হয়েছে একটা ঠাণ্ডা কিছু খেতে, কিন্তু হারীত তক্ষুনি বলেছে, 'ও-সব আবার ভদ্রলোকে খায়! যত বাজে—!' শুনতে-শুনতে শাশ্বতীর বিশ্বাস জন্মেছিলো যে ওগুলো সত্যিই জাতে বড়ো নিচু, সে এখনো একেবারেই অপছন্দ করতে পারছে না ব'লে একটু লজ্জিতও ছিলো মনে-মনে, আর আজ কিনা হারীতের মুখেই তারিফ! হয়তো অসাধারণ কিছু—হয়তো এক-এক গ্লাশ এক-এক টাকা দাম—না-খেলে অন্যায় হয়, সত্যি!—'আচ্ছা, দিন,' শাশ্বতী হাত বাড়ালো।

মজুমদার হেসে বললো, 'ইচ্ছে না-করলে থাক।'

'নষ্ট ক'রে লাভ কী', হারীত আড়চোখে তাকালো, 'দাম তো দিতেই হবে।'

'দাম দিতে হবে ব'লেই খেতে হবে?' মজুমদার যেন জানতে চাইলো হারীতের কাছে।

'টাকা দেখাচ্ছে! বড়োলোকি ফলাচ্ছে!' হারীত মনে-মনে বললো। মুখে বললো, 'অপব্যয় ভালোবাসি না।'

স্বামীর মুখ গম্ভীর হ'তে দেখে শাশ্বতী আর দেরি করলো না; গ্লাশ নিলো, আর ভিতরে-ভিতরে কেঁপে-কেঁপে সেই বরফ-মতো ঠাণ্ডাকে ভিতরেও নিতে লাগলো আস্তে-আস্তে। তার ভাগ্যে ইন্টর্ভল শেষ হ'লো তক্ষুনি, আর আসল ছবি আরম্ভ হ'তে সব চোখ যখন পরদায় আঁটা, প্রায় তেমনি-ভরা গ্লাশটিকে নামিয়ে রাখলো চেয়ারের তলায়। ভুলেই গেলো স্বাতীর পাশে স'রে আসতে; অগত্যা মজুমদারকে ব'সে পড়তে হ'লো দু-বোনের মাঝখানে।

আর ওখানে ব'সে, সিনেমা ছাড়াও আরো কিছু না-দেখে সে পারলো না। ঘাড়টি একবার ডানদিকে, একবার বাঁ দিকে হেলিয়ে, দু-জনের একজনেরও চোখে না-প'ড়ে, দু-বোনের রূপের তুলনা করলো সে, চুল-চেরা বিচার করলো। সেকেলেদের মতো, প্রসাধনের অংশ মনে-মনে বাদ দিলো না; সে, আধুনিক মানুষ, সে জানে যে পৃথিবীর চোখ যাকে দেখবে সে এই সাজগোজ-করা মানুষই; অতএব সেটাই আসল, সেটাই সব। তবু প্রসাধন পেরিয়েও দেখতে পেলো তার বিচক্ষণ চোখ; দিদিকে-যে বেশি ফর্শা দেখাচ্ছে তার কারণ এই অন্ধকার আর পাউডরের উঁচু জাত; কনুইয়ের উপর থেকে যে-অংশটুকু ব্লাউজের হাতা ঢেকে দেয়নি,

সেটুকু লক্ষ্য ক'রে সত্য আবিষ্কার করতে তার দেরি হ'লো না। দিদির মুখখানা গোলগাল, নাকটি বড্ড সোজা, হাঁ বড্ড ছোটো; মজুমদারের জজিয়তি ছোটোটির পক্ষে রায় দিতে-দিতে থমকালো —ছোটো হওয়াটাই ছোটোটির সুবিধে, এখন পর্যন্তও তা-ই, এখন পর্যন্ত সে-বয়স সে ছাড়ায়নি, যখন দু-চার বছরের তফাতেও চামড়া একটু চিকচিক করে বেশি।···কিন্তু বিয়ের পরে, স্বামীর ঘরের অবিরাম বিশ্রামে আর অফুরন্ত আরামে কয়েক বছর কাটাবার পর ঐ ডিম-ছাঁদের মুখ আর একটু-বাঁকা চোখ অত সহজে কি আর প্রাইজ পাবে? দিদির মতো মোটার দিকে ঝোঁকে যদি? থুতনিতে যদি ভাঁজ পড়ে?···শাশ্বতীর মধ্যে মজুমদার দেখতে চেষ্টা করলো ভবিষ্যতের স্বাতীকে; আজকের টাটকা তাজা বয়সটা কোন-কোন খুঁত লুকিয়ে রেখেছে, তার ফর্দ বানালো সাবধানে; কিন্তু সমস্ত হিশেব শেষ ক'রে আরো একবার যেই তাকালো, তক্ষুনি চিনতে পারলো মুখের সেই গুণকে, আর-কোনো বর্ণনা না-পেয়ে যার আমরা নাম দিয়েছি, নুন, মানে লাবণ্য; সমস্ত হিশেব যেন ফেল পড়লো তার, মনের মধ্যে নিশ্চিত জানলো যে এই নুনের গুণ ঝ'রে যাবে না বছরের পর বছরের আছাড়েও।

মজুমদার প্রায় মনস্থির ক'রে ফেললো।···জীবনে এখন তার সেই অবস্থা, যখন একজন স্ত্রী দরকার। দরকার মানে দেহের নয়, মনেরও নয়, সংসারের ঘরকন্নারও না। স্ত্রীকে দিয়ে ও-সব দরকার তারাই মেটায়, যারা বেচারাজাতীয় জীব, কিংবা গরিব। পৃথিবীর অধিকাংশ পুরুষ-যে একবারে একটিমাত্র স্ত্রীকে নিয়ে জীবন কাটাতে রাজী, তার কারণ তো এ-ই যে স্ত্রী সবচেয়ে শস্তা, তার উপর

নির্ঝঞ্ঝাট। কিন্তু সে তো শস্তা খোঁজে না, হাঙ্গামাও ডরায় না; তবে? আর-কিছু না; এখন একজন স্ত্রী হ'লে মানায় বেশ, দেখায় ভালো, আর এ-কথা তো মানতেই হয় যে তু-একটা সুবিধে এমন আছে যা আজকালকার সভ্য সমাজে স্ত্রীর কাছেই শুধু পাওয়া সম্ভব। দেয়ালের সঙ্গে মানিয়ে যেমন ছবি, আবার ছবির সঙ্গে মানিয়ে ফ্রেম, তেমনি টাকার সঙ্গে মানিয়ে রীতিমতো স্ত্রী চাই একটি; না-হ'লে যেন ঠিক হয় না, একটু ফাঁকা ঠেকে। টাকা খাটে ব্যবসায়, নড়ে-চড়ে ব্যাঙ্কে, আটকে থাকে মাটির টুকরোয়; তার মতো ব্যস্ত মানুষ কত আর ওড়াতে পারে; স্ত্রী হ'লে টাকার একটা কাজ হয় বেশ, ঝকঝকে শো-কেসটি সাজানো যায় ইচ্ছেমতো, দেখানো যায় সকলকে। টাকা-যে তার খুব হয়েছে তা নয়---আরে না!—কিন্তু হবার বাধাও আর নেই; আর এর পরে যা-ই হোক আর না-ই হোক, প্রথম পনেরো বছরের পরিশ্রমেই সাধারণ ভদ্ররকম একটা ব্যবস্থা তো করতে পেরেছে, অন্তত গরিব হবার ভয় আর নেই তার—! কথাটা নিজের মনেও নিশ্চিন্তে বলতে পেরে তার গায়ে যেন কাঁটা দিলো; একবার ঘাড় ফেরালো পিছনে—যেন সত্যি সে ভাবছে যে পিছনে তাকালেই দারিদ্র্যের বিকট বীভৎস মূর্তিটার ছায়া দেখবে এখনো—কিন্তু তার বদলে আবছা চোখে পড়লো সারি-সারি এমন-সব মানুষ, কলকাতার কত লক্ষ লোকের মধ্যে সবচেয়ে ভালো যারা খায়-পরে, অতএব যারা সবচেয়ে সুখী। খুব বেঁচে গেছে সে, ওঃ! কী-ভয়ই সে পেয়েছে, কী ভয়ে-ভয়েই সে কাটিয়েছে…এই সেদিন পর্যন্ত! দারিদ্র্য তাকে দাঁত দেখিয়েছে রোজ তু-বেলা ভাত-পাহাড়ের ফাঁকে-ফাঁকে পাৎলা

ডালের গঙ্গাজলে, ছোটো-হ'য়ে-হ'য়ে দম-আটকানো ছিটের কোটে, ঘিনঘিনে স্যাঁৎসেঁতে কলতলার পচা-পচা আঁশটে দুর্গন্ধে। ছেলেবেলার সেই সিধু মিস্ত্রির গলি হঠাৎ মনে পড়লো তার; সাত শরিকের জন্য একটামাত্র···; ভোর হ'তেই লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে গেছে আপিশের বাবুরা—স্ত্রীলোকরা সেরে নেয় রাত থাকতেই—বাবা একদিন কী-মারই মেরেছিলেন হাফ-প্যান্ট নষ্ট হয়েছিলো ব'লে।···সিনেমার ছবিতে জমকালো ভোজ, আশে-পাশে কলকাতার সবচেয়ে সুখীরা—একবার চোখ ঘুরিয়ে এনে যেন নিশ্চিত জেনে নিলো যে সেই কুশ্রীতার কয়েদ থেকে সে পালাতে পেরেছে বাকি জন্মের মতো।

পারলো কেমন ক'রে, নিজেরই অবাক লাগে মাঝে-মাঝে। এ-রকম কথা ছিলো? সে, জন মরিসন কোম্পানির গোডাউন-ক্লার্কের চার ছেলের বড়ো ছেলে! পেট ফাটিয়ে ভাত-ডাল খেয়ে-খেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবে ঘ'ষে-ঘ'ষে, তারপর যে-কোনো কাজে, যে-কোনো মাইনেতে, যে-কোনো রকমে একবার 'বেরোতে' পারলে আর কথা কী, এর বেশি আর কী আছে জীবনে—মালকোঁচার উপর ওপেন-ব্রেস্ট কোট লটকিয়ে বুক ফুলিয়ে ট্র্যাম ধরবে ন-টার সময়! হওয়া উচিত ছিলো তা-ই, এ ছাড়া অন্য-কিছু ভাবতে পারাই তার উচিত ছিলো না।···কিন্তু দৈব প্রেরণা ছিলো তার, বুকে স্বর্গীয় আগুন; অতৃপ্তি ছিলো, ভীষণ অতৃপ্তি; ঘৃণা ছিলো সেই জীবনের উপর, যে-জীবন তার জন্মদোষে পাওয়া; মাসের প্রথম রবিবারে যখন একসের আলুর সঙ্গে মিশিয়ে দেড় সের পাঁঠার মাংস রান্না হ'তো, আর ভাইয়েরা চ্যাঁচামেচি নাচানাচি করতো

সকাল থেকে, তেজপাতাটি চেটে না-নিয়ে পাত থেকে ফেলতো না, তার তখন ঘেন্না করতো, ঘেন্নায় যেন ভাত ঠেকে যেতো গলায়। টাকা, টাকা চাই—তখনই মনে-মনে আউড়েছে—সকলের আগে টাকা, সকলের উপরে টাকা, যেমন ক'রে হোক টাকা, যেহেতু টাকা হ'লেই সব হয়, আর টাকা না-হ'লে কিছুই হয় না। এ-প্রতিজ্ঞা সে রাখতে পেরেছে, লোকে বলবে এটা আশ্চর্য ; কিন্তু সে জানে তার মনে-যে এ-প্রতিজ্ঞা বাসা বেঁধেছিলো, সত্যি আশ্চর্য সেইটেই। এত বড়ো আশা সে কি কখনো করতে পারতো দৈবের বিশেষ দয়া তার উপর না-থাকলে ?

···আর এখন, এখন চাই একটি স্ত্রী। টাকার জন্য অনেক ভেবেছে, অনেক খেটেছে ; এ-ব্যাপারেও খাটতে হবে, ভাবতে হবে ; ততটা না হোক, তেমনি। কেননা বেঁচে থাকতে হ'লে যেমন টাকা, বিয়ে করতে হ'লে তেমনি দরকার যে, স্ত্রী হবে সুন্দরী। সস্ত্রীক কোথাও যাবে যখন, সেটা বেশ দেখার মতো হওয়া চাই তো ! এর অবশ্য চটক নেই তেমন, চমক লাগে না চোখে—কিন্তু ও-সব তো সাজগোজের ব্যাপার ; রূপের যে-অংশটা কিছুতেই কিনতে পাওয়া যায় না, সেই মুখখানা—মুহূর্তের জন্য প্রায় বিগলিত হ'লো মজুমদার—মুখখানা সত্যিই ভালো। ঠিকমতো মেক-অপ করলে, রুখু চুল ফাঁপিয়ে দিলে, সকলেরই চোখে পড়ছে অথচ কাউকেই ঠিক চোখে দেখছে না, এই ভাবটি ফোটাতে শিখলে এও হবে সেই দেমাক-ওয়ালিদেরই মতো, মজুমদার যাদের দেখতে পায় রেস্তোরাঁয় রেসকোর্সে, যাদের সে তারিফ করে মনে-মনে, মনে-প্রাণে, কিন্তু আজ পর্যন্ত যাদের চোখে পড়তে পারেনি ব'লে বাধ্য

হয়েছে বিয়ের হিশেব থেকে তাদের বাদ দিতে। অগত্যা চোখ রেখেছে নিচুতেই, মাঝারিগোছের বাঙালি ঘরে, আর সেই মাঝারি-ঘরের পক্ষে এটি অবশ্য উঁচু দরের, এতই উঁচু যে বলনে-চলনে পাকা হ'লে এ-ই পারবে সেই সবচেয়ে উঁচুতে তাকে চড়িয়ে দিতে; এই হাত দু-খানাই ঠেলে নিয়ে যাবে তার সৌভাগ্যের গাড়িকে এমনকি লেডি গাঙ্গুলির ড্রয়িংরুম, রানি রুক্মিণীর জল-পার্টি পর্যন্ত।···আর বিজনও কাজে লাগবে মন্দ না: ভাইগুলো জাত-ক্যাংলা, দু-আনার মায়া কাটাতে পারেনি, কেরানি ক'রে রেখেছে এক-একটাকে, কেরানিই থাকবে সারা জীবন; বাবাকে করেছে ক্যাশিঅর—বাবা যা ভালোই পারবেন, তার জন্য আর বাইরের লোককে মাইনে গোনা কেন?—কিন্তু এ-সব ছাড়া আরো একজনকে সে খুঁজছিলো মনে-মনে, যাকে একটু বললেই বাকিটা বুঝতে পারে, আর একটু পেলেই যে বড্ড খুশি হয় না। বিজনের, আর যা-ই হোক, নাকটা উঁচু; টাকা দেখলে খাবি খায় না, বড়ো-বড়ো অঙ্ক বেশ সহজেই মুখে আনতে পারে।···চেয়ারে একটু ন'ড়ে সিগারেট বের করলো, ঘাড় বাড়িয়ে নিচু গলায় বললো, 'আপনার কি অসুবিধে হবে ধোঁয়ায়?'

স্বাতীর মন ছিলো ছবিতে, শুনতে পেলো না।

মজুমদার একটু গলা চড়িয়ে দ্বিতীয় বারে পৌঁছিয়ে দিলো তার অনুরোধ।

'না, না, অসুবিধে কী—' পলকের জন্য তাকিয়েই স্বাতী আবার ছবি দেখতে লাগলো দূরদিকের হাতলে কনুই রেখে, হাতের উল্টো পিঠ গালে ঠেকিয়ে।

এতক্ষণে ভালো লাগছিলো স্বাতীর। এসেছে সে অনিচ্ছায়,

এসেও অস্বস্তিতে কাটিয়েছে ইন্টর্ভল পর্যন্ত। মন তার স্থিরই ছিলো, কিন্তু সকালবেলা হঠাৎ এলো ছোড়দি, এসে প্রথম কথা বললো, 'তৈরি হ'য়ে থাকিস, আমরা তুলে নেবো তোকে।'

'মানে ?'

'আ-হা !' স্বাতীর গম্ভীর ভাবটা গায়েই মাখলো না শাশ্বতী।

'আমি তো ব'লে দিয়েছি দাদাকে যে যাবো না।'

'ওঃ! কী আমার ব'লে-দেনেওয়ালি !'

'দাদা বুঝি গিয়েছিলো আবার তোমার কাছে ?'

'গিয়েছিলো এই কথা বলতে যে প্রবীর মজুমদার সিনেমার পরে চিনে রেস্তোরাঁয় নেমন্তন্ন করেছে আমাদের।'

বেশ উৎসাহ ফুটলো শাশ্বতীর গলায়। কিন্তু স্বাতী আবারও বললো, 'আমি যাবো না।'

'কী বোকার মতো কথা ! ভদ্রলোক সব ব্যবস্থা করেছেন—আমরা রাজী হয়েছি—এখন না-যাওয়াটা মারাত্মক অভদ্রতা হবে।'

'তোমরা রাজী হয়েছো—আমি না !'

'তাহ'লে যাবি না ?' মনে-মনে রাগলো শাশ্বতী।

'না।'

'কেন ?'

স্বাতী জবাব দিলো না।

'কিছু হয়েছে ?'

'না।—কী হবে।'

'ঝগড়া করেছে বিজু ?'

'না তো !'

'তোকে কেমন বিষণ্ণ দেখছি?'

'নাকি?'

'বল না ব্যাপারটা কী!'

'কিছু না!' স্বাতী মৃদু হাসলো।

শাশ্বতী আর রাগ চাপতে পারলো না, ঝাঁঝিয়ে উঠে বললো, 'আমরা সবাই যেতে পারি আর তুমি পারো না, না? মস্ত ইম্পর্ট্যাণ্ট লোক হয়েছো একজন!'

'হয়েছি বোধহয়, নয়তো এত ক'রে বলছো কেন?' দাম্ভিক জবাব দিলো স্বাতী।

'বলছি এইজন্য যে তোকে ফেলে যেতে খারাপ লাগছে আমার—না, তার জন্যও না—তোর ভালো লাগবে ব'লেই বলছি!' ব'লে শাশ্বতী দুমদাম পা ফেলে বেরিয়ে গেলো।

স্বাতীর আশা হ'লো যে ছোড়দি রাগ ক'রে ও-কথা আর পাড়বেই না, কিন্তু হ'লো উল্টো। তার গলা শোনা গেলো বাবার কাছে, আর, একটু পরেই ফিরে এলো বাবাকে নিয়ে।—'বলো, বাবা, বলো ওকে!' জ্বলজ্বল করলো শাশ্বতীর চোখ।

রাজেনবাবুর মনে পড়লো এই দু-বোনের ছেলেবেলার ঝগড়া, চ্যাঁচামেচি; মারামারি; ভাগ্য এদের, এখনো তা ফুরোয়নি, আর আমারও ভাগ্য, এখনো দেখছি। হেসে বললেন, 'কী রে? হয়েছে কী?'

স্বাতী মুখ খোলবার আগেই শাশ্বতী গলা চড়ালো, 'ওকে তুমি এমন অমিশুক বানিয়েছো, বাবা—কিন্তু ভদ্র সমাজে চলতে-ফিরতে হবে তো একদিন!'

'আমি বানিয়েছি বুঝি ?'

'তা ছাড়া আর কী ! কোথাও যেতে দেবে না বাড়ির বাইরে—'

'বাবা কেন যেতে দেবেন না !' স্বাতী ব'লে উঠলো, 'আমারই ইচ্ছে করে না কোথাও যেতে।'

'ঐ-তো ! নিজের ইচ্ছেটাকেই চরম ব'লে ভাবতে শিখেছে !'

'আচ্ছা, আচ্ছা,' রাজেনবাবু শালিশি করলেন। 'আজ ছোড়দির ইচ্ছা চরম হোক।—তা আমার বুঝি নেমন্তন্ন না ?'—শাশ্বতী স্বাধীনভাবে একটু খরচ করছে এতদিনে, মনে-মনে তিনি খুশি।

'বাবা—' কী বলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেলো, আর তার থেমে-যাওয়াটাকে চাপা দিয়ে শাশ্বতী তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো, 'বলিনি বুঝি তোমাকে ? বিজুর সেই বন্ধু নেমন্তন্ন করেছে আমাদের।'

'বিজুর বন্ধু ?'

'মজুমদার—সেদিন খাওয়ালো যাকে।'

'ও।'

'যদিও বিজুর বন্ধু,' শাশ্বতী হাসলো, 'ভদ্রলোক বেশ ভালোই।...আমরা যাচ্ছি, স্বাতীও চলুক না, বাবা।' কথাটা শোনালো যেন স্বাতী যেতে চাচ্ছে না বাবার অমত হবার ভয়ে, আর তার হ'য়ে বাবার মত করাতে এসেছে ছোড়দি।

স্বাতী তক্ষুনি বললো, 'না বাবা, আমি যাবো না।'

এ-কথাতেও রাজেনবাবু শুনলেন স্বাতীর যাবার ইচ্ছা। সত্যি তো ওর আরো বেরুনো উচিত, বেড়ানো উচিত ; কত রকম ফুর্তি করে আজকাল এ-বয়সের মেয়েরা। একটু জোর দিয়ে বললেন, 'যাবি না কেন, নিশ্চয়ই যাবি। গেলে ভালো লাগবে।'

কেমন-যেন নিরুপায় হ'য়ে স্বাতীকে দলে ভিড়তে হ'লো, নিজেকে অসহায় লাগলো মজুমদারের গাড়িতে ব'সে। মনের মধ্যে গুমরে ফিরলো এই সন্দেহ যে বাইরে বোঝা না-গেলেও মনে-মনে তার দিকেই মজুমদার মন দিচ্ছে বেশি, তার জন্যই আজকের এই আয়োজন; আবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে ধমক দিলো—দেমাকে টাপুটুপু না-হ'লে এ-রকম কি ভাবতে পারে কেউ? স্বাতী চেষ্টা করলো সহজ হ'তে, অন্যদের ফুর্তির সুরে সুর মেলাতে, দাদা-ছোড়দির হাসাহাসিতে যোগ দিতে; কিন্তু গাড়ি চালাতে-চালাতে মজুমদার হারীতদাকে কী বলছে সেইটে শুনতেই তার কানের যেন আগ্রহ, তার চোখ বার-বার ঠেকে যাচ্ছে ফিকে-নীল কলারের উপরে মজুমদারের টাটকা-ছাঁটা ঘাড়ে: খানিক পরে রাগই হ'লো নিজের উপর ঐ ভদ্রলোকের কথা অত ভাবছে ব'লে; সিনেমায় এসেও তার অস্বস্তি গেলো না, আর ঐ কোল্ড ড্রিঙ্ক নেবার সময় তো প্রায় ধরা প'ড়েই গিয়েছিলো, প্রায় ঢাকনা খুলেই দিয়েছিলো তার দেমাকের, তার বোকামির! সে ভাবছে যে মজুমদার তার কথাই ভাবছে, মজুমদার এ-কথা ভাবলো তো!...নিজেকে ধ'রে মারতে ইচ্ছা করলো তার।

কিন্তু আসল ফিল্মটি আরম্ভ হবার দু-তিন মিনিটের মধ্যেই এ-সব তার মন থেকে মুছে গেলো। হয়তো ছবিটি সাধারণের উপরে ব'লে, কিংবা সে কালে-ভদ্রে সিনেমা ছাখে ব'লে, কিংবা হয়তো তার নভেল-পড়া মনে বানানো ঘটনার সাজানো সুষমা প্রবল নাড়া দেয় ব'লে, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাকে টেনে নিলো দ্রুত, জীবন্ত, উজ্জ্বল ছবিগুলি। যা দেখছে তা তো ভালোই, যেখানে ব'সে দেখছে তাও ভালো লাগলো—মেট্রোর দোতলায় আগে আর

আসেনি সে—এতক্ষণে বুঝলো চেয়ারটা কত আরামের, পিঠে কত নরম, হাঁটু রাখার জায়গা কত বেশি ; কার্পেট-মোড়া গলি, সোনালি সীলিং, দেয়ালে ছবি—লোকে ছবি দেখবে অন্ধকারে ব'সে তো, তবে আর ও-সব কেন—কিন্তু ও-সবের জন্য, স্বাতীকে মানতেই হ'লো, ছবিটা ভালো লাগে আরো ; তখনকার মতো অন্য-সব কথা ভুলিয়ে দিতে চারদিককার এই সুন্দর ষড়যন্ত্র মুগ্ধ করলো স্বাতীকে। শরীরের আরামে ডুবে গেলো সে, মনের বিশ্রামে—কেননা সিনেমা ভাববার সময় দেয় না—তার পক্ষে নতুন এই বিলাসিতার চেতনায় পাশের চেয়ারের মজুমদার চ'লে গেলো হাজার মাইল দূরে ; তাকে ভুলতে পেরে স্বাতীর সুখ সম্পূর্ণ হ'লো। আর সেই সুখের তাপ জুড়িয়ে গেলো না ছবি শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই, সিনেমা দেখার অভ্যস্ত অভিজ্ঞদের মতো বাইরে এসেই তার ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো না ; আবার জমকালো সিঁড়ির জমকালো ভিড়ের মধ্যে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে নামতে-নামতে এ-কথা ভাবতেও তার ভালোই লাগলো যে এখন বাড়ি না-ফিরে আবার যাবে অন্য-এক নতুন জায়গায়।

চাং-আন রেস্তোরাঁয় স্বাতী যেন অন্য মানুষ। স্বচ্ছন্দে কথা বললো ; আনন্দে হাসলো ; একটু-যেন উত্তেজনাই ধরা পড়লো তার ঝলকানো চোখে আর রং-লাগা গালে। এই সে প্রথম চোখে দেখলো কলকাতার চিনে পাড়া : সরু, প্যাঁচালো, কম-আলোর গলি—গলির মোড়ে আর ঘরের দরজায় গুলিয়ে যায়, চ্যাপ্টা মুখের ট্যারচা চোখের চিনেদের মাছ-পাতুরি ঘেঁষাঘেঁষি ; পুরুষ, মেয়ে, ছেলেপুলেও, ভাত খাচ্ছে কাঠি দিয়ে, তাস খেলছে একমনে, বাচ্চা

কোলে মা দাঁড়িয়েছে রাস্তায়—ঘর থেকে পা বাড়ালেই তো রাস্তা, একটা সিঁড়িও পেরোতে হয় না—তাই সমস্ত গলিটা, মানে, সবগুলি গলির সমস্তটাই মনে হয় ওদের বাড়ি-ঘর, গাড়িটাকে বড্ড বেঢপ লাগে, একটু অভদ্র। বার দশেক মোড় নেবার পর—স্বাতী অবাক হ'লো যে মজুমদার একবারও পথ ভুল করলো না—ফটকওলা যে-দোতলার সামনে গাড়ি দাঁড়ালো, সমস্ত পাড়ার মধ্যে সেটিই সবচেয়ে ভালো বাড়ি, আর এতই বাড়ির মতো দেখতে যে স্বাতী প্রথমে বোঝেইনি যে এটাই চাং-আন। বাইরে ঝলমলে আলো নেই, নাম লেখা নেই: আর ভিতরেও চুপচাপ, একটি টেবিলে দু-জন বুড়োমতো সাহেব ব'সে আছে সামনে গেলাশ নিয়ে, কিন্তু তাদের দিকে তাকাবারও সময় পেলো না, তারা উপরওলা!—ভাবছিলো দুই জানলার ফাঁকে ঐ কোণের টেবিলটায় বসলে হয়, কিন্তু না—তাদের জন্য চার নম্বর কেবিন: তা মন্দ কী: এখানেও জানলা আছে, কালো অন্ধকার ঝুলে আছে মখমলের পরদার মতো, আবার একটু পরেই অন্ধকার ছাড়িয়ে আকাশ চিনতে পারলো তিনটি তারার মিটমিটে চোখে।...আর, এক চামচে সূপ মুখে দিতেই ধারালো একটি খিদে যেন চেতিয়ে উঠলো তার মধ্যে—শুধু খাবার খিদে নয়, কথা বলার, হাসির, বন্ধুতার খিদে, বইয়ের বাইরে জীবন্ত মানুষের যে-জগৎ সেই জগতের জন্য খিদে। সে-ই কথা আরম্ভ করলো এই ব'লে:

'ফিল্মটা কেমন লাগলো, ছোড়দি?'

'ভালো।' শাশ্বতী কথায় যা বললো তার আওয়াজ তা বললো না। সব ফিল্মই তার প্রায় একই রকম লাগে মোটামুটি;

তখন-তখন সবই ভালো লাগে, পরে আর কিছুই মনে করতে পারে না।

'ফিল্মটা খুবই ভালো—হ'তে পারতো—শেষটা যদি—'

'হলিউডের বুদ্ধি!' হারীত দাঁত দেখিয়ে হাসলো মজুমদারের দিকে, কেননা উপস্থিত ক-জনের মধ্যে মজুমদারই যা-হোক কথা বলার যোগ্য—'শেষ পর্যন্ত বড়োলোকও হ'লো ছেলেটা—হাঃ!'

'আমাকে এ-বিষয়ে কিছু বলবেন না,' মজুমদার আরো চওড়া ক'রে হাসলো, কিন্তু শব্দ না-ক'রে। 'আমি ভালো ক'রে দেখিইনি। সিনেমায় গিয়ে সিনেমাই যদি দেখলাম তবে আর যাওয়া কেন?'

এই পুরুষালি রসিকতায় হারীত হেসে উঠলো অন্যরকম সুরে, আর স্বাতী মানে বুঝতে না-পেরে অবাক হ'লো।—'কেন, ভাখেননি কেন!'

'আদ্ধেকটা একেবারেই দেখিনি।' মজুমদার সত্য কথা বললো।

'কিন্তু কেন?' স্বাতী প্রশ্ন ছাড়লো না।

মুখ গম্ভীর ক'রে মজুমদার জবাব দিলো, 'ভাবছিলাম।'

'এতটাই যখন বলতে পারলেন তখন কী ভাবছিলেন সেটাও ব'লে ফেলুন।' হারীত দয়া করলো মজুমদারকে, দোস্তালির সুর লাগলো কথায়।

'আপনাদের নিয়ে এই সন্ধ্যাটা-যে কাটাতে পারছি, আমার সেই সৌভাগ্যের কথা ভাবছিলাম,' কথাটা শেষ করতে-করতে মজুমদার স্বাতীর মুখে একটু, একটুখানি চোখ রেখেই সরিয়ে নিচ্ছিলো, কিন্তু স্বাতীর চোখ আটকে ফেললো তাকে।

'ফিল্মের মস্ত অসুবিধে আমার এই মনে হয়,' স্বাতী বললো, 'যে মানুষ কী ভাবছে সেটা বলা যায় না।'

স্বাতীর চোখ আশায় ফাঁপিয়েছিলো মজুমদারকে, কথা শুনে চুপশোলো। তবু চেষ্টা করলো সেই কথার সুতো ধ'রেই তার ইচ্ছায় পৌঁছতে : 'মানুষ কী ভাবছে তা জানতে আপনার ইচ্ছে করে বুঝি খুব ?'

'ও কিছু না!' হারীত মত দিলো তক্ষুনি। 'বুর্জোআ কলচরের বিষফোঁড়া! আমি-তো ফিকশন পড়তেই পারি না গোয়েন্দা-গল্প ছাড়া!'

'সত্যি!' এতক্ষণে বিজন একটা প্রমাণ দিলো যে কথাবার্তা তার কানে যাচ্ছে। 'যা এক-একখানা ডিটেকটিভ নভেল—ওঃ!' ব'লেই চোখ নামালো মিঠে-টক পর্কের থালায়, তাই হারীতের চোখের অবজ্ঞার হলকা তাকে ছুঁয়েও ছুঁলো না। মজুমদার মুখের ভাবে হারীতের কথায় সায় দিলো, আর স্বাতীকে লক্ষ্য ক'রে কথাটা জীইয়ে রাখলো, 'আপনার কী-রকম বই ভালো লাগে?'

'যে-বই সত্যি কথা বলে সে-বই ভালো লাগে আমার।'

'বানানো গল্প আবার সত্যি হয় নাকি?' শাশ্বতী হাসলো।

'হয় তো!' বিজু খবর দিলো। 'ট্রুস্টরি ম্যাগাজিন ছাখোনি?'

'ঠিক তা নয়—আমি বলছিলাম কী—' স্বাতীর একটু লজ্জা করলো প্রথমে, কিন্তু বলতে-বলতে বেশ স্বচ্ছন্দেই ব'লে ফেললো, 'বলছিলাম যে মানুষ তো, ভাবে মনে-মনে, আর যা ভাবে তা মুখে বলে না; মনের কথা জানা যায় শুধু পড়লে, আর গল্প পড়ার মজাই তো ঐ!'

কেমন-একটা চমক লাগলো কথাটায়। 'যা ভাবে তা বলে না বুঝি কেউ?' ব'লে মজুমদার যতটা হাসলো ততটা হাসির কথা ওটা নয়, আর হারীত থেমে গেলো মাংসের টুকরো কাঁটায় ফুঁড়তে গিয়ে; একটু তাকিয়ে থেকে, স্বাতীর দিকে কাঁটা উঁচিয়ে বললো, 'স্বাতী, তোমার বুদ্ধি আছে, কথা বলতেও শিখেছো, কিন্তু মর্বিড হ'য়ে যাচ্ছো। তোমার এখন উচিত—' বলতে যাচ্ছিলো তোমার এখন উচিত বিয়ে করা, কেননা সেই মুহূর্তে স্বাতীকে তার ভালো লাগছিলো বেশ, আর তার পাশে বড্ড ফ্যাকাশে লাগছিলো নিজের স্ত্রীকে: কিন্তু একজন অল্প-চেনা মানুষের সামনে এই নরম মনের জানান দিতে চাইলো না, ঠিক সময়ে ব্রেক ক'ষে দিলো।

হারীতদার গলার আর তাকানোর উষ্ণতা স্বাতী অনুভব করলো মনে-মনে, উপভোগ করলো নিঃশব্দে।

শাশ্বতী বললো, 'কী-উচিত জেনে নিলি না, স্বাতী?'

'কী উচিত? হারীতদার মনঃপূত হ'তে হ'লে তোমার মতো হওয়া উচিত।' স্বাতীর এ-কথায় মজুমদার আর হারীত হেসে উঠলো একসঙ্গে, বিজুও হাসলো—শাশ্বতীও—কিন্তু শাশ্বতীর হাসিটা কেমন জোর-করা, সুর-ছাড়া।

'এই-তো দেখুন,' ছোড়দিকে লক্ষ্য করলো না স্বাতী, আলাদা ক'রে মজুমদারের দিকে তাকালো এবার, 'হারীতদা কেমন বলতে-বলতে থেমে গেলেন। মনের কথা কি মুখে বলে কেউ?'

আগের বার শাশ্বতী যেমন, এবারে তেমনি জোর-করা হাসি মজুমদারের আর হারীতের, থেমেও গেলো তক্ষুনি, দু-জনেই একটু-যেন আড়ষ্ট। এ-মুখ থেকে ও-মুখে তাকিয়ে স্বাতীর আরো সাহসী

লাগলো নিজেকে, আরো স্বাধীন ; আবার বললো, 'ফিল্মের ঐ ছেলেটা মুখে ঘেন্না করছে বড়োলোকদের, কিন্তু মনের কথা ঠিক উল্টো।'

'ঠিক', উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মজুমদার। একে তো কথা-বদলের আরাম, তার উপর এমন মনের মতো কথা! পাছে অত্যন্ত বেশি উৎসাহ ধরা পড়ে, গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা ক'রে বললো, 'এত-যে রোখা-চোখা কথা চারদিকে, সে-তো বড়োলোকদের সবাই হিংসে করে ব'লেই!'

'বড়োলোক হবার এই একটা সুবিধে-তো আছেই যে সবাই হিংসে করছে ভেবে সুখী হওয়া যায়।'

মজুমদারের মুখ অন্য ধরনের গম্ভীর হ'লো, আর হারীত গলা ছেড়ে হেসে বললো : 'তা বড়োলোকদের তোয়াজ করার চাইতে হিংসে করা ঢের ভালো। আমি-তো বলি মহৎ গুণ সেটা।'

'হিংসেটাই তো সব চেয়ে বড়ো তোয়াজ।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে মজুমদার হেসে উঠলো হো-হো ক'রে, আর হারীতের চোখ তার দিকে তাকিয়ে হিংস্র হ'য়ে উঠলো প্রায় ; কিন্তু সেই চোখই স্বাতীর মুখে স'রে নরম হ'লো : একটু তাকিয়ে থেকে ছেলেমানুষের এই বেয়াদবি ক্ষমা করলো সে।

স্বাতী দেখলো যে কথাবার্তার সেই কর্তা। দেখলো, সে যা বলে তা-ই বেঁধে, নয় হাসায় : সাজগোজ-করা প্রকাণ্ড মজুমদার, বিদ্বান ঠোঁট-বাঁকা হারীতদা ; তার কথা উড়িয়ে দেয় না একজনও, বরং আরো শুনতেই চায় ; আর দাদা আর ছোড়দি মুছেই গেছে : একা সে-ই কথা বলছে বয়স্ক দু-জন পুরুষের সঙ্গে, সমকক্ষের

মতো—শুধু সমকক্ষ? নিজের সম্বন্ধে স্বাতীর ধারণা বদলে গেলো, কেননা এর আগে এমন সমানে-সমানে কখনো কথা বলেনি হারীতদার সঙ্গে, সামনেও না; নিজেকে এতদিন যেখানে বসিয়েছিলো তার অনেক, অনেক উঁচুতে উঠে গেলো এক লাফে; আরো কথা এলো মনে, মুখে, আগে জানতোও না এত কথা সে জানে: সাত রাজ্যের বই প'ড়ে-প'ড়ে যত কথা তার মনের তলায় এলোমেলো পেঁচিয়ে প'ড়ে ছিলো, সব যেন দাঁড়িয়ে গেলো সার বেঁধে, পর-পর বেরিয়ে আসতে লাগলো এমন ঠিক-ঠিক সময়ে যে স্বাতী নিজে-তো অবাক হ'লোই, এও বুঝলো যে অন্যেরাও অবাক হচ্ছে। যত বুঝলো যে আজ তার জিতের হাত, তত সে বললো, আর যত বললো তত জিতলো সে। যে-এক ঘণ্টা ধ'রে খাওয়া হ'লো, তার, আর অন্যদের মধ্যে অন্তত দু-জনের মনে হ'লো যেন পাঁচ মিনিট।

হারীত বসেছিলো টেবিলের মাথায়, তাই বিল ধরা হ'লো তার সামনেই। তাকিয়ে বললো, 'আজ আপনার অনেক খরচ হ'লো মিস্টর মজুমদার।' মন থেকেই বললো কথাটা: নিজে যে খরচ ভালোবাসে না, অন্যের খরচও তার খারাপ লাগে, তার ভোগে নিজের ভাগ থাকলেও।

বাঁ হাতে এক তাড়া নতুন নোট বের করলো মজুমদার: ডান হাতে গুনে ক-খানা দিলো; বোয় বেরিয়ে যাবার আগেই বললো; 'রোজ পঞ্চাশ টাকা তো এমনি-এমনিই গ'লে যায়।'

হারীত তাকাতে চাইলো ঠাট্টার চোখে, কিন্তু একটু হকচকানিও ফুটলো। রাজার ছেলে মকরন্দ, সেও তো কোনো পার্টি দিতে হ'লে শস্তা খোঁজে? কিন্তু তার-যে বাপ বেঁচে এখনো; বরাদ্দ

'বাড়ি থাকলেই ফিরতে ব্যস্ত হয় মানুষে—' মজুমদার একচোখ তাকালো হারীতের দিকে, একবার নিশ্বাস ফেললো যেন দম্পতীর আনন্দকে ঈর্ষা ক'রে; তারপর কথা শেষ করলো—'কিন্তু আর-একটু সময় যদি দেন আমাকে, একটুখানি সময়, একটু কফি খেয়ে নেবো ফিরতি পথে—চিনেদের খাবার-টাবার ভালো, কিন্তু কফির জন্যে কাউফমান। হিটলার ইহুদি খেদিয়ে আমাদের এই একটা সুবিধে ক'রে দিয়েছে যে সত্যিকার কফি আমরা চিনতে পেরেছি এতদিনে।' মজুমদারের সমস্তটা বক্তৃতা শাশ্বতীকেই লক্ষ্য করলো, শাশ্বতীকেই কর্ত্রী বানালো তার গলার আওয়াজ; সে দেখতে পেলো তার কথায় কাজ হচ্ছে, আর তক্ষুনি হারীতের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললো, 'মাপ করবেন, মিস্টর নন্দী; হিটলারের কথাটা হয়তো ভুল বলেছি, কিন্তু কফির বিষয়ে বলিনি, আশা করি তা প্রমাণ করতে পারবো।'

তখনকার মতো শহুরে সভ্য না-হ'য়ে হারীত পারলো না। —'আপনার আতিথেয়তার—'

'প্রতিদান দেবেন? নিশ্চয়—যেদিন আদেশ করবেন সেদিনই আমি হাজির হ'তে রাজী।'

হারীত সে-কথা বলতে চায়নি, কোনো-একটা ভদ্রতার বাঁধা বুলি আওড়াতে যাচ্ছিলো, কিন্তু এর পরে মজুমদারের কথাই মেনে নেবার ভাব দেখিয়ে বলতেই হ'লো: 'সে-তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আপনি যা ব্যস্ত, কোথায় ধরবো আপনাকে?'

'আমাকে? কেন, আমাকে ধরার জন্য ভাবনা কী—বিজনের কাছে আমাকে যেতেই হয় মাঝে-মাঝে—যেতেই হবে, ওখানেই-তো

সবচেয়ে ভালো, কী বলো ভাই বিজন?' ব'লে দেলোয়ারি ধরনে বিজনের কাঁধে হাত রাখলো মজুমদার। 'মিস্টর মিত্র'র মহিমা থেকে হঠাৎ এই ঘরোয়া ঘনিষ্ঠতায় বদলি হওয়াটা তার পক্ষে সুখের হ'লো কিনা ঠাওরাতে না-পেরে বিজন হেঁ-হেঁ ক'রে হাসতে লাগলো।

'তাহ'লে আর দেরি না, কেননা,' তার প্রস্তাব পেশ ক'রে, পাশ করিয়ে মজুমদার স'রে দাঁড়ালো টান হ'য়ে, কাটা দরজার একটি পাট হাতে ধ'রে, 'ফ্রাউ, কাউফমান খদ্দের যত ভালোবাসেন, তার চেয়েও খারাপ বাসেন রাত জাগতে।'

কফিতেই শেষ হ'লো না; আবার লেকে দু-চার চক্করও, অতিথিদের যার-যার দরজায় নামিয়ে দিয়ে মজুমদার একা হ'লো এগারোটা রাত্তিরে। আর যে-মুহূর্তে একা হ'লো, তার টগবগে ঝকঝকে ভাবটা খ'সে পড়লো মুখ থেকে, নাকের পাশের রেখা মোটা হ'লো, নিচের ঠোঁট উপরেরটিকে ঢেকে দিলো, থুতনি ঝুলে গলার চামড়া ঢিলে হ'লো, বেরিয়ে এলো ক্লান্ত একজন মানুষ, বড়ো ক্লান্ত, প্রায় বুড়ো। সোজা সে এলো গীতালির বাড়িতে—হ্যাঁ, ফিল্মেরই গীতালি। তার জন্য ব'সে থেকে-থেকে মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়েছিলো প্রায়, চোখ রগড়ে বললো, 'এত দেরি?' কোনো আগ্রহ ফুটলো না কথাটায়, কৌতূহলও না, যেন এ-ই বলতে চাইলো যে এত যেদিন দেরি হয় সেদিন আর না-এলেই তো পারো।

মজুমদার জবাব দিলো না; জুতো-টুতো সুদ্ধু এলিয়ে পড়লো তার নিজের পছন্দ ক'রে কেনা কাউচটিতে।

'খাবে নাকি?'

'না।'

মেয়েটি পরদা-ঢাকা দরজার দিকে তাকিয়ে ডাকলো, 'লক্ষ্মী!' —আর সেই ডাকে তার গলার আওয়াজ প্রাণ পেলো—'লক্ষ্মী, আমার খাবার দে।'

খাবার এলো, গীতালি একটুও দেরি করলো না।

তার খাওয়া, আর-কিছু করবার নেই ব'লে, মজুমদার দেখলো তাকিয়ে-তাকিয়ে। গাল দুটো ফুলছে আর ডুবছে, কণ্ঠমণি কাঁপছে, মুখের ভিতরটা দেখা যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, জিভ বার-বার চেটে নিচ্ছে ঠোঁট। একটি কথা বলছে না, একবার চোখ তুলছে না; হাতে ছিঁড়ছে, দাঁতে চিবোচ্ছে, গলায় গিলছে: খাওয়ার একটা যন্ত্র হ'য়ে উঠেছে তার শরীর। 'আমার জন্য ব'সে ছিলো এতক্ষণ, খিদে পেয়েছে—বেচারা!' এ-কথা মনে হ'তে পারতো মজুমদারের, কিন্তু হ'লো না; নিজের পেট ভরা ব'লে, আর মেয়েটির কাছে ছ-মাস ধ'রে আসছে ব'লে সে দেখলো শুধু কুশ্রীতা, অসহ্য কুশ্রীতা; শুধু ঐ মেয়েটির নয়, সমস্ত স্ত্রীজাতির কুশ্রীতা; হঠাৎ বুঝলো, সারাদিনের ক্লান্তির চেয়েও বড়ো ক্লান্তি সারাদিনের পরে কোনো-একটি স্ত্রীলোকের কাছে আসা; আর সেই ক্লান্তিকে কিনা ডাকতে হচ্ছে জীবনের মতো, সারা জীবনের মতো, আর-কোনো কারণে না, সুদ্ধু জাঁক মেটাতে, তাক লাগাতে! কী যন্ত্রণা টাকার!

৫

গাড়ির দরজা খোলার একটুখানি আওয়াজে আলো জ্ব'লে উঠলো ভিতরের ঘরে, বাইরের ঘরে; আর দরজা খুলে রাজেনবাবু যেই দাঁড়ালেন, ঠিক তক্ষুনি গলির মোড়ে মিলিয়ে গেলো গাড়ির পিছনের জ্বলজ্বলে লাল পাথর-চোখ।

বিজু চ'লে গেলো ভিতরে, স্বাতী ব'সে পড়লো বাইরের ঘরেই, পাখাটা খুলে দিলো বসবার আগে। ঘরটা গরম—আর বড্ড ছোটো না?

মেয়ের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে দেখলেন রাজেনবাবু, তারপর বললেন, 'যেতে তো চাসনি, বেশ ভালোই লাগলো তো?'

স্বাতী কথা বললো না। তার চামড়ায় তখনো ব'য়ে যাচ্ছিলো লেকপাড়ের গাড়িচলার বেশিরাতের হাওয়া।

রাজেনবাবু আবার বললেন, 'শাশ্বতী এলো না?'

'কই, না তো! চ'লে তো গেলো।'

'ভালোই করেছে। এলেই আরো দেরি হ'তো—এগারোটা বেজে গেছে এমনিতেই—'

'এত বেজেছে?'

রাজেনবাবু একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'যা এখন—শুয়ে পড়,' বলতে-বলতে একটা হাই তুললেন নিজে।

তাই তো, এখন শুয়ে পড়া ছাড়া আর কী করবার আছে? কিছু নেই, কিছুই নেই। রোজ রাত্রে একটা নির্দিষ্ট সময়ে শুয়ে

পড়তেই হবে, ঘুমোতেই হবে, প্রতি রাতে প্রত্যেক মানুষকে, বিশ্ববিধাতার এই ব্যবস্থার উপর একটু রাগ ক'রেই মাথা ঝেঁকে উঠে দাঁড়ালো স্বাতী, আর দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো বাবাকে। শুধু-যে বাড়ি ফেরার পর এই প্রথম দেখতে পেলো, তা নয়; যেন অনেকদিন পর চোখে দেখলো; যেন অনেকদিনের মধ্যেও বাবা এমন ক'রে তার চোখে পড়েননি। শাদা, ছাইরঙা আর কালোয় মেশানো অল্প চুল মাথার, চোখের কোলে ছোটো-ছোটো আর নাকের পাশে মোটা-মোটা রেখা, গলার চামড়া ঢিলে, খোলা গায়ে থলথলে একটু ভুঁড়ি—কোঁচাটা উল্টিয়ে কোমরে গোঁজা ব'লে সত্যিকার চাইতে বড়ো দেখাচ্ছে—ধুতি পরার কালো দাগের একটু আভাস দেখা যাচ্ছে কোমরে। একজন বুড়োমানুষকে দেখলো স্বাতী, বুড়ো, ক্লান্ত, সঙ্গীহীন, আপাতত ঘুম-পাওয়া। চমক লাগলো, অবাক হ'লো, যেন বিশ্বাস হ'লো না; কেননা এর আগে কোনোদিন স্বাতীর চোখ বাবাকে বুড়ো ত্যাখেনি।

কেমন লাগে বুড়ো হ'তে? কেমন লাগে বুড়ো হয়েও বেঁচে থাকতে? অন্য যত বুড়ো, আধ-বুড়ো মানুষ—রাস্তায় বেরোলেই যাদের দেখা যায়—তাদের কি মানুষের মধ্যে গণ্য করে স্বাতী, কি তার বয়সের অন্য কেউ? না—নিজের ঘরে আসতে-আসতে কথাটা ভেবে দেখলো মনে-মনে—মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না তাদের; মনে হয় ওরা আছে কেন; না-থাকলে কী এসে যায়; মনে হয় পৃথিবীটা তাদেরই, তাদেরই জন্য, যারা বয়সে তার সমান কিম্বা কাছাকাছি; তার কাছাকাছি বয়সের সকলেরই তা-ই মনে হয়। অন্য সব বিষয়ে যত ঘোরতর অমিলই থাক মতের আর মনের, এই

একটি বিষয়ে তারা সকলেই একমত, একমন, যাদের বয়স পনেরো-ষোলো থেকে আরম্ভ ক'রে চব্বিশ-পঁচিশ ;—এমন একমন যে এ-বিষয়ে তারা কথা বলে না কখনো, এ ওর চোখে তাকিয়েই বুঝে নেয় ; তাদের সমস্ত হাসি, ঠাট্টা ফুর্তি, আড্ডা আর সমস্ত ঝগড়াঝাটি, কান্নাকাটির মস্ত মোটা বইটার প্রথম পাতাতেই এই কথা ছাপানো আছে নিচে-লাইন-টানা মোটা-মোটা অক্ষরে। পঁচিশের পরেই একটু ঝাপসা—হারীতদাকেই মনে হয় আলাদা জাত, আর ঐ প্রকাণ্ড মজুমদারকে তো নিশ্চয়ই—তবু, সত্যি বলতে, হারীতদার সাতাশে, এমনকি মজুমদারের বত্রিশেও আজ কি তার ভির্মি লাগলো ?

ঘরে এসে আলো জ্বাললো, শাড়ি না-ছেড়েই ব'সে পড়লো চেয়ারে, ভাবতে চেষ্টা করলো কত বছর বয়সে মানুষ বুড়ো হয়, কিংবা কত বছর পর্যন্ত হয় না। চল্লিশ ? চল্লিশ সে কাকে চেনে ? ঠিক ! বড়োজামাইবাবু ! কত বয়স ? তা চল্লিশ-টল্লিশ হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বুড়ো ? বাবার মতো ?···হঠাৎ কেমন-একটা কষ্ট হ'লো, বাবাকে মনে-মনেও বুড়ো ভাবলো ব'লে। পৃথিবীর সেই-সব বুড়ো, প্রায়-বুড়ো মানুষ, পৃথিবীর যারা কেউ না, যারা বেঁচে আছে শুধু ট্র্যামের ভিড় বাড়াতে, বাবাও কি তাদেরই একজন ? তার বাবা !

বুড়ো, ক্লান্ত, সঙ্গীহীন, ঘুম-পাওয়া, ঘুমোতে-না-পারা। বাবা ওঠেন খুব ভোরে—শীতে গ্রীষ্মে সূর্য ওঠার আগে—ঘুমিয়েও পড়েন দশটার মধ্যে অঘোরে। আজ ঘুমোতে পারেননি—তার জন্যই। টেবিলের টাইমপীসে—বাবা এটা এনে দিয়েছিলেন ম্যাট্রিক-পাশের পরে—এগারোটা বেজে দশ : প্রায় ছ-ঘণ্টা পর বাড়ি ফিরলো।

এতক্ষণ বাড়ির বাইরে কবে থেকেছে ? শিগগির তো মনে পড়ে না। কলেজেও এতক্ষণ কাটে না—আর কলেজ তো দিনের বেলা, সকলেরই কাজ থাকে তখন, কিন্তু রাত্তিরে ? জামাইবাবুর সঙ্গে দল বেঁধে গিয়েছে সবাই শ্যামবাজারে থিয়েটরে—সবাই, বাবা ছাড়া—কেন ? যাঃ, বাবা আবার থিয়েটরে যাবেন কী—আর তাই বড়দিও প্রায়ই যাননি ; যত উৎসাহে অন্যেরা গিয়েছে, তত উৎসাহেই বড়দি বাড়ি থেকেছেন, কেননা '*নিরিবিলিতে দুটো কথা বলা যাবে বাবার সঙ্গে।' আর সে ? বাঃ, সে কি যেতে চেয়েছিলো নাকি আজ, বাবাই তো বললেন, আর ছোড়দি এমন জোর করলো— ! কিন্তু যেতে চায়নি, তা কি বাবার জন্য ?*...না, নিজের কাছে জবাব দেবার আগে একটু থামলো স্বাতী, যেতে চায়নি প্রবীরচন্দ্র মজুমদারের জন্য। মজুমদারের জন্য যেতে না-চাইবার কারণ ? ভালো লাগে না লোকটাকে—লাগে না ? খুব খারাপ কাটলো এই ছ-ঘণ্টা সময় ?

স্বাতী নিজেকে দেখতে পেলো মেট্রো সিনেমার মখমল-কুশনে, কার্পেটমোড়া ঝলমলে সিঁড়িতে, চাং-আন-এর জমাট কামরায়, লেকপাড়ের হাওয়াগাড়িতে। আর ততক্ষণ বাবা ? একলা বাড়িতে আলো-না-জ্বালা বারান্দার পাটিতে, একটা-দুটো পান, চুপচাপ বাড়িতে চুপচাপ—বই পড়ারও অভ্যেস নেই বাবার—কী ভাবেন ? —তারপর কোনোরকমে ন-টা বাজিয়ে একলা ব'সে খেয়ে নিয়ে আবার দুটো পান, আর তারপর শুয়ে পড়লেই ঘুম, কিন্তু তাও আজ হ'লো না ; একা, অন্ধকারে চুপচাপ জেগে থাকলেন তার জন্য, দশটা, সাড়ে-দশটা, এগারোটা পর্যন্ত ; হয়তো দেরি

দেখে দুশ্চিন্তাও হ'লো, কিন্তু সে-কথা বলবার কেউ নেই ; তাকেও কিছু বলবেন না, কোনো কথা বলবার কেউ নেই ; তার সঙ্গে, সত্যি বলতে, কতটুকুই-বা কথা আছে বাবার, আর তারই বা কী-কথা বাবার সঙ্গে !—বড়দি, তার পনেরো বছরের বড়ো ; বাবার কাছে বসলে ঘর-সংসারের কথা তাঁর ফুরোয় না, কিন্তু তার মনের মধ্যে যত কথার আকুলিবিকুলি ছটফটানি, তার কতটুকু বলা যায় বাবাকে ? এই-তো এখন : সিনেমা দেখে, চিনে রেস্তোরাঁয় খেয়ে, কাউফমানের কফি পান ক'রে, লেক-চক্কর দিয়ে, তারপর কি ইচ্ছে করে বাড়ি এসেই শুয়ে পড়তে, ঘুমোতে ; ইচ্ছে কি করে না বাড়ি এসেও খানিকক্ষণ কথা বলতে, গল্প করতে, হাসতে, কথা বলতে-বলতে ঘুমিয়ে পড়তে, ঘুম-ঘুম গলায় কথা বলতে ?···কিন্তু বাবা ঘুমোতে পারলে বাঁচেন, দাদাও এতক্ষণে বিছানায় ; শুধু সে—তার যেন ঘুম নেই, সুখ নেই, তৃপ্তি নেই।

কেন ?

ঘরের চারদিকে তাকালো স্বাতী। ঠিক-ঠিক গোছানো, ফিটফাট। বেতের চেয়ার, নিচু মোড়া, নিচু আলনায় কুঁচোনো শাড়ি পেঁচিয়ে রাখা ; ছোটো শেলফে বই ; মশারি-ফেলা তৈরি বিছানা ; টেবিলে রেকাবি-ঢাকা জল-ভরা গ্লাশ ; ঠিক যেখানকারটি যেখানে, ঠিক যেমনটি চাই। আর-একটু ভালো ক'রে তাকালো : ধোবারবাড়ির টাটকা পরদা জানলায়, টেবিলের ছড়ানো বইগুলি গায়ে-গায়ে দাঁড় করানো, দেয়ালে মা-র ঝাপসা-হ'য়ে-আসা ছবিটা একটু কম ঝাপসা। নতুন কিছু নয়, রোজই এ-রকম ; সে যেমন খুশি থাকে, চলে, ছড়ায়, আর রামের মা দু-বেলা গুছোয়, আর

বাবা ব'লে দেন। বেশ-তো আছে সে, খুব আরামে, একলা একটা ঘরে তার দিদিরা কেউ থাকেনি, তার কলেজ-বন্ধুরা বোধহয় থাকে না, ভাবতে গেলে সারা দেশে ক-জন মানুষের কপালে জোটে একলা একটা ঘর, তার কপালেও জুটেছে নেহাৎই দৈবাৎ, নেহাৎই সে বাবার সবছোটো মেয়ে ব'লে। তা কারণ যা-ই হোক, আছে তো ভালো, নিরিবিলি, স্বাধীন, আপনমনে; তবে কেন ঘুম নেই, সুখ নেই, কী-যেন নেই, কী?

কী?

স্বাতী হাত বাড়ালো জলের গ্লাশে, আর গ্লাশটা হাতে তুলতেই চোখে পড়লো একটা—চিঠি। না-খেয়েই নামিয়ে রাখলো গ্লাশ, তুলে নিলো শক্ত শাদা খামটা—কিন্তু তক্ষুনি খুললো না। একটু তাকালো খামের উপর নামের দিকে, তারই নাম, কুচকুচে কালিতে ঢেউ-বাঁকা অক্ষরে লেখা, কখন এসেছে, কখন থেকে অপেক্ষা করছে তার জন্য; যদি সে এসেই শুয়ে পড়তো তাহ'লে আজ হয়তো চোখেই পড়তো না। কী অন্যায়!—কিন্তু কার অন্যায়? এতক্ষণ কোথায় ছিলো সত্যেন রায়? আজকের বিকেল থেকে আরম্ভ ক'রে এই মুহূর্তের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একবারও তার মনে পড়েনি সত্যেন রায়কে, যেমন বাড়ি ফেরার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একবারও মনে পড়েনি বাবাকে। বাড়িতে পা দিয়েই বাবাকে যেমন অন্যরকম লেগেছিলো, তেমনি এই চিঠিটা—

স্বাতীর নিশ্বাস ভারি হ'লো, কপালের চুল সরিয়ে আস্তে খুললো খাম, ভিতরে ভাঁজ-করা কড়কড়ে শাদা কাগজটা আস্তে খুললো চোখের সামনে। ঢেউ ব'য়ে গেলো তার মনের উপর

দিয়ে, কালো-কালো অক্ষরের কথা-বলা ঢেউ; হাওয়া ব'য়ে গেলো তার মনের উপর দিয়ে, পাহাড়ি হাওয়া, ঠাণ্ডা হাওয়া, শান্তির, অশান্তির হাওয়া। মনে পড়লো, আর সেই একটি মুহূর্তেই যেন মনে-মনে পড়লো, অন্য সব চিঠি; যত চিঠি সে পেয়েছে, যত চিঠি সে লিখেছে, সেই শান্তিনিকেতনের প্রথম চিঠি থেকে; ফিরে এলো তারা, উড়ে এলো এক ঝাঁক পাখির মতো, কেউ-কেউ শাদা, অন্যেরা হালকা-নীল, কিন্তু শাদারা আর নীলেরা উড়ে চলেছে একই দিকে, দূর দূরের দিকে, তারপর আর বোঝা যায় না কে শাদা কে নীল।

চিঠি পড়া শেষ ক'রে স্বাতী হাতে নিলো গ্লাশ, একটু-একটু ক'রে খেয়ে নিলো সমস্তটা জল। নামলো জল স্রোতের মতো তার ভিতরে, নামলো তার মনে পাহাড়ি ঝরনা, ঠাণ্ডা, কত দূর থেকে ঠাণ্ডা, যত নামছে তত অশান্ত, নামছে শাদা আর নীল দুটি রেখায় ঝরনা, নামছে অশান্তি দূর দূরের সমুদ্রের দিকে, তারপর আর বোঝা যায় না কোনটা শাদা আর কোনটা নীল।

চিঠিখানায় একটি হাত রেখে স্বাতী মাথা হেলিয়ে চোখ বুঝলো।

'স্বাতী।'

ডাক শুনে এমন চমকালো যে চেয়ার থেকে প'ড়ে যাচ্ছিলো প্রায়। সামলে উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে প্রথম কথা মনে হ'লো কোনো-একটা বই-টই দিয়ে চিঠিটা চাপা দেয়। কিন্তু না— লুকোবে কেন, লুকোবার কী আছে। একটু তাকিয়ে, একটু হেসে বললো, 'তুমি ঘুমোওনি, বাবা?'

'তুই এখনো ঘুমোসনি যে?'

'ঘুম পায়নি।'

'ঘুম পায়নি ব'লেই ব'সে-ব'সেই ঘুমিয়ে পড়েছিলি ?'

'ঘুমোচ্ছিলাম না,' স্বাতী বললো, 'ভাবছিলাম।'

'ও আমার রাতজাগুনি ভাবুনি রে!' রাজেনবাবু গলা ছেড়েই হাসলেন মেয়ের গম্ভীর কথা শুনে আর আরো গম্ভীর মুখ দেখে। 'শুয়ে পড় এক্ষুনি, আর এক মিনিট দেরি না!'

'হ্যাঁ বাবা, শুই।'

মেয়ের মুখে একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব দেখে বাবা বললেন, 'কিছু চাই ? রামের মাকে ডেকে দেবো ?'

'না—না—তুমি শুয়ে পড়ো, বাবা—আমি এক্ষুনি—' বলতে-বলতে স্বাতী টেবিলে প'ড়ে-থাকা চিঠিটা দু-আঙুলে নাড়লো একটু, তারপর আস্তে-আস্তে খামে ঢুকিয়ে রাখলো, যাতে বাবার চোখে পড়ে।

রাজেনবাবু এক পলক তাকিয়ে বললেন,—'কী লিখেছে সত্যেন ?'

'কী ক'রে বুঝলে, কার চিঠি ?'

'অত সুন্দর হাতের লেখা আমাদের জানাশোনার মধ্যে আর কার ?'

স্বাতী বললো, 'লেখেনও খুব সুন্দর। তামুপাহাড়ের কথা এমন ক'রে লিখেছেন—একটু পড়বো, বাবা, শুনবে ?'

'দুষ্টু! খালি ছুতো ক'রে-ক'রে জেগে থাকার চেষ্টা! আর কথা না—ঘুম!'

রাজেনবাবু ফিরে এলেন নিজের ঘরে, শুয়ে পড়লেন অন্ধকারে।

আর, একটু পরে দু-ঘরের মাঝখানকার পরদা-ঢাকা দরজাটাও অন্ধকারে মিশে গেলো ; আর, আরো একটু পরে রাজেনবাবুর কানে ভেসে এলো নরম, খুব নরম গলার গুনগুনানি ; প্রথমে বড্ড লাজুক, একটু কাঁপা, ভিতু, গুনগুন ; একটু চড়া, আরো, কিন্তু গুনগুন ; তারপর আবার নামলো, মৃদু, মোছা-মোছা, গুনগুন ; আহা—পাগল-করা বেহাগ—গানটা ছেড়ে দিলো স্বাতী, রাখলে-তো ভালোই হ'তো—ভালো ক'রে শিখলোই না, সেই যতীন দাস রোডে থাকতে একটু-একটু ; আজকাল আর হাঁ-ও করে না বুঝি—কতকাল পরে গানকে আজ মনে পড়লো ওর, কতকাল পরে মনের মধ্যে গানকে ফিরে পেলেন রাজেনবাবু। কান পেতে শুনলেন, মন ভ'রে শুনলেন—দুটো-একটা কথাও কানে এলো, বোধ হয় রবিবাবুর কোনো—তাই এত মিষ্টি !—তক্ষুনি কথা ডুবে গেলো, শুধু গুনগুন ; আহা—থামে না যেন, থামলো না, সেই রাত্রে, চুপচাপ অন্ধকারে, ঘুম-জড়ানো বিছানায় শুয়ে-শুয়ে রাজেনবাবু আস্তে-আস্তে ভেসে গেলেন সেই দুঃখে যে-দুঃখ তিনি কখনো পাননি, আর সেই সুখে যে-সুখ শুধু কল্পনা ; সমস্ত জীবনের ক্লান্তি মুছে গেলো, সমস্ত পৃথিবী শান্তিতে ছেয়ে গেলো ; আর তবু, রাজেনবাবু ঘুমিয়ে পড়ার পরেও আরো চললো গুনগুন, নরম, আরো নরম, আবছা-মোছা গলায়, একটু থেমে-থেমে, গুনগুন মনের গুনগুন-কথা, ব্যাকুলতা, ভয়, প্রার্থনা, প্রশ্ন।

সেই-যে ছেলেবেলায় একবার ছোড়দি তার হাতে বই পাঠিয়েছিলো শুভ্রকে, আর সেই বই খুলেই নীল খামের ঝিলিক দেখে

কেমন-একরকম হেসেছিলো শুভ্র, তারপর থেকে চিঠির নীল রং দেখলেই একটা-যেন ত্রাস হ'তো স্বাতীর। মানে, এ-কথা ভাবতেই ত্রাস হ'তো পাছে কোনোদিন তাকেও কেউ লেখে ও-রকম। কিন্তু সত্যেন রায়ের ঘরে গিয়ে দেখেছিলো টেবিলে ঘন-নীল প্যাডের ফাঁকে ফাউন্টেনপেন গোঁজা, আর সেই কাগজেই প্রথম চিঠি এলো শান্তিনিকেতন থেকে। ভয় ভাঙলো, এমনকি, ভালো লাগলো, খুব ভালো লাগলো ঐ ঘন-নীল বেগনিমতো রংটা। ক-দিন পরে সে-ও কিনেছিলো নীল রঙের কাগজ-খাম ; অত ভালো রং পাড়ার দোকানে মিললো না, অমন খশখশে কাপড়-মতো কাগজও না ; সবচেয়ে ভালো যা পেলো, তা-ই এনেছিলো, আর তারপর ব'সে-ব'সে ভেবেছিলো কাকে চিঠি লেখা যায় তার এই নতুন-নীল কাগজে।

কিন্তু চিঠি লেখার কোনো লোক নেই স্বাতীর। বাবার হ'য়ে মাঝে-মাঝে মৈমনসিং-এ বড়দিকে, রেঙ্গুনে মেজদিকে আর দিল্লিতে সেজদিকে চিঠি লিখতে হয় তার : তাতা হামের পর কেমন আছে, ইরু এবার কোন ক্লাশে উঠলো, দীপুর একটা ছবি পাঠিয়ো, আমি ভালো আছি, বাবা ভালো আছেন, তোমরা কেমন ; ছোটো-ছোটো খবর-চিঠি, মোটামুটি একই খবর, একই রকম, টুকরো-টুকরো শুকনো হাড়—একে কি আর চিঠি বলে? ওরই মধ্যে একটু রক্তমাংস লাগিয়ে ফেলে সে ; বড়দিকে জানায়, 'এক-একদিন সকালবেলা আমার এমন ইচ্ছে করে আলুসেদ্ধ খেতে—কিন্তু আলু-সেদ্ধ হ'লেই তো হ'লো না—' লিখতে-লিখতে একটা পাতাই ভ'রে যায় ; মেজদিকে জিগেস করে, 'মেমিও গিয়েছিলে বেড়াতে,

সে-কথা কেন কিছুই লেখোনি ?—কী-সুন্দর নাম .মেমিও—আচ্ছা, তোমরা স্টিমারে ক'রে ভামো গিয়েছো কখনো—সেদিন একটা বইয়ে পড়ছিলাম—' মনে-মনে ভামোতে চ'লে যায় ; ভামো, মেমিও, ম্যাণ্ডালে ; 'ম' আওয়াজটাই মিষ্টি ; সমস্ত বর্মাটা যেন মস্ত একটা ভ্রমর—আর সেজদিকে খবর দেয় যে সেদিন পুরোনো একটা ট্রাঙ্ক থেকে 'তোমার নাম লেখা একখানা বই বেরোলো হঠাৎ—কী-বই বলো তো ?—তোমার আর কী ক'রে মনে থাকবে —সত্যেন্দ্র দত্তের "বেলাশেষের গান"—সেজদি, তুমি কবিতা পড়তে তখন ?—বইখানা কিন্তু আমার হ'য়ে গেলো—আর তোমার হাতের লেখা কিন্তু একরকমই আছে—শেষের ক-টা পাতা নেই, কাগজও হলদে হ'য়ে গেছে—আরো বেশি ভালো লাগলো সেইজন্য—' এমনি চললো ড্যাশ দিয়ে-দিয়ে খানিকক্ষণ। কিন্তু অনেক দেরি ক'রে-ক'রে এ-সব চিঠির জবাব যেই আসে, তক্ষুনি স্বাতী বুঝতে পারে তার ভুল। মেজদির সর্বদাই এত শরীর খারাপ যে চিঠিপত্র কয়েক লাইনের বেশি এগোয় না ; সেজদির প্রত্যেক চিঠিতেই দারুণ তাড়াহুড়োর লক্ষণ ; ভুল কথা, কথা ফেলে যাওয়া, এক কথা দু-বার, শেষ ক'রে একবার পড়ারও সময় নেই ; আর বড়দি তো নিজের হাতে চিঠি লেখা ছেড়েই দিয়েছেন, নয়তো আর মেয়ে বড়ো হয় কেন মায়েদের। তিন দিদি বাইরে, তবু চিঠি লেখার কেউ নেই ; অথচ লেখার ইচ্ছে ভীষণ ;—লোকে যাকে দুঃখ বলে, এ-দুঃখ কি তার কোনোটার চেয়ে কম ?

একবার চেষ্টা করেছিলো কলেজের অনুপমার সঙ্গে চিঠি জমাতে, অনুপমা যেবার বেড়াতে গিয়েছিলো তার কাকার কাছে বরিশালে।

চিরাচরিত নিয়ম উল্টিয়ে স্বাতীই লিখেছিল আগে। জবাবও এসেছিলো চটপট, উৎসাহ পেয়ে দুই নম্বর চিঠিতে অনেক কথাই বিনিয়েছিলো ; কিন্তু অনুপমার দুই নম্বর আর এলোই না। কলেজ খুলতে স্বাতী যখন জিগেস করলো, 'আমার চিঠির জবাব দিসনি যে ?' অনুপমা দিব্যি হেসে বললো, 'কী আবার লিখবো, আর সময়ই-বা কোথায় ?'—বলে কী ? সময় নেই ? সময় তবে আছে কিসের জন্য ? কথা নেই লেখার ? মনের মধ্যে দিনরাত তবে তা-তা-থৈ কিসের ?

'ছোড়দি, আমাকে চিঠি লিখবে তুমি ?' ভয়ে-ভয়ে, আড়চোখে, আধোগলায় শাশ্বতীর কাছেই প্রস্তাব করেছিলো একদিন।

'চিঠি ?' প্রশ্নচিহ্নটা সুতীক্ষ্ণ হ'লো শাশ্বতীর গলায়।

'আমি লিখবো আর তুমি জবাব দেবে।'

'সে কী রে !' শাশ্বতী হাসলো।

'হাসছো কেন ?' স্বাতী দেখাতে চাইলো দমেনি।

শাশ্বতী জবাব দিলো না, চোখের দিকে তাকিয়ে আরো হাসলো।

'চিঠি লিখতে ভালো লাগে না তোমার ?'

'তোর বয়সে লাগতো, কিন্তু—' কথা শেষ না-ক'রে শাশ্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো দুই কানের মুক্তোদুল ঝিলমিলিয়ে।

এর পর একদিন দুপুরবেলা ব'সে-ব'সে স্বাতী নিজেই নিজেকে লম্বা লিপি চিত্রালো, আর তারপর নিজেই দু-জন সেজে আরো লম্বা জবাব বুনলো পরের দিন ; আর তারপর অবশ্য দুটোই ছিঁড়ে ফেলে দিলো, কেননা এ-খেলা আর ভালো লাগলো না, আর গোর্কীর সেই টেরেসা গল্প মনে প'ড়ে আরো বেশি খারাপ লাগলো।

অতএব নীল কাগজের প্যাডটি খুব বেশি রোগা হ'য়ে যায়নি এই ছ-মাসে। কিংবা পাঁচ মাসে যেটুকু রোগা হয়েছিলো, আবার প্রায় ততটাই হ'লো তার পরের এক মাসে, সত্যেন রায় শিলং যাবার পরে। স্বাতী আশা করেনি চিঠি—কিংবা করেছিলো; আশা মানুষ কী না করে?—কিন্তু সত্যি ভাবেনি—কিন্তু চিঠির ধরনটা এমন যেন এ আগে থেকেই জানা, যেন এ-বাড়ি থেকেই গেছেন আর পাহাড়-বেড়ানোর চিঠি পাঠানোর আর লোক নেই স্বাতী ছাড়া। স্বাতীর চিঠি পাবার আর চিঠি লেখার কল্পনা এতদিনে একটা শরীর পেলো : বিনাকাজের লম্বা ছুটি, লম্বা মে মাস, ভরা গ্রীষ্মের বড়ো-বড়ো দিনগুলির অনেকখানি নীল-শাদা লেখার ঝাঁকে উড়িয়ে দিতে-দিতে জ্বলজ্বলে জুন এসে দরজায় দাঁড়ালো।

কিন্তু হঠাৎ কেন শক্ত হ'য়ে গেলো চিঠি লেখা? যে-কোনো সময়ে মন থেকে কলমে আর কলম থেকে কাগজে ঝরঝর ক'রে যার কথা ঝ'রে পড়ে, সে কেন আজ কলম হাতে নিয়ে চুপ? ভরেছিলো চার পৃষ্ঠায় এক কাহন, কিন্তু শেষ ক'রে পড়লো যখন সমস্তটা—ছী-ছি, কী বাজে, ছেলেমানুষি, কী লিখেছে এ-সব!—একটানে লম্বা ক'রে দিলো মাঝখান দিয়ে, কুচি-কুচি ছড়িয়ে দিলো টেবিলতলায়; আবার আরম্ভ করলো নতুন ক'রে, কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে ভালো ক'রে আরম্ভই করতে পারলো না। কথা নেই ব'লে মুশকিল নয়; মুশকিল এই যে এত কথা আছে যে তার মধ্যে কোনটা লিখবে আর কোনটা লিখবে না সেই হ'লো মুশকিল। যেটা মনে আসে সেটাই মনে হয়—বাজে! অথচ এইরকমই সব পাঠিয়েছে আগে—এই সেদিনও—কেন পাঠিয়েছে? কেন? একটা

সহজ, অত্যন্ত সহজ, কিন্তু অদ্ভুত, অত্যন্ত অদ্ভুত প্রশ্ন দেখতে-দেখতে স্বাতীর মনে গজিয়ে উঠলো, ভেলকিওলার গাছের মতো ছোট্ট চারা থেকে মস্ত বাঁকা-বাঁকা ডালপালা পর্যন্ত : কেন সত্যেন রায় চিঠি লেখেন তাকে, আর সে-ই বা কেন পাওয়া মাত্র জবাব দেয়, কতটুকুই বা চেনা, আর চেনাই বা কী-রকম : চিঠির কোনো কথাই ওঠে না সত্যি বলতে, অথচ এই সহজ কথাটা এতদিনে একবারও মনে হয়নি, কেন হয়নি ?

দিনটা, সিনেমা-সন্ধ্যার পরের সেই রবিবারটা বৃথাই কাটলো স্বাতীর, জবাব লেখা হ'লোই না।

পরের দিন দুপুরবেলা সে যখন প্রায় শেষ ক'রে এনেছে চিঠি, যেন একটা ভার নামাতে পেরে মনটা বেশ ভালো লাগছে, রামের মা এসে খবর দিলো বাইরের ঘরে একজন ভদ্রলোক এসেছেন।

ধ্বক্‌ ক'রে উঠলো বুকের মধ্যে। সত্যেন রায় ? ফিরে এলেন হঠাৎ ? কিন্তু চিঠিতে তো—থাক তাহ'লে চিঠি। উঠে দাঁড়িয়ে, আঁচলে একবার মুখ মুছে জিগেস করলো, 'বসতে বলেছো ?'

'বসেছেন।'

'পাখা খুলে দিয়েছো ?'

'না তো !—'

রাগ হ'লো রামের মা-র উপর—এতদিনেও বোঝানো গেলো না যে কেউ এলেই পাখাটা—রাগ বাড়লো বসবার ঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেই। কী বোকা রামের মা, সত্যি ! ব'লে দিলেই হ'তো দাদাবাবু বাড়ি নেই !

কুঁচোনো কোঁচা মেঝেতে লুটিয়ে মজুমদার উঠে দাঁড়ালো :

ঝিরিঝিরি গিলের ঝিরঝিরানি তুলে দু-হাত জোড় করলো, চোখে চিকচিকোলো, ঠোঁটে হাসলো, একটু পরে বসলো, তারপর বললো :

'বিজন বোধহয় বাড়ি নেই ?'

'না। এ-সময়ে তো থাকে না কখনো।'

'আমিও তাই ভেবেছিলুম,' ব'লে মজুমদার আরো-একটু আরাম ক'রে হেলান দিলো চেয়ারে।

'কোনো কথা ছিলো ? এলে কিছু বলতে হবে ?'

'না, বলতে হবে না কিছু। আর, দিনের মধ্যে দেখা হবেই একবার।'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী বললো, 'আজ আপনার আপিশ নেই বুঝি ?'

'আপিশ ? আপিশ আমার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘোরে। যারা চাকরি করে তারা বেশ আছে, দশটা-পাঁচটা কাজ, বাকি সময় নিশ্চিন্ত : কিন্তু আমার এমন-একটা অবস্থা হচ্ছে দিন-দিন, এমন জড়িয়ে যাচ্ছি পঞ্চাশ ব্যাপারে—সবাই যেন আমাকে খুঁজে-খুঁজে বের করছে, ইচ্ছে করলেও আর রেহাই নেই—এ-রকম কদ্দিন চলবে, আর কোথায় এর শেষ হবে—' হঠাৎ থেমে, একটু হেসে বললো, 'কিন্তু আপনাকে এ-সব কথা বলছি কেন ?'

স্বাতী কথা বললো না, যেন মেনেই নিলো মজুমদারের শেষ কথাটা।

একটু পরে মজুমদার নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলো, 'তা বললামই না-হয়—শুনতে আপনার ভালো লাগছে না, কিন্তু বলতে তো আমার ভালো লাগছে।'

তার প্রায়-শেষ-করা, শেষ-না-করা, চিঠির কথা ভেবে স্বাতী এবারেও কিছু বলতে পারলো না।

মজুমদার বললো, 'আপনি কি বিরক্ত হয়েছেন আমি এ-রকম অসময়ে হঠাৎ এসেছি ব'লে?'

'না—না—কী আশ্চর্য—আমি কেন—'

'কেমন অন্যমনস্ক দেখছি আপনাকে?'

'কই।'

'কী করছিলেন?'

'কী আর—'

'ঘুমোচ্ছিলেন?'

'ঘুমোবো কেন?'—ইনি আমাকে দুপুর-ঘুমোনি ভাবলেন!

'আমি বুঝেছি আপনার অবস্থাটা,' মজুমদার গম্ভীরমুখে বললো। 'আমি উঠলে বাঁচেন, কিন্তু ভদ্রতা ক'রে ব'সেও থাকতে হচ্ছে—তা-ই না?'

স্বাতী লজ্জা পেলো। এই তার দোষ, আর এই তার মস্ত অসুবিধে যে মনের ভাব লুকোতে সে জানে না, তাব'লে এ-রকম ক'রে বলাটাও সত্যি—! সে চোখ তুললো, চোখ নামালো, আবছা হাসলো, কিছু বলতে গেলো, আর এই অপ্রস্তুত অপ্রতিভতা থেকে মজুমদারই তাকে উদ্ধার করলো মুখে ভালোমানুষি হাসি আর কথায় ভালোমানুষি ঠাট্টাসুর টেনে: 'কিন্তু ভয় নেই আপনার—আমি এক্ষুনি উঠবো—সারাদিন তো চরকিঘোরা আছেই—বেশ লাগছে এই ঘরটিতে একটু বসতে।'

একটু ছলছলে হ'লো স্বাতীর মন। মনে পড়লো এমনি এক

দুপুরবেলার কথা, যেদিন সত্যেন রায় এসেছিলেন ক-মিনিটের জন্য 'নবজাতক' বইখানা দিতে। কী-কষ্ট, সত্যি, পুরুষদের।—না, কষ্ট কী, কেমন স্বাধীন, যখন যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে, এই-তো কেমন বেড়াচ্ছেন শিলং পাহাড়ে—চিঠিটা পারবে তো আজ-ডাকে পাঠাতে?···মনকে ফিরিয়ে আনলো চিঠি থেকে, সহজ হ'য়ে বললো, 'বাঃ! আপনি বসুন না যতক্ষণ ইচ্ছে।'

'ইচ্ছে!'—যদিও ছুটির দিনেও সে দুপুরবেলা বাড়ি থাকে না—ভাবতেই হাঁপ ধরে—তবু স্থান-কাল-পাত্রী বুঝে কথা সাজালো: 'কার না ইচ্ছে করে, বলুন, জানলা-ভেজানো ঘরে পাখার তলায় ব'সে দুপুরবেলাটা গল্প ক'রে কাটাতে!' কিন্তু, একটু আগে পুরুষের যে-সুবিধের কথা স্বাতী ভাবছিলো, তার ঠিক উল্টোটা এবার শুনলো সে, 'যা ইচ্ছে করে তা-ই কি আর করা যায়! তাহ'লে আর কাজ ব'লে বস্তুটা জন্মাবে কেন জগতে?'

'তা কাজে তো আপনার অনিচ্ছা নেই!'—কিছু-একটা বলতে পেরে স্বাতী যেন হাঁপ ছাড়লো।

কথাটা শুনে স্পষ্ট খুশি হ'লো মজুমদার, কেননা তার ভাষায় সবচেয়ে বড়ো প্রশংসাই এইটে। যারা তার চাকরি করে, আর যারা কোনোরকম সুবিধের জন্য তার কাছে হাত পাতে, তাদের সকলের কাছে যে-কথাটি সে জাঁকিয়ে বলে, সে-কথাই এখানে একটু নরম ক'রে বললো, 'কিন্তু সে-অনিচ্ছা অন্যদের এত বেশি যে আমাকে মিছিমিছি চারগুণ খাটতে হয়। বেকারের এত কান্নাকাটি তো শোনেন, কিন্তু আমি-তো দেখি পৃথিবী ভ'রে কাজ আছে বিস্তর, কিন্তু কাজের লোক নেই।'

বেকারদের বিষয়টা স্বাতীর কাছে একেবারেই ঝাপসা, তাই সে চেষ্টা করলো কিছু না-ব'লে মুখে-চোখে সমর্থন জানাতে, কেননা সেটাই ভদ্রতা।

তাতেই উৎসাহিত হ'য়ে মজুমদার আরো বললো, 'এই-তো এক্ষুনি ছুটতে হবে বারো মাইল দূরে ফ্যাক্টরিতে, দু-বেলা নিজে না-দেখলে চলে না, ছোটোখাটো ব্যাপারও আটকে যায়—যদিও মাইনে দিয়ে লোক পুষছি অনেকগুলো।'

ভাষাটা ভালো লাগলো না স্বাতীর, মনের মধ্যে কামড় দিলো নিজের দাদার কথা। একটু হঠাৎ ক'রেই বললো, 'আচ্ছা, একটা কথা। দাদা সত্যি-সত্যি কী করছে আপনি কি জানেন?'

'কেন, আপনারা জানেন না?'

'আমাদের কাছে কিছু বলে-টলে না।'

তক্ষুনি মজুমদারের মুখে নামলো আপিশ-বস্-এর গাম্ভীর্য, নিচু গলায় থেমে-থেমে বললো, 'বিজন ভালোই করছে।...ভালোই করবে।...ওর পার্টস আছে—মনে হয়।'

'পার্টস?' প্রশ্ন ফুটলো স্বাতীর চোখে।

'কাজের লোক,' সংক্ষেপে রায় দিলেন কাজের কর্তা।

যে-দাদাকে ছেলেবেলা থেকে বাড়িসুদ্ধু সবাই জেনেছে অকর্মণ্যের চরম নমুনা ব'লে, তার সম্বন্ধে এমন কথা তারই মুখ থেকে যে কিনা সারা রাজ্যে কাজের লোক দেখতে পায় না! স্বাতী যেন বুঝতে পারলো না বিশ্বাস করবে কি করবে না। তার এর পরের কথাটাও, তাই, প্রশ্নের সুরেই বেরোলো, 'তাহ'লে ভালোই?'

'মনে তো হয়, হওয়া তো উচিত,' বস্-গম্ভীর মজুমদার বিচক্ষণ

জবাব দিলো। তারপরেই সহজ করলো ভঙ্গি—'বড্ড দুশ্চিন্তা বুঝি ওকে নিয়ে আপনার বাবার?'

দাদা এঁকে কী বলেছে আর কতখানি বলেছে, মজুমদারের মুখের চেহারা থেকে তা বুঝে নেবার চেষ্টা করতে-করতে স্বাতী বললো, 'হওয়া কি অন্যায়?'

'নিশ্চয়ই না—আর ম্যাট্রিকটাও যখন পাশ করতে পারেনি! —কিন্তু আমিও তো,' মজুমদার বড়ো-বড়ো দাঁত দেখিয়ে হাসলো, 'মাত্রই ম্যাট্রিক-পাশ।'

তার দাদা আর-একজন প্রবীর মজুমদার হ'লে তার কেমন লাগবে, স্বাতী মনে-মনে তা চিন্তা করলো।

'স্কুল-কলেজের পাশ-ফেল আর জীবন-যুদ্ধের পাশ-ফেল এক জিনিশ নয়,' মজুমদার তার অভিজ্ঞতার অংশ দিলো স্বাতীকে, আর সেই সঙ্গে আশ্বাসও: 'আপনার বাবাকে বলবেন দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমি ওকে সব্-কনট্র্যাক্ট দিতেই থাকবো নিয়মিত—আর অমনি ক'রে-ক'রে নিজেই দাঁড়িয়ে যাবে একদিন—এখন যুদ্ধটা কয়েক বছর টিকলেই হয়।'

মজুমদার তাহ'লে কনট্র্যাক্টর? আর দাদাও সেই কাজে ঢুকেছে? মনটা খারাপ হ'য়ে গেলো স্বাতীর। আস্তে-আস্তে বললো, 'কিন্তু বাড়ি বানাবার কাজে দাদা কী করবে?'

মজুমদারের মোটা গালের ভাঁজে-ভাঁজে হাসি ছড়ালো, আবার মনে-মনে উপভোগও করলো মেয়েটির এই প্রায় পাড়াগেঁয়ে অজ্ঞতা। প্রায় সস্নেহ সুরে বললো, 'বাড়ি বানাবার কনট্র্যাক্ট নয়, যুদ্ধের সাপ্লাইয়ের কনট্র্যাক্ট।' মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলো যে স্বাতী

বুঝলো না কথাটা, কিন্তু আর বোঝাবার চেষ্টা না-ক'রে বললো, 'বিজনের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো নিশ্চয়ই কোনো শুভক্ষণে।'

'কেন?' সরল প্রশ্ন স্বাতীর।

'সেইজন্যই তো আপনা—' মুখে এসেছিলো 'আপনার', কিন্তু ঠিক সময়ে কথাটা বদলে নিলো, 'আপনাদের সঙ্গে তো আর আলাপ হ'তো না তা না-হ'লে।—আপনার ছোড়দি চমৎকার মানুষ। হারীতবাবুও। কবে আবার আসবেন ওঁরা এখানে?'

'ঠিক কী—'

'আগে একটা খবর পেলে চেষ্টা করতে পারি হাজির হ'তে—অবশ্য আপনাদের যদি আপত্তি না থাকে।'

স্বাতী চেষ্টা করলো এমন ক'রে হাসতে, যাতে বোঝা যায় আপত্তির কোনো কথাই ওঠে না।

হঠাৎ কব্জিঘড়িতে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠলো মজুমদার, চলতে-চলতে বিদায় নিলো, একবারও পিছনে না-তাকিয়ে উঠে বসলো গাড়িতে।—কিন্তু হঠাৎ নয়, আগে থেকেই আড়চোখে ঘড়ি দেখছিলো, আর ঠিক সময়মতোই উঠেছে। যে-জন্য এসেছিলো তা হয়েছে তার; সোমবারের দামি সময় থেকে খানিকটা খাবলে নিয়ে যে-জন্য সে এসেছিলো হালকা-হাওয়ায় খামকা-চলার উজান বেয়ে ক্যানিং স্ট্রীট থেকে টালিগঞ্জে, তা হয়েছে, ভালোমতোই হয়েছে, বেশ খুশি লাগছে নিজের উপর। সে এসেছিলো তার মনোনীতাকে—একা পেতে ততটা নয়—তাতে আর তেমন লাভ কী?—আর সেটা-তো একটু বেশি পরিমাণেই সহ্য করতে হবে পরে—যতটা বাড়িতে, অসময়ে, অতর্কিতে দেখতে, যতটা সম্ভব

অপ্রস্তুত অবস্থায়। কিন্তু বাস্তব তার আশাকে ছাড়িয়ে গেছে, কেননা সে ভাবতেই পারেনি যে সত্যি দেখতে পাবে এমন ক'রেই, এতটাই আসাজা, আমাজা, যেমন-তেমন। একবার একটি নাচিয়ে মেয়ের সঙ্গে আলাপের একটু সূত্রপাত হয়েছিলো তার, পার্টি আলো ক'রে আছে ফুটফুটে পরিটি; কিন্তু সেই মেয়েকেই একদিন সকালবেলা বাড়িতে দেখে প্রায় চিনতেই পারেনি, মনে হয়েছিলো অন্য মানুষ; শুধু-যে গায়ের রং কালো তা নয়, নাক-চোখ পর্যন্ত আলাদা যেন। আবার, আরো-একটু উঁচু ঘরের এমন মহিলাও সে দেখেছে, যাঁদের বাইরের চেহারা আর বাড়ির চেহারা প্রায় একই রকম; সত্যি তাঁরা দেখতে কেমন—যদি সত্যি ব'লে কিছু থাকে—তা বোধহয় ঈশ্বর ছাড়া—যদি ঈশ্বর ব'লে কিছু থাকে—কেউ জানে না। মজুমদার অবশ্য আগেই জেনেছিলো যে বিজনের বোন এই দু-দলের কোনো দলেই পড়ে না, কিন্তু এটা জানতো না, এটা সে ধারণাও করতে পারেনি যে আজকালকার কোনো ভদ্রমহিলা একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করবার আগে চুলে একবার চিরুনিও চালায় না, মুখে একবার পাউডরও বুলোয় না, যেমন ছিলো তেমনি বেরিয়ে আসে কুঁচকোনো আধ-ময়লা শাড়িতে। কথার ফাঁকে-ফাঁকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখছিলো: ছোটো-ছোটো কোঁকড়া চুল পাখার হাওয়ায় উড়ে-উড়ে পড়ছে কপালে; মুখখানা একটু লালচে-কালো, ঘামলে যে-রকম হয়—ভিতরের ঘরে পাখা নেই নাকি?—আঙুলে কালির দাগ—লিখছিলো?—ফাউন্টেনপেন নেই?—শাড়িটা নেহাৎ বেচারা-গোছের, আর ব্লাউজটা—আঁচল-ঢাকা হ'লেও কড়া চোখে ধরা

পড়লো—ব্লাউজটা শস্তা পপলিনের, তাও ফিট করেনি ঠিক, বোধহয় স্বহস্তেই প্রস্তুত। সাধারণ, একেবারেই সাধারণ ; এ-রকম দু-চার লক্ষ পাওয়া যাবে এই মুহূর্তে এক কলকাতাতেই···তা-ই কি? কপালে-ওড়া কোঁকড়া ছোটো চুল, মুখ, চোখ, হাসি—অনিচ্ছার ঐ আবছা একটু হাসি—আর খালি, শাদা, পাৎলা পা দুটি বেশ-তো মানিয়েছিলো মেঝের উপর, ঐ বাজে মেঝেতেই ও-রকম, আর শাদা-আর-ছাইরঙা মার্বেল-মেঝে হ'লে?···বড্ড ঘরোয়া আজকালকার হিশেবে, এক-এক সময় ছেলেমানুষ, কোনো খবর রাখে না পৃথিবীর, বাইরের ব্যাপার কিছুই বোঝে না ;—তা—ভালোই তো। মজুমদারের এতক্ষণে সন্দেহ হ'লো যে আবছা আলোর ঐ ঘরটিতে এই ঘোরদুপুরের সময়টুকু তার ভালোই কেটেছে, ভালো লেগেছে তার, যেমন ভালো লাগছে এই আগুন-তাতা দুপুর-গাড়ি থেকে জল-সবুজ কোঁকড়া পুকুরটাকে পার্কস্ট্রীটের মোড়ে। এই ভালো লাগাটা ভালো লাগলো না মজুমদারের, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণার সঙ্গে মেলে না এটা, একটু-যেন শ্রদ্ধা ক'মে গেলো নিজের উপর। তবু, কমলা আলো সবুজ হবার সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ো রোড ধ'রে ড্যালহুসি স্কোয়ারের দিকে এগোতে-এগোতে আবার তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মেঝেতে পাতা পাৎলা শাদা পা দুটি ; আর ঠিক তখনই সেই পা দুটি ঢুকলো স্যাণ্ডেলে, বেরোলো রাস্তায়, চললো তাড়াতাড়ি, পেরোলো গলি, থামলো গলি-মোড়ের চিঠিবাক্সের সামনে। লাজুক কথা অন্ধকারে লুকোলো, আকাশে উড়লো ছোট্ট লাজুক হালকা-নীল পাখি।

সে-চিঠি যখন পৌঁছলো, সত্যেন রায় ব্যস্ত ছিলেন হিলভিউ হোটেলের আফটরনূন টী-র প্রতি যথাসাধ্য সুবিচারের চেষ্টায়।... চেষ্টায়? তবে কি পাহাড়-পাড়ার নামডাক মিথ্যে, না কি সত্যেন রায়েরই স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছে না? না; সে-বছরের সেই গ্রীষ্মে, বর্ষা নামার আগের মাসটিতে, পৃথিবীর মধ্যেই স্বাস্থ্যকরতার একটা প্রাইজ নিতে পারতো শিলং; আর সত্যেন রায়, যৌবনের চূড়ায়, শান্ত, সমতল, উচ্চাশাহীন জীবনের স্বাধীনতায়, শিলঙের গুণপনাকে এমন ক'রেই আত্মসাৎ করতে পেরেছিলেন, যেমন বোধহয় আর-একজনও পারেনি সে-বছরের হাজার দেড়েক গ্রীষ্ম-প্রবাসীর মধ্যে। জীবনে কখনো এর চেয়ে ভালো ছিলেন না তিনি; এতই ভালো, যে হিলভিউ হোটেলের আফটরনূন টী-টাও প্রায় পুরো পাওনাই আদায় ক'রে নিচ্ছিলো তাঁর কাছে। আর নেবেই-বা না কেন; টী যখন, চা নিশ্চয়ই আছে; আর তৈরি পেয়ালার বদলে টী-পটের সুবিধেটাও তিনি জুটিয়েছিলেন—অবশ্য বিনামূল্যে নয়—আর যদিও রান্নাঘর থেকে তাঁর ঘরে পৌঁছতে-পৌঁছতে টী-পটসুদ্ধু তাপ হারাতো, আর—যদিও দেশটাই চায়ের, কিংবা সেইজন্যই—চা-পাতাটাও ঠিক পয়লানম্বরি নয়—তবু চা তো, আর নাম যখন বিকেল-চা, শুধু চা-ই নয়; সঙ্গে লুচি, আলুভাজা আর ফল-টল;—লুচি অবশ্য চামড়ামতো, আলুভাজা ন্যাতার মতো, আর ফল মানে হচ্ছে শনিপুজোর শিন্নির মতো কুচি-কুচি কলা আর শশা, কি বড়ো জোর চাক-চাক টক-টক বুনো আপেল। তা যা-ই হোক, এ নিয়ে খুব বেশি নালিশ ছিলো না সত্যেন রায়ের; নালিশের বাধা ছিল তাঁর স্বভাবে, আর প্রতিকার

ছিলো যকৃতের সক্রিয়তায়; ঐ টী-পটটার জন্যই তিনি কৃতজ্ঞ, আরো কৃতজ্ঞ একলা একটা ঘর পেয়েছেন ব'লে: ঘর মানে অবশ্য—তা এর বেশি লাগবেই বা কিসে, আর প্রায় সারাদিন তো বাইরে-বাইরেই—; উঠতে হয় কাঠের সিঁড়ি বেয়ে, একমাত্র জানলাটিকে বন্ধ করলে ফাঁপর আর খুলে রাখলে বরফ, হোটেলের আসল বাড়ি থেকে আলাদা ব'লে ইলেকট্রিক আলোও নেই, কিন্তু এর কোনোটাই তেমন অসুবিধে লাগে না তার এখনকার বাসিন্দার, সুবিধেই বরং, আর অসুবিধেও যদি লাগতো, যে-কোনো অসুবিধেই কি সুবিধে নয় তিন-চারজন জবড়জঙের সঙ্গে এক ঘরে রাত কাটানোর তুলনায়? বেশ প্রীত চিত্তেই অনতিতপ্ত চ[illegible] চুমুক দিচ্ছিলেন সত্যেন রায়; তাঁর এখনকার অবস্থাটাকেই কল্পন[illegible]'রে নিচ্ছিলেন কুইন্স হোটেলের উচ্চচূড়-চা ব'লে (হাঁটতে-[illegible]তে চোখে পড়েছিলো একদিন);—আর সত্যি-তো, কুইন্স [illegible]টেল হ'লেও সুখ কি আর বেশি হ'তো এর চেয়ে? একা আছি, [illegible]মে আছি, মন খেলাবার ভালো-ভালো ভাবনার অভাব নেই: আর-কী চাই?

আর-কিছু চাই না, কিন্তু আরো কিছু হ'লে আরো বেশি সুখী-যে হওয়া যায়, সেটা প্রমাণ হ'লো একটু পরেই। খাসিয়া চাকর চিঠি এনে তাঁর সামনে রাখলো, রেখেই চ'লে গেলো; আর ওটুকু সময়ের মধ্যেই একটুমাত্র তাকিয়ে স্পষ্ট জানালো যে বার-বার কাঁধসিঁড়ি বেয়ে-বেয়ে এই খুচরো অথচ বিশেষ কাজগুলোর সঙ্গে সমান মাপেই যেন বখশিষ ওঠে বাবুর হাতে এখান থেকে চ'লে যাবার সময়।

টাটকা-গরম তোস-রুটি বলো, ভাঁজ-না-ভাঙা খবর-কাগজ বলো, নতুন-কেনা পাতা-না-কাটা বই বলো, চায়ের সঙ্গে চিঠির মতো কিছু না। হোক সকালে, হোক বিকেলে, হোক যে-কোনো-রকম চা আর যে-কোনো লোকের চিঠি—বই-দোকানের বিল হ'লেও আপত্তি নেই—শুধু পোস্টকার্ড না-হ'লেই হ'লো। আর যদি হয় এমন কারো চিঠি, যাকে—ভালো লাগে ; এমন-কোনো চিঠি, যা—ভাবতেই ভালো লাগে,…চা-পেয়ালা নামিয়ে চিঠিটা হাতে নিলেন সত্যেন রায়, একবার উল্টিয়ে দেখলেন, আর-একবার আলোর দিকে তুলে দেখলেন, যেন নেড়ে-চেড়েই ভিতরটাকে চেখে নেবেন একটু ; তারপর খাম খুলে এক নিশ্বাসে প'ড়ে নিয়ে চিঠিটা হাতে রেখেই আর-এক হাতে পেয়ালা তুলে একটু লম্বা মাপেই চুমুক দিলেন চায়ে, আর সঙ্গে-সঙ্গেই মুখ-চোখ বিকৃত হ'লো—ছি! একদম জল!—জল-চায়ের ঢোঁকটাকে খুক ক'রে গিলে ফেলে মন থেকে চা-চিন্তা সরিয়ে দিলেন তখনকার মতো ; আবার আস্তে-আস্তে থেমে-থেমে। পড়লেন চিঠি ; চিঠিশেষের নামের উপর চোখ রাখলেন একটুক্ষণ স্বাতী—স্বাতী মিত্র। নামটি ঝংকার দিলো প্রোফেসরের মনের মধ্যে, সেই হলদে-লাল সূর্যাস্তে প্রথম যেমন শুনেছিলেন। সুন্দর নাম। ছোটো-ছোটো দুটি কথা, সমান ওজনের, নরম একটু অনুপ্রাস ; সবসুদ্ধু হালকা, আবার সেই সঙ্গে গম্ভীরও ; লিখলে ভালো দেখায়, বললে ভালো শোনায়।…তাই-তো, তবে কি আমি এই নাম নিয়ে এতই ভেবেছি?—এই বিষয়টাকে যত রকম ক'রে ভাবা যায়, কিছুই-তো বাকী রাখিনি মনে হচ্ছে!… কিন্তু—হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি লাগলো শরীরে—অবাক লাগলো

যে এত ভেবেও এই আসল কথাটাই এখনো ভাবেননি যে এ-নামটা কাঁচা, অস্থায়ী, বলতে গেলে মিথ্যে। ঐ ছন্দে-বসানো ছিপছিপে 'মিত্র'কে সরিয়ে দিয়ে অন্য-কেউ কায়েমি হবে একদিন ;—একদিন কেন, শিগগিরই—খুব-যে তার দেরি নেই সেটা নিশ্চিতই।

এই নাম-বদলের ব্যাপারটা সত্যেন রায় ঠিক পছন্দ করলেন না। চিঠিটা খামে, আর খামটা পকেটে ঢুকিয়ে একটু ক্ষিপ্রভাবেই উঠে পড়লেন, চায়ের বাসনগুলো সরিয়ে রাখলেন তক্তাপোশের তলায়, সেই তলা থেকেই টেনে আনলেন স্যুটকেস, তালা খুলে বের করলেন একটা পরিষ্কার রুমাল, বন্ধ ক'রে আবার ঠেলে দিলেন ভিতরে, উঠে দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিঠ থেকে তুলে কালো রঙের আলোয়ানটি গায়ে জড়ালেন, হঠাৎ একটু থেমে মনিব্যাগের ভিতরটাতেও উঁকি দিয়ে নিলেন একবার। এই কাজগুলির প্রত্যেকটিতেই প্রকাশ পেলো তাঁর পরিচ্ছন্নতার অভ্যাস, জীবন-যাপনের ধীর লয়ের সমতা ; কিন্তু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে তাঁর নিজেরই মনে হ'লো যেন একটু তাড়াহুড়ো করছেন, বিরক্ত হ'লে মানুষ যেমন করে, কিংবা যেন কারো সঙ্গে দেখা হবে—কিন্তু কারো সঙ্গেই তো না।

বেশি দূর হাঁটলেন না ; প্রথম যে-জায়গাটা মনে হ'লো সহনীয়রকম নিরিবিলি, সেখানেই পাইনতলায় ব'সে পড়লেন। সুন্দর—যে-কোনো জায়গাই সুন্দর এখানে—কিন্তু এই প্রথম, বোধহয় জীবনেই প্রথম—প্রকৃতির লীলাখেলা তেমন-যেন রুচলো না। পার্বত্য দৃশ্য ছাড়াও অন্যরকম লীলাখেলা আছে প্রকৃতির : সেইটে কেড়ে নিলো মন। সেদিন ব'সে-ব'সে জীবনের কোনো

তত্ত্ব ভাবলেন না, জীবনটাকেই ভাবলেন, নিজের জীবন—যেটা, তাঁরই বিবেচনায়, নিতান্তই অযোগ্য বিষয়, কেননা নিজের কথা বড্ড বেশি ভাবে তারাই, যাদের মন অন্য কোথাও পৌঁছতে পারে না, অর্থাৎ যারা বোকা, মূর্খ, কিংবা অসুখী।

প্রথম দুই শ্রেণীর কোনো-একটির অন্তর্গত ব'লে নিজেকে ভাবতে চাইলো না সত্যেন, মন দিলো তৃতীয়টিতে।

কিন্তু নিজেকে অসুখী ব'লে কখনোই তো সে ভাবেনি এ-পর্যন্ত। বরং উল্টো : জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর এ-ধারণাই তাকে উপহার দিয়েছে যে ভাগ্যের বিশেষ-একটু পক্ষপাত আছে তার উপর। মা যখন মরেছিলেন—জীবনের এই পরিচ্ছেদটায় ছাত্রীর সঙ্গে বেশ মিল আছে তার—তখন সে এতটা বড়ো যাতে মা না-থাকলেও বেঁচে থাকতে খুব বেশি অসুবিধে হয় না, আর এতটা ছোটো যাতে আঘাতটা আস্তেই লাগে। বাবা আর বিয়ে করলেন না, উল্লেখ-যোগ্য অন্য-কিছুও করলেন না জীবন ভ'রে। কম খরচে, কম রোজগারে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালেন ছেলেকে নিয়ে, তারপর শান্তিনিকেতনে দিলেন, আর ছেলে যখন ম্যাট্রিকুলেশনে স্কলারশিপ পেয়ে কলকাতায় পড়তে এলো, তখন থেকে বাসা নিলেন ধলেশ্বরীর ধারে দেশের বাড়িতে ; প্রচুর পরিশ্রম ক'রে গ্রামে এক লাইব্রেরি বসালেন ; তারপর সেই লাইব্রেরিতে রোজ দু-খানা খবর-কাগজ প'ড়ে আর যে-কোনো ইচ্ছুক কিংবা অনিচ্ছুক শ্রোতার কাছে বিবিধ রাষ্ট্রিক, সামাজিক, আন্তর্জাতিক সমস্যার উত্তম বিশ্লেষণ ক'রে দিন কাটাতে লাগলেন মোটের উপর মন্দ কী। সবচেয়ে ইচ্ছুক, সবচেয়ে সোত্তর শ্রোতা অবশ্য তাঁর ছেলেই ; আর আস্তে-

আস্তে নিতান্তই শ্রোতার পর্যায়ে সে আর রইলো না, নিজেরও দু-একটা কথা বলবার হ'লো ; বাবা, তাই, একটু ব্যগ্রভাবেই তাকাতে লাগলেন ছেলের ছুটি-হওয়া বাড়ি-আসার দিকে। খুব ইচ্ছা করেছিলেন ছেলে হবে ইতিহাসের পণ্ডিত, কিন্তু সত্যেন পছন্দ করলো ইংরেজি সাহিত্য, তবু তাঁর ইচ্ছাটাকেও সম্মান জানালো তার অনার্সের একশো টাকার প্রাইজ থেকে কয়েকটি বাছা-বাছা মোগল ইতিহাসের বই বাবাকে পাঠিয়ে—যেহেতু মোগল আমলটাতেই তাঁর আগ্রহ বেশি। এই-যে প্রথম সে বাড়িতে কিছু পাঠালো তাও নয় : আই. এ. পড়তে-পড়তেই সে ট্যুশনি ধরেছে, স্কলারশিপ তো আগাগোড়াই আছে ; এমন দিনের নাগাল পেতে, তাই, খুব দেরি তার হ'লো না, যখন কলকাতায় নিজের খরচ নিজে চালিয়ে বাবাকে ছোটোখাটো মনিঅর্ডরও সে পাঠাতে পারলো। সংক্ষেপে থাকতে শিখেছিলো বাবার কাছে ; কলকাতায় ছাত্রজীবনে যে-সব অভ্যাস সংগ্রহ ক'রে অনেকেই উপস্থিত সুখের অনুপাতে ভবিষ্যতের দুঃখ জমায়, তার একটাও টানতে পারলো না তাকে, সিগারেট পর্যন্ত ধরলো না ; আর সেইজন্য সহপাঠী আর সমবয়সী অনেকেরই তুলনায় গরিব হ'য়েও অর্থাভাবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটলো অনেকেরই তুলনায় নামমাত্র। একমাত্র বাজে খরচ ছিলো বই কেনা—বাজে নয় অবশ্য, খুব বেশি-রকমই কাজের—কিন্তু কোনো-একটা বই নিজে কিনতে না-পারলেও খুব দুঃখ নেই, কলেজের লাইব্রেরিতে, কিংবা অন্য কোথাও পাওয়া যাবেই—আর জীবনের অধিকাংশ বই তো ধার ক'রেই পড়তে হয় মানুষকে। না, টাকার কষ্ট সে পায়নি ; এমন একটা দিনের

কথাও, সত্যি বলতে, সে মনে করতে পারে না, যেদিন টাকা নেই ব'লে এমন-কোনো অসুবিধে ভোগ করেছে যেটা সহ্য করা তার পক্ষে সহজ হয়নি।

বাবা মারা গেলেন এম. এ. পরীক্ষার ক-মাস আগে। একটু হঠাৎই। তবু পৌঁছতে পেরেছিলো ঠিক সময়ে, মানে, শেষ সময়ের একটুখানি আগে। বড্ড ফাঁকা লেগেছিলো প্রথমটায়, আর, একটু অন্যায়ও;—কী-ই বা বয়স বাবার—এই-তো সেদিন চল্লিশ পেরোলেন। আর, বলতে গেলে, এই দু-জনই তো আমরা ছিলাম।—কিন্তু বেঁচে থাকার আপাতচিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে বাবাদেরই তো ছুটি হয় আগে, মানে, সেটাই উচিত, আর উচিতটাই ভালো। আমার এখন যে-রকম লাগছে, এর চাইতে অনেক, অনেকগুণ খারাপ লাগতো বাবার, যদি আজ আমি ম'রে যেতাম আর তিনি থাকতেন। যদি, ধরো, মৃত্যুর কোনো দূত এসে আমাকে বলতো, 'এক্ষুনি চলো আমার সঙ্গে, নয় তোমার বাবাকে ধ'রে নিয়ে যাবো'—আমি তাহ'লে কী বলতাম? বলতাম কি, 'আমি যাচ্ছি, বাবাকে ছেড়ে দাও?'—না, সেটা বোকামি হ'তো, বিশ্রী নিষ্ঠুর হ'তো বড্ড। অবশ্য আরো দশ, কুড়ি, তিরিশ বছরও বেঁচে থাকতে পারতেন—কিন্তু তারই বা অর্থ হ'তো কী, কী ছিলো তাঁর জীবনে? কী ছিলো তাঁর জীবন!··· বাবার জীবনে খুব একটা উজ্জ্বলতা সত্যেন দেখতে পায়নি কখনোই, কেননা নিজের মনে মা-র জন্য কোনো অভাববোধ যদিও সে বহুকাল ভুলে গেছে, তবু সব সময় বাবার জন্য কষ্ট পেয়েছে মা নেই ব'লে। মনে-মনে এটা সে পরিষ্কার বুঝেছিলো

যে মাতৃহীন যুবকের প্রায় কোনো দুঃখই নেই, প্রায় সব দুঃখই আছে বিপত্নীক প্রৌঢ়ের।

এ-সব চিন্তা দিয়ে চোখের জলকে ঠেকিয়ে রাখলো সত্যেন, তা থেকে একটু তেতো-মতো সান্ত্বনাও নিংড়ে বের করলো। আর তার পরের দিনগুলিতে তার মুখ ভ'রে খোঁচা-খোঁচা দাড়ির মতোই আরো অনেক চিন্তা গজিয়ে উঠলো মনের মধ্যে; অদূরবর্তী পরীক্ষাটা তাকে শক্তি দিলো; মন-খারাপের সময় কই, এম.এ.টা ভালো না-হ'লে কিছুই হ'লো না। কেননা নিজের সম্বন্ধে দুটি, আর দুটিমাত্র, স্পষ্ট সিদ্ধান্তে সে অনেক আগেই পৌঁচেছিলো: প্রথমত, জীবিকার জন্য প্রোফেসরি ছাড়া আর-কিছুই তার করবার নেই; আর দ্বিতীয়ত, থাকবারও তার আর-কোনো জায়গা নেই কলকাতা ছাড়া। ছাত্রজীবনের ক-বছরেই সে বুঝেছিলো যে কলকাতায় প্রতিযোগিতা তীব্র, শক্তিশালীরা নির্বিবেক, আর কর্তৃপক্ষ সাধারণতই স্বজনবৎসল; রোগা ডিগ্রি নিয়ে কলেজঘাটে ভিড়তে পারে শুধু তারাই, জন্মটা যাদের জোরালো। কিন্তু তার পরিচয় যেহেতু মাত্র তার নিজের নামটুকুতেই শেষ, আর আরম্ভও সেইখানেই, সেইজন্য সেটুকুতে কোনোরকম খুঁত থাকলে তার চলবেই না। আরো ভাবতে-ভাবতে আরো দেখতে পেলো যে বাবা থাকতে তার জীবনের যে-গড়ন ছিলো এখনো তা-ই আছে, আর বাবা থাকলে তার জীবনের যে-গতি হ'তো, এখনো তা-ই হবে; বাবা না-থেকে বলবার মতো কোনো বদল তো ঘটালেন না। মা-ছাড়া বাড়িতে, উদাসীন বাবার সংসর্গে আবাল্য সে স্বাবলম্বী; আর অন্য অর্থেও স্বাবলম্বী হ'তে পেরেছিলো প্রায় সতেরোর পর

থেকেই ; তার জীবনটা, বলতে গেলে, এখন পর্যন্ত কেটেছে বিবিধ হস্টেলে আর বাবার এই বাড়িতে ভাগাভাগি ক'রে—আর এ-বাড়িও তো অন্য একরকম হস্টেলই— ; তার জীবনটা যে-রকম চলছিলো, চলবে, চলতে পারে, তার কোনোই নড়চড় হ'লো না ; শুধু এটুকু তফাৎ হ'লো যে বছরে তিনবার ক'রে এই গ্রামে আর আসতে হবে না তাকে। আর এটা অবশ্য সুবিধে ব'লেই লাগলো তার মনে, মস্ত সুবিধে, কেননা সত্যেন পল্লীপ্রেমিক নয়, দেশ-প্রেমিকও না ; সে নিশ্চিত জানলো যে এই বাড়িতে, গ্রামে আর-কোনোদিন সে ফিরবে না, আর জানতে পেরে যেন গুমোট-ভাঙা হাওয়া দিলো মনে। এতদিন সে শুধু স্বাবলম্বী ছিলো ; এতদিনে স্বাধীন হ'লো। বেড়াতে পারবে, টাকায় যতটা কুলোয় যেখানে ইচ্ছে যেতে পারবে প্রত্যেক ছুটিতে, আর-কোনো বাধা নেই, ভাবনা নেই। শেষের কথাটা ভাবতে দীর্ঘশ্বাস পড়লো ; কিন্তু শ্রাদ্ধ চুকিয়ে, সেই মোগল ইতিহাসের বই ক-খানা, আর অন্য যা খান পাঁচ-সাত বই ছিলো বাবার, সব তার হোল্ডলে ঢুকিয়ে, বাবার বিয়েতে-পাওয়া এখন ফুটোওলা শালখানা স্যুটকেসের সব-তলায় বিছিয়ে, গোছগাছ শেষ ক'রে সে যখন তার মাথাটার মতোই ন্যাড়া একটা তক্তাপোশে চুপ ক'রে বসলো, তখন দীর্ঘশ্বাস ফিরে এলো না।

জ্ঞাতিসম্পর্কের জ্যাঠামশাই এসে বললেন, 'কী হে, আজই যাচ্ছো ?'

'আজই যাচ্ছি।'

'সত্যি—কী-একটা কাণ্ডই হ'লো—নরেন যে এ-রকম হঠাৎ—

তা—' গলা নামিয়ে, যদিও এই সতর্কতা সেখানে একেবারেই অনর্থক—'তা কিছু রেখে-টেখে গেছে তো ?'

'আমাকেই রেখে গেছেন,' জবাব দিলো সত্যেন।

'সে-তো দেখতেই পাচ্ছি,' কথায় হার মানলেন না জ্যাঠা-মশাই। 'কিন্তু তোমার জন্য রেখে গেলো কী ?'

সত্যেনের মুখে এলো, 'সমস্ত পৃথিবীটা।'—কিন্তু সামলে নিলো পাছে ওঁর কানে ফাজলেমি শোনায়; আর-কোনো জবাবও মনে এলো না; অভ্যেসমতো চুলে হাত বুলোতে গিয়ে ন্যাড়া মাথার খশখশে ছোঁওয়ায় অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'লে ফেললো, 'আমার তো দরকার নেই কোনো।'

'শোনো কথা!—দরকারের জন্যই কি সব, আর দরকারের তুমি কতটুকু জানো হে এখনো!—তা তোমার এই বাড়ি, আর জমিজমা—' সত্যেনের ঠোঁট-বাঁকানো অবজ্ঞা লক্ষ্য ক'রে আরো বেশি অবজ্ঞা জানিয়ে হাসলেন একটু—'এমন মন্দই-বা কী, শো-তিনেক টাকা আয় হবে বছরে—এ-সবেও কি কোনো দরকার নেই তোমার ?'

'আমি-তো সত্যি ভেবে পাই না,' সত্যেন একটু ভেবেই বললো, 'এ-সব আমার কোন কাজে লাগবে।'

'তাহ'লে এক কাজ করো,' জ্যাঠামশাই গম্ভীর হলেন। 'বেচে দাও—আমিই কিনে নিতে পারি বলো তো।'

কিনে আবার নেবেন কী—' সত্যেন একটু চপলভাবেই হেসে উঠলো—'আপনার কোনো কাজে লাগে তো লাগবে।'

জ্যাঠামশাই ভুল বুঝলেন কথাটা, মনে-মনে ভাবলেন ছেলেটার

বিষয়বুদ্ধি-যে একেবারেই নেই তা কিন্তু নয়। তাতে অখুশি হলেন না, বেশ-একটু নরম সুরেই বললেন, 'বুঝেছো তো—মেয়েটা বিধবা হ'য়ে এলো—অতগুলো কাচ্চাবাচ্চা—তাই ভাবছিলাম ওর মাথার উপর একটা চাল অন্তত—'

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—এখানে যদি ওঁর সুবিধে হয়—'

'অসুবিধে তো তোমার—আসবে-টাসবে তো মাঝে-মাঝে ?'

মোলায়েম হাসিমুখে সত্যেন জানালো, 'আমি আর আসবো না।'

'না, না, আসবে না কেন, আসবে বইকি—আরে আমরা তো আছি—আর তুমি হ'লে এ-গ্রামের গৌরব। অবশ্য ভেবো না যে বড়ো-বড়ো স্কলার আর হয়নি এখানে—' তমালপুরের মৃত ও জীবিত কীর্তিমান রায়চৌধুরীদের উপাধি ও বৃত্তির বিবরণ সোৎসাহে আবৃত্তি করলেন তমালপুরের অন্যতম অনতিকৃতী রায়চৌধুরী : সত্যেন শুনলো যে তার জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে আছেন কিংবা ছিলেন দু-জন প্রিন্সিপাল (একজন তাঁদের গটিনজেনের ডক্টর), একজন ডেপুটি-পোস্টমাস্টার-জেনরেল, একজন এক্সিকিউটিভ এঞ্জিনিঅর, লাহোরের ডেইলি নিউজ-এর এডিটর একজন, ভাইসরয়ের বাগান-বাড়ির হর্টিকলচরিস্ট একজন, আর ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট একগণ্ডা :—কোনোটাই যেন নতুন লাগলো না, যেন আগেও শুনেছে বারকয়েক, তবু মুখে-চোখে সচেষ্ট মনোযোগ জীইয়ে রাখলো।—'তোমার কাছেও তমালপুর অনেক আশা করে হে!' ব'লে জ্যাঠামশাই কথা শেষ করলেন।

'আমাকে না-হ'লেও বোধহয় তমালপুরের চলবে,' সত্যেন

মনে-মনে বললো, 'আর আমিও বোধহয় তাতেই ভালো থাকবো।'

শিলঙের হালকা হাওয়ার বিকেল-ছায়ায় ব'সে-ব'সে চার বছর আগেকার সেই দিনটিকে যেন জ্যান্ত ক'রে অনুভব করলো সত্যেন : হেঁটে-হেঁটে স্টিমার ঘাটে আসার সময় ঘাড়ের উপর গরম রোদ্দুর আর স্টিমারের সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় একটা ভিজে-ভিজে ধোঁয়ার গন্ধ। ভালো লাগছিলো তার ; মাত্র ক-দিন আগে যে-ছেলের বাপ মরেছে তার পক্ষে হয়তো একটু অন্যায়রকমই ভালো। সত্যি স্বাধীন লাগছিলো তমালপুর ছাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে, সত্যি সুখী লাগছিলো তমালপুরে আর ফিরতে হবে না ব'লে। জায়গাটা কোনোদিনই সে পছন্দ করেনি ; এমনকি, বাবা-যে পছন্দ করেছিলেন সেটাও পছন্দ করতে পারেনি। ওখানকার সকলেরই—তার বাবারও—মনের সেই ভাবটাতে খোঁচা খেয়েছে ছেলেবেলা থেকেই, মনে-মনে যার নাম সে দিয়েছিলো তমালপুরাত্মবোধ কিংবা রায়চৌধুরীচেতনা। প্রতিবাদ জানিয়েছে কলেজে ভরতি হবার সঙ্গে-সঙ্গে নামের 'চৌধুরী'টাকে তালাক দিয়ে, ওখানে গিয়ে যথাসম্ভব কম মেলামেশা ক'রে ; আর প্রতিশোধ নিয়েছে কেউ 'দেশ' কোথায় জিগেস করলে ঝাপসা জবাব দিয়ে। দেশ! দেশ মানে কী? সে-যে ওখানকার, ওটা-যে তার 'দেশ', এ-তো তার মনের হাজার মাইলের মধ্যে নেই ; ওখানে বিশ্রী লাগে তার, ওটা তার প্রতিকূল, বাবাকে ছাড়া একটুও আপন লাগেনি আর-একজনকেও। পৃথিবীতে এত ভালো-ভালো জায়গা থাকতে ঐ দম-আটকানো তমালপুরটাই তার 'দেশ'! কী আশ্চর্য কথা!...

কান পেতে স্টিমারের ঝকাঝক শুনলো একটু, শুনলো দূরত্বের আশা ; চোখ তুলে তাকালো জলভরা দূরত্বের দিকে, দেখলো দিগন্তের আশ্বাস।

বাবা মরবার পরেই খানিকটা অসুখী লাগতে পারতো, কিন্তু তাও যখন তেমন লাগলো না, সত্যেন প্রায় ধ'রেই নিলো যে অসুখী অবস্থার সঙ্গে চেনাশোনা তার হবেই না। আর তার জীবনও তার এ-ধারণার খোরাক যোগালো ; যেমন সে ভেবে নিয়েছিলো ঠিক-ঠিক তা-ই হ'লো পর-পর ; তার এম. এ. পরীক্ষায় পূর্ব-ইতিহাসের বাঞ্ছিত পুনরাবৃত্তিই ঘটলো, চাকরি জোটাতেও হিমশিম হ'লো না ; দেশ-বেড়ানোর শখ মেটাতে লাগলো, বিশেষ-বিশেষ বই পড়ার বাধ্যতার দায়টাকে জীবনের মতো চুকিয়ে দিয়ে সাহিত্যের স্বরাজ পেলো ; শুধু একটু কষ্ট হয়েছিলো হস্টেল ছেড়ে সাধারণ মেস-এ উঠতে, কিন্তু তাও তো শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচিয়ে দিলো টালিগঞ্জের গলির মধ্যে একতলার ঘর দুটো। নিশ্চয়ই মানতে হয় যে ভাগ্য তাকে নেকনজরে দেখেছে : সে যা চেয়েছে, সত্যি-সত্যি যা চেয়েছে তা সবই পেয়েছে এ-পর্যন্ত ; আর যা সে পায়নি তা সত্যি-সত্যি সে চায়ওনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের যিনি শিরোধার্য, তাঁর কাছে গিয়েছিলো চাকরির সুপারিশ আনতে। কলেজের নাম শুনে ঈষৎ নাক কুঁচকে তিনি বললেন, 'ওখানে কেন ?—বি. ই. এস.-এর চেষ্টা করো, পেয়ে যাবে।'

'আপাতত—'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ; কিন্তু এখন থেকেই উঠে-প'ড়ে লেগে যাও—

শিগগির একটা খালিও হচ্ছে কেষ্টনগরে। ডি. পি. আই.র কাছে একটা পার্সনাল চিঠি দেবো তোমাকে ?'

কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো সত্যেন। ঢোঁক গিলে, রুমালে মুখ মুছে, কোনোরকমে আওয়াজ বের করলো, 'আমি—কলকাতাতেই থাকতে চাই।'

'আহা—এখন যাও-তো, সময়মতো ধরাধরি ক'রে প্রেসিডেন্সিতে চ'লে আসতে কতক্ষণ! আর নয়তো—' যুবকের লজ্জা-লাল মুখের উপর একবার চোখ ফেললেন প্রৌঢ়, 'একটা রিসর্চ-ফেলোশিপ নাও আমার কাছে—টাকা ঐ কলেজের চাইতে কম হবে না—বেশিই সম্ভব—' একটু থামলেন, শ্রোতার মুখে ইচ্ছার ঝিলিমিলি দেখে নিয়ে আরো-একটু গম্ভীর গলায় বললেন—'এইটিন্থ সেঞ্চুরির শেষ দিকটাকে ধরো—ঐ পীরিঅডটা নিয়ে বেশি কিছু ওঅর্ক বিলেতেও হয়নি— খানিকটা তৈরি ক'রে পি. আর. এস.-এর জন্য দাও—তদ্দিনে লেকচারশিপ হ'য়ে যাবে—তারপর ঘোষ ফেলোশিপ নিয়ে লণ্ডনের পি.এইচ.ডি., আর তারপর—' বিশ্ববিদ্যার প্রধান পুরুষ নিজের অতীতের ম্যাপটাকেই মেলে ধরলেন চাকরি-চাওয়া ছোকরা-নবিশের ভবিষ্যতের সামনে—'তারপর আর কী।' তারপর-যে আর-কিছুই ভাববার থাকে না, সেইটে বোঝাবার জন্য হেলান দিলেন ইংরেজি-চেয়ারের চামড়া-পিঠে; সহৃদয়, সদয় একটু চোখ টিপে আবার বললেন, 'কিছু ভেবো না, আমি ঠিক চালিয়ে নিয়ে যাবো তোমাকে—ক্র্যাব-এর উপর কিছু নোট আছে আমার—' কথা শেষ করলেন না, আর তাতেই বুঝিয়ে দিলেন নোটগুলির মূল্য, আর শিষ্যের প্রতি তাঁর গুরুদাক্ষিণ্যের গুরুত্ব।

আশাতীত পাবার পর যেমন হয়, ঠিক তেমনি নীরব, নতমুখ, অভিভূত দেখলেন প্রার্থীকে, আর তাঁর এই তৃতীয় দৃষ্টিপাতে—যদিও সত্যেন দেখলো না—প্রায় পুত্রস্নেহ প্রকাশ পেলো। নিজের গুরুত্ব প্রায় ভুলে গিয়ে প্রায় মিত্রবৎ প্রশ্ন করলেন, 'ক্র্যাবকে তোমার কেমন লাগে?'

ক্র্যাব! ইংরেজিতে এত-এত কবি থাকতে জর্জ ক্র্যাব! সত্যেনের বলতে ইচ্ছে করলো, 'ক্র্যাব কে?'—প্রোফেসরের চোখে চোখ রেখে, শান্ত মুখে, গম্ভীর গলায় বলতে ইচ্ছে করলো কথাটা, ভীষণ ইচ্ছে করলো, মনের মধ্যে একটা ত্রাস উঠলো যে আর-একটুক্ষণ ব'সে থাকলে সত্যিই না-ব'লে আর পারবে না, তাই উঠে পড়লো হঠাৎ, বোকার মতো হাসলো, বেচারার মতো হাত ঘষলো, বান্দার মতো পিছে হাঁটলো, আর অধ্যাপক তৃপ্ত হলেন তার সর্বশরীরে কৃতার্থতার সর্বলক্ষণ লক্ষ্য ক'রে।

...সত্যি-তো, অবস্থা তাকে দয়া করেছে দরাজ হাতে। সবচেয়ে সুবিধে এইটে পেয়েছে যে সাংসারিক অর্থে সে একেবারেই একা। যেহেতু কলকাতায় এসেই সে বুঝেছিলো যে তার পড়াশুনোর খরচ বাবার পক্ষে একটু বেশি হ'য়ে পড়ছে, আর সেইজন্য প্রথম সুযোগেই দশটাকা-বারোটাকা মজুরিতে ছেলে-পড়ানোর বৌনি করেছিলো, তাই বাবার আনুষঙ্গিক অন্য-কিছু, যেমন, মা, ভাই, বোন, আর বিবিধ আত্মীয় এ-সব তার মনের উপর আশ্রয়ের ছায়া ফেলতে পারেনি;—ঠিক উল্টো: তার কাছে পারিবারিক সম্বন্ধ মানেই বন্ধন, ভার, স্বাচ্ছন্দ্যনাশ, কেননা এটা-তো অবধারিত যে কাছাকাছি অন্য-কোনো মানুষ থাকলে সে কিংবা তারা নিশ্চয়ই

নির্ভর করতো তারই উপর। যদি, ধরো, তার ছোটো ভাইবোন থাকতো কয়েকজন, তাহ'লে…? তাহ'লে-তো তাকে ঐ করতে হ'তো, বি. ই. এস.-এর সিঁড়ি ভেঙে-ভেঙে ঘুরতে হ'তো কেষ্টনগর রাজসাহী চট্টগ্রাম ; নয়তো জর্জ ক্র্যাবকে নিয়ে 'রিসর্চ' ক'রে ইউনিভার্সিটির কৃপা কুড়োতে হ'তো।…করতেই হ'তো এ-সব, হয়তো আরো অনেক-কিছু, যা ক্র্যাব কিংবা কেষ্টনগরের চেয়েও মারাত্মক। কোথায় থাকতো তার স্বাধীন জীবন, কোথায় থাকতো সাহিত্যস্বরাজ! তার সঙ্গে বি. এতে সেকণ্ড হয়েছিলো অসিত ঘোষ, এম. এ. বাদ দিয়ে আই. সি. এস. দিলো, হ'লো, এখন কোথায়-যেন অ্যাসিস্টেন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ; এম.এতে সেকণ্ড হয়েছিলো প্রাণতোষ বাগচী, সে কৃষ্ণনগরকে কৃচ্ছ্র নগর মনে করলো না, সেদিন বদলি হ'লো ঢাকায় ; আর অল্পের জন্য ফর্স্ট ক্লাশের ফাঁড়া কাটালো যে-ধীরাজ গুপ্ত, সে চ'লে গেছে দিল্লিতে রেডিওর প্রপাগাণ্ডার পাণ্ডা হ'য়ে। পুরোনো সহপাঠীদের কারো-কারো সঙ্গে এখনো তার দেখা হয় মাঝে-মাঝে ; তারা প্রত্যেকেই তাকে বলে, 'করছো কী হে—ঐ-একটা রদ্দি কলেজেই পচবে নাকি?' উত্তরে সত্যেন শুধু বলে, 'বেশ আছি।' কথাটা ভাণ নয়, স্তোক নয় ; সত্যি সে যা বিশ্বাস করে তা-ই সে বলে। কত ভালো আছে, কত সুখে আছে, তা কি এরা বোঝে না : কলকাতায় আছে, অল্প কাজ, লম্বা ছুটি, নিজের ছাড়া আর-কারো ভার নেই, বলতে গেলে কোনো ভারই নেই, কেননা তার নিজের খুব অল্পেই চ'লে যায়। কলেজে পায় একশো-কুড়ি টাকা, একটি (একটিই মাত্র) ট্যুশনি করে সেই সঙ্গে ; সবসুদ্ধ যা পায় তাতে ভেসে যায় তার, বই কেনা, দেশ

দেখা, সবসুদ্ধু ; এর বেশি আয় হ'লে তা নিয়ে কী করবে তা প্রায় ভেবে পাওয়াই মুশকিল। আর, আয় বাড়াবার কথাও অবশ্য ওঠে না ; যদি-না সে রাজী হয় অবসর বেচতে, স্বাধীনতা বিকোতে; আর তার কাছে যা আসল, সবচেয়ে যা মূল্যবান, তা-ই যদি না থাকলো, তাহ'লে অন্য কোনো-কিছুই কোনো কাজে লাগবে না তো।··· ঐ-তো হিলভিউ হোটেলেই আর-একজন আছেন কলকাতার প্রোফেসর, প্রবীণ, পরার্থপর, কেননা শিলঙের এই সোনার মতো সকালবেলার প্রত্যেকটিকে তিনি জবাই করেছেন বি.এ. পরীক্ষার খাতায় লাল পেন্সিলের খোঁচা দিয়ে-দিয়ে।···ভাগ্য তার, ম্যাট্রিকুলেশনের পরীক্ষক তাকে করেনি এখনো ; দরখাস্ত দিয়ে যাচ্ছে নিয়মমাফিক—নয়তো কলেজে ভালো দেখায় না—আর দিয়েই মনে-মনে বলছে, 'না-যেন হয়!'—আর যেহেতু আবেদনপত্রে নাম-সই ছাড়া এ-পর্যন্ত এ-বিষয়ে আর-কিছুই সে করেনি, তাই তার এই অনুক্ত প্রার্থনা নির্ভুলভাবে মঞ্জুর হ'য়ে যাচ্ছে নিয়মিত। যেটা না-হ'লে অন্যদের বাঁচা শক্ত, সেটা না-হ'লেই সে বাঁচে···না, আশে-পাশে এমন একজনকেও সে দেখতে পায় না, যার সঙ্গে জায়গা বদলাবার ইচ্ছা মুহূর্তের জন্যও তার হ'তে পারে।

এক হিশেবে একটু হয়তো স্বার্থপরতা, অন্য হিশেবে নিশ্চয়ই স্বার্থবোধের সাংঘাতিক অভাব—মানে সাংসারিক মূঢ়তা—দুটোই দেখতে পেলো সত্যেন তার মনের এই ভঙ্গিতে। কিন্তু তা-ই বা কেন? ভাই, বোন, অন্যান্য আত্মীয়, যারা আদৌ ছিলো না কিংবা নামে মাত্র ছিলো, তারা নেই ব'লে যদি তার ফাঁকা না লাগে, বরং হালকা লাগে, সেটা কি স্বার্থপরতা? পাঁচটা-সাতটা ভাই-বোন কি

পাতিয়ে নিতে হবে, যাতে সে অধমতম গরিব হ'তে পারে? আর মূঢ়তা—কিসের? যদি কোনো বিপদে পড়ে?—যেমন? শক্ত কোনো অসুখ হ'তে পারে, চাকরি যেতে পারে হঠাৎ, আরো কত কিছু হ'তে পারে—হয় তো অনেকের। কিন্তু—সত্যেন যতই ভাবলো—কিছুতেই নিজের কোনো বিপদে-পড়া অবস্থা কল্পনা করতে পারলো না; কিংবা—যতদূর ভাবতে পারলো—কোনো বিপদই বিপদ লাগলো না তার কাছে। ভয় কী—পাইন-হাওয়ার ঝিরঝিরানি তার কানে-কানে বললো, ভয় কী। পাতার ফাঁকে-ফাঁকে আকাশের নীল চোখও তা-ই বললো। কিছুতেই ভাবতে পারলো না যে তার এই একলা-অবস্থা মানেই অসহায় অবস্থা। ভালো আছে, বেশ আছে, খুব ভালো—এ ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলো না। একা ব'লেই ভালো। সেটাই—এইমাত্রই তার মনে হ'লো কথাটা—তার 'সবচেয়ে মূল্যবান,' তার জীবনের 'আসল,' আর এটাকেই সে নানা দিক থেকে আঁকড়ে থাকে, অবসর স্বাচ্ছন্দ্য কি স্বাধীনতার নাম দিয়ে। কলকাতার এই ন-বছরে অনেক-অনেক লোকের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে—তাকে পছন্দ করেছে অনেকেই, সে-ও উপভোগ করেছে অনেকের সঙ্গ; কেউ-কেউ কখনো-কখনো খুব কাছেও এসেছে, বন্ধু হ'য়ে উঠেছে—প্রায়। প্রায়; ঠিক বন্ধু কেউ হয়নি, একজনও না, ঠিক জায়গায় ঠেকিয়ে দিয়েছে—কিংবা নিজেই ঠেকে গেছে;—কিন্তু সেটাই সে চেয়েছে, এর বেশি হ'লে কী-যেন সে হারাতো, নিজেরই খানিকটা খোওয়া যেতো যেন।

…পকেটের মধ্যে চিঠিটার উপর একবার হাত রাখলো

সত্যেন। তার চিঠি? কে? ছাত্রী? ছাত্রীর সঙ্গে শিক্ষকের এ কী-রকম পত্রবিনিময়? বন্ধু? পঁচিশ বছরের পুরুষের সঙ্গে আঠারো বছরের মেয়ের বন্ধুতা? এ-বন্ধুতার পরিণাম সে কি প্রত্যক্ষ করেনি গল্পে উপন্যাসে হাজার বার? বিদ্বান, সুসংস্কৃত, বাক্‌নিপুণ—এমন কি সত্যিকার জ্ঞানী কিংবা গুণীও দু-একজন—যত পুরুষের সঙ্গে সে মিশেছে, তাদের একজনকেও ঠিক বন্ধু বানাতে পারলো না—পারলো না মানে চাইলো না—আর বন্ধু হ'লো কিনা এই কাঁচা, হালকা, কাঁপা-কাঁপা, প্রায় চোখ-না-তোলা, কথা-না-বলা একটুখানি মেয়ে!—শুধু মেয়ে ব'লেই?

বাড়ি তার স্ত্রীলোকবর্জিত—কিংবা বাড়ি ব'লেই কিছু নেই—তাব'লে দেখাশোনা-যে একেবারেই হয়নি তাও নয়। সহপাঠিনী ছিলেন কয়েকজন, বাছা-বাছা সহপাঠীর মা, বোন, বৌদি; ছাত্রাবস্থার শেষের দিকে কোনো-কোনো অধ্যাপকের স্ত্রী; এমনকি ডিগ্রির জোরে জ্বলজ্যান্ত যুবতীকেও বি. এ. পরীক্ষায় তরিয়ে দিতে পেরেছে নিজের বিপজ্জনক বয়সটা সত্ত্বেও। কিন্তু বিপদ সে কিছু ঘটায়নি, সে-রকম কোনো সম্ভাবনার প্রথমতম উঁকিঝুঁকিও দেখতে পায়নি নিজের মনে। ইচ্ছে করলেই ভাব জমাতে পারতো কোনো-কোনো তরুণীর সঙ্গে, চেষ্টা করলে (হয়তো খুব কঠোর চেষ্টাও না) এগোতে পারতো আরো;—কেন করেনি? যৌবনের মধুর ভীষণ জৈব ষড়যন্ত্র থেকে সে কি মুক্ত? তা কি হ'তে পারে! কখনও কি আকৃষ্ট হয়নি, লুব্ধ হয়নি, ইচ্ছুক হয়নি? তাও হয়েছিলো একবার। কিন্তু আরও প্রবল ছিলো তার নিজের নির্জনতার টান। তাই হারেনি।

তাহ'লে স্বাতী মিত্র আলাদা হ'লো কিসে? অন্যদের থেকে অন্যরকম হ'লো কেমন ক'রে?

স্পষ্ট মনে পড়লো কোলরিজ-পড়ানো কলেজ-ক্লাশের সেই সকালবেলা, প্রথম যেদিন চোখ রেখেছিলো তার মুখে। সেদিন ভালো লেগেছিলো—সেটা না-লেগেই পারে না—অনেকগুলি বিরুদ্ধ, পাশপ্রতিজ্ঞ ফাঁকামুখের মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় প্রাণের অনুকম্পন অনুভব ক'রে। তারপর···হ্যাঁ, কলেজেরই লাইব্রেরিতে··· আশ্চর্য এই আবিষ্কার সেদিন করেছিলো যে সাহিত্যের স্বাদ যাদের দিতে গিয়ে প্রতিদিন সে গভীর আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করে, তাদের মধ্যে এমন একজন অন্তত আছে যার কবিতার খিদে পেয়েছে। আরো আশ্চর্য এই কারণে—কেননা সত্যেন দেখেছে অল্প যে-ক'জন কবিতা পড়ে তারা সকলেই পুরুষ, মেয়েরা গল্পটল্পেরই মক্কেল—যে সে একজন মেয়ে। মেয়েটিকে একটুখানি মনে রাখার মতো মনে হ'লো সেদিন; কেননা তার নিজের উপর যাদের আগ্রহ, তাদের উপর তার আগ্রহ বরং কম, কিন্তু তার যে-সব বিষয়ে আগ্রহ, অন্য কারো সে-সবে আগ্রহ দেখলে সেই মানুষের দিকে আগ্রহ তার দৌড়ে ছোটে।

কিন্তু তাতে কী? সাহিত্য ভালোবাসে এমন মানুষ সে-তো এই প্রথম দেখলো না; তার মেলামেশার সমস্ত জগৎটাতেই একটু-না-একটু সাহিত্যের হাওয়া বয়। কী, তবে, নিজেকে প্রশ্ন করলে সত্যেন, কী তোমাকে টেনে আনলো স্বাতী মিত্রের এতটাই কাছে যে আজ তা নিয়ে এত ভাবনাই ভাবতে হচ্ছে? তার রূপ? তার বয়স? তার ভীরু, নরম, উষ্ণ, বিস্মিত নারীত্ব? না কি তার

উৎসাহ, উৎসুকতা, আনুগত্য, তার মনের মস্ত চমৎকার আচষা খেত, যেখানে তুমি মনের সুখে চালাচ্ছো পৃথিবীর বড়ো-বড়ো লেখকদের লাঙল ? আর-তো কারো মন-তৈরির ভার এমন ক'রে পাওনি।—আর এমন মন, যা তৈরি হবার যোগ্য, আর যার তৈরি হবারই সময়। আর তা-ই থেকেই কি কোনো-একদিন এ-কথা ভাবতেও শুরু করেছো যে এমন আর ছাখোনি, এমন মানুষ, এমন মেয়ে···? সত্যেনের চোখ বুজে এলো, দু-আঙুলে কপালের চামড়া টেনে ধরলো একবার।

দৈবক্রমে প্রতিবেশীও হ'য়ে পড়লো। আরো দেখা হ'লো, আরো ভালো লাগলো ; প্রথম-দেখাতেই ভালো লাগলো তার বাবাকে : আর যদিও সে নিজেকে এটুকু অন্তত অক্ষত রাখতে পেরেছে যে দেখাশোনাটা ঘন-ঘন হ'তে দেয়নি, তবু সমস্ত বাড়িটাকেই যেন সঙ্গী ক'রে নিয়েছিলো তার চলাফেরার। বাড়ি!—কথাটার অর্থ বুঝেছিলো বড়দির নিমন্ত্রণের দিন ; আর সেইদিনই জেনেছিলো পারিবারিক জীবনের আনন্দ। শুধু-যে বড়দি তাকে মুগ্ধ করলো তা নয়, শুধু-যে রাজেনবাবুর প্রতি একটা অস্ফুট, অস্পষ্ট, লজ্জা-পাবার-মতো ভালোবাসা অনুভব করলো তাও নয় ; সমস্তটা মিলিয়ে একটা সুষমা স্পর্শ করলো তাকে, সব যেন ছন্দে বাঁধা, সংগত, কোনো-এক হ'য়ে-ওঠা সম্পূর্ণতার গ'ড়ে-তোলা অংশ, এমনকি হারীতবাবুকেও বেসুরো ঠেকলো না শেষ পর্যন্ত ;—আর, সবচেয়ে বড়ো কথা, নিজেকে একবারও বাইরের লোক মনে হ'লো না সেই আত্মীয়মণ্ডলে। কলকাতার শহরে কোনো-কোনো বাড়িতে সে নিমন্ত্রিত হয়েছে কয়েকবার ; অনাদর পায়নি কোথাও,

সৌজন্য পেয়েছে সর্বত্র ; এমন আরাম, এমন একান্ত আরাম পায়নি আর-কখনো কোনোখানেই !—পরের দিন সকাল থেকেই আবার যাবার ইচ্ছা প্রবলভাবে চেতিয়ে উঠলো মনের মধ্যে, আর সেইজন্যই কিছুতেই গেলো না।

সেটা ভালোই করেছিলো, কিন্তু ভুল, মস্ত ভুল, ঘটিয়ে রেখেছিলো আগেই। কেন সেই চিঠি লিখেছিলো শান্তিনিকেতন থেকে ? কী সেই ইচ্ছা, চিন্তা, জল্পনা বা কল্পনা, যা তাকে তখনকার মতো দখল ক'রে সেই প্রথম চিঠি লিখিয়েছিলো ?···তারপর এবারেও আবার ! আর এই চিঠি লেখা—এটা তার একটা ব্যসন ছাড়া আর-কী ? সাহিত্য ভালোবাসে, কিন্তু নিজে লিখতে পারে না, তাই দুধের সাধ ঘোলে মেটায় মাঝে-মাঝে একে-ওকে লম্বা চিঠি লিখে। কিন্তু সেবারে শান্তিনিকেতনে ব'সে আর-কারো কথাই কি মনে পড়লো না অল্প-চেনা ছিপছিপে ছাত্রীটিকে ছাড়া ? ঐ বাধো-বাধো আধো-বলার মেয়েটির কাছেই কি ভাবোচ্ছ্বাসটি পাঠাতে হ'লো ? আর এবার—লিখবে, যেন জানা কথাই, যেন না-লেখার কথাই ওঠে না।

ভুল করেছে। ভুল করেছে ?

পকেটে-রাখা চিঠিটার অন্তঃসার মনে-মনে আউড়িয়ে গেলো আরো একবার। আর-তো ভিতু-ভিতু নয়, আধো-বাধো নয় : বেড়েছে, জোর বেড়েছে, সাহস পেয়েছে ; দ্বিধা ভুলে যাচ্ছে, বাধা ঠেলে দিচ্ছে ;—কেউ যেখানে আসেনি, সেখানেই শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে নাকি এই মেয়ে, পার হবে নাকি সীমান্ত ?···হঠাৎ এক লাফে উঠে দাঁড়ালো সত্যেন, প্রায় আওয়াজ ক'রে ব'লে উঠলো—

না, আর না। এ-চিঠির জবাব দেবে না, আর লিখবে না কোনোদিন ; শুধু দেখাশোনার ফলে যা হ'তে পারতো না, সেই অভাব্য, অবিশ্বাস্য, অসম্ভবকেই সে কি ডেকে আনবে চিঠির পর চিঠিতে !···সত্যেনের ত্রাস লাগলো, শীত করলো হাওয়ায়, পা ফেললো দ্রুত।

রাত্রে ঘুমোবার আগে লণ্ঠনের আলোয় আবার চিঠি পড়লো। অনেকক্ষণ ঘুম হ'লো না, কিন্তু ঘুম ভাঙলো খুব ভোরেই। চায়ের আগেই বেরিয়ে প'ড়ে কয়েক মাইল হেঁটে এলো ; আর হোটেলে ফিরে চা খেয়েই চিঠির উত্তর লিখতে ব'সে গেলো।···কী-সুন্দর দিনটি আজ !

শিলঙে সুন্দর, কিন্তু কলকাতায় সবচেয়ে বিশ্রীগরম গ্রীষ্মদিনের একটি। আকাশে নীল নেই ; পাৎলা খুব পাৎলা একটা ধোঁয়ারং ছড়ানো, হঠাৎ কখনো মেঘের মতো ছায়া-ফেলা ; কিন্তু মেঘ নয়—মেঘের উল্টো—কেননা বৃষ্টির আশাকেই সে দূরে সরায়, আর হাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়ে পৃথিবীর হাঁপ ধরায়। বাইরের দিকে তাকালে রোদ্দুরটা কড়া লাগে না—বরং মিনমিনেই ; প্রথম গ্রীষ্মের মুড়মুড়ে ফিটফাট টাটকা-তাজা তাত—যা, মনে হয়, হাতে তুলে বাক্সে ভরা যায়—তার বদলে একটা পিছল, প্যাঁচালো, নাছোড়, ধূর্ত তাপ—স্নানের জলে ধোয়া যায় না, আবার উড়িয়েও তাকে নিতে পারে না ইলেকট্রিকের হাওয়া। তাকে ফাঁকি দেবার একটি মাত্র উপায় আছে, কাজ : এমন কাজ, যা সমস্ত মনটাকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু তেমন কাজ স্বাতীর কি আছে ?···স্নান করেছে সকালেই, ব'সে আছে তার বেতের চেয়ারটিকে পাখার তলায় টেনে এনে, পড়ছে রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'—কামড়ে-ধরা বই—তবু মন তার স'রে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, মনে হচ্ছে পাখাটায় যেন জোড় নেই আজ, মনে হচ্ছে শুধু বই প'ড়ে আর সময় কাটে কত।

বিজন ডাকলো ঘরে এসে তার নাম ধ'রে। স্বাতী তাকালো একবার, চোখে আগ্রহ ফুটলো না।

'এই—মজুমদার এসেছে,' ব্যস্ত বিজন মস্ত খবর দিলো।

স্বাতীর মুখ শক্ত হ'লো একটু, অল্প-একটু। ভাইয়ের দিকে

না-তাকিয়ে বললো, 'উনি বুঝি দুপুরবেলা ছাড়া কারো বাড়ি আসবার সময় পান না?'

'দুপুর কী রে? মোটে-তো দশটা!'

—দশটা? এখনো এতগুলি ঘণ্টা প'ড়ে আছে দিনের? কী-লম্বা দিন!

বোনের এই চুপ-করাটুকুর সুযোগ নিলো বিজন, তাড়াতাড়ি জুড়লো, 'বিশেষ একটা দরকারেই এসেছে।' বিশেষ জোর লাগলো 'বিশেষ' কথাটায়।

কিন্তু স্বাতী যেন শুনতেই পেলো না, কিংবা শুধু শেষ শব্দটা শুনলো। বই থেকে চোখ তুলে, কিন্তু এবারেও বিজনের দিকে না-তাকিয়ে, আস্তে-আস্তে বললো, 'এসেছেন তো আমি কী করবো?'—ব'লেই মনে পড়লো, ঠিক এই কথাটাই আগে একদিন বলেছিলো, সত্যেন রায় যখন এসেছিলেন।—একই কথা কতই আলাদা ক'রে বলি আমরা!

'কী করবি?' বিজন চটপট জবাব দিলো, 'বাড়িতে বন্ধুবান্ধব এলে সবাই যা করে তা-ই করবি।'

'আমার কোনো বন্ধু এলে নিশ্চয়ই।'

বিজন একটু থামলো। স্বাতী বুঝলো যে মুখে প্রথম যে-কথা এসেছিলো সেটা বদলে নিলো সে। হেসে বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, আমার বন্ধুর সঙ্গেই না-হয় দয়া ক'রে একটু দেখা করলি।'

'এখন ব্যস্ত আছি,' স্বাতী চোখ নামালো 'ছেলেবেলা'য়। বিজনকে চটাতে চাইলো, পারলো না। হঠাৎ তার স্বভাবের

আদিম সরলতায় ফিরে গেলো বিজন; জানতে চাইলো, 'ব্যস্ত কেন? পড়ছিস তো।'

স্বাতীকে বলতে হ'লো, 'সেইজন্যই ব্যস্ত।'

গম্ভীরভাবে, কিন্তু ঠোঁটের দূর-কোণে একটু হাসিও রেখে বিজন বললো, 'তাই-তো! তুই-যে এত বড়ো একজন ব্যস্ত মানুষ, মজুমদার তো আর জানে না। আর জানবেই বা কী ক'রে— সেদিন দুপুরবেলা ব'সে এক ঘণ্টা গল্প করলি।'

স্বাতী বই নামালো কোলে, বসলো সোজা হ'য়ে, এতক্ষণ পরে বিজনের চোখে চোখ রাখলো। বললো, 'ভুল করেছিলাম।'

'আশ্চর্য!' তক্ষুনি জবাব দিলো বিজন, 'তুইও ভুল করিস!'

স্বাতী কথা বললো না।

বিজন একটু দাঁড়ালো।—'অন্তত দরকারি কথাটা শুনে আয়।'

'আমার সঙ্গে দরকার?'

'তোর সঙ্গেও।'

'তাহ'লে-তো তুই শুনলেই চলতে পারে,' স্বাতী প্রশ্নের মতো আরম্ভ করলো, কিন্তু শেষ করলো সিদ্ধান্তের সুরে, 'মানে, তোর মুখে আমার শুনলে।'

'তা পারে, কিন্তু তুই একবার চেহারাটাও দেখাবি না?' বিজন একবার জিভটাকে ঘুরিয়ে আনলো গালের মধ্যে, মুচকি হেসে রঙের টেক্কা ছাড়লো, 'মজুমদার আবার একা আসেনি, তার ভাগনিও এসেছে সঙ্গে।'

'ভাগনি?'

'হ্যাঁ, ভাগনি।' বিজয়ী ভঙ্গি এবার বিজনের।

'ভদ্রলোকের আবার ভাগনিও আছে?'

'থাকতে নেই?' বিজন হাসলো। 'তাহ'লে তুই একবার—' বিজন কথা শেষ করলো না; দৌত্য সমাধা ক'রে বেরিয়ে গেলো।

তাহ'লে না-গেলেই নয়? স্বাতী দেরি করলো না। অনিচ্ছার কাজের তাড়াতাড়িই ভালো; যত শিগগির আরম্ভ, তত শিগগিরই শেষ। ভেবেছিলো, অন্য-একজন মেয়ের প্রতি তার মেয়েলি কর্তব্য সেরে একটু পরেই ফিরতে পারবে। কিন্তু ভুল ভেবেছিলো; ঊর্মিলা ঘোষ সহজে উঠলো না।

স্বাতী ঘরে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্র, আলাপ করিয়ে দেবার সবুরটুকুও না-ক'রে, মেয়েটি সম্ভাষণ জানালো, 'আসুন—অনেকক্ষণ ব'সে আছি আমরা। এই-যে—এখানে বসুন—' বেতের সোফায় নিজের পাশের জায়গাটি দেখিয়ে দিলো।

একটু দূরে বসতে যাচ্ছিলো স্বাতী, কিন্তু এ-আদেশ অমান্য করতে পারলো না। মুখ ঘুরিয়ে, ছ'কোণ-কাচের ঝকঝকে চশমার ভিতর থেকে স্বাতীকে বেশ মন দিয়ে একটু দেখে নিয়ে নবাগতা আবার বললো, 'আপনার কথা এত শুনেছি যে আলাপ করতে না-এসে পারলুম না।'

'আমার কথা কোথায় শুনলেন?' অন্য-কেউ হ'লে—হয়তো দিনকয়েক আগে হ'লেও—স্বাতী হেসে বলতো কথাটা, একটু খুশি-খুশি ঠাট্টা ধরনে; কিন্তু এখন কথাটা উচ্চারণ করলো ঠিক সেই সুরে, যে-সুরে রেলস্টেশনে লোকে জিগেস করে, 'নৈহাটির গাড়ি আবার কখন?'

'কেন? মামার কাছে! আর আপনার দাদার কাছেও—' দু-জনের দিকে ছিমছাম দুটি হাসি ঝলসালো স্বাতীর অনুরাগিণী।

প্রথমোক্তকে লক্ষ্য ক'রে স্বাতী বললো, 'আপনাদের আলোচনার এর চেয়ে ভালো বিষয় কি নেই আজকাল?'

'কিসের চেয়ে ভালো?' মজুমদার হাসলো। আর এই প্রশ্নের তাৎপর্য স্বাতীর অনুমানের অস্পষ্টতায় ছেড়ে দিয়ে আরো চওড়া হেসে আবার বললো, 'মিলুর কথা! যা বলতে ওর ভালো লাগে, তা-ই ও বলে।—আমার ভাগনি, ঊর্মিলা।'

স্বাতী সৌজন্যসম্মত নমস্কারের ভঙ্গি আনলো মাথায়, কিন্তু উদ্দিষ্টা তা লক্ষ্য না-ক'রে মামার কথার জবাব দিলো: 'যা ভালো লাগে তা-ই বলি আমি? না; যাকে বলছি তার যা ভালো লাগবে, তা-ই বলতে চেষ্টা করি।—কেমন, তা-ই ভালো না?'

ঊর্মিলা সদ্য-আলাপিতার দিকে তাকালো অনুমোদনের জন্য, কিন্তু স্বাতী একটু হেসে বললো, 'এখানে কিন্তু হিশেবে আপনার ভুল হয়েছে।'

'ভুল কেন? আপনাকে নিয়ে অন্যেরা কথা বলছে, এ-কথা শুনতে আপনার ভালো লাগে না?'

'একেবারেই না,' স্বাতী গম্ভীর হ'লো।

'সে কী! ফেমাস হ'তে ভালো লাগে না আপনার?'

'ফেমাস!' স্বাতী, যেন এই প্রথম শুনলো, আলগোছে আওড়ালো কথাটা।

কিন্তু ঊর্মিলা স্পষ্ট জবাব চাইলো, 'লাগে না?'

'যা আমি হইনি, যা আমি হবো না, তা হ'তে কেমন লাগবে ঠিক বুঝতে পারছি না।'

উর্মিলা সশব্দে হেসে উঠে কথাটাকে রসিকতা বানিয়ে দিলো। চেয়ারের মধ্যে পিঠটাকে একটু ঢিল দিয়ে সবুজ জুতো-পরা পা দুটো বাড়িয়ে দিলো মেঝেতে, একটা হাত ঝুলিয়ে দিলো চেয়ারের বাইরে, আর সেই হাতে তার জুতোর রঙেরই ব্যাগটাকে দোলাতে-দোলাতে বললো, 'যদি ধ'রেই নেন যে হবেন না তাহ'লে আর কী ক'রে হবেন ? ও-তো আর-কিছু না ; লোকে যাকে নিয়ে কথা বলে, সে-ই ফেমাস। ভালো বললে ভালো, মন্দ বললেও ভালো। কিন্তু কথা বলবে—না-ব'লে পারবে না। আর সেটা চেষ্টা করলেই হয়।'

'চেষ্টা করলেই ?'

'ঠাট্টা করছেন আমাকে ? কিন্তু আমি ঠিক ক'রে নিয়েছি যে ফেমাস হবো—হবোই—এখন থেকেই চেষ্টা করছি সেজন্য—হবো যখন, দেখবেন।'

'আমি-তো নগণ্যই থেকে যাবো ; তাই দেখবো না, শুনবো।'

'কেন, ফেমাস লোকদের চোখে দেখতেও কি আপনার আপত্তি ?'

'দেখতে চাইলেই কি দেখা যায় তাঁদের ?'

'চেষ্টা করলেই যায়।'

'চেষ্টা করার চেষ্টাই আমার আসে না।'

চড়া গলায়, পিছনে মাথা হেলিয়ে, উর্মিলা আবার হেসে উঠলো, ব্যাগটা প'ড়ে গেলো হাত থেকে। ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো পায়ের উপর পা তুলে, ব্যাগটাকে স্থির করলো হাঁটুর উপর ; যেন হাসিঠাট্টার শেষে এবার 'আসল' কথা পাড়ছে, এমনি একটা

গাম্ভীর্য মুখে এনে বললো, 'যদি আমি বলি, একজন ফেমাস মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা করাবার জন্যই আমরা আজ এসেছি, তাহ'লে কি আপনি সুখী হন না?'

এর উত্তরে স্বাতী বললো, 'আমি এমনিতেই সুখী।'

ঊর্মিলার ছয়-কোণাচে চশমা-আঁটা দৃষ্টি প্রায় কঠোর হ'লো স্বাতীর মুখের উপর। পাছে আবারও ঐ 'ফেমাস' কথাটা কানে শুনতে হয়, সেই ভয়ে এর পরের কথাটাও স্বাতীই ব'লে ফেললো, 'তাছাড়া বিখ্যাতদের বেশি ভালোও লাগে না আমার।'—বলবার সময় ভাবেনি, কিন্তু ব'লেই মনে পড়লো ধ্রুব দত্তকে।

'কাকে দেখেছেন?' ঊর্মিলা জেরা করলো।

'দেখেনি ঠিক কাউকেই, তবে মনে হয়—'

'আপনার মনে-হওয়াটাকে যাচাই ক'রে দেখুন না একবার। কাল আসুন সন্ধেবেলা আমাদের ওখানে শশাঙ্ক দাশের গান শুনতে।—শশাঙ্ক দাশের গান!' আবার সাড়ম্বরে ঘোষণা করলো ঊর্মিলা।—'আপনাকে নিমন্ত্রণ করতেই এসেছি আমরা।' ঊর্মিলা ধ'রেই নিলো যে নিমন্ত্রণ করা মানেই অন্য পক্ষের গ্রহণ করা; কথা শেষ ক'রে চোখা তাকালো পুরুষ দু-জনের দিকে; হাসলো, যেন নিজের উপর খুশি হ'য়ে; আর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে হাঁটু নাড়তে লাগলো ব'সে-ব'সে।

সে-দু'জন একটিও কথা বলেনি এতক্ষণ। স্বাতী দু-একবার তাকিয়েছিলো তাদের দিকে—তারা দ্যাখেনি—আর স্বাতী দেখেছিলো তারা দু-জনেই ঊর্মিলাকে দেখছে, আর চোখোচোখি করছে পরস্পরে। ঊর্মিলাকে উৎসাহ দিচ্ছে তাদের চোখ, বাহবা

দিচ্ছে; দু-জনে যেন পরামর্শ ক'রে পুরো রঙ্গমঞ্চটা ছেড়ে দিয়েছে তাকে;—রঙ্গমঞ্চ কথাটাই এখানে ঠিক, একটা অভিনয় তাকে দেখানো হ'লো—ভালো অভিনয়—ভালোই—; কিন্তু ওখানেই যেন শেষ নয়, তাকে একটা পার্টও দিতে চাচ্ছে, নামাতে চাচ্ছে রঙ্গমঞ্চেই। ভাগনির শেষ হবার পরে ঠিক সময়ে আরম্ভ করলো, মজুমদার, স্বাতীকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'শশাঙ্ক হঠাৎ এসেছে কলকাতায়, আমি খবর পেয়েই পাকড়েছি।'

ততক্ষণে স্বাতী তার মনের মাকড়শা-বোনা কম-আলোর কোণ খুঁজে-খুঁজে শশাঙ্ক দাশকে উদ্ধার করেছে; তাই বলতে পারলো 'সেই ফিল্মের গাইয়ে?'

'হ্যাঁ—ফিল্মের গাইয়ে ব'লেই শশাঙ্ককে লোকে চেনে আজ!' —স্বাতী যেন আশা করেনি মজুমদারের মুখে এই কথা, কথার এই সুর—ঈষৎ চমকালো—কিন্তু বক্তা সেটা লক্ষ্য না-ক'রে আগের কথার জের টানলো—'পরশু ও ফিরে যাবে—ভয়ানক ব্যস্ত—কিন্তু আমি-তো ছাড়বার পাত্র নই!' শেষ কথাটায় মজুমদার নিজে হাসলো বড়ো-বড়ো দাঁত দেখিয়ে, কিন্তু স্বাতীর মনে হ'লো না সেটা হাসির কথা।

'কলকাতায় কেউ-তো জানেই না উনি এসেছেন,' যোগান দিলো বিজন। 'তাহ'লে কি আর রক্ষে ছিলো—ছেঁকে ধরতো না চারদিক থেকে!'

'মাত্র দু-একজনই জানে,' বিজনের ভাষার ভুল শোধরালো স্বাতী, 'তাই অল্পেই রক্ষে পেলেন।'

'তা নয়—' স্বাতী ঠিক বুঝলো না মজুমদার তার কোন কথার

প্রতিবাদ করলো—'হাজার লোকের মধ্যেও আমি ঠিক ধ'রে আনতাম শশাঙ্ককে।—তা আসবেন কাল—বেশি লোক বলিনি—বেশি বলবার মতো-বাড়িও নয় আমার—আপনারা, আর অল্প ক-জন বন্ধুবান্ধব—' বলতে-বলতে মজুমদার উঠে দাঁড়ালো—'হ্যাঁ—আপনার বাবাকেও যদি বলেন—আমার আর সময় নেই—চলি—বিজন, তুমি মিলুকে পৌঁছিয়ে দিয়ো ভাই—' শেষ কথাটা দরজার ধার থেকে ছুঁড়ে দিয়ে আচম্বিতে, অকস্মাৎ, অপ্রত্যাশিত প্রস্থান করলো মজুমদার।

'আমাকে কারো পৌঁছিয়ে দেবার দরকার নেই,' ঊর্মিলা আরম্ভ করেছিলো মামাকে লক্ষ্য ক'রেই, কিন্তু মামা তার কথা শোনার জন্য দাঁড়ালেন না, অগত্যা বিজনকেই তাক করলো চশমা-চোখ—'তবে আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমার সঙ্গে যেতে পারেন।'

ভাগনিকে রেখে, তাকে পৌঁছিয়ে দেবার ভার দাদাকে দিয়ে, মজুমদারের হঠাৎ চ'লে যাওয়ায় স্বাতী একটু অবাক হ'লো, কেননা ব্যবহারের যে-সব ধারণা তার মনে বদ্ধমূল, তার সঙ্গে এটা মেলে না। যেন বিষয়টা বুঝে নেবার জন্য বললো, 'নিজেদের গাড়ি থাকার একটা সুবিধে এই যে পৌঁছিয়ে দিতে লোক লাগে না।'

'গাড়ি না-হ'লেই লাগে না'কি? ঊর্মিলার প্রতিবাদ উঠলো তখনই। 'আপনি ভেবেছেন কী আমাকে?'

'তবু—আপনার মামা গাড়িটা পাঠিয়ে দেবেন নিশ্চয়ই?'

'কেন? গাড়ি পাঠাবেন কেন? ট্র্যাম-বাস্ আছে কী করতে?'

'ও! কাছেই বুঝি?' স্বাতী অন্য দিকে আলোর সন্ধান করলো।

'আমরা কোথায় থাকি আপনি জানেন না?' ঊর্মিলা যেন অবাক হ'লো, আর তার অবাক হওয়ায় অবাক হ'লো স্বাতী, নিঃশব্দে মেনে নিলো নিজের অজ্ঞতা।

'আমরা থাকি বেনেপুকুরে,' ঊর্মিলা আলো ফেললো।

'সেটা কোথায়?'

'ও মা, বেনেপুকুর জানেন না?' খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো ঊর্মিলা।

স্বাতী লজ্জা পেলো।—'বিখ্যাত বুঝি জায়গাটা?'

'না, না, সে-রকম কিছু নয়, পাড়াটা—বাজেই;—তা ঠিক সুবিধেমতো পাওয়া গেলো না আর-কোথাও। অনেক ঘর চাই, গারাজ চাই, গ্যাস চাই, আবার ফ্ল্যাট হ'লেও চলবে না—' ঊর্মিলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক খবর উগরে দিলো—'এত সব হ'য়ে ওঠা ভাড়া-বাড়িতে তো শক্ত?'

এই একেবারেই সত্য কথাটায় ঊর্মিলা প্রশ্নের সুর লাগালো, আর এমনভাবে তাকালো যেন সে ভাবছে স্বাতী এ নিয়ে তর্ক করবে; স্বাতীকে তাই সায় দিতে হ'লো, 'নিজের বাড়িতেও সহজ না।'

'ঠিক বলেছেন—অনেকের পক্ষে তা-ই—তবে মামা যখন বাড়ি বানাবেন—' এ-বিষয়ে এর বেশি বলা ঊর্মিলারও বোধহয় বাহুল্য লাগলো, ফিরে এলো, আগের কথায়—'তা এটাও মন্দ না—বড়ো-বড়ো ঘর—চওড়া-চওড়া বারান্দা—আপনার ভালোই লাগবে।' ঊর্মিলা একবার চোখ ঘুরিয়ে আনলো স্বাতীদের বসবার ঘরের চারটি কাছাকাছি দেয়ালে।

'আর কী-কী আমার ভালো লাগবে বলুন তো—শুনি আপনার মুখে।'

কিন্তু স্বাতীর এই আঘাত জলের উপর পড়লো। জলের মতো সহজে উর্মিলা জবাব দিলো, 'তা-তো জানি না, তবে গান যে ভালো লাগবে, এটা নিশ্চিতই।'

'কিন্তু আমি তো এখনো বলিনি যে কাল যাবো।'

'ও আবার বলবেন কী—যাবেন তো!' উর্মিলা মুখে বললো এ-কথা, আর চোখে বললো, 'শশাঙ্ক দাশের গান শোনার সুযোগ কেউ কি পেয়েও হারায়!'

স্বাতী কিছু বললো না।

'আপনি কি ভাবছেন যে যাবেন না?—ঈশ!' হেসে, তাকিয়ে, ভুরু বাঁকিয়ে স্বাতীর একটি হাত ধ'রে উর্মিলা বললো, 'তোমাকে বড্ড ভালো লেগেছে আমার! সত্যি!'—তারপরেই অন্য হাতে বাঁধা ছোট্ট সোনার ঘড়ির দিকে কোণ-চোখে তাকিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে, প্রায় একই রকম মধুর স্বরে বললো, 'আমার সঙ্গে বেরোবেন নাকি বিজনদা, আমি কিন্তু আর বেশিক্ষণ বসবো না।'

বিজন এতক্ষণ মুগ্ধ হ'য়ে দেখছিলো—বোধহয় দু-জনকেই—কথা শোনামাত্র তড়াক ক'রে উঠলো। 'তার চেয়েও কমক্ষণে আমার হ'য়ে যাবে,' ব'লে দ্রুত বেরিয়ে গেলো দ্রুত স্নানাহার সারতে।

সেই কম-ক্ষণই স্বাতীর পক্ষে অনেকক্ষণ হ'লো। কেননা, বিজন চ'লে যাওয়ামাত্র উর্মিলা ঘুরে বসলো হাঁটুতে প্রায় হাঁটু ঠেকিয়ে, একেবারে দু-চোখভরা ঢলঢলে তাকিয়ে বললো, 'এসো ভাই, এখন একটু মন খুলে কথা বলি দু-জনে।'

এর পরেও আরো মন খুলবেন ইনি? স্বাতী একটু স'রে, বসলো, 'তুমি'টাকে যেন লক্ষ্যই করলো না; একটু বেশিই ভদ্রভাবে বললো, 'আপনাকে কিছু পানীয়—'

কথাটা উচ্চারণ ক'রেই স্বাতী প্রায় জিভ কামড়ালো; কেমন ক'রে সে আগেই না-বুঝে পারলো যে ওটা শুনে তার সঙ্গিনীর খিলখিলে-কলকলে হাসি আবার উথলোবে! কিন্তু স্বাতী সবচেয়ে বেশি যা ভাবতে পারতো, তার চেয়েও বেশি হ'লো: হাসির অথই জলে প'ড়ে গেলো ঊর্মিলা; অনেক ঢোঁক হাসি গিলতে-গিলতে একটি-একটি কথার বুদ্বুদ তুললো কোনোরকমে: '—পানীয়? না ভাই—পানীয়-টানীয়—কিছু—চাই না আমার।'

স্বাতী অদম্যভাবে আবার বললো, 'কিছু না?'

'না। প্-পানীয়!—উঃ!' ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গিয়ে ঊর্মিলা এবার দুর্বলভাবে হাসির হেঁচকি তুলতে লাগলো।

'দাদা বোধহয় খেতে গেলো—আমি একবার—' স্বাতী দৃষ্টিপাত করলো ভিতরের দিকে।

'কেন, চাকর নেই?' তক্ষুনি ঊর্মিলা উঠে এলো শুকনো ডাঙার কেজো ঘাটে।

'সে-জন্য না—' স্বাতী জরুরিভাবে উঠে দাঁড়ালো।

'আরে বসো,' বসো,' ঊর্মিলা হাত ধ'রে সাধলো, বাদ সাধলো। 'দাদার অত যত্ন না-করলেও চলবে। বসো, একটু গল্প করি।'

স্বাতী বিবর্ণভাবে ব'সে পড়লো। ভিতরে যাবার দরজাটায় রইলো তার চোখ, চোখের তৃষ্ণা।

'তুমি বোধহয় আই. এ. পাশ করলে এবার?' ঊর্মিলা আরম্ভ করলো মন-খোলা গল্প।

স্বাতী মৌনভাবে বুঝিয়ে দিলো যে অনুমানটা মিথ্যে না।

'এখন কী করবে?'

'পড়বো।'

'পড়াশুনো তো শেষ হবে একদিন।'

'হোক তো।'

'তোমার শিগগিরই শেষ হবে,' ঊর্মিলা প্রায় দৈবজ্ঞের মতো বললো।

'পড়াশুনার কি শেষ আছে জীবনে?' প্রায় আর্যভাবে উত্তর দিলো স্বাতী।

'তুমি তাহ'লে তোমার জীবনটা নিয়ে বেশি কিছু ভাবোনি?'

'আপনি ভেবেছেন, মনে হচ্ছে?' স্বাতী বলতে চেয়েছিলো, 'আমার জীবন নিয়ে আপনি ভেবেছেন,' কিন্তু ঊর্মিলা উথলে উঠে বললো, 'নিশ্চয়ই! আমার জীবন নিয়ে আমি যদি না ভাবি কিন্তু ঐ "আপনি"টা আর কেন ভাই, মোটে ভালো শোনায় না, আর বয়সে বেশি বড়োও না আমি তোমার—এবার বি. এ. দিলাম—আর এর পরেই মুশকিল! পরীক্ষার আগে থেকেই মা চিঠি লিখছেন মামাকে—মা তো দেশে থাকেন, আর আমার তো বাবা নেই—কিসের জন্য বুঝতেই পারো, আর মামারও তা-ই মত—মনে-মনে উনি বেশ সেকেলেই আছেন এখনো, আর আমাদের মতো মডর্ন হবেনই বা কী ক'রে—মামাও কথাবার্তা এমন বলেন যেন বিয়ে ছাড়া মেয়েদের আর গতি নেই! আমি বলি, না—

কক্‌খনো না—বিয়ে-বিয়ে ক'রে চ্যাঁচামেচি কি এখনো শুনতে হবে, এই উনিশ-শো একচল্লিশেও!—অবশ্য তোমার মতো মেয়ের কথা আলাদা, তোমাকে দেখেই বোঝা যায় তুমি বিয়ে করারই টাইপ—ছাখো না, কলকাতায় আছো তো জন্ম থেকেই? অথচ শহরটাই চেনো না এখনো, একলা চলাফেরাও ভাবতে পারো না—তাই বিয়েটাই তোমার পক্ষে ঠিক—কিন্তু সকলে তো আর লক্ষ্মী মেয়ে নয় তোমার মতো, ইচ্ছা-অনিচ্ছাও অনেকের অন্তরকম। আমাকে যদি জিগেস করো, বিয়েতে আমার মত নেই কেন? আমি কি কোনোদিনই বিয়ে করবো না?—মামা ও-কথা জিগেস করেন আমাকে—আমি বলবো, না, তা নয়, কোনো-একদিন করবো হয়তো, যেদিন ইচ্ছে হবে করবো, আর সেদিনই করবো—কিন্তু তার একদিনও আগে না।—এখন? এখন সে-কথা ভাবতেও পারি না; এখন আমি জীবনটাকে দেখতে চাই, চাখতে চাই, সবচেয়ে বেশি চাই ফ্রীডম, পুরুষরা যেটা মনোপলি ক'রে রেখেছে এতকাল। তাছাড়া আমার একটা প্ল্যানও ঠিক করা আছে—তখন-যে বলছিলাম ফেমাস হবো তারই প্ল্যান—আমি পলিটিক্স করবো—পলিটিক্স ছাড়া আর-কিছুতেই নাম নেই আজকাল, আর-কিছুর দরকারও নেই বোধহয়। মোটামুটি একটা প্রোগ্রামও ভেবে রেখেছি—নেহাৎই মেয়ে হ'য়ে জন্মেছি যখন, মেয়েদের নিয়েই প্রথম হৈ-চৈটা তুলতে হবে;—বাপের সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে মেয়েদের, আর হিন্দু বিয়েতে ডিভোর্সের ব্যবস্থা চাই—উঃ, কী-অসহ্য অত্যাচার মেয়েদের উপর হিন্দু আইনে—পুরুষ যে-ক'টা ইচ্ছে বিয়ে করতে পারে, আর মেয়েরা নাকি কিছুতেই

একবারের বেশি না !—সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, বুঝতে পারছি না এখনো শুধু এইটুকু যে কোন পার্টিতে যাবো—প্রোগ্রেসিভ ডেমক্র্যাট, না র‍্যাডিকল লিবরল, না অ্যাডভান্স গার্ড। সবচেয়ে জোরালোটাতেই যাওয়া উচিত নিশ্চয়ই, কিন্তু প্রত্যেকেই বলে আমরাই সবচেয়ে জোরালো—আবার ভুল পার্টির জন্য-না জেলেই যেতে হয় কোনো সময়।—ঐ একটা শুধু অসুবিধে আমাদের দেশে পলিটিক্স করার।'

হাত নেড়ে, পা নেড়ে, হাঁটু নেড়ে, হাঁটু ছড়িয়ে, চোখ ঘুরিয়ে সমস্ত শরীরে কম্প তুলে, সমস্ত কথায় রঙ্গ ঢেলে, প্রত্যেকটি চীৎকারচিহ্ন কণ্ঠস্বরে পরিস্ফুট ক'রে স্বাতীর নতুন বন্ধু এই বিচিত্র বক্তৃতাটি তাকে শোনালো। মাঝে-মাঝে একটু-একটু থামলো, যেন অন্যজনেরও কিছু বলবার কথা,-যেন, এমনকি, সত্যিই অন্যজন কিছু বলেছে ;—আর স্বাতী অবশ্য কিছু বললো না, বলতে চাইলো না, পারলো না, চাইলেও পারতো না, পারলেও চাইতো না ; শুনলোও না সব, প্রায় কিছুই শুনলো না ; শুধু তাকিয়ে থাকলো স্থির, কিন্তু খানিক পরে আর দেখলোও না, শুধু তার কানের মধ্যে ঘনঘোর গোলমালের গোলাগুলি চলতে লাগলো।

ঊর্মিলার মনের কথা এখানেই হয়তো শেষ হয়নি, হয়তো মন খুলতে আরম্ভ করেছিলো মাত্র। কিন্তু গভীরতর উন্মোচনের আর সময় হ'লো না, বিজন ফিরে এলো। সময় বাঁচাবার জন্য স্নানটা বাদ দিয়েছিলো সে ; হোক গরম—স্নানে গরম কমে এটা কুসংস্কার ছাড়া আর কী, রাস্তায় বেরোলে একই, আর একশো

ডিগ্রির উপরে তাতা রাস্তাটাই তখন তার কাছে কলকাতার সুখস্থান। ঘরে পা দিয়েই বললো, 'চলুন।'

উর্মিলা এমন চিরস্থায়ীভাবে চেয়ারটায় ব'সে ছিলো যে তাকে উঠতে দেখে স্বাতী অবাক হ'লো।

'আচ্ছা, আজ চলি ভাই, অনেক গল্প করলাম—' হঠাৎ, যেন নিজের ভাষার ভুল বুঝতে পেরে জুড়ে দিলো—'তুমি-তো কথাই বললে না, আমাকে বোধহয় পছন্দ হ'লো না তোমার—কী বলো?—আমার কিন্তু তোমাকে খুব পছন্দ হয়েছে—' উদার উচ্ছল, বৎসলভাবে স্বাতীর পছন্দকারিণী হাত রাখলো তার কাঁধে। তারপর ব্যাগ খুলে, স্বাতীর ঠিক মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, প্রসাধনের ভাঙচুর মেরামত ক'রে নিলো, ভুরু কুঁচকে নিজেকে দেখলো আয়নায়, নিজেকেই উপহার দিলো মিষ্টি একটি হাসি, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বিজনকে বললো, 'চলুন।'

বিজন বললো, 'একটা ট্যাক্সি আনানো যাক।'

'ট্যাক্সি কেন?' বিজনের প্রস্তাবটা হাত ঘুরিয়ে উড়িয়ে দিলো উর্মিলা, 'বাস্-এ ট্র্যামে সাত রাজ্যি ঘুরে বেড়াই আমি!'

'আপনার জন্য বলিনি,' ক্ষিপ্র উত্তর দিলো বিজন, 'নিজের জন্যই বলেছিলাম।' সম্ভবত নিজে বুঝলো না কথাটা কত গভীর।

কিন্তু উর্মিলা বুঝলো।—'ঐ-তো দোষ বিজনদার!' বলতে-বলতে কুলকুল ক'রে হেসে উঠলো। 'বাজে খরচের রাজা! দাদাটিকে একটু শাসন করো ভাই—বড্ড ব'য়ে যাচ্ছে!'

'ওকে আপনি নাম ধ'রে ডাকলেই পারেন,' স্বাতী হঠাৎ নিজেকে বলতে শুনলো। 'ও আপনার ছোটোই হবে।'

'না ভাই, এটা কিন্তু ভালো বললে না; এতই কি বুড়ো দেখায় আমাকে?'

কিন্তু এ-কথার উত্তরে সৌজন্যের ন্যূনতম প্রত্যাশাও স্বাতী মেটাতে পারলো না; আর-কিছু বলবারই শক্তি পেলো না।

'তা এ-কথা ঠিক,' অকাতর ঊর্মিলা আবার বললো, 'যে অমুকদা অমুকদির দিন আর নেই;—সকলেই এখন সমান, সকলেই সকলকেই নাম ধ'রে ডাকবে—তা না-হ'লে আর হ'লো কী!' কথাটা শেষ করলো বিজনের দিকে জ্বলজ্বলে তাকিয়ে, আর এই আশ্চর্য স্বর্ণযুগ—তার আরো আশ্চর্য প্রমাণ—বিজনের মুখে স্বর্গসুখ উদ্ভাসিত করলো।

নিজের ঘরে, একলা বাড়িতে, স্তব্ধ দুপুরে স্বাতীর আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেলো আস্তে-আস্তে; তার চেতনা, তার চিন্তা ফিরে এলো; কিন্তু অভ্যস্ত আশ্রয়গুলিতে ঠিক যেন ফিরতে পারলো না। ক্লোরোফর্ম থেকে জেগে উঠে এইরকম লাগে মানুষের? নিজের এই ঘর যেন অচেনা, বইগুলি অর্থহীন, দিনটা জ্বরের মতো শূন্য। খানিক আগে ব'সে-ব'সে 'ছেলেবেলা' পড়েছিলো; এখন আবার সেই চেয়ারটিতেই বসেছে, 'ছেলেবেলা'ও আছে, কিন্তু বই খোলার নিয়মরক্ষাটুকুও করছে না;—এর মধ্যে কী-যেন একটা সাংঘাতিক ঘ'টে গেছে, যেন একটা দেয়াল উড়ে গেছে তার ঘরের, কিংবা হঠাৎ তার ডান হাত আর নাড়তে পারছে না;—এমন একটা সাংঘাতিক কিছু, যা তার জীবনটাকে এক ধাক্কায় অনেক পিছনে ঠেলে দিয়েছে, যেন একেবারে আরম্ভে, আবার প্রথম থেকে নতুন

ক'রে সব ভাবতে হবে। মনের তলার পাগলা-ঘোলা ঘূর্ণি থেকে যে-কথাটি প্রথম স্পষ্ট হ'য়ে উপরে ভেসে উঠলো তা এই যে তার মা নেই। কথাটা ভাবতেই—আর-কোনোদিন এ-রকম লাগেনি—অসহায় লাগলো, ভয়-ভয় করলো। যেন কোনো অদ্ভুত বিদেশে, কোনো ভীষণ ভিড়ের মধ্যে সবাই তাকে ফেলে চ'লে গেছে। বাবাও। বাবা-যে এ-সময়ে আপিশে সেটাও মনে হ'লো তার এখনকার কান্না-পাওয়া হারিয়ে-যাওয়ার অংশ। আর এখন এই লম্বা-লম্বা দমবন্ধ ঘণ্টাগুলি ভ'রে বাবার জন্য ব'সে থাকা ছাড়া কিছুই তার করবার নেই।

স্বাতী একবার জোরে নিশ্বাস নিলো, মুখ মুছলো আঁচলে—বড্ড ঘাম—কিন্তু ঘামটা যেন ঠাণ্ডা, গরমটা যেন ভিতরে-ভিতরে শীত। খুব চুপ ক'রে, খুব মন দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলো বাবা এলে কী বলবে।...কী বলবে? এখন যদি থাকতেন তাহ'লেই বা কী বলতো? কোন ভাবনাটা তার মনে পরিষ্কার, কোন ভাষাটা তৈরি? সে-তো নিজেই এখনো জানে না তার কী হয়েছে। নিজেই জানে না এই ভয় কেন। আরো ;—সেটা জানতেও তার ভয়।

হঠাৎ তার শরীরটাই দুর্বল লাগলো; ক্লান্ত, অবসন্ন, ঘুমিয়ে পড়ার মতো।

রামের মা ঘরে এসে বললো, 'দিদিমণি, খাবে নি?'

রামের মা-র চেহারা, গলার আওয়াজ স্বাতীকে যেন সান্ত্বনা দিলো। চেয়ারের মধ্যে একটুও না-ন'ড়ে বললো, 'তুমি বড্ড তাড়া দাও, রামের মা।'

'এত্ত বেলা হ'য়ে যায়, খাবার জন্য মন বলে না তোমার?'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী জিগেস করলো, 'রামের মা, তোমার নাম কী?'

'নাম? আমার নাম?'

'হ্যাঁ, নাম কী তোমার?'

'আমার নাম—' যেন একটু চেষ্টা ক'রে এই তথ্য মনে করতে হ'লো—'আমার নাম মনোরমা।'

'তবে আমরা তোমাকে মনোরমা ডাকি না কেন?'

'কী-যে বলো, দিদিমণি!' এমনভাবে শরীর বেঁকিয়ে হাসলো যেন এটা লজ্জার কথা।

'তুমি-তো আর জন্ম থেকেই রামের মা ছিলে না। রাম জন্মালো, তবে-তো হ'লে।'

এই যুক্তি অনুধাবন করতে পারলো না রাম-জননী; ফাঁকা মুখে তাকিয়ে রইলো।

স্বাতী আবার বললো, 'রামের বাবা কী ব'লে ডাকতো তোমাকে?'

মুখে আঁচল চেপে হাসি লুকোলো রামের পিতার পুত্রের মাতা; তার শরীরে এমন একটা ভঙ্গির ঝিলিক দিলো যে স্বাতী হঠাৎ বুঝলো যে তার বয়স অত্যন্তই বেশি না। আধখানা মুখ ফিরিয়ে সে জবাব দিলো, 'সে আমি বলতে পারবো নি, দিদিমণি।'

'বলো না!' স্বাতী যেন জীইয়ে উঠলো এই প্রাকৃত, পার্থিব কৌতুকে।

'সে বড়ো নাজের কথা। তোমাদের কানে সইবে নি।'

স্বাতী একটু ভেবে বললো, 'তবে-তো ভালোই।'

'শুনলে ভালো বলতে না, দিদিমণি—' এত বড়ো একটা স্বাধীন মন্তব্য শুনতে স্বাতী আশা করেনি, একটু বেশি মন দিলো কথা শোনায়—'আধেক শুনলে মূর্ছো যেতে। তা আমাকে যা বলে বলতো—সোয়ামী যখন, বলতেই পারে—কিন্তু মা-বাপ তুলে যখন মুখ ছাড়তো—' স্বাতী ভেবেছিলো কথাটা শেষ হবে না, কিন্তু তার আশাতীত আরো একটা কথা বললো তার পরিচারিকা—'তখন আমিও ছাড়তাম না!'

স্বাতী দ'মে গেলো। 'লাজের কথা'র সে অন্য মানে বুঝেছিলো। এত বছর ধ'রে রোজ যাকে দেখছে, অথচ কিছুই যার জানে না, তার কথা আর-একটু জানবার তার ইচ্ছে হ'লো; জিগেস করলো, 'তোমার স্বামী মারা গেছে কদ্দিন?'

'মরেছে কবে?' প্রশ্নটা যথাযথ জেনে নিলো, তারপর উত্তরও দিলো যথাযথ, 'সে অনেক কাল হবে। সেবারে খুব আম হয়েছিলো না?—সারা জষ্টি বিষ্টি নেই এক ছিটে—ভোররাতে কলিরা হ'লো, আর মানুষটাকে যেন হিঁচড়ে টেনে নিয়ে গেলো যমে।'

একটু থেমে স্বাতী এর পরের প্রশ্নটি করলো, 'তোমার কষ্ট হয় না?'

মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে রামের মা প্রশ্নটা বোঝবার চেষ্টা করলো। তারপর তৃতীয়বার স্বাতীকে তাক লাগিয়ে বললো, 'না দিদিমণি, মিছে বলবো না, কষ্ট আমাকে তেমন দিতো নি, খেতে পরতে দিতো। ঐ-যা এক দোষ ছিলো—মুখটা আঁস্তাকুড়—তা দোষ বিনে কি মানুষ হয়?—আর মারধোরটা ছিলো না তো, রোজগারেও কামাই দেয়নি একদিন, একদিনের

তরে ব্যামো হয়নি একটা—তা মরণে ডাকলে তার উপর তো কথা নেই!'

চুপ ক'রে থাকলো স্বাতী।

মাথার কাপড়টা—কথা বলতে-বলতে প'ড়ে গিয়েছিলো সেটা—যথাস্থানে তুলে দিয়ে রামের মা যথারীতি আবার প্রস্তাব করলো, দিদিমণি, এখন খাবে চলো।'

'চলো—' স্বাতী উঠলো তক্ষুনি ; আর নিজেকে তার অনেক বেশি নিজের মতো লাগলো খাবার পরে ঘোর দুপুরের মস্ত ঘন ঘণ্টাগুলিতে। হঠাৎ যদি কেউ চলতে-চলতে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে যায়, রাস্তায় ভিড়, পাড়ায় হৈ-চৈ, অ্যাম্বুলেন্সে খবর, তারপর ডাক্তার বলে, 'কিছু না, এক্ষুনি সেরে যাবে,'—এ যেন সেই রকম অনেকটা। এখন স্বাতী মনে করতে পারলো সব, ভাবতে পারলো সমস্তটা। ঊর্মিলার বকরবকরের বাছা-বাছা অংশগুলিকে টেনে-টেনে তুলে পর-পর সাজাতে পারলো—তখন যদিও শুনছে ব'লেই মনে হয়নি। দাদার মুখ-চোখের ভঙ্গি মনে পড়লো স্পষ্ট ; মজুমদারের সঙ্গে তার চোখোচোখি, ঊর্মিলার দিকে তার তাকানো, ঊর্মিলার সঙ্গে তার বেরোনো, আর তাকে, স্বাতীকে, কেমন এড়িয়ে-এড়িয়ে চলা। এক মজুমদারেই কিষ্কিন্ধ্যা, তার উপর আবার ভাগনি, আর ঐ লম্বা হাবা লেজুড় তার দাদা!—আবার, মুহূর্তের জন্য, স্বাতী যেন শিউরে উঠলো ; মনে-মনে বললো, 'মেয়েদের যেন কখনো মা না মরে, আর মা যদি-বা মরে, এমন ভাই যেন কখনো কোনো মেয়ের না হয়।'

কিন্তু দাদা—হঠাৎ গর্বের একটা ঢেউ উঠলো স্বাতীর মনে, আর সেই সঙ্গে সাহসের হাওয়া লাগলো—দাদা তার কী করতে

পারে? দাদা কি একটা মানুষ? তাকে যন্ত্রণা দিতে পারে এমন সাধ্য কী দাদার? এইটেই তার ভুল হয়েছে যে সে আশ্রয় খুঁজছিলো; মা-র আশ্রয়, বাবার—; কিন্তু কেন? এই ব্যাপারটাকে একটা বিরক্তিকর বইয়ের মতো তাড়াতাড়ি পাতা উল্টিয়ে সে কি শেষ ক'রে দিতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, নিজেই পারে। সে নিজেই তার আশ্রয়—আর আবার কে? সে যদি সোজা হ'য়ে দাঁড়ায়, চোখ তুলে তাকায়, যদি সে শুধু একবার মনস্থির ক'রে নেয়—তাহ'লে কেউ কি তার কিছু করতে পারে!

সঙ্গে-সঙ্গে, আর একসঙ্গে, স্বাতীর মন দুটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। প্রথম: বাবাকে কিছুই বলবে না এ-সব; দ্বিতীয়: কাল যাবে গান শুনতে। গান শুনতে অবশ্য না, যাবে উর্মিলাকে কয়েকটা কথা বলতে;—অন্য কোথাও, অন্য কোনো সময়ে হ'লে ভালো হ'তো, উপলক্ষ্যটা ঠিক উপযুক্ত না; কিন্তু আবার সুযোগ পাবে কবে, আর যে-কোনো জায়গায়, যে-কোনো সময়ে কথাটা যখন অস্বস্তিকর, তখন একই কথা। আর উর্মিলাকে ঠিকমতো বলতে পারলে বাবাকে আর বলতে হয় না—এ-বিষয়ে জানবারই দরকার নেই তাঁর—এক দাদাই যা জ্বালাচ্ছে বাবাকে, তার উপর আরো অশান্তি?

ছায়া লম্বা হ'লো রাস্তায়, রোদের রং বদল হ'লো; আর ঠিক যখন বর্ষার আগের দুরন্ত দিনগুলির আরো-একটির শেষ হবার খবর ফুরফুর ক'রে হাওয়ায় উড়লো, তখন স্বাতী উঠলো চেয়ার ছেড়ে, জানলা খুলে দিলো ঘরের, শেলফের সবগুলি বই নামিয়ে নতুন ক'রে গোছাতে বসলো। উর্মিলাকে কাল যা বলবে, তার

প্রত্যেকটি কথা এতক্ষণ ধ'রে ভেবে-ভেবে সে ঠিক করেছে, অনেকবা আউড়েছে মনে-মনে, এতক্ষণে পরীক্ষার পড়ার মতো প্রায় মুখ হ'য়ে গেছে। ঊর্মিলা বার-বার বাধা দেবে, বার-বার জিভ নাড়বে চ্যাপ্টানো আমের রসের মতো চুঁইয়ে-চুঁইয়ে গড়াবে তার আঠা আঠা কথা ;—স্বাতী শুধু একটু দূরে স'রে যাবে, হাত যাতে চিটচিটে না হয়, চোখ দিয়ে বিঁধে রাখবে ঊর্মিলাকে, বিঁধিয়ে দেবে তা কথাগুলি, সব, সমস্ত, প্রত্যেকটি।

কথাগুলি বেশি না ; কথাগুলি এই :

'আপনার মামার বয়স হয়েছে, টাকা হয়েছে, এখন তাঁর জীবনের একটি যোগ্য সঙ্গিনীর সন্ধান করছেন আপনারা। তিনি নিজেও করছেন, কিংবা নিজেই করছেন। তিনি ভাবছেন—তাই আপনারাও ভাবছেন—যে এখন সেই সময় এসেছে যখন মনে করা যায় যে সন্ধানের আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু না ;—আপনাদের অনুমান ভুল, সম্পূর্ণ ভুল ; আর সেই ভুল অনুমানের অনুসরণ আরো যদি আপনারা করেন, সেটা শুধু পণ্ডশ্রমই হবে না, অপ্রীতিকরও হবে। অনেকের পক্ষেই অপ্রীতিকর। আমি আজ এসেছি শুধু এই অপচেষ্টা থেকে আপনাদের বিরত করতে। দয়া ক'রে আপনার মামাকে এই কথাটা বলবেন, বুঝিয়ে দেবেন ; দয়া ক'রে একটুও অস্পষ্টতা রাখবেন না। তাঁর সঙ্গিনীর সন্ধান অন্যত্র করতে হবে।

'আপনাদের পারিবারিক বিষয়ে আমার মন্তব্য করা অশোভনতার চরম, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে নির্লিপ্ত থাকা আমার পক্ষে আর-যে সম্ভব হ'লো না, আপনারাও—আপনারাই—তার কারণ ;

অতএব আশা করি আমার ভব্যতার এই ব্যতিক্রম মার্জনা করতে আপনারা অনিচ্ছুক হবেন না।

'আরো একটা কথা আপনাদের জানানো দরকার। আমার দাদা আর আমি এক বাড়িতে বাস করি, থাকি দু-জনে দুই জগতে। দাদার বন্ধু আমার বন্ধু হ'তে পারে না কখনো। তাই আপনার মামার, কিংবা আপনার, আবার যদি অবসরের এমনই প্রসার কি প্রয়োজনের এমনই বাধ্যতা ঘটে যে আমাদের বাড়িতে আসতেই হয়, তাহ'লে দাদাকে লক্ষ্য ক'রেই আসবেন, দাদাকেই, শুধু দাদাকে।

'এই কথাগুলি শুনতে আপনার ভালো লাগলো না, বলতে আমার আরো অনেক খারাপ লাগলো ; কিন্তু না-বললে খারাপ হ'তো, তাই বলাই ভালো হ'লো।'

স্বাতীর মন এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটি রচনা ক'রে তার ভার নামালো। এখন বলতে পারলেই নিশ্চিন্ত।

৩

যবনিকা কম্পমান

১

বৃষ্টি পড়ছিলো বাইরে। নিঃশব্দ, প্রায় অদৃশ্য বৃষ্টি। অচেনা, ছায়া-ছায়া, ঝাপসা-আলোর রাস্তায় গাড়ি মোড় নিচ্ছে এক-একবার, আর হেডলাইটের কড়া কৌতূহলের সামনে ধরা প'ড়ে যাচ্ছে লম্বা, বাঁকা সমান্তরাল বৃষ্টিরেখার এক-একটি ঝাঁক। কিন্তু মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার আবছা, আবার কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

ভিতরেও নিঃশব্দ। গাড়ি চলছে প্রায় দশ মিনিট ধ'রে, আর এই সময়টুকুতে একটা টুকরো-কথাও পড়েনি ভিতরকার কাচ-বন্ধ মখমল-ঘন অন্ধকারে। নরম, খুব নরম একটা আরামের মতো সেই অন্ধকার, তাতে সবাই ডুবে আছে যেন; কেউ-যে কিছু বলছে না তাও কেউ জানে না।

একবার একটা মোড় নেবার পর রাজেনবাবু বললেন, 'খুব বৃষ্টি হচ্ছে।'

কথাটা পড়লো যেন বালিশের উপর কাচের টুকরো; কোনো রেশ তুললো না।

একটু পরে রাজেনবাবুই আবার বললেন, 'কিন্তু গরম কী—!'

ঐ 'গরম' কথাটায় স্বাতী জেগে উঠলো। সত্যি—! কত ইচ্ছার বৃষ্টি, কত আশার আষাঢ়—; আর তার প্রথম ঝাপটা কিনা বাজে-খরচ হ'য়ে গেলো এই বন্ধগাড়িতে ব'সে। রওনা হবার পরে এই যেন প্রথম বুঝলো সে কোথায় আছে, কোথায় যাচ্ছে, কোত্থেকে এলো। একটু নড়লো, হাত বাড়িয়ে কাচ নামালো,

আর সঙ্গে-সঙ্গে ধাক্কা লাগলো বর্ষার ; কানে ঝমঝম গান, গায়ে ঠাণ্ডাভিজে হাত—না, হাত না, কোনো হাত অত নরম হয় না। স্বাতী ঝুঁকলো বাইরের দিকে, আর বর্ষার আস্ত একটা জগৎ তার দিকে ছুটে এলো ; কলকাতার বৃষ্টিরাতের কালো, চিকচিকে আলো-পিছল রাস্তা, গাছগুলির আরো-কালো, ফুটপাতে ছায়ার নাচ, আর মুখে, শরীরে, মনে এই মাটির ঠাণ্ডা, জলের ঝাপটা—আঃ !

'আঃ !' ভিতর থেকে শাশ্বতীর গলা উঠলো। 'করছিস কী—শাড়িটা ভিজে গেলো !'

আবার কাচ তুলে দিতে-দিতে স্বাতী বললো, 'বেশ লাগছিলো।'

'যত অদ্ভুত তোর—!' কথা শেষ না-ক'রে শাশ্বতী হাত দিয়ে টান করতে লাগলো হাঁটুর কাছে তার ইট-রঙের জর্জেট।

'একটু নামিয়ে রাখলে কিন্তু মন্দ হয় না।' রাজেনবাবু চেষ্টা করলেন তাঁর দিকের কাচটা নামাতে, কিন্তু হাতলটা হয় খুঁজে পেলেন না, নয় ঘোরাতে পারলেন না।

'আমি দেবো, বাবা, নামিয়ে ?' স্বাতী ঝুঁকে পড়লো ওদিকে, শাশ্বতীর হাঁটুর উপর দিয়ে হাত বাড়ালো, আর শাশ্বতী সরু গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই !'

'কী হ'লো ?' বিজন, ড্রাইভরের পাশে, মুখ ফেরালো।

'পাড়টা মাড়িয়ে দিলি বোধহয়,' বললো শাশ্বতী, বলতে-বলতে নিচু হ'য়ে দু-আঙুলে খুঁটে দেখতে লাগলো।

'এক শাড়ি দিয়ে সমস্তটা গাড়ি ভ'রে রেখেছো। কিচ্ছু করা যাবে না।' কিছু করবার চেষ্টা ছেড়ে দিলো স্বাতী, বসলো আবার ঠিকমতো।

'হয়েছে কী ?' বিজন জানতে চাইলো।

রাজেনবাবু জবাব দিলেন, 'কিছু না।'

একটু পরে, যেন কিছু বলবার জন্যই, যেন শাড়ি নিয়ে একটু-যে বাড়াবাড়ি হ'য়ে গেছে, সেইটে চাপা দেবার জন্যই শাশ্বতী বললো, 'এটা কোন রাস্তা রে, বিজু ?'

'আমিরালি এভিনিউ,' শাশ্বতী সঙ্গে-সঙ্গে জবাব পেলো। তারপর মুখ না-ফিরিয়ে, চোখ না-ফিরিয়ে গড়গড় আউড়িয়ে গেলো কলকাতার ভৌগোলিক, 'এখনো আমিরালি এভিনিউ, বাঁয়েরটা ব্রাইট স্ট্রীট···ঐ ডাইনে রইলো স্টোর রোড···এই ওল্ড বালিগঞ্জ রোড আরম্ভ হ'লো।'

এর পরে শাশ্বতী যে-কথা বললো, আগেরটার সঙ্গে তার কোনোই যোগ নেই। 'সত্যি ক'রে বল তো, স্বাতী, কেমন লাগলো তোর আজ ?'

'সত্যি ক'রে মানে ?'

'মানে—তোর তো কিছুই ভালো লাগে না—'

'তা নয়—তুমি বলতে চাচ্ছো যে আসলে আমার ভালো লাগে কিন্তু মুখে বলি, না। কিন্তু না, ও-রকম আমি বলি না কখনো। তাছাড়া ভালোও আমার লাগে—সবই—প্রায় সবই।'

'নতুন একটা খবর পেলাম আজ,' শাশ্বতী ঠাট্টার চেষ্টা করলো। 'তাহ'লে ধ'রে নিতে পারি যে আজ তোর ভালোই লেগেছে ?'

'আপাতত খুব বেশি ভালো লাগবে, যদি তুমি আপত্তি না করো ঐ কাচটা একটু, একটুখানি নামালে।'

এবার সহজেই শাশ্বতী রাজী হ'লো বোনের মরজিতে, কিন্তু

যতটা সম্ভব বাবার দিকে ঘেঁষে বসলো, আর স্বাতীও কাচ নামালো সবটা না—মাত্র নাক পর্যন্ত। শাড়ি-টাড়ি বাঁচলো, আর স্বাতীও বাঁচলো বুকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আর মুখে একটু জলছিটে নিতে পেরে।

'শশাঙ্ক দাশ দেখতে তো বেশ!' শাশ্বতী এমনভাবে কথাটা বললো যেন অনেকক্ষণ ধ'রেই এইটে ভাবছে।

'বলিনি আমি তোমাকে!' দ্রুত ঘাড় ফেরালো বিজন। 'আগে যা ছিলো!—এখন একটু মোটা হ'য়ে তত স্মার্ট আর নেই।'

'অনেক অ্যাক্টরের চেয়েই ভালো,' শাশ্বতীর মন্তব্য ঠিক যে বিজনকে লক্ষ্য করলো না। 'ফিল্মে কেন নামেন না জানি না।'

'চেহারা আর গান হ'লেই তো হ'লো না,' বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বিশেষজ্ঞভাবে, আর একটুখানি তাচ্ছিল্যেরও স্বরে বিজন সমস্যার সমাধান করলো, 'অ্যাক্ট করতেও পারা চাই তো!'

'গান কিন্তু ফিল্মে যা শুনেছি তার চেয়েও ভালো।' শাশ্বতী একটু থামলো, তারপর সোজাসুজিই লক্ষ্য তাক করলো, '—রে, স্বাতী?'

স্বাতী ব'সে ছিলো সামনে এগিয়ে, নামানো কাচের ধারটুকুতে প্রায় নাক ঠেকিয়ে, তেমনি ব'সেই জবাব দিলো, ' "কিন্তু" মানে—'

'তুই আজ বড্ড মানে জিগেস করছিস, স্বাতী!' শাশ্বতী হাসলো, বিরক্ত হ'লে মানুষ যেমন হাসে। আরো কিছু বলবার সময় দিলো স্বাতীকে, তারপর একটু চড়া গলায়, একটু বেশি জোর দিয়ে বললো, 'আমার-তো চমৎকার লাগলো!'

কিন্তু স্বাতী এতেও সাড়া দিলো না।

'গড়িয়াহাট-রাসবিহারী মোড়!' বাস্-কণ্ডক্টরের মতো মোটা ।লায় ঘোষণা করলো বিজন। 'তুমি এক্ষুনি পৌঁছে যাবে, ছোড়দি!'

এতক্ষণে বাইরে তাকাতে ইচ্ছে করলো শাশ্বতীর। পুরোনো ।ালিগঞ্জের থমথমে বড়োমানষি অন্ধকারের পরে ভালো লাগলো মালো, দোকান, এখানে-ওখানে বৃষ্টিতে আটকে-থাকা ভিড়। নজের এলাকায় ফিরে আরাম পেলো, সহজে নিশ্বাস নিলো; ।াড়ি ডাইনে ফেরার পরে রাসবিহারী এভিনিউর এই অংশটুকুর অন্তরঙ্গতা—যাতে আর কারো অংশ নেই এখানে—নিঃশব্দে উপভোগ করলো, তারপর স্বাতীকে আর আলাপে টানবার চেষ্টা না-ক'রে তার অন্য পাশের মানুষটির দিকে ফিরলো।—'বাবা, তোমার কেমন লাগলো গান?'

'ভালো—' যেন যথেষ্ট বলা হ'লো না, রাজেনবাবু আবার বললেন, 'ভালো।'

বাবার কাছে শাশ্বতী এর বেশি আশা করেনি; তাই দ'মে গেলো না, বরং উৎসাহ চড়িয়ে বললো, 'কী-সুন্দর গান, সত্যি! ভাগ্যিশ মজুমদারের সঙ্গে চেনা হয়েছিলো আমাদের, তাই-তো শুনতে পেলাম!'

বিজনের পিঠটাতেই একটা জাঁকালো ভঙ্গি হ'লো, আর অন্ধকারেও তা বোঝা গেলো।

রাজেনবাবু ভাবলেন ড্রাইভর শুনলো নাকি কথাটা, আর শুনে থাকলে ভাবছে কী? কিন্তু শাশ্বতীকে অবহিত ক'রে দিতে হ'লে যতটা দরকার, ততটা গলা নামাতে রাজেনবাবু পারেন না—

কোনো পুরুষই পারে না বোধহয়—তাই কথাটা ঘোরাবার চেষ্টা করলেন হারীত এলো না কেন জিগেস ক'রে।

'ও এ-সব গান ভালোবাসে না!' দ্রুত, নিশ্চিন্ত জবাব দিলো শাশ্বতী। যেন নিজের সঙ্গে স্বামীর এই রুচিভেদে সে একটুও বিমর্ষ না, বরং খুশি।

'আজকাল বুঝি স্বামীকে "ও" বলে মেয়েরা?' রাজেনবাবুর মৃদু প্রশ্ন।

'স্বামীরাও তা-ই বলে যে!' অর্ধেক প্রশ্নের সুর শাশ্বতীর উক্তিতে।

'আমাদের সময় স্বামীরাও "উনি" বলতেন।'

'ও একটা বললেই হ'লো,' শাশ্বতী চাপা দিলো কথাটা, কিন্তু একটু পরে আবার বললো, 'আজকালকার মেয়েদের আর তুমি কী জানো—আর আমিই বা কী জানি।'

কথাটা সে বললো ঊর্মিলার কথা ভেবে। কী-একটা অদ্ভুত খোঁপা করেছিলো, কী-অদ্ভুত সাজ, কী কটকটে রং ঠোঁটের, আর গানের পরে যতক্ষণ তারা ছিলো ততক্ষণের মধ্যে একবার থামলো না, তার চরকি-কথার তুর্কিনাচ! বাবা নিশ্চয়ই অনুমোদন করবেন না, তাই তাঁর সঙ্গে ওর কথা বলতে চেয়েছিলো সে, কিন্তু তার গভীর মন্তব্যটি রাজেনবাবুর কোনোই প্রত্যুক্তি জাগালো না, আর, সময়ও আর হ'লো না, শাশ্বতী পৌঁছে গেলো।

বাইরে হাত বাড়িয়ে বিজন বললো, 'যাক, বৃষ্টিটা ধরেছে।'

শাশ্বতী এখন অনেকটা পারে, কিন্তু এতগুলি ফ্ল্যাটের মধ্যে তেতলা পর্যন্ত সিঁড়ি রাত্তিরে একলা তার খারাপ লাগে এখনো: বিজনকে সঙ্গে নিলো।

স্বাতী এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলো বাইরে তাকিয়ে; ছোড়দির নামার সময়ও কিছু বলেনি, কিন্তু গাড়িটা এক্কেবারে একটা ল্যাম্প-পোস্ট ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে ব'লে সে স'রে এলো ভিতরের অন্ধকারে, আর চোখ ফিরিয়েই বাবাকে দেখতে পেয়ে এমন খুশি হ'লো যেন সে আশাই করেনি বাবাকে এখানে দেখতে। আরো একটু কাছে স'রে নিচু গলায় বললো, 'আমি কিন্তু ভাবিনি বাবা, যে তুমি সত্যি-সত্যি ওখানে যাবে।'

'কেন আমার কি কখনো কোথাও যেতে নেই ?'

'অন্য কোথাও হ'লে—' ড্রাইভরের ঘাড়ে চোখ রেখে স্বাতী চুপ করলো।

'আমিও—তোর কথা—ঠিক ঐ-রকমই ভেবেছিলাম,' বললেন রাজেনবাবু।

স্বাতীর মুখ তক্ষুনি ফিরে গেলো বাবার দিকে—আবার তক্ষুনি নিচু হ'লো। বাবা তাহ'লে বোঝেন—কতটা বোঝেন ? তার মনের এ-দু'দিনের, এ-ক'দিনের উথালপাথাল বাবা কি জেনেছেন, বুঝেছেন, কিছু না-ব'লে, না-শুনে, শুধু তার মুখ দেখে ?···অস্বস্তি হ'লো স্বাতীর, আর সেই সঙ্গে আশ্বস্তও হ'লো সে : জীবনের যে-জটিলতা তার কাছে একেবারে নতুন, আর সেই জন্য দুরন্ত ভয়-দেখানো, তার চেয়ে, হঠাৎ বুঝলো, তার চেয়েও ব্যাপ্ত তার প্রথম-চেনা পুরোনো সব সরলতা।

নিজের দিকের কাচটা—এতক্ষণে ঠিক ঠাওরাতে পেরে—রাজেনবাবু নামিয়ে দিলেন আস্তে-আস্তে। ছোট্ট বন্ধ জায়গাটুকুর মধ্যে বর্ষারাতের ঝিরিঝিরি দিলো।

পৃথিবীতে, তাহ'লেই-তো সুখী হ'তে পারে সকলেই ; কেন একজন অন্যজনকে দুঃখ দিতে গিয়ে দুঃখ পায় নিজেই ?

দুঃখ ? কথাটা খট ক'রে বিঁধলো স্বাতীর কানে, মনের কোণে। ভালো না কথাটা, ওতে আরো দুর্বল করে। তার একটা আবছা-আবছা ধারণা হ'লো যে সংসারে এত রকম লোক আছে, আর তারা এত রকম মৎলবে ঘুরে বেড়ায় যে দুঃখ যদি সবশেষের বেশিদামের না হয়, তাহ'লে বেঁচে থাকাই শক্ত। বেঁচে থাকতে হ'লে—মানে, ঠিকমতো, নিজের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকতে হ'লে এ-কথাই ভাবতে হবে, মেনে নিতে হবে, বিশ্বাস করতে হবে যে আমাকে কেউ দুঃখ দিতে পারে না। আমি আমার নিজের মনে যত ইচ্ছে মন-খারাপ করতে পারি ; কিন্তু অন্য কেউ আমাকে একটুও নড়াবে কেন যেখানে আছি সেখান থেকে ? ছেলেবেলা থেকে তার খুব-চেনা যে-মন-খারাপ, সেটা, স্বাতী এতদিনে বুঝেছিলো, সেটা দুঃখ না। দুঃখ বাইরে থেকে আসে, আর মন-খারাপটা নিজের মধ্যে জন্মায়—আর নিজের সবই তো আমরা ভালোবাসি ? তাছাড়া মন-খারাপেরও সুখ আছে, ওটা যেন সুখেরই ছড়িয়ে-পড়া চেহারা; সুখ জ্বলজ্বলে রং, সূর্যাস্তের আকাশের মতো, এখানে লাল, ওখানে সোনালি, আরো দূরে হলদে, কিন্তু মাঝে-মাঝে ফাঁক, অনেকটাই ফাঁকা ; তারপর ও-সব যখন মুছে যায় আর সমস্তটা আকাশ জুড়ে কেবল একটা ছায়ারং, ছাইরং, না-রং থাকে, মন-খারাপও সমস্ত মন ভ'রে সেইরকম।···আর দুঃখ ? যাতে গলা শুকোয়, কথা ফোটে না, ভয় করে ? না, দুঃখ না, দুঃখ কিছুতেই না।

একটি হাতের একটুখানি মৃদু ভঙ্গিতে স্বাতী যেন জানা, অজানা

আর না-জন্মানো সমস্ত দুঃখকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলো চলতি ট্যাক্সি থেকে রাস্তায়। হালকা করেছিলো মন—এ তো কিছুই না, কোনো নিমন্ত্রণে যাবো না বলার মতো, কি কেউ যদি আমাকে অন্য-কেউ ভেবে কথা বলে, তার ভুল শুধরে দেবার মতো। আবার তার যত্নে বানানো বক্তৃতাটি আউড়ে নিলো মনে-মনে; বইয়ের শেষ প্রুফ পড়ার সময় লেখকের মতো প্রত্যেকটি কথা শেষবার ভাবলো, এখানে একটা সরালো, ওখানে একটু বসালো, কমা-টমাগুলির কড়া পরীক্ষা নিলো, বাধ্য হ'লো মানতে যে যতটা সে পারে, ততটাই এটা ভালো, এর চেয়ে পারে না—এখন পারে না;—আর ট্যাক্সি থেকে নামলো হালকা, নিশ্চিত, তৈরি, আর ছাপা হ'য়ে না-বেরোনো পর্যন্ত লেখক যেমন থাকে, তেমনি একটু, একটু উদ্বিগ্ন।

বেরোতে দেরি হয়েছিলো, নির্দিষ্ট সময় পার ক'রে দিয়েছিলো বাড়িতেই। শাশ্বতীর তাড়া, আর বিজুর ছটফটানিতে রাজেনবাবু জল ছিটিয়েছিলেন এই ব'লে যে গান-বাজনার ব্যাপারে দেরিটাই নিয়ম। কিন্তু তিনি পুরোনো মানুষ—এ-যুগের কথা কী জানেন, আর তার অন্যতম প্রতিনিধি শশাঙ্ক দাশের কথা তো কিছুই না। এখনকার গাইয়ে-বাজিয়ে মহলের 'ভিতরকার' খবর যারা রাখে—ততটা ভিতরে বিজুও ঢুকতে পারেনি এখনো—তারা সকলেই জানে যে অন্যান্যরা যেমনই হোক শশাঙ্ক দাশ কোথাও গাইবে বললে কাঁটায়-কাঁটায় যায়, আর গিয়েই দেরি-হওয়াদের কারো জন্যই অপেক্ষা না-ক'রে, এমনকি গল্পগুজবও এড়িয়ে, পারলে তক্ষুনি আরম্ভ ক'রে দেয় গান। কম কথার মানুষ ব'লে নাম—বদনাম—আছে তার। ভক্তরা পছন্দ করে না তার আঁটোমুখ স্বভাব; বলে

লোকটা মিশুক হ'লে তার পশার জমতো আরো, আবার কেউ বলে ওটা তার ব্যবসার চাল, ঐ গম্ভীর হাম্বড়া ভাবটার জন্যই তার রোজগারে নাকি শূন্য বেড়ে যায় ডান দিকে।

আর তাই, স্বাতীরা যখন পৌঁছলো, তখন তানপুরোয় সুর দিয়েছেন শশাঙ্ক। মামা-ভাগনির অভ্যর্থনা খর্ব হ'লো, ব'সে পড়তে হ'লো আসরের ভিড়ের মধ্যে—হ্যাঁ, রীতিমতো ভিড়, আর ঘরটাও প্রকাণ্ড, যদিও মজুমদার অন্যরকম বলেছিলো—কিংবা সেইজন্যই বলেছিলো বোধহয়। কিন্তু মজুমদারের বর্ণনার সঙ্গে বাস্তবের বৈষম্য ভালো ক'রে লক্ষ্য করার স্বাতীর সময় হ'লো না: নতুন জায়গা, চারদিকে নতুন মুখ, দেয়ালে সোনালি ফ্রেমে শস্তা বিলিতি ছাপা ছবি, দরজাধারে জুতোজঙ্গল, সারামুখে হাসি-চোঁওয়ানো মজুমদার, উর্মিলার বুক-দেখানো পোশাক—এই সব সুতীক্ষ্ণ বাস্তব তানপুরোর গুঞ্জনে চাপা পড়লো। 'তোমাদের দেরি হ'লো—আমরা ভাবছিলাম—যাক, ঠিক সময়েই এসেছো—এইমাত্রই আরম্ভ হ'লো—' তার পাশে বসা উর্মিলার এই কথাগুলি সে যেন কানেই নিতে পারলে না, আর এর পরে—'উনি আজ যা গাইবেন, সব একেবারে নতুন গান, ওঁর নিজের সুর—নিজের বানানো—' এই আলোর রেখাটিও মুছে গেলো তানপুরোর ঝমঝম কুয়াশায়। আর এর পর অবশ্য খানিকক্ষণ—কতক্ষণ?—আর কিছুই ছিলো না কোনোখানে, গান ছাড়া আর-কিছুই ছিলো না।

মজুমদার তার জায়গা থেকে মাঝে-মাঝে দেখছিলো স্বাতীকে, চোখাচোখিরও চেষ্টা করছিলো, কিন্তু স্বাতীর চোখ বোজা, শরীর স্থির;—একেবারে স্থিরও না, কোমরের উপর থেকে একটু, একটু

তুলছিলো অল্প হাওয়ায় কাঁচা বাঁশের ঝাড়ের মতো—আর তার একটু-ফাঁক-হওয়া ঠোঁট দুটিতে আর যেন ভাষার চেতনা নেই। আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসেছে, হাত দুটি কোলের উপর জড়ো করা, তুলে-ধরা সম্পূর্ণ মুখটি যে-কোনো ইচ্ছুক চোখের তলায় খোলা। অদ্ভুত একটা সৌন্দর্য মজুমদার লক্ষ্য করলো সেই মুখে—অদ্ভুত, আর নতুন, আগে ছাখেনি—কোনো ছবির মতো, প্রতিমার মতো, ধূপের ধোঁয়ায় আবছা-দেখা প্রতিমার মুখ, কোন দূর, উদাসীন, কারো-কোনো-কাজে-না-লাগা সৌন্দর্য, আর তাতে—মজুমদার অনুভব করলো যদিও অনুভূতিকে ভাষা দিতে পারলো না—তাতে যে-কৌমার্য আঁকা আছে তা যেন কোনোদিন নষ্ট হবে না। মজুমদারের ঠিক ভালো লাগলো না, যেন ধাঁধায় পড়লো, ব্যবসার কোনো হাত-সাফাইতে ঠ'কে যাবার মতো ভাব হ'লো হঠাৎ!

পুরীতে, ঘিঞ্জি শহরের অলিগলির ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে হেঁটে-হেঁটে, সমুদ্র ভুলে গিয়ে, কোনো-এক অচেনা পাড়ায় হঠাৎ এক অচেনা মোড় নিতেই সামনে যখন সমুদ্র খুলে যায়, তখন যেমন লাগে, তেমনি লেগেছিলো স্বাতীর—মানে ভাববার শক্তি যদি তার থাকতো, তাহ'লে বুঝতো তার এখনকার অবস্থাটা সেইরকম। এসেছিলো পোর্শিয়া সেজে তর্ক করতে, যুক্তি দিতে মামলা জেতার ফন্দি নিয়ে; আসামাত্র কোথায় সে পড়লো? প্রথমে ছেলেবেলার জগতে;—স্বাধীন, সহজ, অবোধ ছেলেবেলায়—মনে পড়ায় ভ'রে গেলো মন: যতীন দাস রোডের বাড়ি, মা, মেজদি-সেজদির বিয়ে, আর শুভ্র—শুভ্রকেও মনে পড়লো। কিন্তু কিছুতেই কোনো আবেগ আর নেই, দুঃখ না, রাগ না, সুখ না, শুধু

স্তব্ধতা ; যা-কিছু এখন আর নেই, আর নেই ব'লে কখনো ফুরোবে না, সে-সবের স্তব্ধতা। তারপর, আরো গভীর, আরো জটিল সুর যখন উঠলো, মনে-পড়ার সেই জাদু-করা জগৎ মিলিয়ে গেলো, তখন, পটে-আঁকা ছবির শান্ত সীমানার বদলে এবার দিগন্ত, শূন্য, আকাশ, সেই-সব অসম্ভব উঁচু-উঁচু আকাশ, সব সমান্তরাল রেখা যেখানে মেলে, আর যেখানে প্রত্যেকটি ইচ্ছা সেই ইচ্ছারই পূর্ণতা।

এখনো ঝাপসা হ'য়ে আছে স্বাতীর মন। কী-গান, কেমন গান, রাগিণীর নাম কী, কেউ জিগেস করলে কিছুই বলতে পারবে না। হঠাৎ তাকিয়ে বড্ড কড়া লেগেছিলো আলো, আর সকলেই যেন বড্ড চড়া গলায় কথা বলছে। শশাঙ্ক দাশ চওড়া বুক দিয়ে আরো-একটি গানের পিড়াপিড়ি ঠে কয়ে দিলেন ; আর তিনি উঠতেই সকলে উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে-সঙ্গে—সভা ভাঙলো—কিচির-কিচির কথা, জুতো খোঁজাখুঁজি, দরজায় ঠেলাঠেলি—স্বাতী তাকালো ছোড়দির জন্য, আর তাকিয়েই পাশে দেখলো বাবাকে।

বাবা কথা বললেন, 'চল আমরাও—'

'না, না, আপনারা এখন যাবেন না,' স্বাতীর ঠিক পিছন থেকে উর্মিলা রাজেনবাবুর কথা কেটে দিলো। তারপর স্বাতীর পাশে এসে বললো, 'একটু দেরি করো ভাই—লোকজন চ'লে যাক—এই প্রথম এলে আমাদের বাড়ি, বসবে তো একটু—ঐ মিসেস ঘোষ যাচ্ছেন—একটু কথা ব'লে আসি ; নয়তো আবার—কী-যে মুশকিল এত লোকের মধ্যে সক্কলের সঙ্গে কথা বলা!'

এত বড়ো মুশকিলের মধ্যে যতটা সম্ভব উর্মিলা স্বাতীর কাছাকাছি থেকে তাকে আপ্যায়ন করলো, পাহারা দিলো, আর

ভিড় ভাঙার পর উপরে নিয়ে গেলো তাদের। মস্ত বারান্দায় রেস্তোরাঁ-মতো ছোটো-ছোটো টেবিল ঘিরে চেয়ার, খাবার-সাজানো থালা, চা, কফি, আইসক্রীম, যার যেটা পছন্দ—বাছা-বাছা ক-জন বন্ধু, আর হয়তো বাড়ির লোক, আর অবশ্য এত লোক জড়ো হবার যিনি কারণ—উর্মিলা তাকে হাতে ধ'রে-ধ'রে আলাপ করিয়ে দিলো সকলের সঙ্গে, সকলের আগে শশাঙ্ক দাশের সঙ্গে—অন্যদের ভার নিলো মজুমদার—নিজের বন্ধু ব'লে, আর অসাধারণ একজন মেয়ে ব'লে, তার পরিচয় দিলো সকলের কাছে। কিন্তু উর্মিলার বর্ণনার কোনো প্রমাণই স্বাতী দিতে পারলো না—যদি-না কারো সঙ্গে কোনো কথা না-বলাটাই অসাধারণ হয়—কথা বললো না ব'লে বুঝলোও না; কখন বেরোবে এখান থেকে এ-ছাড়া আর কথা নেই তার মনে, কখন মন দিয়ে শুনতে পাবে যে-গান এখনো তার কানে লেগে আছে। একবার উর্মিলাকে বলতে শুনলো:

'তুমি খাচ্ছোও না, কথাও বলছো না; হয়েছে কী?'

স্বাতী একটু হাসলো, আর তক্ষুনি ছুতো বানালো, 'মাথা ধরেছে।'

কথাটা শুনতে পেলো মজুমদার।—'মাথা ধরেছে? খুব?'—চেয়ার ছেড়ে উঠে এলো ব্যস্ত হ'য়ে।

'না, তেমন না—' আবার হাসতে হ'লো।

'অ্যাস্পিরিন দেবো?'

উর্মিলা বললো, 'আমার ঘরে চলো, অ্যাস্পিরিন খেয়ে একটু শুয়ে থাকবে।'

স্বাতীকে চমৎকার সুযোগ দিয়েছিলো উর্মিলা। কিন্তু স্বাতী উঠলো না, বাড়ি যাবার অনুমতি চাইলো।

ভাগ্যিশ বাবা সঙ্গে ছিলেন, তার উপর মেঘ ক'রে ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিও শুরু হ'লো, তাই উঠতে পারলো তাড়াতাড়ি। আর, গলি থেকে বড়ো রাস্তায় যেই এলো, অমনি বৃষ্টি বাড়লো স্বাতীর মনের সুরে ঠিক-ঠিক সুর মিলিয়ে। তারও বেশি ; বন্ধগাড়িতে নিঃশব্দ বৃষ্টি, এমন মিশে গেলো তার মনের মধ্যে যে যতক্ষণ-না বাবা বিষয়টা উল্লেখ করেছিলেন, ততক্ষণ বৃষ্টিটাকে বাইরের একটা ঘটনা ব'লে সে যেন বুঝতেই পারেনি। কিন্তু বৃষ্টিই শুধু নয় ; একটু-নামানো কাচের ফাঁক দিয়ে বৃষ্টিটাকে শরীরে নিতে-নিতে আরো বুঝলো, অনেক ; মনে পড়লো এটা মজুমদারের গাড়ি, মনে পড়লো —এতক্ষণে—তার উদ্দেশ্য, প্রস্তুতি, প্রতিজ্ঞা, আর প্রতিজ্ঞার ব্যর্থতা।

বার-বার ক'রে লেখা, বার-বার প্রুফ পড়া, সবই হ'লো ; বই বেরোলো না। কিন্তু স্বাতীর মনে হ'লো—লেখকদের সাধারণত যা মনে হয় না—মনে হ'লো, তাতে কী ? আজকের জন্য যা সে চেয়েছিলো, তা পেয়েছে ; বড়ো হয়েছে, যত বড়ো সে ভাবতে পারেনি ; স্বাধীন হয়েছে—মনের কথা মুখে বলতে পারার মতো নিশ্চয়ই, এমনকি, না-বলতে পারারও মতো স্বাধীন। কিছু বলতে হওয়াটা একরকম বাধ্যতা, প্রতিবাদ মানেই তো সেটা প্রতিবাদের যোগ্য ?···কিন্তু প্রতিবাদ কিসের ? ভালোই-তো, মজুমদার, উর্মিলা, এরা তো ভালোই ; তার এই বেড়ে-ওঠার চূড়া থেকে এদের ভালো বলার বাধা নেই আর ; এখন, এখান থেকে, এরা কিছু না, কিছুই না, কিছু এসে যায় না। তার গাড়ি হুইসল দিলো, আর এরা রইলো স্টেশনে প'ড়ে—এর মধ্যেই কত ছোটো—আর সেই আকাশভরা-গান-জাগানো রেলগাড়িতে ব'সে-ব'সে তার কষ্টে-

বানানো যত্নে-সাজানো কথাগুলি তুচ্ছ হ'য়ে গেলো সেই-সব ফোঁটা-ফোঁটা স্টেশনগুলির মতো, গাড়ি যেখানে দাঁড়ায় না, অথচ গাড়ির চ'লে যাওয়ার জন্য যাদের তৈরি থাকতে হয়।...রাত্রে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে, কয়েকবারই তার মনে পড়লো মজুমদারকে, ঊর্মিলাকে, বোজা চোখে দেখলো তাদের মুখের আশা, ইচ্ছা, উৎসাহ : একটু কষ্ট হ'লো দু-জনেরই জন্য।

সেই রাত্রে ঘুমোবার আগে আর-একজনেরও মনে পড়ছিলো মজুমদারকে, কিন্তু তার ভাবটা করুণা থেকে বহুদূর। শাশ্বতীর খুব আনন্দে কেটেছিলো সময়টা, ইচ্ছে ছিলো আরো থাকার, কিন্তু স্বাতী যে-রকম যাই-যাই করতে লাগলো, আর বাবা-তো স্বাতীর কথাতেই ওঠেন বসেন। গানের চেয়েও বোধহয় বেশি আনন্দের হয়েছিলো গানের পরে উপরে গিয়ে বসাটা; সুন্দর জায়গা, চমৎকার চা, জিভের উপর গ'লে-যাওয়া সন্দেশ, আর তার উপর, সবার উপর, শশাঙ্ক দাশের সঙ্গে এক টেবিলে বসার সম্মান। এই বিশেষ সম্মানটুকু শাশ্বতীকেই দিয়েছিলো মজুমদার: নিজেও বসেছিলো সেখানে, কথা বলেছিলো এমনভাবে যাতে শাশ্বতীও যোগ দিতে পারে। সে অবশ্য বেশি কিছু বলেনি, শুনতেই ব্যস্ত ছিলো, শশাঙ্কর গম্ভীর সুন্দর মুখের গম্ভীর ভারি গলার অল্প-অল্প কথা, আর মজুমদারের জোরালো হাসির ফুর্তি। মজুমদারকে আজকের মতো ভালো আর-কোনো দিন তার লাগেনি; আর, সবটা মিলিয়ে মনে তো পড়ে না আরোর ইচ্ছা-জাগানো এমন ভালো লাগা শিগগির কোথাও পেয়েছে। কম-তো পার্টিতে যায়নি

হারীতের সঙ্গে, কতবার অগ্রণী সংঘের নানা ব্যাপারে, নানা রেস্তোরাঁয়, বড়ো-বড়ো বাড়িতে, রাজপুত্র মকরন্দর নিমন্ত্রণে ;— জমকালো, যাবার সময় উৎসাহ লাগে, কিন্তু কখনো এমন হয়নি যে যাবার আধঘণ্টা পরেই মন চায়নি চ'লে আসতে, আর তার পরেও অনেকক্ষণ—কতক্ষণ !—কোমর টাটিয়ে ব'সে থাকতে হয়েছে হারীতের কথা আর ফুরোয় না ব'লে। আজকাল তার সাহস হচ্ছে একটু-একটু—কখনো-কখনো যায়ও না, হারীতও জোর করে না তেমন, যদি-না হোমরাগোছের নতুন কেউ আসেন, তাহ'লে অবশ্য স্ত্রীকে হাজির করাই চাই—; কিন্তু দু-জনের আনন্দের জগৎ—যদিও হারীত ও-সমস্তকে আনন্দ বলে না, বলে কর্তব্য—আলাদা হওয়ার একটা অসুবিধে হয়েছে এই যে কোনোখানে ভালো লাগার খোরাকি পেলেও বাড়ি এসে কথা ব'লে-ব'লে সেটাকে হজম করা আর হয় না—যেহেতু আর-কোনো লোক নেই বাড়িতে—আর এইরকম সময়ে স্বাতীকে, বাবাকে, বিজুকে—বিয়ের আগের সমস্ত জীবনটাকেই—কোনোখান থেকে ফিরে তাদের যতীন দাস রোডের পাটি-পাতা আড্ডা, স্বাতীর রং-বেরং বর্ণনা, বিজুটার লাফালাফি, চুপচাপ বাবার নিচু-আওয়াজ হাসি—এ-সব তার যেমন অসহ্য মনে পড়ে, আর-কখনো তেমন না। আজ ফিরতি-পথে গাড়িতে ব'সে কোনো কথাই প্রায় হ'লো না—যদিও বলবার আর শোনবার অনেক ছিলো—ওদের সঙ্গে গেলে হ'তো, খানিকটা ব'সে, গল্প-টল্প ক'রে—কিন্তু এমনিতেই ন-টা বেজে গেছে, আর বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে দেখতে না-পেলে কি ভালো লাগে কোনো স্বামীর ?···কিন্তু এখন,

অন্ধকারে শুয়ে-শুয়ে, এ নিয়েও শাশ্বতীর মনস্তাপ কম না, কেননা হারীত ফিরলো তার প্রায় একঘণ্টা পরে, আর একলা ফ্ল্যাটে এই একটি ঘণ্টার প্রতিটি মিনিট দাঁত বসিয়ে গেলো তার মনের মধ্যে।

খেতে ব'সে হারীত বললো, 'তোমার কি মনে হয় হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করবে?'

'আমি কী ক'রে বলবো?' শাশ্বতী আজকাল চেষ্টা করে এ-সব বিষয়ে উৎসাহিত হ'তে, কিন্তু তখন তার কোনো কথাই মনে পড়লো না, হিটলারের গূঢ় অভিসন্ধি জানে না ব'লে লজ্জিত হ'তে হ'লো।

'আমি আজ বাজি রেখেছি একজনের সঙ্গে: সে বলছিলো আর তিন মাসেই যুদ্ধ শেষ হ'য়ে যাবে—যুদ্ধের নাকি কিছুই বাকি নেই! সুখেই আছে বোকারা!'

শাশ্বতী বললো, 'তা সুখে যতক্ষণ থেকে নিতে পারি ততক্ষণই লাভ।'

হারীত চোখ তুললো স্ত্রীর মুখে, তার বাঁকা ঠোঁটে যেন ছুরির ফলা ঝিলিক দিলো, কিন্তু হঠাৎ অবিশ্বাস আর মিনতির মাঝামাঝি একটা সুর লাগলো তার গলায়। 'সত্যি কি তোমার মনে হয় পৃথিবী জ্বলুক পড়ুক যা-ই হোক, তোমার তাতে কিছু না?'

এ-কথার একটা অদ্ভুত উত্তর দিলো শাশ্বতী। 'আচ্ছা, আমরা তো ও-বাড়িতেই থাকতে পারি।'

'কোন—'

'তোমাদের—আমাদের ভবানীপুরের বাড়িতে?'

হারীত হাঃ ক'রে হেসে উঠলো।—'হঠাৎ আমার মা-বাবাদেরই পছন্দ করলে ?'

'তেমন যদি বিপদের সময়ই আসে তবে-তো সকলের একসঙ্গে থাকাই ভালো। আর—তাতে খরচও বাঁচে।'

কিন্তু দ্বিতীয় যুক্তিটাতেও হারীত কান পাতলো না।—'আমিই টিকতে পারি না সেখানে, আর তুমি !' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলো এই আজগুবি প্রস্তাব !

শাশ্বতী আবার বললো, 'কেন, আমার তো বেশ ভালোই লাগে—'

'বেড়াতে যেতে,' হারীত স্ত্রীর হ'য়ে কথা শেষ করলো। 'কিন্তু থাকতে হ'লে ! দু-দিনেই পাগল হ'য়ে যেতে—মানে, আমাকে পাগল করতে। আমি জানি না ! একজন মেয়েও কি আছে আজকাল শাশুড়িকে যে বিষের চোখে না-দ্যাখে ! আর সেটাই-তো ঠিক—শাশুড়িরা এবার ফেরৎ পাচ্ছেন হাতে-হাতে তাঁদের নিজের টাকাই !' ইংরেজি বুকনির তর্জমা ক'রে বিষয়টা প্রাঞ্জল করলো সে, আর বলতে-বলতে চোখ পড়লো স্ত্রীর থেমে-থাকা হাতের উপর।—'তুমি কিছুই খাচ্ছো না !'

'ওখানে খেয়েছি, আর—' শাশ্বতী এতক্ষণে সুযোগ পেলো, সুযোগ নিলো—'কী সুন্দর গান শুনলাম !'

হারীত বললো, 'অসময়ে খাওয়ানো আর খাওয়া—এই এক দুশ্চিকিৎস্য বদভ্যাস বাঙালির ! খাওয়াতে হ'লে ঠিকমতো একটা করা উচিত—হয় চা নয় ডিনার—লোকে তাহ'লে বুঝতে পারে, তৈরি হ'য়ে যেতে পারে !'

তবু শাশ্বতী আওড়ালো, 'খু—ব সুন্দর গান।' একটু থেমে জুড়লো, 'তুমি যদি যেতে—'

'সিনেমার গান ? তার তো রেকর্ড আছে, আর রেডিওতে এত বাজায় সে-সব যে পথে-ঘাটে অনিবার্যভাবে যা শুনতে হয়, তার উপর আবার—' তার বিলেতে শেখা অন্যতম বিদ্যে যে-কাঁধনাড়া, হারীত কথা শেষ করলো তাইতে।

'ঠিক তা নয়—' শাশ্বতী আরো একবার চেষ্টা করতে গেলো, কিন্তু হারীত উঠে পড়লো খাওয়া সেরে, রেডিওর সামনে বসলো শত্রুপক্ষের খবর টুকতে। কিন্তু সেই সময়টিতে মনে হ'লো যুদ্ধে-জ্বলা ইওরোপ ভ'রে গান-বাজনাই শুধু হচ্ছে ; বিরক্ত হ'য়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লো।

…শাশ্বতী একবার তাকালো তার পাশে শোওয়া অঘোর-ঘুমোনো মানুষটির দিকে। পাজামা প'রে শোয় হারীত—এমনিতেও পরে অনেক সময়—দরজির তৈরি লংক্লথের পাজামা, অনেকবারের পরে আবারও শাশ্বতীর অবাক লাগলো যে ওগুলো আরো ঢোলা কেন বানায় না। এ নিয়ে তর্ক তুলেছে সে, তর্কে—অবশ্যই হেরেছে।…তার মন ফিরে গেলো কাটিয়ে-আসা সন্ধ্যায় ; সেখানে যেন সবই বড়ো মাপের ; খানিকটা ক'রে বেশি—আর সেই বেশিটাই অভ্যাস। আরামে আছে মানুষটা—ইচ্ছাটাকে যত ইচ্ছে বাড়তে দেয়, খরচের একটা ছুতো পেলেই খুশি—আর ইচ্ছাগুলিও তার বন্ধুদের মতোই ভালো-ভালো।…আর সত্যি-তো, শশাঙ্ক দাশকে বন্ধু বলতে পারে যে, সে-তো নিজেও কিছু !

তাদের সঙ্গে নামতে-নামতে মাঝসিঁড়িতে একটু দাঁড়িয়ে

মজুমদার বলেছিলো, 'মিসেস নন্দী, আশা করি আপনাদের কষ্টই শুধু দিলাম না ?'

'খুব ভালো লাগলো,' এর বেশি জবাব শাশ্বতীর যোগালো না।

'সেটা প্রমাণ হবে আবার যদি আসেন।'

'আবার গান হবে ?'

'শশাঙ্ককে আর কোথায় পাবো, তবে অন্য কারো গান যদি আপনার ভালো লাগে—আর—' শাশ্বতীর পাশে-পাশে আস্তে নামতে-নামতে হঠাৎ এক সিঁড়ি এগিয়ে গেলো, ঘুরে দাঁড়ালো মুখোমুখি, 'কখনো যদি আমার এমন সৌভাগ্য হয় যে বিনা গানে শুধু আমাদের জন্যই এলেন।'

'বেশ, তা-ই আসবো আমরা,' শাশ্বতী হেসে বললো।

'অত সহজে "হ্যাঁ" বলা মানেই "না"। কিন্তু আমি আশা ছাড়বো না।'

…কথা বলতে না-পারায় হজম-না-হওয়া আনন্দ শাশ্বতীকে জাগিয়ে রাখলো অনেকক্ষণ। বেশ হ'তো, মজুমদার যদি কোনো আত্মীয় হ'তো তাদের। হ'তে-তো পারতো—হ'তে কি পারে না ? পারে না মানে ?—এমন হঠাৎ কথাটা মনে লাফিয়ে উঠলো যে তার ধাক্কায় সে প্রায় উঠে বসেছিলো বিছানায়—তা-ই তো চায় প্রবীর মজুমদার, প্রাণপণে চায়, তার জন্যই তো তার সব—এই সব ! প্রথমে সেটা ঠাট্টা ছিলো, আবছা ছিলো, কিন্তু এতদিনে—এ-ক'দিনেই স্পষ্ট, সত্য ; আর আজ-তো পোস্টরের মতো বড়ো-বড়ো অক্ষরে র'টে গিয়েছে সেটা—সেটাই ছিলো মজুমদারের চোখে-মুখে, নড়াচড়ায়, স্বাতীকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলায়, আর

সিঁড়িতে বলা ঐ কয়েকটা কথায়। আশ্চর্য—এতক্ষণ মনে হয়নি।

শাশ্বতীর ইচ্ছে হ'লো স্বামীকে ডেকে তুলে কথাটা বলে। আরো ইচ্ছে হ'লো। স্বাতীর বিয়ে ভাবতে অন্য একরকম উত্তেজনা লাগলো তার মধ্যে। সমস্ত শরীরে ফিরে এলো হারীতের সঙ্গে তার প্রথম চেনাশোনার দিনগুলি, তারপর বিয়ের পর প্রথম ক-টি মাস। মাত্র ক-টি মাস?···শাশ্বতী পাশ ফিরলো স্বামীর দিকে—কিন্তু হারীত আবার উল্টো দিকে ফিরেছে—তাই দেখতে পেলো শুধু কাটা গেঞ্জিতে অর্ধেক পিঠ-ঢাকা প্রশান্ত পিঠ। সেই পিঠের দিকেই স'রে এলো, ঘাড়ের উপরকার মিহি চুলের উপর দিয়ে আস্তে হাত তুললো আর হাত নামালো।···থাক, ডাকবে না, ডাকলেও জাগবে না, বড়ো গভীর ঘুম—আর সত্যি!—সারাদিন যা খাটুনি!

ঘুমিয়ে পড়ার আগে শাশ্বতী শেষ কথা এই ভেবেছিলো যে এখন কি প্রবীরই প্রস্তাব নিয়ে আসবে, না কি তাদের দিক থেকে কিছু করা উচিত? সকালে উঠে হারীতের কাছে কথাটা পাড়তে গেলো দু-তিনবার—যেন মনে হ'লো এ-বিষয়টা তার কথা বলার একেবারে অযোগ্য লাগবে না—কিন্তু আপিশমুখো এই সময়টা হারীত এমন ছটফটিয়ে কাটায় যে শাশ্বতী ঠিক সময় পেলো না, কি নিজেই তাড়াহুড়োর মুখে মুক্তো ছিটোতে চাইলো না, মোলায়েম সময়ের অপেক্ষা করাই ভালো ভাবলো। কথাটা উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলো নিজের মনে—দেখবার বেশি কিছু আছে ব'লেও মনে হ'লো না, এ নিশ্চয়ই ঠিক, নির্ঘাৎ!—এমনকি এও মনে

হ'লো এর জ্যান্ত প্রমাণ নিজে-নিজেই হাজির হবে শিগগির। কিন্তু কত-যে শিগগির শাশ্বতীও তা ভাবতে পারেনি।

হারীত বেরোবার প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে—শাশ্বতী তখন বিজুর যোগানো একতাড়া সিনেমাপত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছে শুয়ে-শুয়ে—তাদের চাকর এসে একজন আগন্তুকের খবর দিলো—'আপনাকে একটু ডাকছেন তেনি।'

'কে—?' স্বামীর বন্ধুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতমর নাম করলো শাশ্বতী।

'না, বৌদি,' শ্বশুরবাড়ির পুরোনো চাকর জবাব দিলো, 'এনাকে দেখিনি আগে।'

সঙ্গে-সঙ্গে বাইরের ঘর থেকে—মাত্রই একটি পরদা-ঢাকা দরজার আড়াল পেরিয়ে—স্পষ্ট পৌঁছলো চড়ানো গলা : 'আমি প্রবীর মজুমদার, একটা কথা বলতে এলাম।'

—আঁরে! শাশ্বতী উঠলো, ছুটলো। আর তাকে চোখে দেখামাত্র—দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই—মজুমদার কথা আরম্ভ করলো : 'নিশ্চয়ই খুব অসুবিধে করলুম এ-রকম হঠাৎ এসে, হয়তো একটু অভদ্রতাও হ'লো ; নিশ্চয়ই—অন্তত প্রথমদিন—এমন সময়ই আমার আসা উচিত ছিলো যখন আপনারা দু-জনেই থাকবেন ; কিন্তু একটা কথা আমার বলার আছে—কথাটা আপনাকেই শুধু বলতে চাই ; তাই ইচ্ছে ক'রেই এমন সময়ে এসেছি যখন মিস্টর নন্দী বাড়ি থাকবেন না।'

হঠাৎ ধ্বক ক'রে উঠলো শাশ্বতীর বুকের মধ্যে, মুখের রং লাল হ'লো, পায়ের দাঁড়িয়ে থাকার জোর যেন ক'মে গেলো। তবে কি সে ভুল ভেবেছিলো ? তবে কি—? কিন্তু কোনো কথা, কোনো-

একটা কথাও তার দুই ঠোঁটে তৈরি হ'তে পারার অনেক আগেই মজুমদার আবার বললো : 'কথাটা আপনার বোনের বিষয়ে, তাই প্রথমে আপনাকেই—'

শাশ্বতী নিশ্বাস ছাড়লো, সহজ হ'লো, হাসতে গেলো, কিন্তু হাসি চেপে গম্ভীর মুখে বললো, 'বস্থন।'

মিনিট কুড়ি পরে—কেননা বেশি বলাবলির দরকার হ'লো না—আগন্তুক যখন উঠলো, মনে-জমানো হাসিটা মুখে খরচ করতে শাশ্বতীর তখন বাধলো না, কিন্তু প্রবীর মজুমদারের মুখ, যা শাশ্বতী হাসি-হাসি ছাড়া ছাখেইনি, সে-মুখ আঁটো হ'য়ে গেছে গাম্ভীর্যে। ছিলে চড়িয়ে প্রথম তীর ছুঁড়েছে, ঠিক বিঁধেছে ; কিন্তু এটা প্রথম, আর এটাই সবচেয়ে কাছের তাক। আরো দূরে ছুঁড়তে হবে, সেটা সহজ না। প্রথম-বাজি-জেতার আহ্লাদে আখের না ভেস্তে যায়। এখন তাই গম্ভীর, তৈরি।

'যদি অনুমতি করেন,' মজুমদার মাথা নোওয়ালো, 'ও-বেলা এসে আপনাকে পৌঁছিয়ে দিতে পারি ও-বাড়িতে।'

'তা বেশ তো—' ফশ ক'রে কথাটা ব'লেই শাশ্বতীর মনে পড়লো যে এই মানুষটি এখনো তার ভগ্নীপতি ঠিক হয়নি, তার সঙ্গে একা যাওয়াটা কি···? তক্ষুনি তাই ছুতো বানালো, 'কিন্তু আজ-যে এক জায়গায় যাবার কথা আমাদের।'

'তাহ'লে···?'

শাশ্বতী ভাববার ভাণ করলো।—'আচ্ছা, আমি নিজেই সময় ক'রে যাবো একবার।'

'আজই ?'

'আজ—না হয় কাল।'

'তাহ'লে কাল আমি আসবো একবার?'

'এখানে?'

'যেখানে বলবেন। আমার ভাগ্যের গাড়ির আপনিই এখন এঞ্জিন।'

শাশ্বতী খুশিতে জ্বলজ্বলে হ'লো।—'আচ্ছা, আসবেন।'

'কাল?'

'কাল।'

'এই সময়ে?'

শাশ্বতী মাথা নাড়তে গিয়ে থামলো।—'সন্ধেবেলা আসবেন।'

'তখন···'

'আমি চেষ্টা করবো যাতে আমার স্বামীও সে-সময় থাকেন,' বিবাহিত ভদ্রমহিলার সমস্ত সম্ভ্রম প্রকাশ পেলো শাশ্বতীর উঠে দাঁড়ানোয়। 'কাছাকাছি আমরাই যখন আছি, বাবা হয়তো তাঁর মতটাও নেবেন।'

পলকের জন্য শাশ্বতীর মুখের উপর চোখ ফেলে মজুমদার বললো, 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।'

শাশ্বতী টালিগঞ্জে গেলো সেদিনই বিকেলে। বাড়ি ফিরে স্বামীকে দেখে সুখী হ'লো। হারীত এ-সময়টায় হয় বাড়ি থাকে না, নয় বাড়িতেই তার বন্ধুরা আসে; কিন্তু—এটা একটা শুভ লক্ষণ ব'লে ধরলো শাশ্বতী—আজ সে একাও, আবার বাড়িতেও, যে-রকম যোগাযোগ শিগগির ঘটেছে ব'লে মনেই পড়ে না।

টেবিলে কয়েকটা চটি বই ছড়িয়ে ফুলস্ক্যাপ কাগজে ঘষঘষ ক'রে ইংরেজিতে কী লিখে যাচ্ছিলো হারীত, শাশ্বতী কাছে গিয়ে বললো : 'তুমি বাড়িতেই আছো!'

হারীত এই বাহুল্য প্রশ্নের জবাব দিলো না।

'কেউ আসেনি?'

'না।'

'তাহ'লে তো আমাকে আনতে যেতে পারতে।'

'এতদিনে বাপের বাড়ি যাওয়া-আসাটা অন্তত একাই তোমার পারা উচিত।'

'পারি যে না তা নয়, কিন্তু আজ যখন তোমার সময় ছিলো—'

স্ত্রীর গলায় যেন অন্যরকম একটা আওয়াজ পেয়ে হারীত মুখ তুলে তাকালো।—'কোথায় সময়? দেখছো না—?' হাওয়ায় হাতটা ঘুরিয়ে আনলো তার প্যাম্ফলেট আর ফুলস্ক্যাপের উপর দিয়ে।

ছোটো ঘর : খাটের মাথা ঘেঁষেই লেখার টেবিল। খাটের ধারে, হারীতের যথাসম্ভব কাছাকাছি ব'সে শাশ্বতী তাকালো হারীতের হাতের লেখার অক্ষরগুলির দিকে। 'ওটা কি খুব জরুরি?'

'খুব।'

'একটু সময় ক'রে আমার একটা কথা শুনবে?'

হারীত এবার আরো অন্যরকম গলা শুনলো। আবার চোখ তুললো, একটু তাকিয়ে থেকে জিগেস করলো, 'কী হয়েছে?'

'শোনো—একটা কথা—তোমার লেখা-টেকা রাখো এখন—এটাও জরুরি—ভীষণ—'

'কী ব্যাপার?'

শাশ্বতী একটু দম নিয়ে বললো, 'মজুমদার স্বাতীকে বিয়ে করতে চায়।'

'কে?'

'প্রবীর মজুমদার—ঐ যে—বিজুর—'

'ও!' ছোট্ট আওয়াজ করলো হারীত, হালকা বাঁকা একটি হাসি নামলো ঠোঁটে।

শাশ্বতী অপেক্ষা করলো হারীত আরো কিছু বলবে ব'লে, কিন্তু তার চোখ ফুলস্ক্যাপেই নামলো আবার। শাশ্বতী যেন ব্যথা পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'কিছু বললে না?'

'আমি কি বলবো?'

'কেন, স্বাতী কি তোমার কেউ নয়? ওর ভালো-মন্দে তোমার কি কিছু না?'

খোলা কলমটিতে টুপি পরিয়ে রেখে হারীত বললো, 'তা—বিয়ে কবে?'

'শোনো কথা!—কিছুর মধ্যে কিছু না—নাঃ পুরুষরা যে কী!'

'তবে যে বললে—'

'কী বললাম? একটা দিন কি আমার কথায় মন দিতে পারো না তুমি?'

হারীত চটি-বইগুলি সাজালো, ফুলস্ক্যাপের পাতাগুলি গুছোলো—আর সেই কয়েকটা সেকেণ্ড অসহ্য লাগলো শাশ্বতীর—একপাশে সব সরিয়ে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বললো, 'বলো।'

'এ-বিষয়ে তোমার কী-মত সেইটে আমি জানতে চাই।'

হারীত চিন্তা ক'রে বললো, 'স্বাতীকে বিয়ে করতে চাওয়া যে-কোনো পুরুষের পক্ষে খুবই-তো স্বাভাবিক মনে হয়। তবে পুরুষটি অবিবাহিত কিংবা বিপত্নীক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

'ও—ঃ!' শাশ্বতী কঁকিয়ে উঠলো। 'যুদ্ধ আর স্টালিন ছাড়া আর-কিছুই কি তোমার মগজে নেই?'

খোদ মস্কো থেকে টাটকা পৌঁছনো চোরাই কাগজ প'ড়ে স্টালিনের জন্য দুশ্চিন্তা সে-সন্ধ্যায় হারীতের একটু কম ছিলো, তাই লঘুমুখে গুরু নাম ক্ষমা ক'রে বললো, 'আর স্বাতীও—হ্যাঁ, যাকে বলে বিবাহযোগ্যা, স্বাতী এখন রীতিমতোই তা-ই বইকি।'

শাশ্বতী বুঝলো না এটা হারীতের আগের কথারই রকমফের, তাই সোৎসাহে সায় দিলো, তা-ই তো! এখন—ঠিক এখনই স্বাতীর বিয়ে হবার সময়। বাবার বয়স হচ্ছে—আর ক-দিন পরেই পেনশন—বাবারই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তার কথা—আমার কী, আমি-তো আর ও-বাড়ির কেউ নই এখন—আর বাবাই কিনা কথাটা কানেই তুললেন না!'

'হুঁ?' একই সঙ্গে স্ত্রীর আর শ্বশুরের প্রতি সমবেদনা ফুটলো হারীতের আওয়াজে।

'—বললেন, "পাগল নাকি!"' দুঃখে শাশ্বতীর গলা বুজলো।

'তাই-তো!' হারীত কপালে রেখা ফেললো, 'বেচারা মজুমদার!'

"মজুমদার কেন বেচারা হবে—বেচারা আমার বাবা—তাঁরই বুদ্ধির দোষ হয়েছে—ভাবছেন তাঁর স্বাতীর মতো মেয়ে সারা দেশে আর নেই। কিন্তু সত্যি তো তা নয়—সত্যি কি এর চেয়ে সুপাত্র ওর জুটবে কোনোদিন!'

'সে-ভাবনা তোমার বাবাকেই ছেড়ে দাও না ;—আর তুমিই এক্ষুনি বললে না ও-বাড়ির কেউ আর নও তুমি ?'

'তা-ই তো !' শাশ্বতী নিশ্বাস ছাড়লো। 'এখানেও গঞ্জনা, ওখানেও কেউ না ! মেয়েদের জীবনটাই বাজে !'

হারীত আরেক চোখ দেখে নিলো স্ত্রীকে।—'অল্পেই যদি এত উত্তেজিত হও—'

'অল্প ! এতক্ষণ ধ'রে এত বললাম, এত বোঝালাম—আর বাবা ভালো ক'রে উত্তরও দিলেন না—এটা অল্প হ'লো !'

'তুমি কেন ?' এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম যেন অবাক হ'লো হারীত।

'আমি কেন—কী ?' শাশ্বতী প্রশ্নটা বুঝলো না।

'তুমি কেন বললে বোঝালে ?'

'আমি ছাড়া আর গরজ কার—আর আছেই বা কে ?'

'কিন্তু মজুমদার নিজেই যখন জবাব নিয়ে গেছে, তারপর আবার—?'

'মজুমদার নিজেই—? না তো ! সে-তো এখনো জানেই না। আমাকে এসে বললো আজ দুপুরবেলা—আগে তোমাকে বলিনি একবারে সবটাই বলবো ব'লে—আর সময়ই-বা কখন—আমার অবশ্য আগেই—কাল রাত্রেই মনে হয়েছিলো কথাটা—'

'তোমাকে এসে বললো কেন ?' হারীত বাধা দিলো স্ত্রীর বিবরণে।

'মা থাকলে মা-কে বলতো, মা যখন নেই—'

'তুমি স্বাতীর মাতৃস্থানীয়া হ'লে কবে থেকে ?' হারীত নিচু

গলায় হাসলো, যেন একটা মজার কথা শুনে। 'মা না-থাকলে বাবাকেই বলতে হয়—আমি তা-ই বলেছিলাম—আগে অবশ্য তোমাকে। তখন তোমার বাবা যদি অমত করতেন, তুমি তাঁর সঙ্গেই যুঝতে। স্বাতীও তা-ই করবে!—আর আমার তো মনে হয় সে একাই বেশ চালাতে পারবে নিজের পক্ষের লড়াই। এর মধ্যে তুমি কোথায়?'

শাশ্বতীর কথার তোড় হঠাৎ থেমে গেলো। টেবিলের ফিকে ব্রাউন রংটার দিকে চোখ রেখে চুপ ক'রে থাকলো একটুখন, তারপর নিচু চোখেই বললো, 'মজুমদার স্বাতীকে এখনো বলেনি।'

'আসামি না-পাকড়েই উকিল ধরেছে!' হারীত হা-হা ক'রে হাসলো, চেয়ারের মধ্যে কোমর ঢিল দিয়ে টেবিলের তলায় লম্বা করলো পা দুটো। 'খুব অদ্ভুত।'

'অদ্ভুতের কী আছে—' কিন্তু শাশ্বতীর প্রতিবাদে তেমন আর জোর লাগলো না, যেন জোর ক'রে একটু হাসলো। সবাই কি আর তোমার মতো বীর! মানুষটা লাজুক—'

'আ—হ্!' ইংরেজ-ধরনে বড়ো হাঁ ক'রে হারীত ইংরেজি আওয়াজ ছাড়লো, হসন্ত 'হ'-টা আস্তে মিলিয়ে গেলো নিশ্বাসে। ইংরেজিতেই বললো,—একটু ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো এতক্ষণ ধ'রে বিশুদ্ধ বাংলা ব'লে—'এর পর কী শুনবো আমরা?'

এবার আরো বেশিক্ষণ থেমে থাকলো শাশ্বতী; আরো মিয়োনো গলায় বললো, 'না-ব'লে ভালোই করেছিলো।'

হারীতও একটু দেরি করলো আবার কথা বলার আগে। হাতের কাছে শোওয়ানো কলমটি আঙুলে নাড়তে-নাড়তে জিগেস

করলো, 'তোমার কথাটার মানে কি এই যে পাত্রী নিজেই নারাজ ?'

শাশ্বতী জবাব দিলো না ; তার নিচু-করা মুখে এমন একটা ভাব ঘনালো যেন দু-দিন আগে তার কেউ মরেছে, আর সেই ভাবটি লক্ষ্য করতে-করতে হারীতের ভুরু বেঁকলো, কপাল কুঁচকোলো, দু-হাতে ছোট্ট একটি তালি দিয়ে ব'লে উঠলো 'হে-ভন্স ! তাহ'লে এতক্ষণ আমাকে বকালে কেন ?'

শাশ্বতী মুখ তুলে বললো, 'কথাটা কি এত সহজেই উড়িয়ে দেবার ? স্বাতী যে ভুল করছে না তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে ?'

'তা যেমন নেই, উল্টোটারই বা প্রমাণ কী। ভুল হোক, ঠিক হোক, বিয়ে-তো হয় দু-জন মানুষের, আর সে-দুজনেরই একজন যদি না চায় তাহ'লে আর কার সঙ্গে কার বিয়ে হবে ?' তাড়াতাড়ি, এদিক-ওদিক চোখ ফেলতে-ফেলতে হারীত কথাগুলি বললো, যেন না-বললেও চলে কিংবা যেন সে অন্য-কিছু ভাবছে ;—আবার সেইসঙ্গেই, সেইজন্যই সহজ কথাকে পেঁচিয়ে বললো ইচ্ছে ক'রে, বেশ যেন মজা।

সামনে শাদা, ফাঁকা, অনেকটা দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে শাশ্বতী আপত্তি তুললো, 'স্বাতী বোঝে কী ? ছেলেমানুষ—'

'ছেলেমানুষ ? তুমি যখন বিয়ে করলে তুমি ওর চেয়ে কত বড়ো ?'

'আমি ঠিকই করেছিলাম।'

'স্বাতীও—' হারীত শেষ করলো না কথাটা, তার দরকার আছে ব'লেও ভাবলো না ; হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো চেয়ার ছেড়ে, আর তক্ষুনি আবার ব'সে প'ড়ে কাছে টেনে নিলো তার লেখার কাগজ আর চটি-চটি বই ক-টা।

শাশ্বতী উঠে দাঁড়ালো।—'আমি জানতাম তুমি এ-রকমই বলবে।'

তক্ষুনি—যদিও তার চোখ ফুলস্ক্যাপে লেখা শেষ কথাটির উপর—তক্ষুনি হারীত জবাব দিলো, 'নিশ্চয়ই! তুমি জানবে না তো—' হঠাৎ মুখ তুললো, হাসলো, অন্যরকম সুরে বললো, 'তুমি যখন আমাকে বিয়ে করবে ঠিক করলে তখন তোমার বাবা যদি চাইতেন অন্য কারো সঙ্গে—ধরো—ঐ-যে তোমাদের গোঁফ-গজানো গাইয়েটি ছিলো, অভ্র না শুভ্র, তার সঙ্গে—'

'কী বাজে—!' শাশ্বতী মুখ ফিরালো, যেন সেখানে আর দাঁড়াবে না, কিন্তু পলক-পরেই ঘুরে দাঁড়িয়ে তর্ক তুললো, 'কিন্তু স্বাতীর মনের অবস্থা তো আমার যেমন ছিলো তেমন না।'

হারীত পিঠ সোজা করলো, চেয়ারে হেলান দিলো, এলিয়েই দিলো শরীর। একটু বেশি প্রফুল্ল দেখালো তাকে—তার পক্ষে বেশি—মনটা বেশ হালকা যেন, যেন তার বিশ্ব-বাঁচানো কাজ ঠেকিয়েও স্ত্রীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের জন্য সে তৈরি, কিংবা যেন—অনেকদিন পর—এই দাম্পত্য অন্তরঙ্গতাটুকুই তার মনে ফুর্তি এনেছে।—'কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা না-হ'লেই তুমি তো আর বভ্রুবাহনকে বিয়ে করতে না।—আর তাছাড়া—' স্ত্রীকে সে কিছু বলতে দিলো না, তার মুখের রাগের রং উপভোগ করতে-করতে বললো, 'স্বাতীর মনেরই বা কতটুকু খবর আমরা রাখি।'

ঐ 'আমরা'টা শাশ্বতীকে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিলো;—তা'হলে এটা হারীত স্বীকার করে যে অন্তত এ-বিষয়ে তারা 'আমরা'! একটু কাছে স'রে এলো, আস্তে-আস্তে আবার ব'সে পড়লো

খাটে। ভালো ক'রে শোনা গেলো না তার গলা, যখন বললো, 'তোমার কী—তোমার কাছে হাসিঠাট্টা এ-সব ;—কিন্তু আমি-যে কী-যন্ত্রণায় পড়েছি !'

হারীতের ফুর্তি যেন চড়লো এতে, চকচকে চোখে বললো, 'তুমি এমন ক'রে বলছো যেন তোমাকেই কেউ বিয়ে করতে চায়—আর তুমিও তাকেই—আর তোমার বাবা তাতে বাধা দিচ্ছেন।'

হঠাৎ গলা ছেড়ে শাশ্বতী ব'লে উঠলো, 'আমি তোমার স্ত্রী !' নিশ্বাস নিতে লাগলো জোরে-জোরে।

'সে-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে ?' হারীত স্ত্রীর চোখ এড়ালো, কিন্তু লঘুতাটাও বজায় রাখলো গলায়। 'কিন্তু সত্যি—তুমিই বা এত ব্যস্ত কেন আমি জানি না।'

শাশ্বতী থেমে থাকলো, যতক্ষণ-না তার নিশ্বাস স্বাভাবিক হ'লো আবার। তারপর সাধারণ সাংসারিক সুরে বললো, 'মজুমদার কাল আবার আসবে—কী-যে বলবো তাকে—'

'কিছু না-ই বা বললে,' হারীত চট ক'রে বাৎলে দিলো, 'তোমার বাবার কাছেই পাঠিয়ে দিয়ো—চাই কী স্বাতীর সঙ্গেও দেখা হ'য়ে যাবে সেখানে।'

এ-কথার সমস্তটা অর্থ বুঝতে একটু সময় লাগলো শাশ্বতীর। একবার ঢোঁক গিললো, জিভের ডগা বুলিয়ে নিলো নিচের ঠোঁটটিতে। আস্তে বললো, 'আমার সঙ্গে তুমি যা খুশি করতে পারো, কিন্তু কারো উপরেই কি দয়া নেই তোমার ?'

হারীত একটু থমকালো ; স্ত্রীর মুখে এ-রকম কথা শুনতে সে আশাই করেনি। কিন্তু—সেইজন্যই—ওটা সে গ্রাহ্য করলো না,

যেন শুনতেই পেলো না, একটু বাঁকা ঠোঁটে মিটিমিটি হেসে বললো, 'তুমি বোধহয় বড্ড আশা দিয়েছিলে তাকে ? বোধহয় ভেবেও ছাখোনি যে শুধু তার ইচ্ছা আর তোমার গরজই এখানে চলবে না ?'

শাশ্বতীর কান্না পেলো, হাত কামড়াতে ইচ্ছে করলো। আর যেহেতু যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো অবস্থায় স্বামীর চেয়ে বড়ো বন্ধু বিবাহিত স্ত্রীলোকের হয় না, তাই আবার স্বামীকেই আবেদন জানালো, 'কাল সন্ধেবেলা তুমি কি বাড়ি থাকতে পারবে ?'

'থাকতেই হবে !'—কেজো সুর লাগলো হারীতের গলায়—'আমার কাছে লোক আসবে তখন।'

'আমি ভাবছিলাম—মজুমদার এলে তুমিও যদি—তোমারই-তো বাড়ি—আর তাছাড়া কথাটা বলাও তো—'

'আমার কি কোনো দরকার আছে ? কথাটা তো ভালো লাগবে না তার, তবু তোমার মুখে শুনলে—আর তুমি অনেকটা মোলায়েম ক'রেও বলতে পারবে। কিন্তু বসতে দেবে কোথায় ?'

শাশ্বতী না-বুঝে ভুরু কুঁচকালো।

'সকাল-সকাল এসে যায় তো ভালো, নয়তো ওরা সব এসে পড়লে—'

'এসে পড়লে কী হবে ?'

'আমাদের কথাবার্তার মধ্যে বাইরের লোক থাকতে পারে না তো,' হারীত গম্ভীরভাবে জানালো।

'তার মানে—' শাশ্বতী দিশেহারা চোখে তাকালো—ভদ্রলোককে বসতে দিতে পারবো না ?'

হারীত-স্ত্রীর উৎকণ্ঠা খুব সহজেই দূর ক'রে দিলো, 'কেন, খাবার ঘরে বসতে পারো তোমরা।'

খাবার ঘরে! ঐ-বিনা-পাখার খুপরিতে! শাশ্বতীর মনের উপর দিয়ে ভেসে গেলো মেট্রো সিনেমার দোতলা, চাং-আন রেস্তোরাঁ, কাউফমানের কফি। সেদিন তো হারীতও ছিলো, আর—যতটুকুই, যতক্ষণেরই হোক—ভালোও তো লেগেছিলো তার?

স্ত্রীর ফ্যাকাশে মুখে চোখ রেখে হারীত এবার মলম লাগালো, 'বসতে আরাম হবে না ওখানে, কিন্তু তোমাদেরও তো নিরিবিলি চাই। আগে যদি আমাকে জানাতে—'

'তোমাকে জিগেস না-ক'রে এটা করাই ভুল হয়েছে আমার,' মানতে হ'লো শাশ্বতীকে।

'তা এক কাজ করতে পারো,' আরো একটু শুশ্রূষা করলো হারীত, 'বিজুকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে দাও—অন্য সময়ে—কি অন্যদিন—'

'আর আসবারই বা দরকার কী। বিজুই ব'লে দেবে।' শাশ্বতীর ঠোঁট দুটি এঁটে গেলো, যেন আর কথা বেরোবে না।

'ভগ্নদূত বিজন!' স্ত্রী মুখ থেকে রঙের শেষ চিহ্নটুকু মুছে নেবার কৃতিত্বে হারীত গলা ছেড়ে হাসলো।

ভগ্নদূত? এত সহজেই? বিজন তাণ্ডব বাধালো। কেন? মজুমদারের দোষ কী? কুচ্ছিৎ, না গরিব? না কি মানুষ মন্দ? বয়স বেশি? পাশ করেনি? ব্যবসা করে? আরেকজন পাশ-না-করা বেশি বয়সের ব্যবসাদারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাওনি তোমরা? কোন

হিশেবে মগমুলুকের টেকোমাথার কাঠখোট্টা বর্ধনের চাইতে প্রবীর মজুমদার খারাপ হ'লো? একটা আজেবাজে মানুষ নাকি?—পাঁচজনকে চেনে কলকাতার শহরে, পাঁচটা খোঁজখবর রাখে, গান বোঝে, ফাইন আর্টস-এ ইন্টারেস্ট আছে। একটা ভদ্রলোক! এদিকে পয়সা কত! বালিগঞ্জে তার জমি কেনা আছে, জানো? আরেকটা গাড়ি কিনছে, জানো? ইনশিওরেন্সের প্রিমিঅম কত দেয়, জানো? কী জানো তোমরা তার কথা—সে কি তোমাদের হারীত-জামাইয়ের মতো কঞ্জুষ, না কি কলকাত্তাই বাবুদের মতো অল্প-পরানী! কত বড়ো হার্ট!—এই-তো ভাগনিকে এনে রেখেছে, আর চাকরি দিয়ে বাঁচিয়েছে কত গরিব আত্মীয়কে! আর কী-অবস্থা থেকে উঠেছে—কিছু ছিলো না, নিচ্ছন গরিব—সেই থেকে আজ কোথায়? এটা কি একটা কম কথা? কর্মবীর—একদিন স্যর আরেন-টারেনই হবে হয়তো! অনেক ভাগ্যি তোমার মেয়ের যে তাকে পছন্দ করেছে এই মানুষ! আর তোমরা তুড়ি মেড়ে উড়িয়ে দিলে তাকে? কানেই তুললে না কথাটা? কেন, এত ডম্ফাই তোমাদের কিসের? বেশ-তো, বিয়ে দেবে না বুঝলাম, কিন্তু কারণটা শুনতে পাই না? আর তো কিছু-না—আমার চেনা, আমার বন্ধু, আমিই তাকে এ-বাড়িতে এনেছি, এই তো তার দোষ? আমি যা বলবো, ঠিক তার উল্টোটা না ক'রে তো টিকতে পারে না রাজেন মিত্তির! এই কথাই যদি অন্য কেউ বলতো, অন্য যে-কেউ, তাহ'লে এর সঙ্গেই বিয়ে দিতে না নাচতে-নাচতে! চিনি না আমি তোমাদের!

সকালে-সন্ধ্যায়—রাজেনবাবু যখন বাড়ি থাকেন—বিজন বারান্দায় দাঁড়িয়ে এক-একবার চীৎকার ক'রে এই বক্তৃতাটি

উগরোতে-উগরোতেই ছিটকে বেরিয়ে যায় রাস্তায়, তক্ষুনি ফিরে আসে গোলপোস্টে ধাক্কা-খাওয়া ফুটবলের মতো, আবার গলা লোটায়, দম আটকে যেন খুন হ'য়ে যাবে সেখানেই। ঘেঁষাঘেঁষি পাড়ার পাশাপাশি বাড়িতে পৌঁছয় তার গলা—কথা ; কাছাকাছি জানলাগুলিতে মেয়েরা দাঁড়িয়ে যায়, পুরুষরা কেউ-কেউ রাস্তায় বেরিয়ে আসে, আর বাড়ির যে-দু'জন এর লক্ষ্য, তারা দুই আলাদা ঘরে নিঃশব্দে ব'সে তখনকার মতো বধির হবার প্রার্থনা জানায়। পুনরুক্তির গুণে বাগ্মিতার আরো বিকাশ হয় ; আরো তথ্য জোটে, আরো জোরালো যুক্তি : সুচিত্র বর্ণনায়, বিচিত্র বিশেষণে আর মর্মস্পর্শী ইঙ্গিতে বিজন এক-একবার প্রায় প্রতিভার পরিচয় দিয়ে ফেলে।

একবার বিজন বললো, 'এ-ই যদি তোমাদের মনের কথা, আগে মনে ছিলো না ? বিয়ে যদি না-ই দেবে, এগোলে কেন এত দূর !'

স্বাতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'বলছিস কী তুই ?'

এতক্ষণে স্বাতীকে যুদ্ধে নামাতে পেরে বিজনের মুখে হিংস্র হাসির ঢেউ উঠলো !—'ঠিক বলছি ! মনে ছিলো না নেমন্তন্ন নেবার সময়—ঢ'লে-ঢ'লে কথা বলার সময়—দুপুরবেলা একলা বাড়িতে একঘণ্টা গল্প করার সময় !'

'আস্তে কথা বল !'

'আস্তে বলবো কেন—আমি কি ভয় করি তোকে, না তোর বাবাকে ?—সকলে জানুক তোর কেলেঙ্কারি—'

'—এই !' দরজার ধারে দাঁড়িয়ে রাজেনবাবু একটা চীৎকার দিলেন, যতটা চীৎকার তাঁর পক্ষে সম্ভব।

বিজনের বিক্রম কমলো না। ফুলে-ফুলে বলতে লাগলো, হ্যাঁ—সকলে জানুক! কেউ কি জানে—বাবাও কি জানে তুই কী-একটা— ! তলে-তলে আরেকজনের সঙ্গে—ঐ-যে একটা ছিঁচকে প্রোফেসর—কত চিঠি-লেখালেখি, কত রঙ্গরস—তোর কীর্তিকাহিনী সব ফাঁশ করবো না আমি—আর তারপর কি ভেবেছিস কাউকে তুই পাকড়াতে পারবি? হয় তুই মজুমদারকে বিয়ে করবি, নয় কেউ তোকে বিয়ে করবে না—শোন—শুনে রাখ—কেউ না—আর শেষ পর্যন্ত ঐ তাকেই—হ্যাঁঃ, তবে আমার নাম বিজনচন্দ্র!' নিজের বুকে থাপ্পর মাড়লো সে, শূন্যে লাফ দিলো একটা, বেরিয়ে গেলো গনগনে একটা কামান-গোলার মতো।

স্বাতী কাঁপছিলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, রাজেনবাবু তার পিঠে হাত রেখে তাকে ঘরে নিয়ে এলেন। খানিকক্ষণ দু-জনেই যেন বোবা হ'য়ে রইলো, তারপর যখন বোঝা গেলো যে বিজন আপাতত আর ফিরবে না, তখন রাজেনবাবুর গলা দিয়ে অস্ফুট একটা 'উঃ' বেরোলো।

আওয়াজটা আস্তে-আস্তে হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো, কোনো প্রতিধ্বনি জাগালো না।

আবার শব্দহীনতার জলে ডুবতে-ডুবতে রাজেনবাবু পায়ের তলায় হঠাৎ মাটি পেলেন। মুখ তুলে নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'এক কাজ করলে হয়—'

স্বাতীও মুখ তুললো কথা শুনতে।

'এইরকমই তো যন্ত্রণা করবে তোকে—' রাজেনবাবু বিজনের নামটা ছেড়ে গেলেন—'আমি তো সারাদিন বাড়ি থাকি না, আর থাকলেও—' তাঁর গলা বুজলো এখানেই।

বাবার জন্য তীব্র একটা কষ্ট হ'লো স্বাতীর।

'তুই না-হয়—' একটু থামলেন রাজেনবাবু—না-হয় তোর বড়দির কাছে একবার—কত খুশি হবে—আমিই দু-দিনের ছুটি নিয়ে—নয় তো সরস্বতীর কাছে দিল্লিতে—। যাবি ?'

স্বাতী বললো, 'না বাবা, কোথাও যেতে হবে না।'

'গেলে হয়তো ভালোই লাগবে—মনটাও—'

স্বাতী আবার বললো, 'না !'

'কিন্তু—'এবার রাজেনবাবু একটা অস্পষ্ট সর্বনামের সাহায্য নিলেন—'কিন্তু ওরা যদি—কী বিশ্রী—বাড়ির মধ্যে একটা—'তখনকার মতো একটা সম্পূর্ণ বাক্যরচনার শক্তি তাঁর যেন লোপ পেলো।

'দাদার ভয়ে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাবো নাকি ?' স্বাতী ঠোঁট বাঁকালো, প্রায় হাসলো, আর বাবার চুপ ক'রে তাকানোর উত্তরে আবার বললো, 'দাদা আমার কী করবে ?'

এর পরে একজনও আর কথা বললো না, একজনও উঠলো না সেখান থেকে। স্বাতী—যদিও সে-ই সাহস দিলো বাবাকে, তবু বাবার কাছেই ব'সে থাকতে তার মন চাইলো, আর রাজেনবাবু হঠাৎ বুঝলেন—বুকে ধাক্কা দিলো কথাটা—যে এ-ই আরম্ভ হ'লো, আর এই আরম্ভ মানেই শেষ—শেষ মানে, স্বাতীর নতুন আরম্ভ। সন্ধ্যা তখন, ঘোর নেমেছে ঘরে ; হাওয়ায় উড়ছে দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের পাতা যেন পরের মাসগুলির জন্য অস্থির।

হালকা পায়ের শব্দ হ'লো বাইরে। 'শাশ্বতী বোধহয়—' ব'লে রাজেনবাবু উঠে আলো জ্বাললেন।

ঘরে ঢুকে শাশ্বতী একবার বাবার, একবার বোনের দিকে

তাকালো। দাঁড়িয়ে থাকলো চুপ ক'রে। স্বাতী উঠে বললো, 'বোসো, ছোড়দি, আমি স্নান ক'রে আসি।'

মাঝে ক-দিন শাশ্বতী আসেনি। তার গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, 'বোস!'

স্বাতীর ছেড়ে-যাওয়া চেয়ারটা যদিও কাছেই ছিলো, শাশ্বতী এগিয়ে এসে বসলো খাটের ধারে, আড় হ'য়ে, বাবার মুখোমুখি জিগেস করলো, 'কী হয়েছে?'

রাজেনবাবু উত্তর দিলেন না।

বাবার শুকনো, কুঁচকোনো, মুখের উপর চোখ রেখে শাশ্বতী প্রশ্নটির পুনরুক্তি না-ক'রে পারলো না।

রাজেনবাবুকে শেষ পর্যন্ত মুখে আনতে হ'লো, 'বিজুর যন্ত্রণা—!'

'বিজু? বিজুর কথা ছেড়ে দাও!' কেন যন্ত্রণা, কী-রকম যন্ত্রণা, শাশ্বতী যেন নিজেই তা বুঝে নিলো।

বুক-ভরা গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়লেন রাজেনবাবু।

একটু থেমে শাশ্বতী বললো, 'কিন্তু বিজু মন্দ ব'লে তুমিও অন্ধ হোয়ো না, বাবা।'

যেন সামনে কিছু ভয়ের দেখতে পেয়ে রাজেনবাবু হঠাৎ চোখ বুজে ফেললেন।

'শাশ্বতী—থাক—এখন আর—'

'না বাবা, আমি তর্ক করবো না তোমার সঙ্গে। শুধু একটা কথা ব'লে যাবো। তারপর তুমি যা ভালো বোঝো কোরো।'

রাজেনবাবু অপেক্ষা করলেন, ডাক্তারের ছুঁচের সামনে রোগীর মতো।

'কথাটা এই,' শাশ্বতী ন'ড়ে-চ'ড়ে বসলো। 'বিজুর কথা ভুলে যাও, স্বাতীকেও এখানে এনো না; মনে করো তুমি একজন মেয়ের বাপ—মেয়ের মা নেই—সমস্তটা দায়িত্বই তোমার উপর।'

শাশ্বতী তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে তাঁর দায়িত্বের কথা, এটা নিঃশব্দে মেনে নিলেন রাজেনবাবু।

'এখন মেয়ের যদি বিয়ের কোনো প্রস্তাব আসে, তুমি সেটা নিয়ে ভাববে-তো অন্তত একবার? তুমি কি ঠিক জানো যে এটা—এই ব্যাপারটা নিয়ে যতটা তোমার ভাবা উচিত ততটাই তুমি ভেবেছো?'

এবারেও রাজেনবাবু কিছু বললেন না, আর শাশ্বতী যেন উৎসাহ পেয়ে তক্ষুনি আবার বললো, 'না কি তুমি কিছু না-ভেবেই নেহাৎ হেলাফেলা ক'রে, কি মেয়েকে আরো ক-দিন কাছে রাখতে চাও ব'লে—'

'তোর তা-ই মনে হয়?' রাজেনবাবু হঠাৎ বাধা দিলেন কথায়।

'রাখতে চাইলে কিছু দোষের না—বিজুটা যে-রকম—আর আমাদের মধ্যে ওকেই-তো তুমি সবচেয়ে—'

'নাকি?'

'তাই যদি হয়—বেশ-তো, মজুমদার অপেক্ষা করবে—ছ-মাস—একবছর—এমনকি দু-বছর—'

'গিয়েছিলো বুঝি তোর কাছে?'

'তার পক্ষ নিয়ে আমি কিছু বলছি না—সে আমার কেউ না—আমি শুধু এটুকু দেখছি যে মেয়ের জন্য মা-বাপের—সাধারণ যে-সব আকাঙ্ক্ষা থাকে, তার সব না হোক অনেকগুলোই সে

মেটাতে পারে—আর—আর এমনও তো হ'তে পারে যে স্বাতীর মনই বদলে গেলো পরে?'

'বদলাবার ভার তুই নিবি? না সে নিজেই?'

শাশ্বতী আরো গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'না, সে আর আসবে না তোমাদের বাড়িতে, কিচ্ছু বিরক্ত করবে না, যদি-না, যতদিন-না তোমরা তাকে ডেকে পাঠাও।'

রাজেনবাবু নিঃশব্দে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন।

'তোমাকে কথাটা জানানো দরকার মনে করলাম—মজুমদারের জন্য না, নিজেদেরই জন্য। আপাতত স্বাতীর মন উঠছে না ব'লে, কিংবা নিজে তুমি ও-রকম মানুষ পছন্দ করো না ব'লে উড়িয়ে দিয়ো না একেবারে; ভেবে দেখো। আর-কিছু বলবার নেই আমার।'

শাশ্বতী উঠলো, আর তখনই নিজের শেষ কথাটার বিরোধিতা ক'রে বললো, 'মা থাকলে একে অপছন্দ করতেন না। তোমার তিন মেয়ের পাত্র মা-ই তো পছন্দ করেছিলেন?'

'আর তার পর থেকে অবশ্য তুই করছিস,' বললেন রাজেনবাবু।

'আমার পছন্দই কি মন্দ?' হাসির একটু ঝিলিক দিলো শাশ্বতী, আর সঙ্গে-সঙ্গে রাজেনবাবুও চিকচিকোলেন: 'আজ কী? পান্তুয়া না জলতরঙ্গ?'

'আজ যাই, বাবা।'

'এখনই?'

'হ্যাঁ—এখান থেকে আবার ভবানীপুরের বাড়িতে—'

একটু থেমে রাজেনবাবু বললেন, 'বেশ একা-একাই চলাফেরা করিস আজকাল?'

'ভালোই লাগে—আর সব সময় সঙ্গে নিয়ে ঘুরবেই বা কে ?'

'হারীত বুঝি ওখানে ?'

'আপিশ থেকেই ফেরেনি—এতক্ষণে ফিরেছে হয়তো—উনি যাবেন তাঁর সময়মতো।—আচ্ছা, যা বললাম ভুলো না।' হিল-তোলা জুতোর খুটখুট আওয়াজ করতে-করতে শাশ্বতী চ'লে গেলো। হঠাৎ যেন রাজেনবাবুর মনে হ'লো এই ভদ্রমহিলাটিকে তিনি চেনেন না।

স্নানের পরে স্বাতী এসে বললো, 'ছোড়দি কোথায় ?'

'তাড়া ছিলো—শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন আবার—আর শ্বশুর-শাশুড়ি খুব-তো ভালোবাসেন ওকে—' রাজেনবাবু দরকারের চেয়ে খানিকটা বেশিই বললেন।

—চ'লে গেলো ! স্বাতীর মুখ ফুটলো না, কিন্তু কথাটা তার সমস্ত মুখে লেখা দেখলেন রাজেনবাবু। আর তখনকার মতো সব কথা যেন ফুরিয়ে গেলো তাঁর সঙ্গে স্বাতীর।

স্বাতী একখানা বই হাতে বসবার ঘরে এলো। বসবার ঘরের একটা প্রভাব আছে মনের উপর; ওখানেই আমরা বাইরের জগৎকে বাড়িতে ডাকি ; বাইরের কেউ না-থাকলেও, একা থাকলেও ওখানে নিজেকে অন্য অনেকের অংশ মনে হয়, যেটা একান্তই নিজের একলার সেটাকে তত যেন প্রকাণ্ড আর লাগে না। স্বাতী অন্তত সেই আশাতেই ও-ঘরে এলো, তার একলার ভার হালকা হবার আশায়, অন্তত জানলা দিয়ে চারদিককার পৃথিবীর একটু আভাসের আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু আশার চেয়ে বেশি পেলো সে, অনেক বেশি, কেননা সে স্থির হ'য়ে বসবার মাত্র কয়েক মিনিট পরে—জানলা

দিয়ে একটুখানি আভাস না, খোলা দরজা দিয়ে বাইরের সমস্তটা পৃথিবী একেবারে সশরীরে হেঁটে চ'লে এলো ঘরের মধ্যে।

'শুনেছো খবর ? শুনেছো ?' হারীতের চুল উড়ুক্কু, চোখ চকচকে, আর মুখের রোদে-পোড়া চামড়ার তলায় অন্য-একটা লালচে রঙের ছটফটানি।

'কী ? কী-হয়েছে ?' কী-জানি-কী ভেবে ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালো স্বাতী।

'হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে ! হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে !' দু-বারই শূন্যে হাত ছুঁড়লো হারীত। 'শোনোনি এখনো ?'

নিরাশ হ'য়ে, নিশ্চিন্ত হ'য়ে, স্বাতী ব'সে পড়লো আবার।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে হাঁটতে-হাঁটতে হারীত ভেরী বাজালো, 'মরবে ! মরবে এবার ! ছিন্ন হবে কাস্তেতে, চূর্ণ হবে হাতুড়িতে ! এতদিন-তো শুধু রিহার্সেল—আসল পালা তো এবার ! ···আছো কোথায়, স্বাতী, ভাবছো কী—কী-যে হবে দেখতে-দেখতে —লড়তে হবে, সকলকে লড়তে হবে—সমস্ত পৃথিবী ভ'রে সকলকে —তৈরি হও, তৈরি হও সব !'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী বললো, 'আপনি কি আপিশ থেকে ?'

'তা বলতে পারো—' হঠাৎ শরীরটাকে একটা চেয়ারের উপর ছেড়ে দিয়ে হারীত অন্য রকম গলায় বললো, 'খবরটা অবশ্য তোমার কাছে কিছু না—এখন না—কিন্তু বুঝবে একদিন, বুঝিয়ে ছাড়বে।'

স্বাতী বললো, 'ছোড়দি এই একটু আগে চ'লে গেলো।'

'নাকি ?'

'আপনাদের ভবানীপুরের বাড়িতে গেলো এখান থেকে।'

'ভালো।—আমি অবশ্য তোমার ছোড়দির জন্য আসিনি, এসেছিলাম তোমাকেই খবরটা দিতে।'

'আমাকে!' স্বাতী হেসে ফেললো। 'আমাকে এতটা যোগ্য ভাবলেন হঠাৎ?'

হারীতের মুখের ভাব সহজ হ'লো, ছোট্ট হাসি ফুটলো ঠোঁটে।—'তা আজকাল বেশ যোগ্য হ'য়ে-তো উঠেইছো। বেচারা প্রবীরচন্দ্র মজুমদার!' বিশ্ব-কাঁপানো ঘটনা সত্ত্বেও কৌতুকের ক্ষেত্র এখনো বেশ প্রশস্ত দেখা গেলো হারীতের মনে।

স্বাতী তার মুখের ভাবটা বেশ সপ্রতিভ রাখার চেষ্টা করলো।

'বেচারা! আশা ছাড়েনি এখনো—শাশ্বতীর কাছে কী-যেন ঘ্যানর-ঘ্যানর করছিলো কাল! বেচারা!' প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থীকে ঐ আখ্যায় বিদ্ধ ক'রে-ক'রে হারীতের যেন আশা মেটে না।

স্বাতী অবাক হ'লো খবরটা শুনে। ঘ্যানর-ঘ্যানরের সারমর্মটা কী? জিগেস করলো না, কিন্তু আশা করলো হারীতদা নিজেই বলবেন।

সে-আশা মিটলো না। হারীত এর পরে বললো, 'তা বেশ, ভালো! আরো গৌরব হোক তোমার, আরো ক-জনের হৃদয় ভাঙো—তবে-তো! ফরাশিরা বলে, সেই মেয়েই বিয়ে করার যোগ্য আগে যে সাতজনকে অন্তত—' কথা শেষ করলো না হারীত, হঠাৎ বোধহয় বিশ্ববার্তা মনে পড়লো আবার, মুখের পেশী শক্ত হ'লো, একটানে দাঁড় করালো অনেক-ঘোরা ক্লান্ত শরীরটাকে।

'যাচ্ছেন নাকি?'

'হ্যাঁ, এখন মকরন্দর ওখানে—'

'চা—'

'না—' হারীত ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজেনবাবুকে দেখতে পেলো, আর শ্বশুরের সম্মানে মুখশ্রীতে অমায়িকতার চেষ্টা করলো।

রাজেনবাবু আরম্ভ করলেন, 'শাশ্বতী তো—'

'শুনলাম,' হারীত সময় নষ্ট করলো না। 'হ্যাঁ—আজ বুঝি মা-র কী ব্রত-ট্রত—ও-সব আবার আছে তো ওঁদের!' হারীতের হাসিতে করুণা ফুটলো একসঙ্গে নিজের মা আর স্ত্রীর বাবার প্রতি।

'তুমি ওখানে—'

'দেখি। এখন যাচ্ছি এক জায়গায়—সেখান থেকে যদি—না,' শ্বশুরের অনুক্ত অনুরোধের আগাম জবাব দিলো সে—'এখন আর চা না—যাচ্ছিলাম—আচ্ছা যাই।' ক্ষিপ্র পিছন ফিরলো হারীত, দ্রুত অদৃশ্য হ'লো দরজার বাইরে।

রাজেনবাবু বসলেন মেয়ের কাছে। একটু হেসে বললেন, 'হারীত, তোর ছোড়দির জন্যই এসেছিলো, তাকে না-পেয়ে আর বসলো না।'

'না বাবা,' স্বাতীও হাসলো বাবার উত্তরে। 'হারীতদা এসেছিলেন আমাকে এই খবরটা দিতে যে হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেছে।'

'নাকি?'

'হ্যাঁ, সেইজন্যই—'

'যুদ্ধ তবে ছড়ালো!'

বাবার মুখে এ-কথা শুনে স্বাতী থমকালো।—'সত্যি কি খুব খারাপ হবে এর পরে? হারীতদা তো হুলুস্থুল ক'রে গেলেন!'

'আমরা ভেবে কী করবো। আর এর চেয়েও বড়ো ভাবনা আমাদের আছে এখন।'

বাবার শেষ কথাটা শুনে আবার ভারি হ'লো স্বাতীর মন।

মিনিটখানেক রাজেনবাবু কিছু বললেন না। তারপর আস্তে-আস্তে আরম্ভ করলেন : 'স্বাতী, শোন। তোর মা নেই, তাই তোকেই বলতে হচ্ছে—আর তুইও বুদ্ধিমতী, নিজের ভালো-মন্দ নিজেই-তো বুঝিস।'

স্বাতীর শাদা গালে সরু একটি নীল শিরা একটু স্পষ্ট হ'লো।

'আর এতদিনে এটাও নিশ্চয়ই বুঝেছিস,' রাজেনবাবুর গলায় একটু-যেন হালকা সুর লাগলো, 'যে মানুষের জীবনে—মেয়েদের জীবনে বিশেষ ক'রে—বিয়েটা একটা মস্ত ব্যাপার, জীবনের অনেকটা সুখেরই কারণ।'

ব'লে রাজেনবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। আর মেয়ে—যদিও তার শরীরের প্রত্যেকটি স্নায়ুতে টান পড়ছিলো তখন—কিছু বুঝতে দিলো না বাবাকে, চোখ এড়িয়ে উত্তর দিলো, 'দুঃখেরও।'

নভেল-পড়া কন্যার কথা শুনে একটু অবাক হলেন রাজেনবাবু। —কিন্তু ও যদি এতটাই বোঝে, তবে-তো আরো ভালো। এই দুরূহ আলাপের পরের ধাপটি মেয়েই যেন যুগিয়ে দিলো বাপের মুখে : 'হ্যাঁ, দুঃখেরও—হ'তে পারে। আর তাই-তো এত চেষ্টা আমাদের, এত চিন্তা। দুঃখ তো কেউ চায় না, সুখের চেষ্টাই করে সকলে।'

স্বাতী একটু চুপ। তারপর :

'আগে বলা যায় নাকি?'

'অদৃষ্ট ব'লে একটা কথা আছে তো সেইজন্যই।' ব'লেই

রাজেনবাবু বুঝলেন মেয়ের কথার ঠিক উত্তর এটা হ'লো না, তাই আবার বললেন, 'সে-তো যায়ই না। দেখতে যেটা তেমন ভালো না, সেটাই হয়তো সুখের দাঁড়িয়ে যায়। ঐ প্রবীর ছেলেটি--তার স্ত্রী হয়তো সুখী হবে খুব।'

গলার উপর স্বাতীর মাথাটি একটু পিছনে সরলো। স্থির হ'য়ে বললো, 'হয়তো কেন—নিশ্চয়ই!' তারপর হঠাৎ জিগেস করলো, 'ছোড়দি এসে কী ব'লে গেলো তোমাকে?'

'শাশ্বতীর ইচ্ছে তো জানিসই,' স্পষ্ট জবাব দিলেন রাজেনবাবু। 'আমি তোর ইচ্ছেটা জানতে চাই, তাই—'

'তা কি তুমি জানো না?' স্বাতী আর পারলো না, দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

স্বাতীর বাঁকা-বাঁকা কুচকুচে-কালো ঘন চুলের উপর রাজেনবাবুর চোখ পড়লো; একটু দেরি ক'রে বললেন, 'আমি-তো তোকে জিগেস করিনি আগে, ধ'রেই নিয়েছি এ-বিষয়ে আমার কথা তোরও কথা। কিন্তু আমার অপছন্দ ব'লেই তুই যদি—'

'তুমি আমাকে তা-ই ভাবো?' স্বাতী মুখ তুলে জ্বলজ্বলে চোখে তাকালো।

'আমার যা ভালো লাগে না,' রাজেনবাবু আস্তে-আস্তে বললেন,' সেটা তোরও যাতে ভালো না-লাগে, সে-রকম চেষ্টাই-তো তোর পক্ষে স্বাভাবিক? কিন্তু আমাকে বাদ দিয়ে তুই ভেবে ত্যাখ, তারপর যদি তোর মনে হয়, যদি এতটুকুও—'

'বাবা!'

রাজেনবাবু কষ্টের কান্না শুনলেন সে ডাকে। মেয়ের মুখে শান্ত

চোখের দৃষ্টি বুলিয়ে বললেন, 'আমি তোকে এই শুধু বলতে চাই যে আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা ভাবিসনে। তোর ইচ্ছামতোই সব হবে।'

'তবে আর কী!' রং, রস, রক্ত ফিরে এলো স্বাতীর মুখে।

'তোর ইচ্ছাটা তুই যাতে বুঝতে পারিস—'

'ইচ্ছা বুঝি বুঝিয়ে দিতে হয় কাউকে?'

'তাও হয়,' রাজেনবাবু হাসলেন। 'ছোটোছেলে কি বুঝতে পারে তার খিদে পেয়েছে?'

'আমি আর ছোটো নেই, বাবা!' স্বাতী উঠে দাঁড়ালো, লম্বা, সংবৃত, সুন্দর।

—কিন্তু যত বড়ো তাকে দেখায় সে কি তত বড়ো? এখনো-তো জীবনের কাছে আশ্রয় তার অক্ষুণ্ণ, প্রশ্রয় প্রচুর; এখনো-তো জীবনের অনেকটাই তার খেলা-খেলা, তার দিন-রাত্রি শুধু ভালো-লাগা আর না-লাগার শাদা-কালোয় আঁকা। বয়স্ক জীবনের ভয়, অনিশ্চয়তা, বাধ্যতা, দায়িত্ব—এ-সবের সে কী জানে? একশো রকমের আশ্চর্য জটিলতার কথা সে পড়েছে, কিন্তু নিজের জীবন যখন একটুখানিও জটিল হ'য়ে ওঠার ভয় দেখায়, তার ব্যবস্থা কি স্বাধীনভাবে নিজেই করতে পারে? তখন-তো সেই পুরোনো আর প্রথম নিশ্চয়তাই তার নির্ভর?···কিন্তু তাও কি ভাঙলো আজ? বাবাও কি তাকে ছেড়ে দিলেন এই ভীষণ পৃথিবীতে?···খুব-তো তখন সাহস দেখালো, কিন্তু রাত্রে বিছানার মধ্যে কুঁকড়ে রইলো ভয়ে, বুকের ভিতরটা শুকিয়ে উঠতে লাগলো। দাদার সঙ্গে হারীতদার কথার কোথায় একটা মিল দেখলো সে,

আর বাবাও কি ভাবছেন যে সে-ই—? তবে কি তারই দোষ? প্রথম থেকে সতর্ক হ'লে, সচেষ্ট হ'লে, এই ফাঁড়াটা এড়াতে পারতো না কি? ফাঁড়া কাটলো, কিন্তু কথাটা কি এই দাঁড়ালো যে মনে-মনে এটা সে চেয়েইছিলো? কিন্তু কেউ যদি তাকে অন্যায়ভাবে চিন্তা করে, সে কী করতে পারে? তাকে কি আজ প্রমাণ করতে হবে যে সেই অন্যায়ে তার কোনো হাত ছিলো না? আর সেটা প্রমাণ করার পরেও অপরাধীই থেকে যাবে? কী বিপদ—কী আপদ এসে জুটলো তার কপালে!

ভালো ঘুম হ'লো না সে-রাত্রে। অনেক বেলায় উঠলো পরের দিন, আর সে ওঠবার খানিক পরেই, যেন ঠিক সময়ের অনেকটা আগেই, বাবা চ'লে গেলেন আপিশে। স্বাতীর মনে হ'লো, বাবা তাকেই এড়ালেন।

স্বাতী চুল খুললো না, স্নান করলো না, বই খুললো না। দাঁড়ানো বইগুলির পুটের উপর দিয়ে চোখ চালিয়ে গেলো, কোনোখানে থামলো না চোখ, কোনো বই তাকে ডাকলো না আজ, আজ প্রথম সে বইয়ের কাছে কোনো জবাব পেলো না। হয়তো অন্য কোথাও জবাব আছে? ছাপার অক্ষরে না, হাতের লেখায়? দেরাজ থেকে বের করলো—চিঠি, একটি নীল আর এক গোছা শাদা খাম; একটু দেখলো তাকিয়ে, এখানে-ওখানে হাত ছোঁয়ালো; তারপর খুলে-খুলে পড়তে লাগলো প্রথম নীল খামটি থেকে শুরু ক'রে।...কিন্তু এ-ও তো বইয়ের মতো! শেষেরটির, শেষের ক-টির উপর সে প্রয়োগ করলো মনের সমস্ত ইচ্ছা আর ইচ্ছার সমস্ত শক্তি; তন্নতন্ন খুঁজলো লেখার ফাঁকে-ফাঁকে অন্য-কোনো কথা; প্রাণপণ চেষ্টা

করলো কথাগুলিকে দুমড়ে-মুচড়ে জবাব ছিনোতে, এক ফোঁটা নিশ্চয়তা নিংড়ে বের করতে।—কিচ্ছু না! শুধু সারি-সারি কথা, সাজানো কথা, সুন্দর কথা—কিন্তু এ-সুন্দর দিয়ে কী করবে সে, এর চেয়েও আরো কত সুন্দর কথা তো ছাপানো আছে বইয়ের পাতায়। পাহাড়ে বেড়াচ্ছেন, আনন্দে আছেন, মাঝে-মাঝে চিঠি লিখে সাহিত্যচর্চা করেন ;—এদিকে ছুটিও আর বেশি নেই, কিন্তু তাতে *কী? একেবারে শেষ সম্ভব দিনটি কাটিয়ে তবে-তো ফিরবেন।*

চিঠিগুলি তুলে রাখতে-রাখতে স্বাতীর মনে হ'লো সে যেন অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে হাঁটছে, অথচ কোথাও যাচ্ছে না, স্বপ্নে যেমন পথ আর ফুরোয় না, সেইরকম। আর হঠাৎ যেমন চমক দিয়ে স্বপ্ন ভাঙে, তেমনি একটা জেগে-ওঠার ধাক্কায় সব তার কাছে সহজ হ'য়ে গেলো ; স্বপ্নকে স্বপ্ন ব'লে চিনলো ; সোজা দেখতে পেলো চোখের সামনে বাস্তবের পরিষ্কার পথ।

কাগজ নিলো, কলমের টুপি খুললো। প্রথমবার 'শ্রীচরণেষু' লিখেছিলো, এখন 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' লেখে ; আজ কিছুই লিখলো না, শুধু :

> 'কবে আসবেন? ছুটি-তো প্রায় শেষ, আর আসতেই তো হবে। চিঠি আর চাই না। চিঠি আর ভালো লাগে না। এর উত্তরে আসবেন।'

নিজের নাম লিখে একটু তাকিয়ে থাকলো।

দু-মিনিট পরে স্বাতী নিজের হাতে সমর্পণ করলো ডাকবাক্সের বিশ্বস্ত অন্ধকারে তার জীবন, তার ভবিষ্যৎ, তার অদৃষ্ট।

২

সুখী, সুশ্রী, উজ্জ্বল একটি দিন। গ্রীষ্মের ধোঁয়ামুখে মেঘের ধোঁয়া, মেঘের ধোঁয়ারং কালো, আকাশ-ভরা কালো, আকাশ-ভাঙা বৃষ্টি, তারপর বৃষ্টি প'ড়ে-প'ড়ে তাপ জুড়োলো, মেঘ লুকোলো, আকাশ ফেটে নীল বেরোলো, সত্যি নীল, নরম অথচ জ্বলজ্বলে ঘন নীল, যে-নীল—যদিও নীলের জন্যই তার খ্যাতি,—বাংলার আকাশে দেখা দেয় বছরে আট কি দশ দিনের বেশি না। বাইরে রোদ্দুরটা নিশ্চয়ই গরম, কিন্তু ঘরে আলো, হলদে-সবুজ-বেগনি মেশানো আভা, যেন গাছপালার ভিজেসবুজ নিজের গায়ে মেখে নিয়েছে এই আলো। ভিজে ভাবটা হাওয়াতেও, ঝিরঝির বইছে ঠাণ্ডা, যখন বইছে না তখনো ঠাণ্ডা, এমনকি ইলেকট্রিক পাখাটাকে, যদিও এখন দুপুর, একটু ছুটি দিলেও চলে। স্বাতীর, অন্তত, থেমে-থাকা পাখাটার দিকে লক্ষ্যই নেই ; পরনে ঘাস-রঙের শাড়ি, নিচু-করা মাথার মাঝখান দিয়ে আলোর সুতোর মতো সিঁথি, আলোর দিনটির সমস্ত সুখ তার মুখে, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটি চিঠি পড়ছে সে, আর তার পিছনে, তার বাঁকানো ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তার চেয়ে লম্বা একজন, ঢোলা মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরা, গায়ে শার্ট, পায়ে স্যাণ্ডেল, হাতে দু-খানা বই আর একটি খাতা। তার দাঁড়িয়ে থাকার ভাবটা এমন যেন সে স্বাতীর মুখের কোনো-একটা কথা শুনবে ব'লে অপেক্ষা করছে, আর সেই কথার উপরে অনেক-কিছু নির্ভর করছে তার। একটা চিঠি প'ড়ে উঠতে

যেটুকু সময়, তার মতে, লাগতে পারে, সেটুকু দেরি করলো সে. তারপর কথা বললো :

'কী লিখেছেন মা ?'

'ভালোই আছে সব,' মুখ না-তুলেই জবাব দিলো স্বাতী।

'আমার কথা ?'

'আমার উপরেই তোর ভার দিয়েছেন বড়দি,' স্বাতী মুখ ফেরালো, তাকালো, হাসলো।

'আমি কি এখানেই থাকবো, না হস্টেলে যাবো ?'

'ওঃ, বড়ো-যে হস্টেলের শখ! সেখানে বাবু সেজে ঘুরে বেড়াবেন আর কলেজ ফাঁকি দেবেন রোজ! ও-সব হবে না—কেমন আমি তোমাকে কড়া শাসনে রাখি ছাখো না!'

'মা বলেছিলেন আমি এখানেই থাকবো। কিন্তু বাবা বলেছিলেন—না, না, ওঁদের অসুবিধে হবে!'

'আর-কী বলেছিলেন তোমার বাবা ?'

'বাবা কিন্তু আনতেই চেয়েছিলেন আমাকে—সেই পুজোর সময় সবাই যখন এলো। তখন মা-ই বললেন—না! সামনে পরীক্ষা!—এমন তখন রাগ হয়েছিলো মা-র উপর!'

'খুব রাগ ?' স্বাতী ভুরু বাঁকালো।

'হবে না! ছ-মাস দেরি তখনো পরীক্ষার!—আর ঐ এক মাস আমি কি পড়েছিলাম নাকি! মিছিমিছি আমার আসা হ'লো না!'

'তা বেশ-তো ; বেড়াতে না-এসে একেবারে থাকতেই এলি।'

'তাও কি তুমি ভেবেছো সহজে ? মা কি কম প্যানপ্যান করেছেন—কেন, এখনকার কলেজেই তো—ছেলেমানুষ, একা-একা

কলকাতায়—যত হ্যানো-ত্যানো জানেন মা!—আচ্ছা, তুমিই বলো, ওখানকার কলেজকে কি কলেজ বলে, না পুরো ষোলো বছর বয়সকে ছেলেমানুষ বলে?'

'বড়দি-যে তোকে ছেড়ে দিলেন শেষ পর্যন্ত, সেটাই তো আশ্চর্য। যা ভালো তিনি বাসেন তোদের!'

'নিজের ছেলেমেয়েকে সব মা-ই ভালোবাসে; ওতে আর নতুন কী আছে?'

'বাঃ, এক মাস হয়নি কলকাতায় এসেছিস, এরই মধ্যে বুলি কপচাতে শিখেছিস তো বেশ!'

'নাঃ, তুমিও আমাকে ছেলেমানুষ ভাবো!'

'তাতে আর দুঃখ কী—লম্বা তো হয়েছিস খুব! চিনতেই পারিনি প্রথম দিন দেখে—এই ডালিম? আমাদের ডালিম? ঠাশ ক'রে এত বড়ো হ'য়ে গেলো কবে?'

'তুমিও অনেক বড়ো হয়েছো, ছোটোমাসি।'

এ-কথার উত্তরে স্বাতী কিছু বললো না, কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটি চেয়ারে বসলো। চেয়ারগুলি আগে ছিলো ঘরের মাঝখানে, যেমন থাকা উচিত; এখন আছে একপাশে একটু ঘেঁষে-ঘেঁষে, কেননা বসবার ঘরের অর্ধেকটা এখন ডালিমের; সরু একটা তক্তাপোশ, ছোটো টেবিল—শাশ্বতীর পুরোনো দিনের পড়ার টেবিল, এতদিন যেটা রাজেনবাবুর ঘরে জায়গা জুড়ে প'ড়ে ছিলো—সেই সঙ্গে বেখাপ্পারকম নতুন একটা চেয়ার—মামার উপহার ভাগ্নেকে—টেবিলে বই, গোল টাইমপীস, দেয়ালে দৃশ্য-আঁকা ক্যালেণ্ডর, কিন্তু ছবির অংশ অনেকটাই ঢাকা প'ড়ে গেছে একই পেরেকে ঝোলানো

মালিকের নিজের কেনা চকচকে নতুন চৌকো আয়নাটিতে। এত জিনিশে নিশ্চয়ই একটু আঁটো হয়েছে ঘরটি, কিন্তু এখন—এই আলোর দিনে, এই সুখী, সুশ্রী, সুন্দর দিনটিতে বেশ হালকা-খোলা ছিপছিপে লাগছিলো ঘরটিকে ; যদিও একতলা, তবু জানলা বেশি ব'লে, আর জানলার পরদাগুলি দুপুরবেলার নিরিবিলির সুযোগে আর আজকের আশ্চর্য আলো-হাওয়ার খাতিরে স্বাতী সরিয়ে দিয়েছিলো ব'লে, আকাশের নীল-সোনার সচ্ছলতা পৌঁছতে পেরেছিলো ঐ ঘরটি পর্যন্ত।

ডালিম বসলো না, এগোলোও না, যেখানে ছিলো সেখানেই দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বললো, 'আচ্ছা ছোটোমাসি, আমি কি খুব বেশি লম্বা ?'

'লম্বাই-তো ভালো।'

'ভালো, কিন্তু বড্ড বেশি হওয়া ভালো কি ? আমি আবার রোগাও কিনা—কী করা উচিত আমার বলো তো ? এক্সেরসাইজ করবো ? কিন্তু এক্সেরসাইজ একবার ধরলে তারপর ছেড়ে দিলেই নাকি মোটা হ'য়ে যায় ?'

'রোগাও থাকবি না, মোটাও হবি না—মুশকিল হ'লো তো তোকে নিয়ে।'

'কেন, রোগা-মোটার মাঝামাঝি কিছু নেই বুঝি ?' ডালিম তার ছোটোমাসির দিকে তাকালো, একটু থেমে থাকলো, তারপর বললো, 'তুমি ব্যাকব্রাশ করতে বলেছিলে—ঠিক হয়েছে ?'

'দেখি ?'

লম্বা ডালিম মাথা নিচু করলো। বাপের মতোই শক্ত

কোঁকড়া চুল তার, ছেলেবেলার সিঁথি-স্মৃতি নিশ্চিহ্ন ক'রে ঠেলে তুলে দিয়েছে উপর দিকে।

স্বাতী বললো, 'বড্ড তেল দিয়েছিস, অত দিবি না। আর ঐ নীল শার্টটা কি নিজে পছন্দ ক'রে কিনলি ?'

ডালিম মুখ তুললো। 'ভালো না ?'

'রংটা বেশ—পরদা হ'লে মানাতো। আর তুই বুঝি কোঁচাবিরোধী ?'

ডালিমের মাথা আবার নিচু হ'লো। বিচ্ছিরি—এখন তা-ই লাগলো—বিচ্ছিরি মালকোঁচার ফুলে-ওঠা ভাঁজের দিকে একবার তাকালো, বিচ্ছিরি নীল রঙের শার্টটার দিকে একবার; তারপর মাথা নিচু রেখেই ভুরু কুঁচকে চোখ তুললো, স্বাতীর পিছন দিকের দেয়ালটা দেখতে-দেখতে বললো, 'আমি যা-ই করি আর না করি, আমি-তো আমিই থেকে যাবো।'

'তোর বুঝি অন্য-কেউ হ'তে ইচ্ছে করে ?' স্বাতী মুখ টিপে হাসলো, নিজের তেরো-চোদ্দ বছরের জ্বালা-যন্ত্রণার কথা মনে ক'রে।

'ইচ্ছেতে আর কী হয়, বলো ?' এর পরে, সেই দেয়ালে চোখ রেখেই, ডালিম আবার বললো, 'ইচ্ছে করলেই কি আমি সত্যেনবাবু হ'তে পারি ?'

স্বাতী জোরে হেসে উঠে বললো, 'এত লোক থাকতে ওঁকেই পছন্দ করলি ?'

বাঃ, সত্যেনবাবু খুব সুন্দর-যে !'

'সুন্দর ?' আর-এক দমক হাসলো স্বাতী। 'এ-কথা পৃথিবীতে তোর আগে কেউ উচ্চারণ করেনি।'

'আহা—লোকে-তো ফর্শা রং আর মাপজোক-মতো নাক-চোখ হ'লেই সুন্দর বলে। কিন্তু আমরা বলি, না—লাবণ্যই আসল।'

'আমরা মানে কে-কে ?'

ডালিম হেসে ফেললো তার একটু ফাঁক-ফাঁক দাঁত দেখিয়ে। চোখ সরিয়ে, ঠিক স্বাতীর মুখের উপর এনে বললো, 'তুমিই বলো ছোটোমাসি, সত্যেনবাবু সুন্দর না ?'

এ-কথার উত্তরে ছোটোমাসি ঠাট্টা করলেন, 'এ-রকম বুঝি কোনোদিন কেউ দ্যাখেনি ?'

ডালিম গম্ভীরভাবে বললো, 'কাউকে দিয়ে আমি কী করবো। আমি আমার চোখ দিয়েই দেখি।'

'ওরেব্-বাবা !' স্বাতীর হাসিতে দিনটির সমস্ত আলো সুর হ'য়ে বেজে উঠলো। 'এদিকে ওঁকে দেখলেই তো পালিয়ে যাস।'

'আমি আর কী কথা বলবো ওঁর সঙ্গে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে স্বাতী হঠাৎ বললো, 'তোর বোধহয় অসুবিধে হয় এ-ঘরে ?'

'অসুবিধে ? কেন ?'

'বসবার ঘর তো—কখনো কেউ এলে—'

'ওঃ, আমি কি আর তেমন ছেলে যে সব সময় শুধু পড়বো ব'সে-ব'সে ! আর আসেই বা কে।—মাঝে-মাঝে সত্যেনবাবু—' হঠাৎ থামলো ডালিম, তক্ষুনি আবার বললো, 'তোমাদের হয় না তো অসুবিধে ?'

স্বাতী বললো, 'বড্ড। বাবার তো রাত্তিরে ঘুম হয় না এ-কথা ভেবে যে তুই বুঝি একা ঘরে ভয়-টয় পেলি।'

'সে কী!' গোঁফের ছায়া-পড়া ঠোঁট এমন ক'রে বাঁকালো ডালিম যে দেখতে মিষ্টি হ'লো। 'আমি ভয় পাবো কেন?'

'আমিও তো তা-ই বলি। কিন্তু বাবা রাত্তিরে উঠে একবার দেখেই যাবেন—কী জানি, বলা তো যায় না, তোকে যদি ভূতেই ধরে কি রাক্ষসেই খেয়ে ফ্যালে!'

'কি-অন্যায়!'

'বাবার ইচ্ছে তুই তাঁর ঘরেই থাকিস। বলেন, "এখানে-তো অনেক জায়গা, আর আমি-তো থাকিই না সারাদিন"—'

'দাদু বড্ড—'

'হ্যাঁ, বাবা বড্ড। তা তুই কী বলিস?'

তার টেবিল, তার তক্তাপোশ, তার আয়না, তার ছিমছাম-গুছোনো ছোট্ট রাজত্বটির উপর একবার চোখ ঘুরিয়ে এনে ডালিম বললো, 'আমি—আমি এখানেই থাকি—কেমন, ছোটোমাসি?' তারপর ইচ্ছার সপক্ষে একটা যুক্তিও উদ্ভাবন ক'রে ফেললো, 'তোমাদেরও স্নবিধে—কেউ এলে-টেলে তক্ষুনি খবর দিতে পারি।'

'মস্ত স্নবিধে!' স্বাতী হাসলো, তারপর কড়া চোখে তাকিয়ে বললো, 'গল্প ক'রেই কাটাবি দিনটা, না কি কলেজ আছে-টাছে?'

টেবিলের টাইমপীসটার দিকে একবার চোখ ছুঁড়ে ডালিম উত্তর দিলো, 'এখনো দেরি আছে একটু। তোমাদের বেশ সকালে কলেজ—সারাটা দিন ছুটি পাও।'

'আমার ভালো লাগে না।'

ডালিম তক্ষুনি বললো, 'আমারও না! কোন ভোরে উঠতে হয়—। আচ্ছা ছোটোমাসি, সত্যেনবাবু তোমাদের কী পড়ান?'

'তুই যা একেবারেই পড়িস না, উনি তা-ই পড়ান।'

ডালিম চোখ দিয়ে হাসলো।—'বাঃ, আমি বুঝি কবিতা পড়ি না? দেখছো না আমার টেবিলে "সঞ্চয়িতা"?—নিশ্চয়ই খুব ভালো পড়ান উনি? আগে জানলে ওখানেই ভরতি হতাম। কিন্তু বাবা ব'লে দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সির কথা—বাবাও সেখানেই পড়েছিলেন—আর তাঁর কথামতো সায়ান্সও নিয়েছি—কিন্তু একটুও ভালো লাগছে না, ছোটোমাসি।'

ছোটোমাসি ধমক দিলেন, 'ভাগ, পালা এখন, আর আড্ডা না! দেরি হচ্ছে না কলেজের!'

ডালিম বই-খাতা হাতে কয়েকটি অনিচ্ছুক পা ফেলে দরজা পর্যন্ত এলো। আবার দাঁড়িয়ে বললো, 'আজ কলেজ হবে কি না কে জানে।'

'কেন?'

'রবীন্দ্রনাথের যে-রকম—'

'যাঃ! ও-কথা মুখে আনতে নেই।'

'না, না, কাল সবাই বলছিলো কিনা, আর আজকেও তো কাগজে—আচ্ছা, যাই।' ডালিম যেন নিজেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিলো রাস্তায়।

স্বাতী একভাবেই ব'সে থাকলো। আরাম লাগছিলো তার, শরীরের আরাম, ঝিরঝিরে দুপুরের আরাম, খেয়ে উঠে একটু গল্প-টল্পের পর পরিপাকের মসৃণতার আরাম। ব'সে-ব'সে ঝিমুনি এলো—ঘুমই আসছিলো, সত্যি বলতে—হঠাৎ ঘরের মধ্যে হালকা আওয়াজ শুনে চোখ বুজেই বললো, 'কী-রে, ফেলে গিয়েছিলি কিছু?'

উত্তর না-পেয়ে স্বাতী চোখ খুললো, চোখ খুলেই ছিটকে উঠে দাঁড়ালো।

'—কী ? কী হয়েছে ?'

শুকনো মুখ, উশকো চুল, চাপা ঠোঁট আর না-কামানো গাল—এতদিনের মধ্যে কখনো স্বাতী ছাখেনি সত্যেন রায়ের এ-রকম চেহারা। আর কথা যখন বললেন, আওয়াজটাও অন্যরকম শোনালো :

'শোনোনি এখনো ?'

'কী ?'

সত্যেন চোখ তুললো স্বাতীর মুখে, চোখ নামালো মেঝেতে বললো, 'রবীন্দ্রনাথ—' আর বলতে পারলো না।

সঙ্গে-সঙ্গে স্বাতীর মাথাও নিচু হ'লো, আর হাত দুটি এক হ'লো বুকের কাছে। খানিক আগে যখন বড়দির চিঠি পড়ছিলো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, ভঙ্গিটা সেইরকমই হ'লো অনেকটা ; আর তার ঘাড়ের, কাঁধের, পিঠের গড়নে—যেখানে তখন সুখের সুষমা প্রায় কথা বলছিলো—সেই সব রেখাই দুঃখ আঁকলো সেখানে, স্তব্ধ আনতি, দুঃখের আরো গভীর সুষমা।

দু-জনে দাঁড়িয়ে থাকলো মুখোমুখি। কিন্তু মুখোমুখি না, কেননা দু-জনেই নিচু মাথা, আর দু-জনেই চুপ। একটু পরে সত্যেন চোখ তুললো ; স্বাতী তা দেখলো না, কিন্তু সেও চোখ তুললো তখনই : প্রশ্নহীন শান্ততায় তাদের চোখোচোখি হ'লো।

সত্যেন রায় বললেন, 'চলো।'

'যাবো ? কোথায় ?'

'যাবে না একবার ? দেখবে না ?'

'নিশ্চয়ই!' ব'লেই স্বাতীর মনে হ'লো—কিন্তু বাবাকে না-ব'লে?

'চলো তাহ'লে।'

'কিন্তু আপনি— এখন কোত্থেকে?'

'আমি ওখানেই—এখন আসতাম না—তোমার জন্য এলাম। তুমি-তো ছাখোনি কখনো—দেখলে না—তবু যদি শেষ একটু—'

সত্যেন রায়ের দাড়ি-গজানো শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে স্বাতী বললো, 'কিন্তু আপনার স্নান-খাওয়া বোধহয়—'

'ও-সব এখন না,' ঈষৎ ভঙ্গি হ'লো সত্যেনের কাঁধে, ঈষৎ অসহিষ্ণুতার।

'আর দেরি না। চলো!'

'আপনি একটু কিছু খেয়ে নিন। কিচ্ছু খাননি সকাল থেকে?'

'না, না!' একটু জোরেই ব'লে উঠলো সত্যেন। মনে-মনে একটু খারাপ লাগলো তার—যেন আঘাত লাগলো—আজকের দিনে, এ-রকম সময়ে এ-সব তুচ্ছ খাওয়া-টাওয়া নিয়ে স্বাতীর এই ব্যস্ততায়। সকালে প্রথম পেয়ালা চায়ের পরে এ-পর্যন্ত কিছুই খায়নি, তা সত্যি: কিন্তু এখন তার ক্ষুধাবোধ একটুও ছিলো না, ক্লান্তিও না; আর-কোনো চেতনাই তার ছিলো না দুঃখের চেতনা ছাড়া; মহৎ, মহামূল্য, তুলনাহীন দুঃখ; কল্পনায় চেনা, সম্ভাবনায় পুরোনো, তবু বাস্তবে আশ্চর্য, আকস্মিকের মতো নতুন, অবিশ্বাস্যের মতো অসহ্য।···সকালে গিয়ে যেই বুঝলো যে আজই শেষ, তখনই স্থির করলো শেষ পর্যন্ত থাকবে;—তারপর কেমন ক'রে কাটলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ভিড় বাড়লো, জোড়াসাঁকোর বড়ো-বড়ো ঘর আর বারান্দা ভ'রে গেলো, উঠোনে আরো—;

টেলিফোনে ব'সে গেঞ্জিগায়ে কে-একজন ঘামতে-ঘামতে খবর জানাচ্ছে চেঁচিয়ে ; তাছাড়া চুপ, অত লোকের মধ্যে কারো মুখেই কথা নেই, চেনাশোনারা পরস্পরকে দেখতে পেয়ে কিছু বলছে না, নতুন যারা আসছে তারা কিছু জিগেস না-ক'রেই বুঝে নিচ্ছে। অপেক্ষা, বোবা অপেক্ষা, শুধু অপেক্ষা—কিসের ?···একবার, অনেকক্ষণ পর, একটু বসেছিলো সে, ব'সে থাকতে-থাকতে হঠাৎ একটা শব্দ শুনলো—পাশের ঘর থেকে—অনেকক্ষণ চেপে রাখার পর বুকফাটা ঝাপটা দিয়েই থেমে যাবার মতো, আর সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই তাকালো হাতের, দেয়ালের ঘড়ির দিকে, বারোটা বেজে কত মিনিট কী-যেন ফিশফিশানি উঠলো। খানিক পরে যখন একবার ক'রে ঘরে যাবার অনুমতি দিলো সবাইকে—সেও গেলো। মাথাটি মনে হ'লো আগের চেয়েও বড়ো, প্রকাণ্ড, কিন্তু শরীরটি একটু-যেন ছোটো হ'য়ে গেছে, যদিও তেমনি চওড়া কব্জির হাড়, তেমনি জোরালো, প্রচণ্ড আঙুল। শেষবার সে চোখ রাখলো তার কতকালের চেনা সেই মুখের, মাথার, কপালের দিকে, মহিমার দিকে ; একবার হাত রাখলো হিমঠাণ্ডা পায়ে।···আর সেই মুহূর্তটি যেই মনে পড়লো সত্যেনের, যেই দেখতে পেলো মনের চোখে আবার সেই প্রকাণ্ড মাথার ক্লান্ত নুয়ে পড়া, অমনি তার বুক ঠেলে একটা গরম শিরশিরানি উঠলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো তাড়াতাড়ি। মুহূর্তের চেষ্টায় আত্মস্থ হ'য়ে নিয়ে আবছা একটু কাশির ধরনে বললো, 'আচ্ছা, জল দাও এক গ্লাশ।'

'শুধু জল?' স্বাতী তাড়াতাড়ি জল এনে দিলো ডালিমের কুঁজো থেকে।

জল খেয়ে সত্যেন বললো, 'আর দেরি না। চলো।'

তখন স্বাতী বললো, 'কিন্তু—আমি ভাবছি—'

'তোমার বাবার কথা ভাবছো?' সত্যেন ঠিক আন্দাজ করলো—অর্ধেকটা ঠিক—'তিনি এসে পড়বেন এখনই। আপিশ সব ছুটি।'

স্বাতীর মুখ উজ্জ্বল হ'লো। 'তাহ'লে—একটু দেরি করলে হয় না?'

'বাবাকে ব'লে যেতে চাও?' সত্যেন এবার ধরলো পুরো কথাটা, আর আবার একটা ধাক্কা লাগলো তার মনে। আজকের দিনেও নড়চড় হ'তে পারবে না কোনো নিয়মের? দৈনন্দিন বাধ্যতাকে একটু ভোলা যাবে না কোথাও? ভাবতে হবে অন্য সব দিনের মতোই অন্য সব কথা? কিন্তু সে-তো আর-কিছু ভাবেনি; ভিড়ের মধ্যে বেঁকে-বেঁকে বেরিয়েই দৌড়ে বাস্ ধ'রে ছুটে এসেছে জোড়াসাঁকো থেকে টালিগঞ্জ, তক্ষুনি আবার টালিগঞ্জ থেকে জোড়াসাঁকো ছুটবে ব'লে।—কিন্তু কেন?

প্রশ্নটা সত্যেনের মনে উঠেই মিলিয়ে গেলো; নিজের সঙ্গে শওয়াল-জবাবের অবস্থা তার নেই এখন, সময়ও না। বললো, 'তোমার বাবা কিছু বলবেন না, আমি জানি।'

'আমিও জানি।'

'তবে?'

স্বাতী জবাব দিলো না।

সত্যেন বললো, 'তাহ'লে তুমি বরং থাকো। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না।'

স্বাতী তক্ষুনি বললো, 'না, আমিও যাবো।'

ছুটে ভিতরে গেলো, দু-লাইন চিঠি লিখে রামের মা-র হাতে দিলো বাবার জন্য, বদলে নিলো জামা আর জুতো, হাতে নিলো ব্যাগ, আর সত্যেন রায়ের সঙ্গে রাস্তায় নেমে প্রথমেই লক্ষ্য করলো যে দিনটি এখনো তেমনি সুখী আর সুশ্রী আর উজ্জ্বল।

কালিঘাটের আগেই ভরতি হ'য়ে গেলো বাস্। তবু আরো উঠছে ; কলেজের ছেলে, মেয়ে, স্কুলের ছেলে, দোকানদার, বেকার, আড্ডা-দিয়ে-দিন-কাটানো ছোকরা। দম আটকে আসে, এমন ভিড়। কিন্তু স্বাতীর লেডিজ সীট নিরাপদ ;—আর সে বসেছে জানলাধারে, একমনে বাইরের দিকে তাকিয়ে। রাস্তায় বিকেলের মতো লোক ;—দলে-দলে চলেছে স্কুলছেলেরা, কিন্তু হল্লা নেই ; বুড়োমতো অনেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেন কিছুই করবার নেই ; যে-দোকানেই রেডিও চলছে তার সামনেই ভিড় ; আর মোড়ে-মোড়ে ছোটো-ছোটো ভিড় কোনো-একটা বাস্-ট্র্যামে উঠতে পারার আশায়। সিনেমার দেয়াল-ছবি কালো কাগজে কাটা পড়েছে ; দরজা বন্ধ। মেয়েরা, খোলা চুলে, বাচ্চা কোলে, দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়, জানলায়, দেখে নিচ্ছে যতটা সম্ভব রাস্তাটাকে। রাস্তাতেই আজ সকলের চোখ, সকলের মন।

মেঘলা হ'য়ে এলো দিন, চৌরঙ্গিতে আসতে-আসতে বৃষ্টি নামলো। কিন্তু এসপ্লানেডে এসে বাস্ দাঁড়ালো যখন, আবার জ্বলজ্বলে রোদ ; আর সেই ভিজেনরম আলোয় স্বাতী দেখলো ভিড়ের এক আশ্চর্য আলোড়ন, এসপ্লানেডের পক্ষেও আশ্চর্য। স্যুটপরা আপিশচাকুরে, কালোকোর্তা উকিল, ছাতাহাতে আধবুড়ো

বাবুরা, ছিপছিপে ছোকরাকেরানি, ইংরেজ, চিন, মান্দ্রাজি, পাদ্রি, পার্শি ; চৌরঙ্গি, ধরমতলা, কর্জন পার্ক, কর্পোরেশন স্ট্রীট—সব দিক থেকে সব দিকে আসা-যাওয়া করছে সকলে, কিন্তু কোথায় যাচ্ছে ঠিক যেন জানে না, একটু-যেন দিশেহারা : আপিশ-ছুটি হ'লেই সোজা বাড়ি ফিরতে হবে, এই মুখস্থ কথাটা অনেকেই যেন ভুলে গেছে। দেখতে যতই ছিন্নভিন্ন হোক, কলকাতার ভিড় কখনোই লক্ষ্যহীন নয় : প্রত্যেকে জানে কোথায় যাচ্ছে আর কেন যাচ্ছে : কিন্তু সেই লক্ষ্য, লক্ষ্যের নিশ্চয়তা আজ হারিয়ে ফেলেছে সবাই— আর সেইজন্যই আশ্চর্য, অদ্ভুত এই ভিড়।

সোজা দাঁড়িয়ে সোজা তাকিয়ে আছে কেউ, কেউ মিছিমিছি হাঁটছে, কেউ হঠাৎ যেন মনস্থির ক'রে বারকয়েক পা ফেলেই থেমে যাচ্ছে আবার, কেউ কাগজ পড়ছে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, আর তার ঘাড়ের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়েছে আরো দু-তিনজন। এইমাত্র পৌঁছলো কাগজের স্পেশল, হাতে-হাতে উজোড় হ'য়ে যাচ্ছে।

সত্যেন, স্বাতীর পিছনে ব'সে, হাত বাড়িয়ে কাগজ কিনলো। একবার তাকিয়েই স্বাতীকে দিলো। স্বাতী একবার তাকিয়েই রেখে দিলো কোলের উপর। তার পাশে ব'সে ছিলো যে-বছরপনেরোর মেয়েটি, অনুমতি না-নিয়েই সেটা হাতে নিলো, তার চোখ নড়তে লাগলো উপর থেকে নিচে, আর সেই চোখ থেকে টপটপ ক'রে জল পড়তে লাগলো কালো-কথা-ছাপানো কাগজটার উপর, ছাপাখানার কাঁচা কালি মুছে-মুছে দিয়ে।

জোড়াসাঁকোয় প্রায় খালি হ'য়ে গেলো বাস্। সকলে ছুটলো দ্বারকানাথের গলির দিকে, কিন্তু সত্যেন রাস্তা পেরোতে গিয়ে

থমকালো। দেখে গেলো মানুষের জাঙাল—হ'লো কী? কেউ নেই যে?—'এর মধ্যে নিয়ে গেলো?' তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো কথাটা।

'হ্যাঁ, নিয়ে গেছে—দেখতে চান তো কলেজ স্ট্রীটে—' বলতে-বলতে চ'লে গেলো একজন।

স্বাতী আগে কখনো আসেনি চিৎপুরে; অবাক হ'য়ে দেখছিলো গলির মতো রাস্তায় ট্র্যাম-বাস্-এর ঠেলাঠেলি; আবার ওরই মধ্যে আরো গলি, প্যাঁচালো, অন্ধকার; উঁচু-উঁচু বাড়ির আকাশ-ঢাকা ঘেঁষাঘেঁষি: ফুটপাতে অদ্ভুত ভিড়, আর অদ্ভুত সব জিনিশের দোকান। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলো কেন এসেছে; মনে পড়লো সত্যেনের কথায়: 'নিয়ে গেছে। চলো কলেজ স্ট্রীট। হাঁটতে পারবে না তাড়াতাড়ি?'

নামমাত্র ফুটপাতে গায়ে-গায়ে ধাক্কা বাঁচিয়ে দ্রুতনিঃশব্দ হাঁটতে লাগলো দু-জনে। ক-মিনিট পরে বেঁকলো বাঁয়ে, ঢুকলো মুক্তারামবাবু স্ট্রীটে। কলকাতার এ-সব পাড়া—স্বাতীর মনে হ'লো—যেন অন্য দেশ, অন্য জগৎ: এর আলো, হাওয়া, এর গন্ধ পর্যন্ত অন্যরকম। এদিক-ওদিক তাকাতে চাইলো, কিন্তু ভালো ক'রে দেখতে পারলো না—এত তাড়াতাড়ি হাঁটছিলেন সত্যেনবাবু।

লম্বা, বাঁকা, অন্ধকার মুক্তারামবাবু স্ট্রীট কর্নওআলিস স্ট্রীটে শেষ হ'লো; আর একটু পরেই দেখা গেলো কলেজ স্ট্রীট হ্যারিসন রোডের মোড়।

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের ছাতে-ঢাকা ফুটপাতে সত্যেন দাঁড়ালো, একটা জুতোদোকানের সিঁড়িতে উঠলো। আরো অনেকে

দাঁড়িয়েছে সেখানে, বেশির ভাগ কলেজের ছাত্র। মুখে-মুখে শোনা গেলো, এক্ষুনি এসে পড়বে।

সত্যেন বললো, 'কষ্ট হ'লো তোমার হাঁটতে?'

'ন্‌না।'

'মনে হচ্ছে কি, না-এলেই পারতে?'

'না।'

কথা ফুরোলো ওখানেই, আবার দু-জনে চুপ। উল্টো দিকে একটা একতলা দোকানঘরের কার্নিশছাড়া বিপজ্জনক ছাতে কয়েকজন দাঁড়িয়ে আছে ক্যামেরা তাক ক'রে; পাশের দোতলার বারান্দায় মেয়েদের, বাচ্চাদের ভিড়; আশে-পাশে একটা জানলা নেই যেখানে তিন-চারটি ক'রে মুখ না বেরিয়ে আছে, আর রাস্তায় কেউ চলছে না, সকলেই দাঁড়িয়ে। সত্যেন আবার অনুভব করলো মনের উপর সেই অপেক্ষার, সেই বোবা অপেক্ষার চাপ।

'আসছে···আসছে···' গুনগুন রব উঠলো ভিড়ের মধ্যে।

স্বাতী মনে-মনে ভাবছিলো লম্বা গম্ভীর আনত আচ্ছন্ন স্তব্ধ মন্থর মিছিল; কিন্তু মাত্রই কয়েকজন যেন অত্যন্ত তাড়াহুড়ো ক'রে নিয়ে এলো কাঁধে ক'রে—নিয়ে গেলো উত্তর থেকে দক্ষিণে—পিছনে এলোমেলো অল্প লোক—; বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে মিলিয়ে গেলো স্বাতীর চোখের সামনে দিয়ে—রোদ্দুরে ঝিলিক দিলো লম্বা শাদা চুল আর মস্ত শাদা শান্ত তন্ময় কপাল। ঐটুকু দেখলো স্বাতী, আর দেখতে পেলো না।

সত্যেন দেখলো, স্বাতী দাঁড়িয়ে আছে শক্ত সোজা হ'য়ে, হাত মুঠ ক'রে, ঠোঁটে ঠোঁট চাপা; দেখলো তার কণ্ঠের কাঁপনি, ঠোঁটের

কাঁপুনি, গালের ঘনরং : দেখলো তার তরল কালো উজ্জ্বল চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল হ'লো, ঝকঝকে দুটি আয়না হ'য়ে উঠলো, তারপর ভাঙলো আয়না, আবার তরল হ'লো, উপচোলা, মাথা নিচু হ'লো।

আর তা-ই দেখে সত্যেনেরও নতুন ক'রে গলা আটকালো, চোখ ঝাপসালো, আর সেজন্য লজ্জা করলো নিজের কাছেই। এ-মৃত্যু তো কান্না চায় না ; এই দুঃখ, এই মহান, মহামূল্য দুঃখ, আশি বছরের পরম পরিশ্রমের এই সবশেষের রত্ন—এ কি চোখের জলে বাজে-খরচ করবার ?

'চলো এখন,' সত্যেন কথা বললো।

সে-যে কাঁদছিলো তা লুকোবার চেষ্টা করলো না স্বাতী, আঁচলে চোখ মুছলো, কাশলো একবার, একটু ভাঙা গলায় বললো, 'চলুন।'

কিন্তু ট্র্যাম-বাস আকণ্ঠ। নানা রাস্তা দিয়ে, নানা রাস্তা ঘুরে সবাই ছুটেছে নিমতলার দিকে। অসহায় দাঁড়িয়ে রইলো দু-জনে, দাঁড়িয়ে থাকতে-থাকতে পা ধ'রে এলো।

স্বাতী বললো, 'হাঁটলে হয় না ? একটু এগিয়ে গেলে হয়তো—'

'একটু এগোলে কিছু হবে না। এক যদি এসপ্লানেড পর্যন্ত—'

'এসপ্লানেড কি খুব দূর ?' স্বাতী, এ-অঞ্চলের ভূগোল-বিষয়ে অনিশ্চিত, জিগেস করলো।

'তেমন আর দূর কী,' সোৎসাহে বললো সত্যেন। 'চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়ে—হাঁটবে তাহ'লে ?'

'বেশ-তো।'

কলুটোলা পার হ'য়ে চিত্তরঞ্জন এভিনিউয়ে পৌঁছতেই আকাশ কালো ক'রে আবার বৃষ্টি নামলো একেবারে হঠাৎ। একটা

পোর্টিকোর তলায় আশ্রয় নিলো তারা। ঘোর বৃষ্টি, জোরনামলো ঝমঝম, আর সেই বৃষ্টিতে ভিজে-ভিজে চ'লে গেলো একদল শান্ত নিঃশব্দ গম্ভীর মন্থর চিনে, প্রত্যেকের মাথা নিচু, প্রত্যেকের হাতে ফুল, প্রত্যেকের খালি পা।

যতক্ষণ দেখা গেলো স্বাতী তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো তাদের। তারপর বললো, 'কী-সুন্দর এরা!'

সত্যেন মাথা নেড়ে সায় দিলো।

'যাচ্ছে কোথায়?'

'নিমতলায়—নিশ্চয়ই।'

নিমতলার নাম শুনেছিলো স্বাতী, তাই বুঝলো।—'আপনি যাবেন না?'

'য়েতাম—কিন্তু—'

'আমি বুঝি যেতে পারি না সেখানে?'

'তুমি যেতে পারো, কিন্তু আমি নিয়ে যেতে পারি না?'

'কেন?'

'ভাবতে পারো না কী-ভিড় হবে।'

স্বাতীর ভালো লাগলো না কথাটা। মনে হ'লো আজকের দিনেও সত্যেনবাবু বড্ড সাবধানী, ধরাবাঁধা, বড্ড নিয়ম-মেনে-চলা। এদিকে বৃষ্টি থামে না।

আর-একটি দল এলো, সাহেব, পাদ্রি, দাড়িওলা বুড়ো-বুড়ো, লম্বা শাদা আলখাল্লা পরনে, হাতে ফুল, মুখে শান্তি, চোখে প্রার্থনা। ভিজতে-ভিজতে চ'লে গেলো।

বৃষ্টি কমলো, বৃষ্টি থামলো, ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টিতে আবার রওনা

হ'লো তারা, ফোঁটা-ফোঁটা বৃষ্টি হাতে, ঠোঁটে, মাথায়। রোদ ফুটলো; ভিজেকালো রাস্তায় চিকচিকোলো বিকেলবাঁকা হলদে রোদ, ভিজেনরম হাওয়ায় ঝলমলালো।

সত্যেন বললো, 'ক্লান্ত লাগে তো বলো, এখানে বাস্-এ ওঠা যেতে পারে, মনে হচ্ছে।'

স্বাতী বললো, 'বেশ-তো লাগছে হাঁটতে।' কথাটা ব'লেই অনুতাপ হ'লো, অপরাধী লাগলো; আজকের দিনে, এ-রকম সময়ে কারো কি কিছু 'বেশ' লাগতে পারে? না কি লাগলেই কেউ মুখে বলে? ভীরু আড়চোখে স্বাতী তাকালো সত্যেন রায়ের মুখের দিকে, কিন্তু বেশ-লাগার বিসদৃশতা শোকাচ্ছন্ন অধ্যাপক যেন লক্ষ্যই করলেন না, বরং খুশি গলায় বললেন, 'তাহ'লে আর কথা কী।'

আবার চুপচাপ হাঁটলো দু-জনে, কিন্তু জোড়াসাঁকোয় বিফল হ'য়ে মুক্তারামবাবু স্ট্রীট দিয়ে যেমন চুপচাপ হেঁটেছিলো; সে-রকম না; তখন গতি ছিলো দ্রুত, গলি ছিলো সরু, মন উৎকণ্ঠ; আর এখন চোখের সামনে চিত্তরঞ্জন এভিনিউর উদার ঋজুতা—মস্ত চওড়া দিলখোলা রাস্তা, নিরিবিলি, ট্র্যাম নেই, মোটরগুলো যেন আলগোছে ভেসে যাচ্ছে চুপচাপ; দু-ধারে মস্ত উঁচু-উঁচু বাড়ি, কিন্তু আরো মস্ত, আরো অনেক উঁচু এখানে আকাশ, আর রাস্তা এত ছড়ানো যে বাড়িগুলিকে হালকা লাগে—দু-ধারের বাড়ি যেন দু-পাড়ার—; আর সমস্ত রাস্তাটির উপর কাঁপছে, দুলছে, জ্বলছে বৃষ্টিধোয়া হলদেসবুজ বিকেলের স্বচ্ছ, সূক্ষ্ম আভার একটি পরদা। আস্তে চলছে তারা, এখন আর তাড়া নেই; কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের

জুতোদোকানের বারান্দায় পরমক্ষণ কেটে গেছে ; কানে-কানে টানা মনের ছিলা এখন ঢিলে ; এখন সময় আছে তাকিয়ে দেখার, বিকেলের দিকে, আলোর দিকে, সুন্দর, উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখার। অস্পষ্ট একটা সুখ মনের মধ্যে অনুভব করলো স্বাতী ; একটু পরে তার অপরাধবোধও থাকলো না, কিন্তু মনের এই হাওয়াবদলের খবর নিজেই জানলো না যেন, ভাবলো না কিছু, বিশেষ-কিছু ভাবলো না, আস্তে ডুবে গেলো নতুন সুখচেতনায়। আর সত্যেন— কবিতা-পাগল মানুষ, আবাল্য রবীন্দ্রপূজক, সে-ও অনুভব করলো অস্পষ্ট একটা সুখ ; রবীন্দ্ররহিত বাংলাদেশে শোকোচ্ছ্বাসী কলকাতার উপরে যেমন এই মুহূর্তে আকাশের বিকারহীন তোরণে নীলিমার নিশান উড়লো, তেমনি এখন তার মনেও ঐতিহাসিক শোকের গভীর কালো কবরটাকে ঢেকে দিলো বর্তমানের, উপস্থিতের, জীবন্ত মুহূর্তের সবুজ—আর এতই সহজে যে সে নিজেই তা বুঝলো না। এই আবছা-চেতন ভালো লাগাটা দু-জনেই মেনে নিলো নিঃশব্দে—নিজেরটা আর অন্যজনেরটাও— ; এর আগে তারা কথা বলেনি বলবার কিছু নেই ব'লে, আর এখন বললো না যেহেতু দরকার নেই।

এসপ্লানেডে এসে আবার চাকার চীৎকার, জনতার আবর্ত, ছুটোছুটির ধাক্কা। অনেক থেমে-থেমে রাস্তা পার হ'লো। চৌরঙ্গিতে এসে সত্যেন বললো, 'চা খাবে ?'

'আপনি তো কিছু খাননি সারাদিন,' স্বাতীর মনে পড়লো।

'তোমার দেরি হ'য়ে যাবে যদি মনে করো—'

'কত আর দেরি হবে।'

'তার মানে—ভীষণ দেরি হ'য়ে গেছে এমনিতেই ?'

এ-কথায় স্বাতীর মনে পড়লো যে বাড়ির কথা, বাড়ি ফেরার কথা, বাবার কথা এতক্ষণের মধ্যে একবারও তার মনে পড়েনি। বাবা কি ভাবছেন ? কতক্ষণ বেরিয়েছে ? বেজেছে ক-টা ? হোয়াইটওএ লেডলর ঘড়ি দেখার চেষ্টা করলো, কিন্তু এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে—যাকগে। বললো, 'কোনটাতে যাবেন ?'

সারি-সারি ছোটো-ছোটো রেস্তোরাঁ প্রত্যেকটা বোঝাই। মাঝখানে বড়ো একটা ইংরেজ হোটেল, রাস্তার দিকটা ঘষা কাচে আব্রু-করা, রবর-মোড়া সিঁড়ি—সেইটিতে ঢুকে পড়লো স্বাতীকে নিয়ে সত্যেন। রাস্তার আলোভিড়গোলমালের উথালপাথাল থেকে হঠাৎ চ'লে এলো মসৃণ, শব্দহীন, প্রশস্ত, গম্ভীর অন্ধকারে। আবার একটা নতুন গন্ধ পেলো স্বাতী, কেমন-একটা বিলেতি গন্ধ শুকনো, হালকা, গরম-করা গন্ধ—অচেনা, কিন্তু ভালো—ভালো !

ফাঁকা-ফাঁকা টেবিলের ধার দিয়ে-দিয়ে একটা কোণটেবিলের দিকে যাচ্ছিলো তারা, হঠাৎ 'এই যে' আওয়াজ দিলো একটা টেবিলে একলা বসা একজন।

সত্যেন দাঁড়ালো, হাত তুললো নমস্কারে। কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোনো প্রত্যভিবাদন না-ক'রে ভদ্রলোক বললেন, 'কোত্থেকে ? নিমতলা ?'

'না, ও-পর্যন্ত আর—স্বাতী, চিনতে পারছো না এঁকে—'

স্বাতী চিনেছিলো। কালো, অপ্রসন্ন, উশকোখুশকো, ধ্রুব দত্ত ব'সে আছেন চেয়ারের মধ্যে ছড়িয়ে, আঙুলের ফাঁকে সিগারেট, সামনে গেলাশে ফিকেব্রাউন পানীয়, যে-রকম—হঠাৎ ঝলসালো

স্বাতীর মনে—যে-রকম সে দেখেছিলো চাং-আন রেস্তরাঁয় বুড়ো-মতো ফিরিঙ্গির সামনে। সত্যেনবাবুর নমস্কারের ব্যর্থতা লক্ষ্য ক'রে সে আর অনুরূপ কোনো চেষ্টা করলো না, শুধু মুখের নম্র ভাব দিয়েই বোঝাতে চাইলো যে এই যশস্বীর সহিত পরিচিত হবার সৌভাগ্য একবার তার হয়েছিলো।

কিন্তু সেটুকুরও দরকার ছিলো না, ধ্রুব দত্ত লক্ষ্যই করলেন না তার উপস্থিতি। সত্যেনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কেমন দেখলেন হায়-হায় কাণ্ড, হৈ-হৈ ব্যাপার ?'

সত্যেন তখনই কোনো জবাব খুঁজে পেলো না এ-কথার, আর ধ্রুব দত্ত তখনই আবার আরম্ভ করলেন, 'রবীন্দ্রনাথের জন্য দুঃখ হচ্ছে আমার। এত চেষ্টা করলেন ইওরোপে মরতে, এতবার বললেন,* লিখলেন সে-কথা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত—"আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি" !' তেতো, ছোট্ট হাসলেন ধ্রুব দত্ত, আর সেই মস্ত ফাঁকা রেস্তরাঁয় আবছা আলোর চুপচাপের মধ্যে বড্ড চড়া আর কর্কশ শোনালো তাঁর কণ্ঠ। সত্যেন কিছু বলতে যাচ্ছিলো বোধহয়, কিন্তু পলকে বুঝে নিলো যে ইনি কিছু শুনতে চায় না, নিজের মনের জমানো কথাগুলো উগরোতে চান শুধু ;—সিগারেটে টান দিয়ে, কিন্তু পানীয়টাকে তেমনি ফেলে রেখে, একটু ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতে লাগলেন কবি : 'আমি বেরিয়েছিলাম, অনেকক্ষণ ঘুরলাম রাস্তায়-রাস্তায়, তারপর টিঁকতে না-পেরে ঢুকে পড়লাম এখানে। ওঃ, কী-একটা সুযোগ ! যারা "কথা ও কাহিনী" ছাড়া কিচ্ছু রবীন্দ্রনাথ পড়েনি, পড়লেও বোঝেনি, বুঝলেও মানেনি, আর যে-সব ধূর্তনির্বোধ-ধুরন্ধর তেলতেলে ঠোঁটে "গুরুদেব" আওড়ায়,

অথচ যাদের সমস্ত অস্তিত্বটাই রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধতা, আর সেইসব অসংখ্য হুজুকনাচুনিরা, যারা সারা জীবনে কখনো জানবে না, জানতে চাইবে না, রবীন্দ্রনাথ কী, কেন, কেমন, সেই দেশসুদ্ধু সক্কলের কী-একটা সুযোগ আজ! দশটা আই. এফ. এ. ফাইন্যালের সমান, একশোটা কানন-সাইগল একসঙ্গে! কাগজওলাদের পৌষ মাস, মিটিংওলাদের মরশুম, ব্যবসাদারি বড়োকর্তাদের নাম-ফাঁপানো হল্লা! কী- উৎসাহ, কী-হুটোপুটি, কী-ফুর্তি! রবীন্দ্রনাথের বেঁচে থাকা বা না-থাকায় কিছুই যাদের এসে যায় না, এই শোকের হোলিতে চরম মেতেছে তারাই! হাঃ!'

থেমে-থেমে, প্রত্যেকটি কথা ভেবে-চিন্তে, চড়া, কড়া, কর্কশ গলায় পূর্বসূরীর অন্ত্যেষ্টিভাষণ উচ্চারণ করলেন উত্তরসাধক, শেষ কণ্ঠধ্বনির পরে ঠিক জায়গায় থামলেন, সামনে ঝুঁকে হাত বাড়ালেন, অন্তঃস্থ করলেন কিঞ্চিৎ পানীয়, তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন এ-বিষয়ে আর-কিছু তাঁর বলবার নেই।

সত্যেন কথাগুলি শুনছিলো চুপ ক'রে, শুনতে-শুনতে গম্ভীর হ'লো তার মুখ, তারপর বিষণ্ণ, এমনকি একটু ব্যথিত হ'লো। একটু পরে বললো, 'আচ্ছা, তাহ'লে—' হাত তুললো বিদায় জানিয়ে।

'আপনারা—' ধ্রুব দত্ত হঠাৎ তাকালেন স্বাতীর দিকে, যেন এইমাত্র দেখতে পেলেন—'এখানেই বসুন না।' অস্বস্তি হ'লো স্বাতীর, এর আগে সত্যেনবাবুর ঘরে এঁকে দেখে যেমন হয়েছিলো তার চেয়েও বেশি, মুখ ফেরালো তখনই, তবু অনুভব করলো মুখের উপর তীক্ষ্ণ জ্বলজ্বলে চোখ—আর তার ভয় হ'লো যে সত্যেনবাবু-না ও-টেবিলেই ব'সে পড়েন, তাই নিজেই এগিয়ে গেলো কয়েক পা।

'আমরা একটু ওদিকে—' ব'লে সত্যেনও এগোলো। অনেকটা দূরে কোণঘেঁষা টেবিলে দু-জনে বসলো যখন, নিপুণভাবে চা ঢেলে, নিঃশব্দে চুমুক দিয়ে, বাঁ হাতে একটি স্যাণ্ডউইচ তুলে স্বাতী বললো —*তার পক্ষে একটু বেশিই গরম সুরে বললো, 'কবি হ'তে পারেন, বিখ্যাত হ'তে পারেন; কিন্তু মানুষ ভালো না!'*

সত্যেন তখন পর্যন্ত ধ্রুব দত্তের কথাই ভাবছিলো, একটু হেসে বললো, 'ভালোমানুষ? মনের কথা যে মুখে বলতে পারে না, অন্যায়ের প্রতিবাদ পারে না, যার চক্ষুলজ্জা বেশি; সৎসাহস কম, আর সেইজন্য অন্যেরা যাকে যেমন-তেমন ব্যবহার করে—সেই তো ভালোমানুষ?' বলতে-বলতে নিজের কথাই মনে পড়লো সত্যেনের, ধ্রুব দত্তর কথার উত্তরে কিছু তার বলবার ছিলো, বলা উচিতও ছিলো, কিন্তু কিছুই বলতে পারেনি—আর এ-রকম নিত্যই ঘটে তার জীবনে, মনে-মনে অনেক কষ্ট পায় সে-জন্য।

'না, তা কেন?' স্বাতী প্রতিবাদ করলো। 'নিজে কষ্ট পেলেও অন্যকে যে আঘাত করে না, সে-ই ভালোমানুষ।' ব'লেই মনে পড়লো নিজের বাবাকে—কিংবা বাবাকে ভেবেই কথাটা বললো।

সত্যেন তাকালো স্বাতীর দিকে, একটু তাকিয়ে থাকলো। আবেগের উষ্ণতার রং লেগেছে তার মুখে, এতক্ষণের হাঁটাচলায় ঈষৎ বিস্রস্ত চুল, চোখে আত্মবিশ্বাসের ঋজুতা। এতদিনের মধ্যে এই প্রথম এত স্বাধীনভাবে কথা বললো সে; এই সেদিনও একটা বাধো-বাধো ভীরুভাব ছিলো প্রোফেসরের সামনে—; এবার শিলং থেকে এসে অবধি বদল দেখছে সত্যেন—শিক্ষকের প্রাপ্য সমীহ মুছে গেছে মন থেকে—যদিও সপ্তাহে একদিন কলেজের

অনার্স-ক্লাশে রীতিমতো দেখা হচ্ছে আজকাল। সত্যেন চেষ্টা করেছে সেটা লক্ষ্য না-করতে—অন্তত স্বীকার না-করতে—কিন্তু এই মুহূর্তে স্বাতীর এই স্বচ্ছন্দ, প্রাণবন্ত প্রতিবাদে সেটা স্পষ্ট, মূর্ত, সংজ্ঞেয় হ'য়ে উঠলো, সংজ্ঞাত হ'লো সত্যেনের মনে ;—চোখ সরিয়ে নিলো সে, চোখ নামালো চায়ের পেয়ালায়। আমি—আমিই কি বজায় রেখেছি শিক্ষকের মাত্রা-মাপা সৌজন্য? এই দূরত্বলোপে, এই অন্তরালমোচনে আমিও কি সহকর্মী নই, আমিই কি দায়ী নই, উদ্যোক্তা নই? কী করছি আমি, কোথায় চলেছি? কেন ছুটেছিলাম ঊর্ধ্বশ্বাসে জোড়াসাঁকো থেকে টালিগঞ্জে, অস্নাত, অভুক্ত, শোকাচ্ছন্ন দুপুরবেলায়? রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু!—সে কি আমার পক্ষে এমন একটা ঘটনা নয়, যা আমাকে তখনকার মতো ভুলিয়ে দেবে অন্য সব, সব চেষ্টা, ইচ্ছা, উৎসাহ? তবু তো—শেষ নিশ্বাস যখন পড়লো, শেষ প্রণাম ক'রে যেই বেরিয়ে এলাম, তক্ষুনি আমার মনে পড়লো—ওকে ; মনে হ'লো আজকের এই মহান অভিজ্ঞতার অংশ ওকে দিতেই হবে, আর সেটা আমার কর্তব্য আমারই দায়িত্ব।···কিন্তু কেন? কিন্তু কেন?···কেমন-একটা লজ্জায়, বিক্ষোভে, আত্মপীড়নে মাথা নুয়ে পড়লো সত্যেনের, আর সেই ভাবটা লুকোবার জন্য চায়ে চুমুক দিতে লাগলো ঘন-ঘন।

সত্যেনের এই অনুচিন্তনের সমস্তটুকুতে কয়েক সেকণ্ডের বেশি সময় লাগলো না ; স্বাতী, তাই, তার সঙ্গীর কোনো ভাবান্তর না-বুঝে পরের কথাটি তেমনি স্বচ্ছন্দে বললো : 'নিজের দেশে বুঝি কিছুই ভালো দেখতে পান না উনি?'

সত্যেন হঠাৎ বুঝলো যে ধ্রুব দত্ত নিছক সত্য বলছেন, তাঁর

শোক অনেক বেশি পবিত্র, তাঁর রবীন্দ্রভক্তি অনেক বেশি নিষ্কাম ; আর কথাগুলি শুনতে তার—সত্যেনের—যে খারাপ লাগছিলো তার কারণ তার সাময়িক ভাবালুতা, তার কারণ তার মনেও আজকের গণোন্মাদের সংক্রমণ। মুখ তুলে বললো, 'ভালো না-থাকলেও ভালো দেখতে হবে ?'

'কিন্তু,' স্বাতী তর্ক তুললো, 'দেশের দোষ তিনি যেমন বোঝেন, নিজের দোষও কি তেমনি ?'

'নিশ্চয়ই !' মৃদু হাসলো সত্যেন। 'পর-পর তাঁর চারখানা কবিতার বই-ই তো তার প্রমাণ। নিজের প্রতিটি দোষ কাটিয়ে ওঠার, নিজেকে প্রত্যেকবার ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টায় কখনো তাঁর ক্লান্তি নেই। আর বোঝো তো,' প্রায় মাস্টারি সুর লাগলো শেষ কথাটায়, 'নিজের দোষ নিজে দেখতে পাওয়া কত শক্ত, আর কত কষ্টের !'

'লেখার কথা জানি না, কিন্তু তাঁর নিজের দোষ যে কত তা কি তিনি বোঝেন ?'

'নিজের দোষ মানে ? আর তাঁর কথা তুমি জানোই বা কী ?' এবার প্রায় কঠোর হ'লো সত্যেন।

স্বাতী হঠাৎ জিগেস করলো, 'উনি যেটা খাচ্ছেন সেটা কী ?'

'উনি ও-সব—ও-সব ব্যবহার করেন বোধহয়,' সত্যেন গম্ভীর জবাব দিলো।

স্বাতী থামলো একটু। সে যা ভেবেছিলো, কিন্তু ভাবতে চায়নি, তা-ই তাহ'লে সত্যি। কবি ধ্রুব দত্ত ব'সে-ব'সে তা-ই খাচ্ছেন, সোজা বাংলায় যাকে বলে মদ। মাঝারি ঘরের সব বাঙালি মেয়েরই

মতো স্বাতী ছেলেবেলা থেকেই ঐ বস্তুটাকে বিভীষিকা ব'লে জেনেছে ;—আর যদিও সম্প্রতি বিদেশী বইয়ে এর একটা অন্যরকম ছবিও সে পেয়েছে, তবু—সেটা যেন অন্য জগতের, ইংরেজিতেই ভালো শোনায়—বাংলায় কথাটা শুনলেই তার গা শিউরে ওঠে। শুনেছে অনেক, শরৎচন্দ্রও পড়েছে, ফিল্মেও দেখেছে, কিন্তু জ্বলজ্যান্ত একজন মানুষকে ব'সে-ব'সে মদ খেতে চাক্ষুষ দেখলো বলতে গেলে এই প্রথম। আর সে-মানুষ কে? একজন কবি। আর সময়টা কখন? যখন কয়েক ঘণ্টা আগে কবিতার হৃৎপিণ্ড বন্ধ হ'য়ে গেছে, আর সমস্ত দেশ আত্মহারা।

'চমৎকার সময় এ-সবের!' মনের কথাটা সে মুখে ব'লে ফেললো।

'আমরাও-তো চা খাচ্ছি ব'সে-ব'সে,' সত্যেন মৃদুস্বরে বললো, 'ওতে কী আছে?'

স্বাতীর ভালো লাগলো না সত্যেনবাবুর মুখে ধ্রুব দত্তর এই সমর্থন। উনি নিজেও কি ঐ দলে? উনিও কি মাঝে-মাঝে 'ব্যবহার' করেন 'ও-সব'? কবিতা ভালো, কবিতা খুব ভালো ; কিন্তু বোকারা যা রটায়, তারও কি কোনো ভিত্তি আছে তাহ'লে ;—কবিতা যারা বানায়, কবিতা নিয়ে দিন কাটায়, তারা কি সকলেই একটু—একটু—?

'তাছাড়া,' সত্যেন আবার বললো, 'কাউকে কিছু বলবার থাকলে সামনেই বলতে হয় ; আমরা এখন যা করছি তাকেই ইংরেজিতে বলে ব্যাকবাইটিং—আক্ষরিক অর্থেই তা-ই,' ব'লে তাকালো অনেকগুলি ফাঁকা টেবিল পেরিয়ে ধ্রুব দত্তর পাঞ্জাবি-ঢাকা পিঠের দিকে।

স্বাতী অনুসরণ করলো সত্যেনের দৃষ্টি। সে যেখানে বসেছিলো সেখান থেকে মুখেরও একটুখানি দেখা যাচ্ছিলো, আর পেঁচিয়ে-ওঠা সিগারেটের ধোঁয়া, আর মাত্র ওটুকু থেকেই স্বাতী বুঝে নিলো যে ভদ্রলোকের সমস্ত মন এখন একান্তনিবিষ্ট সামনে-রাখা ঐ গেলাশটার উপর। যেন ধাক্কা খেয়ে স'রে এলো তার চোখ, পড়লো সত্যেনের অন্যমনস্ক মুখে, দেখলো সে-মুখে সরলতা, সততা, শান্তি; দেখলো বিশ্বাসের আশ্রয়, নিশ্চয়তার আশ্বাস :—আর, একটু আগে কবিভাবের মানুষদের বিষয়ে যা ভেবেছিলো তার জন্য অনুশোচনায় মেঘলা হ'লো চোখ, আর সেটা মিথ্যা জেনে চোখের মেঘ কেটে গেলো।

সত্যেন, যেন তার দিকে স্বাতীর চোখের নিবিড়তা বুঝতে পেরেই ফিরে তাকালো, আর স্বাতী চোখে চোখ পড়তেই হেসে ফেললো—আকস্মিক, অবান্তর, এমনকি একটু অসংগত হাসি।

সত্যেন ভুরু কুঁচকে বললো, 'কী ?'

'কিছু না। আপনার সব কথাই ঠিক, কিন্তু একটা কথা আমি বলবোই—ভদ্রলোকের চোখের তাকানোটা ভালো না,' ব'লে আর-একবার তাকালো ধ্রুব দত্তর পিঠের দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ধ্রুব দত্ত উঠলেন কোনো দিকে না-তাকিয়ে, লম্বা শরীরে একটু কুঁজো হ'য়ে, দ্রুত বেরিয়ে গেলেন কেমন এলোমেলো, অস্থির লক্ষ্যহীনভাবে। সত্যেন তাকিয়ে থাকলো ঐ চ'লে-যাওয়ার দিকে, তারপর বললো : 'এটা একেবারেই ভুল বললে। ওঁর চোখেই তো ওঁর প্রতিভা।—কিন্তু এ-কথা আর না। অন্য কিছু বলো।'

কিন্তু স্বাতী তখনো ধ্রুব দত্তর অভদ্র চোখের কথাই ভাবছিলো।

সত্যেনই অন্য কথা পাড়লো।—'ডালিমকে দেখেছিলে তখন?'

'ডালিমকে? কখন?'

'যখন কলেজ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটা বাস্-এ ঝুলতে-ঝুলতে যাচ্ছিলো। আমাদের ছাখেনি। বেশ ছেলে ডালিম।'

শেষের কথাটা খামকা শোনালো—মানে, যথেষ্ট শোনালো না স্বাতীর কানে। জিগেস করলো, 'কেন? বেশ কেন?'

সত্যেন একটু দেরি ক'রে জবাব দিলো, 'কোনো কারণে নয়, এমনি।'

ধ্রুব দত্ত সেখান থেকে চ'লে যাওয়াতে স্বাতীর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ সম্পূর্ণ হয়েছিলো, চেয়ারে হেলান দিয়ে আরামে ব'সে বললো, 'কাউকে বরবাদ করার যে-ক'টা উপায় আছে তার মধ্যে একটা হ'লো ঐ "বেশ" কথাটা।'

সত্যেন হেসে বললো, 'অন্যের মুখে "বেশ" শুনতেও ভালো লাগে না—না?'

'তার মানে?'

প্রশ্নের উত্তর না-দিয়ে সত্যেন বললো, 'আর তোমার বড়দি—তিনি কেমন আছেন?'

'বড়দির কথা আপনি মাঝে-মাঝেই জিগেস করেন। কেন বলুন তো?'

'মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে ব'লে।'

'কিন্তু কতটুকুই-বা দেখেছেন আপনি ওঁকে।'

'সেইজন্যই বোধহয়।'

'বেশি দেখা হ'লে মনে পড়ে বুঝি কম ?' স্বাতী খুব যুক্তিসংগত প্রশ্ন করলো একটা।

'যেটা নেই, সেটাই আমাদের মনে পড়ে। যেটা আছে, সেটা-তো আছেই।'

স্বাতী বললো, 'তাহ'লে-তো "নেই"টাই ভালো।'

'কেন ? মনে পড়াটাই ভালো বুঝি ?'

স্বাতী একটু ভাবলো। তার তরুণ জীবনে একটুখানি-যে স্মৃতির চর পড়েছে, সেই নতুন নরম মাটির গন্ধ নিলো মনে-মনে। বললো, 'ভালো না ? খুব ভালো।'

'আর এটা ?'

'কোনটা ?'

'যেটা আছে। হচ্ছে।'

'কী জানি !' স্বাতী, ঈষৎ লাল, হাসলো।

'এই-তো অসুবিধে আমাদের,' সত্যেন হেলান দিলো চেয়ারে. 'যে সব সময়ই আমাদের চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে। যেটা আছে, হচ্ছে, সেটা আমাদের কাছে কিছুই না ; আমাদের সুখের সময়গুলিকে আমরা বুঝতে পারি, তখন-তখন না, পরে—অনেক পরে ; আর তাই সব সময় মনে হয় যা হ'য়ে গেছে তার মতো আর হ'লো না, হবে না।—এটা অবশ্য,' একটু হেসে জুড়ে দিলো, 'আমার নিজের কথা না, নতুনও না, কিন্তু পুরোনোকেই নতুন লাগে যখন সেটা জীবন দিয়ে বুঝি।'

সত্যেন কথা শেষ ক'রে পিঠ সোজা করলো, পেয়ালা হাতে নিলো, পেয়ালা খালি ক'রে রুমালে ঠোঁট মুছলো। সারাদিনের

উপবাসভঙ্গের প্রভাবে, চায়ের তাপে, স্বাতীর চোখের উষ্ণতায় সত্যেনের খুব বেশি জীবন্ত লাগছিলো নিজেকে, ভালো লাগছিলো ব'সে থাকতে, দেখতে, শুনতে, বলতে। আর তার কথা শুনে স্বাতী ভাবলো এটাই আমার সুখের সময়ের একটা নয় তো? এখন বুঝি না, পরে বুঝবো? কিন্তু এখনই বুঝতে চাইলো স্বাতী, চেষ্টা করলো হাতে-হাতে চোর ধরতে—আর তখনই ধিক্কার দিলো নিজেকে যে সমস্ত দেশের এত বড়ো-একটা শোকের সময়কে নিজের একটি সুখের সময় ব'লে কল্পনা করতেও পেরেছিলো! কিন্তু সত্যেনবাবুরও মুখে-চোখে দুঃখের কোনো চিহ্ন তো আর নেই।

বাসন সরালো, বিল শোধ হ'লো, ব'সে থাকার আর-কোনো কারণ থাকলো না, তবু সত্যেন দেরি করলো। এতক্ষণে তার চোখে পড়লো যে রেস্তোরাঁয় ভিড় বর্ধিষ্ণু, আলো উজ্জ্বলিত, আর ঢুকেই যে-ক'জনকে দেখেছিলো তারা সকলেই প্রস্থিত। চারদিক ভ্রমণ ক'রে ফিরে এলো তার চোখ; খুব সহজে, হালকাসুরে, যেন আগের কথার সঙ্গে এর কোনো সম্বন্ধ আছে, এমনিভাবে বললো, 'একটু যেন ব্যস্ত হয়েছিলে তখন?'

'ব্যস্ত, কখন? কিসের?'

'শিলঙে তোমার শেষ চিঠি যেটা পেয়েছিলাম—,

এই প্রথম সে-চিঠির কোনো উল্লেখ করলো সত্যেন। এর আগে একবারও করেনি—আর সে-জন্য স্বাতী কৃতজ্ঞ ছিলো মনে-মনে। চিঠিটা পাঠিয়েই লজ্জা করেছিলো তার; আর তার ঠিক চারদিন পরে সত্যেনবাবুর যখন এলেন, আর এসেই দেখা করলেন তার সঙ্গে তখন আরো বেশি লজ্জা করছিলো;—কিন্তু সত্যেনবাবুর কোনো

কথায় কি ব্যবহারে যখন বোঝাই গেলো না যে সে-চিঠি তিনি পেয়েছিলেন, তখন স্বস্তির নিশ্বাস পড়লো তার; এমনকি—যদিও মনের কোনো গভীর অংশে নিশ্চয়ই জেনেছিলো যে তার চিঠি ভ্রষ্ট হয়নি, ব্যর্থ হয়নি, কেননা ছুটির বাকি ক-দিনও উনি কাটিয়ে আসতেন তাহ'লে—তবু নিজের কাছে এ-রকম একটা ভানও সে করেছিলো যে সে-চিঠি পৌঁছয়নি, বাঁচা গেছে, আপদ চুকেছে! আর এখন যদিও তায়.মুখের তপ্ত-লালিমা তার মাথাটাকে নুইয়ে দিচ্ছিলো বুকের কাছে, চোখের পাতা টেনে দিচ্ছিলো চোখের উপর, তবুও সেই ছলনাই তাকে আত্মরক্ষার শক্তি দিলো, স্পষ্টই প্রশ্ন করলো, 'কোন চিঠি?'

'যেটাতে লিখেছিলে আমাকে—চ'লে আসতে।'

'আপনি সেটা পেয়েছিলেন?'

'তুমি কি ভেবেছিলে পাইনি?' সত্যেন, সরল পুরুষ, শক্তি বাড়িয়ে দিলো ছলনার।

'কি জানি!' স্বাতী আত্মস্থতা ফিরে পেলো, উদাস চোখে তাকালো, একটা নিশ্বাস ছাড়লো গোপনে খুব গোপনে।...বড্ড ভয় পেয়েছিলো তখন, দম আটকে আসছিলো।...যাক। মজুমদার, আর যা-ই হোক, এটুকু ভদ্রতা অন্তত করেছে যে তারপর আর আসে না, দাদার কাছেও না, আর দাদা এখন খুব গম্ভীর, এর মধ্যে আটটা-দশটা কথাও বোধহয় বলেনি তাকে...তা, তা-ই ভালো, রাগই লক্ষ্মী। কী-ভীষণ চেহারা নিয়েছিলো তখন, অথচ কত সহজেই মিলিয়ে গেলো। ছোট্ট হাসি ফুটলো স্বাতীর ঠোঁটে, মুখ নিচু করলো লুকোতে।

এদিকে সত্যেন ভাবছিলো সেই চিঠিটার কথা, চোখে দেখছিলো কাগজটার নীল রং, নিশ্বাসে পাচ্ছিলো তার ঝাপসামতো গন্ধ, পাঠ নেই, কয়েকটি, মাত্র কয়েকটি কথা, আর তলায় সেই নাম, সুন্দর নাম, পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর নাম। ফেরার পথে সমস্ত রাত ঐ চিঠির কথাগুলি ট্রেনচাকার তালে-তালে তার মাথায় ঘুরেছে, কেমন-একটা অস্বাভাবিক সুখের স্রোত হ'য়ে চলতিট্রেনের আবছাঘুমের ফাঁকে-ফাঁকে ব'য়ে গেছে ;—আর সেই স্রোত, সেই গূঢ় গোপন সুখ, সেই অতিসূক্ষ্ম অস্বাভাবিক কম্পন—যদিও বাইরে কিছু বোঝা যায় না, আর তার দিন-রাত্রি তেমনি নির্দিষ্ট নিয়মেই কাটছে—এখনো তার মনের তলায় থেমে যায়নি। আর এখন, এই মুহূর্তে সেটা যেন উপরদিকে উঠে এলো, কোনো-একটা কথা হ'য়ে ফুটতে চাইলো সত্যেনের মুখে, কিন্তু কথাটা ভাষায় তৈরি হ'তে যে-সময়টুকু লাগলো, সেই ফাঁকে স্বাতী ব'লে উঠলো, 'এখন উঠলে হয় না ?'

'হ্যাঁ, চলো।'

বাইরে প্রায় সন্ধ্যা, আবার মেঘলা, বৃষ্টি টিপটিপ, ট্র্যামে ভিড়। স্বাতী বসতে পেলো লেডিজ সীটে, আর সত্যেন দাঁড়ালো যদিও তার ঠিক পিছনেই, তবু কথাবার্তা অসম্ভাব্য জেনে—কিংবা ইচ্ছে ক'রে—সে-রকম চেষ্টা করলো না একজনও। স্বাতী ব'সে-ব'সে ভাবলো যে দু-মাস আগেও সে যেন ছেলেমানুষ ছিলো, বোকা ছিলো, এখন সে ঠিক-ঠিক নিজেকে পেয়েছে, খুঁজে পেয়েছে সেই নিজেকে, যার মতো হ'তে সবচেয়ে বেশি তার ইচ্ছা। আর, এক-একবার বাইরের ম্রিয়মাণ সন্ধ্যার দিকে, এক-একবার স্বাতীর

আলগা হওয়া, কাঁটা-বেরিয়ে-পড়া মস্ত খোঁপার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সত্যেন ভাবলো যে স্বাতীকে ঐ চিঠি বিষয়ে যে-কথা সে জিগেস করেছিলো, তার কোনো উত্তর পায়নি।

স্বাতী স্তম্ভিত হ'লো বাড়ি ফিরে বাবাকে দেখে। বাবাকে এত অভিভূত করেছেন রবীন্দ্রনাথ! বাবার মুখ কালো, ঠোঁট শুকনো, চোখ যেন গর্তে-বসা। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বললো, 'রামের মা চিঠিটা দিয়েছিলো তোমাকে?'

রাজেনবাবু মাথা নাড়লেন।

'দেরি হ'লো আমার—না?'

এবারেও বাবা যখন কথা বললেন না, কিছু জিগেস করলেন না, কী-রকম একটা সন্দেহ হ'লো স্বাতীর।—'বাবা, তুমি—তোমাকে—বাবা, কী হয়েছে?'

'একটা টেলিগ্রাম এসেছে।'

'টেলিগ্রাম? কই—দেখি—' বলতে-বলতেই স্বাতীর চোখে পড়লো বাবার হাতের কাছে প'ড়ে-থাকা ফ্যাকাশে রঙের খামটা। তুলে নিয়ে এক পলক পড়লো, তারপর বাবার দিকে তাকালো। বাবা কিছু বললেন না।

স্বাতী জিগেস করলো, '"স্ট্রোক" কাকে বলে, বাবা?'

'অসুখ—' স্বাতী যা বুঝেছিলো রাজেনবাবু তার বেশি বললেন না।

'খারাপ অসুখ?'

'ভালো না—' মেয়ের দিকে তাকালেন না বাবা।

'ডালিম—?' স্বাতী এদিক-ওদিক তাকালো।

'ফেরেনি এখনো।'

'ওর তো আজই যাওয়া চাই। কিন্তু গাড়ির কি সময় আছে?'

'সময় বদলেছে, ন-টায় আজকাল। ও যদি আটটার মধ্যে না-ফেরে—'

'আসবে—এক্ষুনি আসবে—সকলেই তো আজ—কিন্তু আটটার মধ্যে ঠিক এসেই পড়বে।'

'—তাহ'লে আমিই চ'লে যাবো,' রাজেনবাবু তাঁর কথা শেষ করলেন।

'তুমি—তুমি কেন—না, না, যাবে বইকি, তোমাকে দেখলে কত ভালো লাগবে বড়দির—অসুখটা কি খুবই খারাপ?'

রাজেনবাবু উত্তর দিলেন না।

'খারাপ—খুব খারাপ—কত আর খারাপ—' ঘরের মধ্যে ছটফট ক'রে হাঁটতে-হাঁটতে স্বাতী বলতে লাগলো—'মানুষের কি শক্ত অসুখ করে না—করেও, সেরেও যায়—তুমি অত ভাবছো কেন, ওখানকার ডাক্তাররা যদি না পারে এখানে চ'লে আসুক—হ্যাঁ, তা-ই তো ভালো, কলকাতায় কত বড়ো-বড়ো ডাক্তার—সব অসুখ সারাতে পারেন তাঁরা—' হঠাৎ থেমে গেলো স্বাতীর কথা, ছুরির খোঁচার মতো মনে পড়লো যে কলকাতার ডাক্তাররা যদি সব সারাতে পারতো তাহ'লে মা—আর রবীন্দ্রনাথ—; অথচ চুপ ক'রে থাকতে পারছিলো না—কিছু-না-বলা চুপচাপটা যেন অসহ্য, তাই আবার বললো, 'কখন এসেছে টেলিগ্রাম?'

'এই—দুটো।'

'তুমি কখন ফিরেছো?'

'তার একটু আগে।'

ছুটো! চার—পাঁচ ঘণ্টা! এতক্ষণ ব'সে আছেন বাবা এই দুশ্চিন্তার ভার নিয়ে একলা! আর আমি—

'ছোড়দিকে খবর দিয়েছো?'

'হরিকে পাঠিয়েছিলাম—বাড়ি ছিলো না। আজ তো সবাই—'

'এখন আবার পাঠাও!'

'থাক, এখন আর ওকে ব্যস্ত ক'রে কী হবে। এমনিতেই ক্লান্ত হয়ে ফিরবে।' রাজেনবাবু তাকালেন পুরোনো হলদে-হওয়া দেয়াল-ঘড়ির দিকে।

'দাদা?'

রাজেনবাবু কথা না-ব'লে হাত ওল্টালেন।

'দাদা এলেও তা—ছুটোর সময় এসেছে টেলিগ্রাম, না?—তা—তুমি চা খেয়েছো?' হঠাৎ কথাটা মনে পড়লো স্বাতীর।

'দিয়েছিলো।'

এ থেকে ঠিক বোঝা গেলো না বাবা খেয়েছিলেন কি খাননি; কিন্তু ও-বিষয়ে আর-কিছু বলা—কি আবার চা দিতে বলা—অর্থহীন লাগলো, সব কথাই অর্থহীন লাগলো। স্বাতী আর-একবার টেলিগ্রামটা পড়লো, উল্টে-পাল্টে দেখলো, তারপর যেন বাইরের ঘরে শব্দ পেয়ে ছুটে গেলো ডালিমকে কিংবা দাদাকে আশা ক'রে;—কিন্তু না—কেউ না।

রাজেনবাবু উঠলেন, হোল্ডলে ডালিমের বিছানা বাঁধালেন হরিকে দিয়ে, আর শতরঞ্চিতে জড়িয়ে নিলেন সুজনি বালিশ আর নিজের দু-একটা জামা-কাপড়।

স্বাতী তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখলো, তারপর বললো, 'তুমি যাবে, বাবা?'

'দেখি।'

'হ্যাঁ, বাবা, তুমি যাও—আমার জন্য ভেবো না—আমি থাকতে পারবো।'

'তুই না-নয় শাশ্বতীর ওখানে—'

'কেন? হরি আছে, রামের মা আছে—কী হবে আমার? আর তুমি-তো চ'লেই আসবে—আর জামাইবাবুও সেরে উঠবেন—' বলতে-বলতে বাঁধা বিছানা ছুটোর দিকে তাকিয়ে ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগলো স্বাতীর, কেমন-একটা দম-বন্ধ-করা শূন্যতা ছড়িয়ে পড়লো সারা বাড়িতে।

সব তৈরি ক'রে রাজেনবাবু আবার বসলেন চুপ ক'রে, আর স্বাতীরও সব কথা ফুরিয়ে গেলো, নিজেকে তার মনে হ'লো একটা নিংড়োনো ভিজে গামছার মতো, আর ঘরের মধ্যে টিকটিক করতে লাগলো হলদে বুড়ো ঘড়িটা।

ডালিম ফিরলো আটটার আগেই। জামা-কাপড় কাদায় মাখা-মাখি, মুখে বিজয়ীর নম্র হাসি। ছাড়েনি সে, নিমতলা গিয়েছিলো, ঢুকেছিলো, মানুষের চাপে ম'রে যেতে-যেতেও হেরে যায়নি, আর ফিরতে-ফিরতে ভেবেছে কী-রকম ক'রে বলবে সব ছোটোমাসিকে আর ছোটোমাসি কী-রকম অবাক হ'তে-হ'তে শুনবে। 'ছোটোমাসি—' ডাকতে-ডাকতে সে ঘরে এলো, আর ঢুকেই থমকে দাঁড়ালো দরজার কাছে। ছোটোমাসি এলিয়ে আছে খাটে, আর দাছুর মুখ যেন কেমন, আর মেঝেতে ছুটো বিছানা বাঁধা।—কেন?

···ডালিমের তৈরি হ'তে কয়েক মিনিটের বেশি লাগলো না। কোনোরকমে স্নান—গায়ের কাদাও উঠলো না—আর খাবার সামনে একবার বসলো আরকি। তার-যে ভীষণ একটা উদ্বেগ হচ্ছিলো তা নয়, কিন্তু বাবার অসুখের জন্য এখুনি তাকে যেতে হচ্ছে, হঠাৎ এত বড়ো একটা দায়িত্ব পেয়ে তার আত্মমর্যাদা বেড়ে গেলো অনেকখানি, আর তারই ফলে চরমে উঠলো তার ক্ষিপ্রতা, আর তাকে দেখতেও হ'লো গম্ভীর, খুব গম্ভীর। বুদ্ধি ক'রে বললো, 'কিছু ফল-টল নিয়ে যাবো শেয়ালদা থেকে?'

এ-কথার উত্তরে রাজেনবাবু বললেন, 'ট্যাক্সি এসেছে। চলো,' ব'লে নিজেই এগোলেন।

'আপনি—আপনি কেন?'

'তোমাকে তুলে দিয়ে আসি—'

'না—না—কিচ্ছু লাগবে না—আমি বুঝি—বাঃ!' ডালিম প্রায় হাত দিয়ে ঠেলে দিলো দাদুকে, তারপরেই নিচু হ'য়ে প্রণাম করলো, আর তার ছোটোমাসির দিকে একবার তাকিয়েই লাফিয়ে উঠে বসলো ট্যাক্সিতে।

এতক্ষণে স্বাতী জিগেস করলো, 'বাবা, তুমি গেলে না?'

'গেলাম না তো। দেখি—কাল—' এতক্ষণে রাজেনবাবু মেয়ের দিকে ভালো ক'রে তাকালেন।

৩

স্বাতীর ঘুম ভাঙলো অন্ধকারে। কিন্তু তখনই বুঝলো রাত আর নেই। কানে এলো কাকের কা-কা, রান্নাঘরে হরির কয়লা ভাঙার ঠকাশ-ঠকাশ, বাথরুমে জলের ছলছল। শেষের শব্দটায় বুঝলো বাবা উঠে পড়েছেন। নিজেও দেরি করলো না।

বেরোতে গিয়ে হোঁচট খেলো। দরজার ঠিক বাইরে, দুটো ঘরের মাঝখানকার ফালি গলিতে, ছড়িয়ে ঘুমুচ্ছে রামের মা— এ-রকম ক'রে ঘুমোয় নাকি সে, এমন অসহায়, নিঃস্ব ভঙ্গিতে?

রামের মা-কে প্রায় টপকে স্বাতী এগোলো, পিছনের বারান্দায় দেখা হ'লো বাবার সঙ্গে—হাত-মুখ ধুয়ে বেরিয়ে আসছেন বাথরুম থেকে। ছাইরঙা আবছায় স্বাতী দেখলো বাবার মুখ ছাইরঙা। ফ্যাকাশে অন্ধকারে রাজেনবাবু দেখলেন স্বাতীর মুখ ফ্যাকাশে। কেউ কিছু বললো না।

স্বাতী বাথরুমে ঢুকলো; বেরিয়ে এসে—আবার রামের মা-কে টপকে—ঘরে এলো; পরনের কুঁচকোনো আধময়লা মনমরা বেগনিরঙের শাড়িটা ছেড়ে একখানা পাটভাঙা মিলের শাড়ি পড়লো—শাদা শাড়ি, বড্ড শাদা, চুনের মতো, চুনকাম-করা দেয়ালের মতো শাদা আর মনমরা।

শাড়ি বদল ক'রে স্বাতী আবার এলো পিছনের বারান্দায়। এটাই বাবার বসবার ঘর, আর এটাই তাদের খাবার ঘর। লম্বা সরু রেক্সিনে-মোড়া খাবার টেবিল,—ডাক্তারদের রোগী দেখার

টেবিলের মতো, যেন এক্ষুনি কোনো অপারেশন হবে। লম্বা দিকে ধারের চেয়ারটায় বাবা বসেছেন উঠোনের দিকে মুখ ক'রে, স্বাতী বসলো উঠোনের দিকে মুখ ক'রে সরুদিকের একলা চেয়ারটায়। কেউ কিছু বললো না।

ঘোর কাটলো, ভোর হ'লো। ছাইরঙা আবছায়ার পর ফ্যাকাশে ছাইরঙা ভোর; ময়লা ধোঁয়াটে আলো রান্নাঘর থেকে পেঁচিয়ে-বেরোনো ধোঁয়ার মধ্যে মিশলো; রান্নাঘরের দেয়ালটা কালো, উঠোনে ধুলো আর কয়লাগুঁড়ো; ময়লা মনমরা, শীত-করা ভোর। স্বাতী আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিলো—এর মধ্যেই শীতের ভাব! গ্রীষ্ম কেটে গেলো কবে? বর্ষা ফুরোলো কখন?

রামের মা ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে আসছিলো ঘোমটা-খোলা মাথায়; বাবাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো, কাপড় টানলো, ঘোমটার তলায় দিদিমণির দিকে একবার তাকিয়ে ফিরে গেলো উল্টো দিকে। দুঃখী মুখ রামের মা-র—স্বাতী পলকে দেখলো—কালো, কুঁকড়োনো কুঁচকোনো মুখ।

ঘোর কাটলো, রোদ ফুটলো। রান্নাঘরের ময়লা ছাদে রোদ পড়লো রোগা, ছোট্ট চৌকো হলদে ময়লা রোদ উঠোনে নামলো। হরি এলো রান্না ঘর থেকে চা নিয়ে, চায়ের সঙ্গে রুটি-মাখন। তারও দুঃখী মুখ, শুকনো, সুখ নেই, বিষণ্ণ। ছেলেবেলা থেকে হরিকে দেখে আসছে স্বাতী; আর প্রথম দেখলো যে তার মুখ দুঃখ দিয়ে আঁকা।

নিঃশব্দে চা খেলো দু-জনে। ঘোমটা-ঢাকা রামের মা নিঃশব্দে এলো, টেবিলে রাখলো চশমা আর খবর-কাগজ, নিঃশব্দে চ'লে গেলো।

রাজেনবাবু কাগজের ভাঁজ খুললেন, চশমা-চোখে পড়তে লাগলেন খুব বেশি মন দিয়ে। স্বাতী নিঃশব্দে ব'সে থাকলো।

ছোট্ট, চৌকো, হলদে রোদ মিলিয়ে গেলো; রোগা, শাদা, লম্বা রোদ এগিয়ে এলো। স্বাতী নিঃশব্দে উঠলো, নিঃশব্দে চ'লে এলো ঘরে; রাজেনবাবু নিঃশব্দে কাগজ পড়তে লাগলেন।

না—কিছু বলবার নেই, কিছু করবারও নেই। যে-কথা এ-ক'দিন ধ'রে সব সময় মনে পড়ছে তার, যে-কথা কাল সারা রাত ঘুমের মধ্যেও এক মুহূর্ত সে ভোলেনি, তা নিয়ে একটি কথাও বলবার নেই, একটি কথাও শোনবার নেই—এমনকি, নতুন কোনো ভাবনাও ভাববার নেই আর। অথচ অন্য-কোনো কথাও নেই, অন্য-কোনো ভাবনাও নেই; যে-সব কথা হাজার বার ভাবা হ'য়ে গেছে, ঘুরে-ফিরে সে-সবই ভাবতে হয় আবার।

এই যেন প্রথম মৃত্যুকে চিনলো স্বাতী। মা মরেছিলেন: কেমন লেগেছিলো? অসুখ দেখে-দেখে স'য়ে গিয়েছিলো, জ্ঞান হবার সময় থেকেই বুঝেছিলো মা ব্যাপারটা তার পক্ষে তেমন মজবুত নয়। আর ছেলেমানুষও ছিলো; কষ্ট খুব, ভীষণ কষ্ট, কিন্তু আরামও সঙ্গে-সঙ্গে; যত কষ্ট তত কান্না, আর যত কেঁদেছে ততই ভুলেছে। তারপর সেই একবার ছুটির পরে কলেজে গিয়েই মায়া সান্যালের মৃত্যুর খবর। সেদিন—এখন ভাবলে বোঝে সে-কথা—সেদিন সবচেয়ে বেশি তার হয়েছিলো মনে-মনে একটা জিতে যাওয়ার ভাব—অন্য একজন মরলো, তাকে মরতে হ'লো না; আর সেইজন্য কলেজ থেকে রাস্তায় বেরিয়ে অনেক বেশি ভালো

লেগেছিলো—সব ; শুধু-শুধু বেঁচে থাকতেই ভালো লেগেছিলো। আর এই সেদিন রবীন্দ্রনাথের—কিন্তু ও-তো কোনো মৃত্যু নয়। পৃথিবীর রবীন্দ্রনাথেরা মরেন না ; তাঁরা চ'লে যান সময় থেকে সময়ের বাইরে, শরীর ছেড়ে মানুষের মনে, তাঁদের শেষ নেই। কিন্তু অন্যেরা, লোকেরা, সকলেরা ? তারা ম'রে গেলেই মরলো, শরীর থেকে বেরোলেই হারিয়ে গেলো, কিছু থাকলো না।

আর এই মরাই সকলকে মরতে হবে।

স্বাতীর মনে পড়লো স্কুলে যখন 'আমরা সাতজন' ব'লে সেই ইংরেজি কবিতাটা পড়েছিলো। মেয়েটি বলছে, 'আমরা সাত ভাইবোন—হ্যা, সাতজনই তো !' যদিও সাতজনের দু-জনই ম'রে গেছে। ছেলেমানুষ, মৃত্যু কাকে বলে বোঝে না। প'ড়ে হাসি পেয়েছিলো স্বাতীর। আট বছরের মেয়ে—মৃত্যু বোঝে না ! যত দূর স্মৃতি পৌঁছয়, এমন দিনের কথা মনে করতে পারেনি, যখন সে ঐ কবিতার মেয়েটির মতো ছিলো। খুব, খুব ছেলেবেলাতেই—বোধহয় চার কি পাঁচ বছরেই—এই খবরটা সে পেয়েছিলো যে সকলকেই মরতে হয়, এমনকি তাকে—তাকেও মরতে হবে। এই-তো সে খেলছে, হাসছে, খাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, যা ইচ্ছে তা-ই করছে ; কিন্তু সব সময়, সব সময় তাকে পিঠের দিকে তাক ক'রে আছে এক তীরন্দাজ, কানে-কানে ধনুক টেনে, মহাভারতের ছবিতে কিরাতের মতো পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে—যে-কোনো মুহূর্তে ছাড়তে পারে তীর, ছাড়ছে না কেন কেউ জানে না ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাড়বেই, কখন কেউ জানে না, আর ছাড়লেই হ'য়ে গেলো। ঘরে কখনো একা থাকলেই এই তীরন্দাজকে মনে পড়তো স্বাতীর,

পিছন ফিরে তাকাতে ভয় করতো, পিঠটা শুড়শুড় করতো যেন। কিন্তু একলা তাকে তো না, সকলকেই-তো একসঙ্গে তাক ক'রে আছে ঐ এক তীরন্দাজ, এক তীর, অন্যেরা জানে না? ভাবে না? ভয় পায় না? বড়োদের মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে স্বাতী চেষ্টা করেছে তাঁদের মনের ভাব বুঝতে—কই, তাঁরা-তো ভয়ে-ভয়ে নেই, দিব্যি!—তাহ'লে তারও কি আর ভয় থাকবে না বড়ো হ'লে—কবে বড়ো হবে?—কত বড়ো হ'লে ও-রকম নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? ছোট্ট স্বাতী আশায়-আশায় থাকলো, কিন্তু কবে-যে সেই শুভক্ষণ এলো আর গেলো, কবে থেকে যে পিঠের শুড়শুড়ানি সারলো, মহাভারতের কিরাতের মতো সেই তীরন্দাজকে ভুললো, তা আর মনে করতে পারে না এখনকার স্বাতী। এখন শুধু এইটে মনে পড়ে যে অনেক, অনেকদিন তাকে মনে পড়েনি—সেই ঝাপসা ছেলেবেলার পর আর না—মা যখন মরলেন তখনো না—একটানা অনেক, অনেক বছর সে এমনভাবেই কাটিয়েছে যেন মৃত্যু নেই।

'টেলিগ্রাম!'

আওয়াজটায় বুক কেঁপে উঠেছিলো স্বাতীর, যদিও এর জন্যই বিকেল থেকে বসেছিলো ছোড়দির আর বাবার সঙ্গে। একটু দেরি হয়েছিলো উঠতে, বাবা তার আগেই উঠলেন; স্বাতী দেখলো দরজায় একটা দৈত্যের ছায়া, আর একটু পরে রাস্তার অন্ধকারে রাক্ষসের একচোখের মতো সাইকেলের আলো। মুহূর্তের জন্য বাবার মুখটা যেন ভেঙে-চুরে অন্যরকম হ'য়ে গেলো, তারপর ফিশফিশে আওয়াজে বললেন, 'আমি যাই।'

স্বাতী বললো, 'আমিও যাবো।'

'না।'

'বাবা!'

'না।'

আগের দিনের বাঁধা বিছানা বাঁধাই ছিলো, আর ত্ব-একটা জিনিশ শাশ্বতী গুছিয়ে দিলো চটপট—আর পাঁচটা মিনিটও দেরি হ'লো না, কোনোরকমে ট্রেন ধরবার সময়টুকুই ছিলো তখন। রাজেনবাবু তুই মেয়েকে নামিয়ে দিলেন শাশ্বতীর বাড়িতে।... সেই-তো বাবা গেলেন, তবু আগের দিন গেলে—কিন্তু তাতেই-বা কী হ'তো!

তাদের দেখে, তাদের মুখ দেখে হারীত বললো, 'খবর ভালো না?'

শাশ্বতী জবাব দিলো না।

'তোমার বাবা চ'লে গেলেন আজ?' হারীত তাকালো স্বাতীর দিকে।

স্বাতী আস্তে মাথা নাড়লো।

হারীত কপাল কুঁচকোলো।—'অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'শেষ,' কথা বললো শাশ্বতী।

শুনে হারীত চুপ ক'রে থাকলো মিনিটখানেক, তারপর খুব গম্ভীরমুখে বললো, 'হুঁ।—এত খাওয়া—যদি শেষের দিকেও খাওয়াটা কমাতেন—তাছাড়া তো আর ওষুধ নেই এর—আর স্ট্রোক একবার হ'য়ে পড়লে মুশকি-ল!' 'মুশকিল কথাটা একটু আলগা ক'রে উচ্চারণ করলো, যেন এখনো এ থেকে উদ্ধার পাবার আশা আছে।

শাশ্বতী দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

ছোড়দির দীর্ঘশ্বাস, আর হারীতদার কথা, ছুটোই খুব খারাপ লাগলো স্বাতীর। খারাপ লাগলো ও-বাড়িতে থাকতে—বাড়িতে থাকলেই হ'তো, কিন্তু বাবা কিছুতেই দিলেন না। যে-ক'টা দিন বাবা ফিরলেন না, কী-যে খারাপ তার কেটেছিলো! একবার ঘুরেও আসতে পারেনি বাড়ি থেকে, কেননা সে-ক'দিনের মতো ছোড়দির তো কথা ওঠে না বাপের বাড়ি যাবার, আর দাদা যদিও মাঝে-মাঝে এসেছে, একবারও তাকে নিয়ে যেতে চায়নি—আবার, যদিও বাবা নেই, বলতে গেলে কেউ নেই, তবু বাড়িতেই যে তার মন প'ড়ে আছে, এ-কথা ছোড়দির কাছে লুকোনোও দরকার।

অন্য বাড়িতে এই প্রথম থাকলো স্বাতী। ঠিক-ঠিক নিজের অভ্যেস-মতো সব হয় না অন্য কোথাও, কিন্তু ঐ অসুবিধে আর কতটুকু, আর সেজন্য খারাপ লাগার মতো মনও তখন ছিলো না তার। কিন্তু, যেহেতু বাড়িটা ছোড়দির, তার ছোড়দির, এ-বাড়ির যা-কিছু তাদের বাড়ি থেকে আলাদা, সবই একটু বিশেষ হ'য়ে তার চোখে পড়লো। ছোড়দির সঙ্গেই তার মাখামাখি ছিলো সবচেয়ে বেশি; মেজদির সেজদির বিয়ের পর, আরো বেশি মা মরবার পর—ছোড়দিকে না-হ'লে এক দণ্ড তার চলতো না। আর এখন সেই ছোড়দির সঙ্গে—মাঝে-মাঝে দেখা হ'লে খুব ভালো—কিন্তু সারাদিন একলা কাটাতে হ'লে সে-যে একটু হাঁপিয়ে ওঠে, এইটে বুঝতে পেরে তার বিবেকে কামড়ালো। ছোড়দির অনেক অভ্যেসই আলাদা, কথাবার্তা আলাদা, অনেকটাই মেলে না তার সঙ্গে। স্বাতী ধ'রে নিলো যে ছোড়দি যা ছিলো তা-ই আছে, সে

নিজেই বদলেছে ; তাই নিজেকে দোষ দিলো মনে-মনে, আর সে-দোষ ঢাকবার জন্য ছোড়দিকে খুব বেশি ক'রে ভালোবাসতে চেষ্টা করলো। দুপুরবেলা পাশে শুয়ে-শুয়ে নিবিড় হ'তে চাইলো ছেলেবেলার স্মৃতিতে, কিন্তু ঠিক সুরটি যেন লাগলো না, আর ছোড়দিও তাকে রেহাই দিলো খানিক পরেই ঘুমিয়ে প'ড়ে। রাত্রে খাওয়ার পরে আবার—কিন্তু তখন যদি ছোড়দি একটু বেশিক্ষণ কাটিয়েছে তার সঙ্গে, হারীতদা, সে স্পষ্ট বুঝেছে, সেটা পছন্দ করেনি ; আবার হারীতদা যদি কখনো তার সঙ্গে বেশি কথা বলেছেন তাহ'লে ছোড়দির মুখভার হয়েছে। অন্য সময় হ'লে স্বাতীর হয়তো মজা লাগতো ; তখন শুধু খারাপই লাগলো, শুধু মনে হ'লো এখানে তার জায়গা নেই, এখানে সে আছে কেন।

কিন্তু সবচেয়ে খারাপ লাগলো মৃত্যুর প্রতি ছোড়দি-হারীতদার উদাসীনতায়। দু-জনের মধ্যে হারীতদাই অবশ্য ভালো ; তিনি স্পষ্টই বুঝতে দিলেন যে স্ত্রীর দিদির স্বামীর মৃত্যু তাঁর কাছে কিছুই না, তবে স্ত্রীর মন রক্ষার জন্য কয়েকটা দিন তিনি একটু চুপচাপ কাটাতে প্রস্তুত! কিন্তু ছোড়দি প্রায় সব সময় একটা শোকের ভাব রাখলো, থেকে-থেকেই বলতে লাগলো জামাইবাবুর, বড়দির কথা, বলতে-বলতে নিশ্বাস ফেললো ঘন-ঘন, চোখের জল মাঝে-মাঝে। এইটে অসহ্য লাগলো স্বাতীর।

কেন? ছোড়দি কি কপট, না স্বাতীর দুঃখ বেশি? না, ছোড়দির দুঃখও খাঁটি, তার দুঃখও বেশি না। বেশি দুঃখের কথাই-বা কী, ছোড়দির চেয়ে বেশি তো আর ছাখেনি জামাইবাবুকে। হয়তো ভালো লেগেছিলো বেশি, খুব ; কিন্তু সে-মানুষ হারিয়ে গেলো

ব'লে তার কি কিছু হারালো ? কিছু না। কোনো-এক প্রমথেশ চৌধুরী পৃথিবীতে আর নেই, তাতে ছোড়দির যতটা এসে যায়, তারও ঠিক ততটাই ;—কিছু না। ছোড়দির দুঃখ বড়দির জন্য, আর সেটাই ঠিক, স্বাভাবিক ; কিন্তু স্বাতী বড়দিকে তেমন ভাবলো না, ডালিমদেরও না, জামাইবাবুকেই ভাবলো বার-বার। বার-বার ভাবলো তাঁর লম্বা, ঠাণ্ডা, নিঃসাড় শুয়ে থাকা—মরা! কেমন দেখাচ্ছিলো ? সব-সময় হাসি-হাসি সেই মুখে একটুও হাসির ভাব ছিলো কি ? না কি যন্ত্রণায় মোচড়ানো মুখ ? না কি কিছুই না—শূন্য ? কিছু না, শুধু শূন্যতা।

স্বাতী ভাবলো—জামাইবাবুকে না—মৃত্যুকেই ভাবলো স্বাতী তাহ'লে এই ? অদৃশ্য তীরন্দাজ অব্যর্থ তীর নিয়ে ঠিক তৈরি ? যেমন ছিলো তার ছেলেবেলায়, তেমনি ? তখনো তেমনি, এখনো তেমনি, সব সময় তেমনি। আমরা ভুলে' যাই, আমরা ভুলে' থাকি ; সে কখনো ভোলে না। সে আছেই। সে আছে। তাক ক'রে আছে পিঠের দিকে, আমার দিকে, যা-কিছু আমার আর যা-কিছু আমি সেই সমস্তর দিকে। যত আমার ইচ্ছা, চিন্তা, চেষ্টা, সবার 'পরে সে ; যত আমার ফন্দি, ঝগড়া, ফুর্তি, সবার 'পরে সে ; যত আমার আশা আর যত আমার ভালোবাসা, তার 'পরেও সে। কেমন ক'রে এতদিন ভুলে' ছিলাম !

মৃত্যুকে এতদিন ভুলে' ছিলো ব'লে স্বাতীর অবাক লাগলো, আরো অবাক লাগলো অন্যদের এখনো ভুলে' থাকতে দেখে, আর চোখের উপর ছোড়দি-হারীতদাকে দেখে। মৃত্যুর সঙ্গে হারীতদার ভদ্রতার সম্পর্ক, আর ছোড়দির করুণার ; যে যার সম্পর্কের

পাওনাটুকু মিটিয়ে আবার বেঁচে থাকতেই ব্যস্ত; একবার মনে পড়লো না তাদের যে, মৃত্যুর আরো পাওনা আছে; মনে পড়লো না যে, জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুর কাছে বিক্রি হ'য়ে গেছে তারা নিজেরাই। সেই নিশ্চিত, নিশ্চিন্ত, ভীষণ তীরন্দাজকে কখনো তারা ছাখেনি, এখনো তারা দেখলো না।

ছোড়দি-হারীতদার সঙ্গে মস্ত একটা বিচ্ছেদ অনুভব করলো স্বাতী। শুধু ও-দুজন নয়, সকলের সঙ্গেই বিচ্ছেদ। যারা বেঁচে আছে, যাদের নিয়ে পৃথিবী, স্বাতীর মনে হ'লো তারা তার কেউ না। এমন-কিছু সে জেনেছে যা আর-কেউ জানে না; সেইজন্য সকলের থেকে সে বিচ্ছিন্ন, পৃথিবীর মধ্যে সে একলা। সবাই চলেছে একদিকে, নেচে, লাফিয়ে, ছুটে, ঘুরে, তাড়াতাড়ি, দেরি ক'রে, দলে-দলে চলছে বলির পাঁঠা, কেউ জানে না কোথায় যাচ্ছে, একলা সে জানে। একলা সে জানে যে জীবন্ত মানুষরাই মরন্ত, যারা বেঁচে আছে তারাই দিনে-দিনে মরছে, মৃত্যু নেই শুধু মৃতের। একলা সে জানে যে মৃত্যু ছাড়া সত্য নেই, যতদিন পারি আর যেমন ক'রে পারি মৃত্যুকে আমরা পালিয়ে বেড়াই, আর সেই পালিয়ে বেড়ানোর নামই জীবন। আর এই জীবন—এতে দুঃখই সত্য, দুঃখই নিশ্চিত আর স্থির; যতক্ষণ পারি আর যেমন ক'রে পারি আমরা তাকে এড়াই, ফাঁকি দিয়ে বেড়াই, আর সেই ফাঁকির নামই সুখ, আশা, ইচ্ছা। এও সেই জানে, একলা সে।

গান আরম্ভ হবার আগে যেমন ঝমঝম তানপুরা বাজে, তেমনি একটা ঝিমোনো, গম্ভীর, একটানা সুর স্বাতীর মনের মধ্যে বাজতে লাগলো সব সময়, দুঃখের সুর, সব-জড়ানো দুঃখের; গম্ভীর, মন্থর:

নিশ্চিত দুঃখের স্রোত ব'য়ে চললো একটানা ; থামে না, কমে না ; বাড়ে না, ছাড়ে না ; সব সময় একরকম। বাবা ফিরলেন, বাড়ি ফিরলো ;—একই রকম। দিনের পর দিন কাটতে লাগলো ; —একই রকম।

যেদিন বাড়ি ফিরলো, সেদিনই সত্যেনবাবু এলেন। তাঁকেও একটু দূর লাগলো, পর লাগলো, কিন্তু এও মনে হ'লো যে তার এখনকার মনের ভাব কেউ যদি বোঝে তো তিনিই বুঝবেন। তাকে প্রথম দেখে হাসিমুখে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আর-একবার তাকাতেই হাসি মিলিয়ে গেলো মুখ থেকে, উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী হয়েছে ?'

স্বাতী তখনই কোনো জবাব দিতে পারলো না।

'এখানে ছিলে না তোমরা ?—আমি এসেছিলাম দু-দিন—বাড়ি বন্ধ ছিলো—কোথায় গিয়েছিলে ?—কী ? কী হয়েছে ?'

স্বাতী আরো একটু দেরি করলো, মনে-মনে কথাগুলি সাজিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'আমার বড়োজামাইবাবু—মানে, বড়দির স্বামী—তিনি—মারা গেছেন।'

কথাটা শুনে সত্যেনবাবু একবার মাত্র তাকালেন—চকিত, দ্রুত, একটু ভীত দৃষ্টি। তারপরেই ব'সে পড়লেন, ব'সে থাকলেন নিচু মাথায় চুপ ক'রে ; কিছু বললেন না, জিগেস করলেন না, কোনো বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন না ; শুধু ব'সে থাকলেন চুপ ক'রে খানিকক্ষণ, অনেকক্ষণ ; আর স্বাতীও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলো, মনে পড়লো এই সেইদিনের কথা, যেদিন উনি এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর খবর নিয়ে। সেদিন তক্ষুনি কিছু করবার ছিলো,

অনেক করবার ছিলো, তারপর বলবারও ছিলো অনেক ;—আজ কিছু নেই, আজ শুধু চুপ। শহর ভ'রে, দেশ ভ'রে এখনো রবীন্দ্রনাথের হৈ-হৈ, কাগজে সেটাই বড়ো খবর এখনও ; কত পত্রিকা, কত বক্তৃতা, ছবি, গান, কথা, কমিটি সমিতি—এ-রকম চলবে আরো কিছুদিন ;—আর এরই মধ্যে আরো বড়ো এক খবর এসে পৌঁছলো মাত্র কয়েকজন মানুষের কাছে, সব মানুষ থেকে আলাদা হ'য়ে গেলো সেই ক-জন, আরো কাছাকাছি হ'লো পরস্পরের। যে-কোনো একজনের ম'রে যাওয়াটা কিছুই না, রোজই মরছে ; চলতে-চলতে একবার 'আহা' বললেই ফুরোলো ; কিন্তু যে-ক'জন তাতে দুঃখ পায়, তাদের দুঃখের মতো দুঃখ নেই, নিজের দুঃখ ছাড়া দুঃখ নেই—সেটাই শুধু দুঃখ ; অন্য সব খবর, ঘটনা, কথা বলার বিষয়। হঠাৎ স্বাতীর মনে পড়লো রেস্তোরাঁয় ব'সে ধ্রুব দত্তের সেই কথাগুলি—খুব খারাপ লেগেছিলো তখন, খুব রাগ হয়েছিলো, কিন্তু—ঠিকই-তো—ঠিক কথাই তো বলেছিলেন। দুঃখ কি অমন ক'রে শহর ভ'রে ছড়ায়, দুঃখ কি পৃথিবী ভ'রে সোর তোলে ?—কেমন ক'রে হবে :—দুঃখ-তো সেটাই, যা মানুষকে একলা ক'রে দেয় ; সকলে মিলে, অনেকে মিলে দুঃখী হওয়া যায় না তো। আমরা-যে শুধু দুঃখকে ডরাই তা নয়, দুঃখীকেও এড়াই ; তাই, যতক্ষণ পারি, এমনভাবে চলি ফিরি যেন দুঃখ ব'লে কিছু নেই, যেন ওটা কিছুই না।

যে-কথা শুনে সত্যেনবাবু অমন ক'রে ব'সে পড়লেন, সেটা কি তাঁর কাছে কিছু ? তাঁর মুখে চোখ রেখে এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজলো স্বাতী। কিন্তু কপালে হাত রেখে নিচুমাথায় এমন ক'রে বসেছেন যে থুতনি ছাড়া কিছু প্রায় দেখাই যাচ্ছে না।

সত্যি যেন একটা আঘাত পেয়েছেন এইরকম দেখাচ্ছে ভঙ্গিটা। কিন্তু তাঁর আঘাত পাবার কী আছে? আর আমিই-বা কেন ভাবছি সে-কথা—তিনি তো বলতে গেলে চেনেনই না ওঁদের। এটা তাঁর ভদ্রতা—হারীতদার চেয়ে উঁচু জাতের ভদ্রতা—সুন্দর সৌজন্য, কিন্তু আমারও তো ভদ্রতা আছে, আমারই কথা বলা উচিত, যাতে উনি সহজ হ'তে পারেন।

স্বাতী ব'সে আলাপ করলো, 'আপনি এসেছিলেন এর মধ্যে?'

সত্যেনবাবু হাত সরালেন কপাল থেকে, কথা বললেন না।

'কলেজেও যাইনি এ-ক'দিন,' স্বাতী আলাপ চালালো, 'ছোড়দির ওখানে ছিলাম। বাবা তো গেলেন বড়দির কাছে।'

সত্যেনবাবু মুখ তুললেন, কথা বললেন না।

'একেবারে হঠাৎ—আপনাকে তাই আগে জানাতে পারিনি।' ব'লেই অপ্রস্তুত লাগলো স্বাতীর;—সবই ওঁকে জানাতে হবে নাকি? আর খবরটাও যেন ওঁর কাছে জরুরি!—তাই তাড়াতাড়ি আবার বললো, 'আপনি এ-ক'দিন কী করলেন?'

এতক্ষণে উনি তাকালেন, এতক্ষণে কথা বললেন। 'আমি—আমি আর কী করবো। এখন যাই,' ব'লে একবার একটু তাকালেন স্বাতীর চোখে, তারপর চ'লে গেলেন।

সেই চোখের গভীর স্তব্ধতাকে স্বাতী অবিশ্বাস করতে পারলো না। একটু অবাকই হ'লো, একটু ভাবলো মনে-মনে। উনি কি তবে বুঝেছেন আমার মনের কথাটা? উনিও কি দেখেছেন সেই ভীষণ তীরন্দাজকে? যা শুধু আমিই জানি, আর পৃথিবীর আর-কেউ জানে না, তা কি তবে উনিও জানেন?

বালতি-ন্যাতা হাতে ঘর মুছতে এলো রামের মা। তার দিকে তাকিয়ে সত্যেনকেই দেখলো স্বাতী, দেখলো সেদিনের সেই স্তব্ধ গভীর চোখ। তার মনের মধ্যে খেলে গেলো—'আমি দুঃখ পেয়েছি, সেটাই তার দুঃখ; আমি বড়দিকে ভালোবাসি, তাই সে বড়দিকে প্রায় না-দেখেই ভালোবাসে।' কথাটা এর আগেও অনেকবার উঁকি দিয়েছে তার মনে—আমল দেয়নি—এখনো আমল দিলো না। কিন্তু নিজেরই অজান্তে সত্যেনের কথাই ভাবতে লাগলো ব'সে-ব'সে। এই দেড় মাস ধ'রে একটু ঘন-ঘন আসছে; এই দেড় মাসে স্বাতী সবসুদ্ধ যত কথা বলেছে, তার অর্ধেকেরই বেশি সত্যেনের সঙ্গে। বাবা বড্ড চুপচাপ আজকাল, আর একটু-যেন ব্যস্ত, উদ্বিগ্ন; চশমা-চোখে ব'সে চিঠি লেখেন বড়দিকে, বড়দির বড়ো দেওরকে;—স্বাতী কখনো বাবাকে ছাখেনি নিজের হাতে এত চিঠি লিখতে। এতদিনে সে-ই ছিলো বাবার সেক্রেটারি; কিন্তু এ-সব চিঠির বিষয়ে সে কিছু জানে না পর্যন্ত, মেজদি-সেজদির চিঠি এলেও বাবা তাকে দেন না। একদিন জিগেস করেছিলো 'কী লিখছো, বাবা, বড়দিকে?'

'আসতে লিখলাম এখানে।'

'বড়দি আসবেন!' কথাটা খুশির না, উচ্ছ্বাসের না; কথাটা যেন প্রশ্ন, যেন দ্বিধাভরা প্রশ্ন। কেমন ক'রে চোখ রাখবে বড়দির উপর আবার, কেমন ক'রে কথা বলবে?

'হ্যাঁ, আসাই ভালো।' বাবাও এমন ক'রে কথাটা বললেন যেন এর বিরুদ্ধ যুক্তিও আছে। স্বাতী বুঝলো যে বড়দির পক্ষে এখানে আসা এখন আর সহজ না—আগেও সহজ ছিলো না,

কিন্তু তখনকার বাধা আর এখনকার বাধা একেবারে উল্টোউল্টি তাই বললো, 'তুমি বললে আসবে না?'

'দেখি।' বাবা আবার লিখতে লাগলেন, একটু পরে চোখ তুললেন তার দিকে। চশমার পিছনে বাবার কুঁকড়োনো বুড়ো চোখে স্বাতী কী-যেন দেখলো; আর তাকালো না, আর দাঁড়ালো না সেখানে।

বাবার মুখ মিলিয়ে গেলো, সত্যেনকে মনে পড়লো আবার। স্বভাবত সরল তার চোখ, মুখে গম্ভীরতার লাবণ্য, আস্তে কথা বলে, কিন্তু অস্পষ্ট কখনো না। আর এমন কথা বলে যে সব সময় উত্তর না-দিলেও চলে, চুপ ক'রে শুনলেও মনে হয় দু-পক্ষেরই কথাবার্তা এটা। এখন আর বইয়ের কথা না, নানা কথা; তিন বছরে সব সুদ্ধু যে-ক'টা কথা বলেছিলো তারা, এই দেড় মাসে তার বেশি বলা হ'য়ে গেছে। স্বাতী ভাবতে চাইলো সেই কথাগুলি; কিন্তু কী-আশ্চর্য—একটা কথাও মনে আনতে পারলো না। কী? কী বলে সত্যেন?

হঠাৎ চমকে উঠলো স্বাতী, চমকে বুঝলো সত্যেনবাবুকে সে মনে-মনে 'সত্যেন' ভাবছে। একা ঘরে লাল হ'লো, যেন নিজের দিক থেকেই মুখ ফেরালো; আর ঠিক তখনই ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো শরতের শীতল, উজ্জ্বল সুন্দর একটি সকাল, যে-সকালটা এতক্ষণ ম'রে ছিলো তার কাছে।—সত্যেন! আওয়াজ না-ক'রে, কিন্তু ঠোঁট নেড়ে, নামটা উচ্চারণ করলো একবার। কবে থেকে সত্যেন হ'লো?

একটু শব্দ হ'লো ঘরে, তাকিয়ে দেখলো, ছোড়দি। দু-বোনে

'এখনই ?' একটু কেঁপে উঠলো স্বাতী।

'গাড়ি ক-টায় পৌঁছয় ?'

'আটটা—কত মিনিট যেন—'

'তাহ'লে দেরি আছে এখনো,' শাশ্বতী তাকালো হাতের ছোট্ট সোনার ঘড়ির দিকে—তার বিয়েতে জামাইবাবুর উপহার। 'বাবা স্টেশনে গিয়েছেন ?'

'কী-যেন—বোধহয়—'

বাবার গতিবিধি সম্বন্ধে স্বাতীর ওই 'বোধহয়'টা একটু বেখাপ্পা শোনালো শাশ্বতীর কানে। 'যাই, দেখে আসি।' তখনই ফিরে এসে বললো, হ্যাঁ, গিয়েছেন।'

এবার বেখাপ্পা লাগলো স্বাতীর। বাবা কোথাও বেরিয়ে গেলেন তাকে কিছু না-ব'লে, তার সঙ্গে দেখা না-ক'রে—এটা তার কাছে নতুন।

'বিজু ?' শাশ্বতী জিগেস করলো।

'ওঠেনি—বোধহয়।'

শাশ্বতীর মনে হ'লো স্বাতী অন্য কথা ভাবছে, যে-কথার সঙ্গে বড়দির আজ আসার কোনো যোগ নেই। নিজেই গেলো বিজনের ঘরের দিকে। দরজা বন্ধ। টোকা দিলো ; 'বিজু, বিজু' ব'লে ডাকলো ; জবাব পেলো না। ফিরে এসে বললো, 'বিজু এত বেলায় ওঠে ?'

স্বাতী বললো, 'এমন আর বেলা কী ? আমরা আজ ভোরে উঠেছি কিনা, তাই মনে হচ্ছে।'

'কারণ আছে ব'লেই উঠেছি। বিজুরও ওঠা উচিত।'

স্বাতী চুপ।

'ওকে ডাকলে হয় না?'

'তুমি ডাকলে তো শুনলাম।'

'কিন্তু—ওদের আসবার সময়ও ঘুমিয়ে থাকে যদি বিজু?' শাশ্বতীর চোখে-মুখে উদ্বেগ ফুটলো।

'অতক্ষণ কি আর ঘুমোবে।'

'কী-বিশ্রী! কী ভাববেন বড়দি—ছি! আমার-তো মনে হয় ধাক্কাধাক্কি ক'রে ওকে ডেকে তোলাই উচিত,' শাশ্বতী ব্যস্ত হলো।

'গ্যাখো চেষ্টা ক'রে।'

'তোর ভাবটা যেন তোর কিছুই না?'

স্বাতী চুপ।

'এখনো তোর রাগ পড়েনি বিজুর উপর?'

'রাগ ছিলো নাকি কোনোদিন?' স্বাতী পাৎলা হাসলো।

শাশ্বতীও হাসলো। 'আমার উপরেও রেগেছিলি খুব?'

মজুমদারের ব্যাপারটি চুকে যাবার পরে এই প্রথম তার কোনো উল্লেখ হ'লো দু-বোনের মধ্যে। স্বাতী বললো, 'আমি কি তোমার উপর রাগতে পারি?'

শাশ্বতী তাকালো স্বাতীর দিকে, ঘরের দিকে। এই ঘরেই সে থাকতো, ঘুমুতো—স্বাতীর সঙ্গে। একটু আবছা ক'রে বললো, 'তখন যা ভালো মনে হয়েছিলো করেছিলাম। মনে রাখিস না।'

এর পরে দু-জনেই চুপ ক'রে রইলো একটুক্ষণ।

'আসবার সময় সত্যেনবাবুকে দেখলাম ট্র্যাম-স্টপে,' শাশ্বতী কথা বদলালো।

'কে সত্যেনবাবু?'

'সত্যেনবাবু—সত্যেন রায়—তোর আজ হয়েছে কী বল তো?'

ছোড়দির সঙ্গে একটু-একটু কথা বলতে-বলতে মনের গভীরে যে-মানুষের কথা সারাক্ষণ সে ভাবছিলো, তার সম্বন্ধে হঠাৎ ওরকম একটা দৈনন্দিন উল্লেখ শুনে স্বাতী বুঝতেই পারেনি প্রথমটায়। কিন্তু ঠিকই তো: অন্যদের কাছে সে মাত্রই একজন সত্যেনবাবু, যে-কোনো একজন সত্যেন রায়। ছোড়দির সাধারণ সুরটা নকল ক'রে বললো, 'কলেজে যাচ্ছেন বোধহয়।'

'ছুটি হয়নি এখনো?'

'এই হবে।'

'আমি তাকালাম, কিন্তু উনি দেখলেন না—নয়তো কথা বলতাম একটু।' একটু পরে শাশ্বতী আবার বললো, 'বেশ লাগে আমার ওঁকে।'

স্বাতী লক্ষ্য করেছে সত্যেনকে আজকাল একটু অন্য চোখে দেখছে ছোড়দি। কবে থেকে যেন ভাবটা স্পষ্ট বদলেছে। এখানে এসে দেখতে পেলে কেমন হাসে, এগিয়ে কথা বলে, একটু বেশিই বলে—অন্তত স্বাতীর তা-ই মনে হয়। দাদা ছোড়দিকে কিছু বলেছে—এ-ই সে ধ'রে নিয়েছিলো মনে-মনে, যেহেতু তার মনেই হয়নি তাকে আর সত্যেনকে একসঙ্গে দেখতে পাওয়াই সত্যেনকে লক্ষ্য করার যথেষ্ট কারণ আজকাল। ছোড়দির মুখ দেখে বোঝবার চেষ্টা করলো দাদার কথা সে কতটা বিশ্বাস করেছে, তারপর তার কাঁধের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সুন্দর ব্লাউজটা।'

কিন্তু শাশ্বতী আগের কথাতেই ফিরে গেলো। 'একদিন চা

খেতে বলবো ভাবি বাড়িতে ; কিন্তু—' যেটা ভাবছিলো স্বামীর বিষয়ে সেটা চালিয়ে দিলো স্বামীর বন্ধুদের নামে—'হারীতের বন্ধুদের সঙ্গে ঠিক-তো মিলবে না সত্যেনবাবুর।'

'একা ওঁকে বললেই পারো।'

'তা পারি, কিন্তু তোর হারীতদাকে তো জানিস, নিজের দলের দু-তিনটি বন্ধু যেখানে নেই, সেখানে তাঁর কিছুই ভালো লাগে না ; আবার দু-চারজন না-হ'লে জমেও না ঠিক, আর—আর সত্যেনবাবুর কি ভালো লাগবে তুই না-গেলে ?'

স্বাতী হেসে ফেললো, হেসে বললো, 'বেশ-তো, আমাকে যদি বলো আমিও যাবো।'

'না, তোকে বলবো না।' শাশ্বতী হাসলো, বাঁকা।

খানিকটা এটা মনের কথা শাশ্বতীর। সম্প্রতি এ-বাড়িতে সে যে-ক'দিন এসেছে—যদিও এক-একদিন এক-এক সময়ে—তার মধ্যে চার-পাঁচদিনই দেখেছে স্বাতীকে ঐ প্রোফেসর ভদ্রলোকটির সঙ্গে ব'সে থাকতে ; সে এলে স্বাতীর যেন একটু ইতি-উতি অবস্থা—একবার এ-ঘর, একবার ও-ঘর—আবার তিনজনে একসঙ্গে বসতেও উশখুশ। এ থেকে যা ভেবে নেবার তা অবশ্য ভেবেইছিলো শাশ্বতী, যদিও, মজুমদারের ব্যাপারটা তখনো তার মনে তেতো হ'য়ে লেগেছিলো ব'লে, কাউকে কিছু বলেনি এ-পর্যন্ত, বাবাকেও না, স্বামীকেও না। মনে-মনেই পুষছিলো কথাটা, ভালোই লাগছিলো ; মনে পড়ছিলো নিজের—নিজেদের—কথা ; আহা, এই একটা সময় জীবনের ! তার ইচ্ছে করে সত্যেনের সঙ্গে একা কথা বলতে, টিপে-টিপে তার মনের কথা বের করতে—; কিন্তু

তার স্বামীটি-যে সে-রকম না, এ-রকমের মেলামেশা ভালোবাসে না, আরো কম বাসে খরচ করতে। মজুমদার মানুষটা কিন্তু মন্দ ছিলো না, যদি আসা-যাওয়াটা রাখতো অন্তত—যাঃ, ওর পরে তা আর হয় নাকি—সত্যি, স্বাতীকে বিয়ে করতে চেয়েই সব মাটি ক'রে দিলো মজুমদার।

তখনকার মতো শাশ্বতী ভুলে' গেলো যে মজুমদারের এই ইচ্ছায় সে-ই যোগান দিয়েছিলো সবচেয়ে বেশি; আর এ-কথাও তার মনে হ'লো না যে ঐ মানুষটাকে সে ভাবছে শুধু নিজের ইচ্ছা মেটাবার একটা উপায়হিশেবে, এই অসম্ভব আশা করছে তার কাছে যে যে-মেয়েকে সে চেয়েছিলো কিন্তু পেলো না, তাকেই ফুর্তিসে এগিয়ে দেবে অন্য-একজনের দিকে। অনেক অসংলগ্ন, অনুচিত, পরস্পরবিরোধী ভাবনা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে শাশ্বতীর মনের উপর দিয়ে ভেসে গেলো। তিন বছরের চেষ্টাতেও স্বামীর দলটির মধ্যে মিশিয়ে দিতে পারলো না নিজেকে, এখন চেষ্টাও ছেড়ে দিয়েছে। বাপের বাড়িতে বাবা বুড়ো হচ্ছেন, আর স্বাতীটা একটু অন্য রকম মানুষ তো, আর বিয়ে হয়নি ব'লে অসুবিধেও অনেক—শাশ্বতীর অসুবিধে। আনন্দের জায়গা বলতে এখন তার শ্বশুরবাড়িটাই; জা দেওর ননদ ননদাইতে বেশ ঝমঝমে এক-এক সময়, কিন্তু চালচলন তাঁদের একটু সাবেকি, বাইরের জগতে মেয়েদের আনাগোনা এখনো পাড়ার দোকানে শাড়ি-জামা কেনা আর বাংলা ফিল্ম একটিও বাদ না-দেয়াতেই আবদ্ধ। ওখানে তার ভালো লাগে, কিন্তু হারীত-যে ও-বাড়ি ছেড়েছে তাতেও সে মনে-মনে খুশি; ঠিক তার মনের মতো একটা মেলামেশার জগৎ, যার

স্বাদ ঐ অল্প ক-দিনের জন্য মজুমদার তাকে দিয়েছিলো, এখনো খুঁজে পাচ্ছে না কোথাও। সত্যেনকে দেখে, সত্যেনের সঙ্গে স্বাতীকে দেখে আবার তার নতুন ক'রে আশা হ'লো।

শাশ্বতীর এই একটু চুপ ক'রে থাকার সুযোগ নিলো স্বাতী।— 'দাদাকে ডেকে দেখবে নাকি আরেকবার?'

এবার তার চেষ্টায় কাজ হ'লো, মনের বাক্সে ডালা এঁটে শাশ্বতী তখনই উঠলো। 'হ্যাঁ, দেখি।' যেন একটা মস্ত কাজ নিয়ে যাচ্ছে, যে-কাজ আর-কেউ পারবে না, এমনি চেহারা ক'রে বেরিয়ে গেলো। ফিরে এলো মুখ লাল ক'রে মিনিট দুই পরে।—নাঃ! কত ডাকলাম, ধাক্কালাম,—পাত্তাই নেই! শেষ পর্যন্ত উঃ, আঃ আওয়াজও শুনলাম দু-একবার, একটু দাঁড়ালাম, কিন্তু আবার চুপ!—সত্যি!'—ছোটোদের অবাধ্যতায় গুরুজনের মুখ যেমন গম্ভীর হয়, তেমনি হ'লো শাশ্বতীর।

স্বাতী ব'সে-ব'সে ও-সব ডাকাডাকি শুনেছিলো, তার ফলও বুঝেছিলো, তাই কিছু বললো না।

'অত ঘুমোতে পারে নাকি কোনো মানুষ! ঘুম কি আর না-ভেঙেছে এতক্ষণে—ইচ্ছে ক'রে শুয়ে আছে, ইচ্ছে ক'রে জবাব দিলো না, পাছে কিছু করতে হয়। তুই ঠিকই বলিস, স্বাতী, বিজুটা মানুষ না!'

'ও-কথা আমি কবে বলেছি?'

স্বাতীর আপত্তি শাশ্বতী গ্রাহ্য করলো না, আবার বললো, 'এত বড়ো একটা কাণ্ড ঘ'টে গেলো—একটু বিকার নেই ওর মনে।'

দাদা-যে এটাকে চুপচাপ মেনে নিয়েছে, তাতেই বরং স্বাতী

স্বস্তি পেয়েছিলো—যা ওর রোলারুলি স্বভাব! তাই বললো, 'কী আর করবে। পুরুষমানুষ—'

'আরে রাখ ও-সব! মনে লাগলে কেউ আবার চাপতে পারে! বিজুটা মানুষ না, ওর আত্মা নেই; কী-রকম স্বার্থপরের মতো থাকে দেখিস না—খায়, ঘুমোয়, তা ছাড়া আর সম্পর্ক নেই বাড়ির সঙ্গে!' বলতে বলতে শাশ্বতী বড্ড রেগে গেলো ভাইয়ের উপর, হঠাৎ তার মনে হলো স্বাতীকে বিয়ে করতে চাওয়ার দুর্বুদ্ধি বিজুই দিয়েছিলো মজুমদারকে। 'ও কি জানেও না বড়দি আসবেন?'

'জানে,' স্বাতী সংক্ষেপে উত্তর দিলো।

'জানে তো জেগে-জেগে শুয়ে আছে কেমন ক'রে—আর এত ডাকলাম! ভদ্রতা ব'লেও তো আছে একটা!'

স্বাতী বললো, 'সত্যি ঘুমোচ্ছে হয়তো।'

'কিসের! কোনো হাঙ্গামার মধ্যে থাকবে না, এই আর কি।' শাশ্বতী থামলো, দম নিলো। 'তা এদিকে সব ঠিকঠাক তো?'

'ঠিকঠাকের আর কী।'

'বাঃ, এত লোক আসবে, তার একটা ব্যবস্থা আছে না! চল দেখে আসি।' আবার কেজো ধরনে শাশ্বতী উঠলো, ছোট্টো বাড়িটি ঘুরে এলো রান্নাঘর পর্যন্ত। রান্নাঘরে হরি দুধ ফুটিয়ে রেখে, চা-বাসন সাজিয়ে, এখন শিঙারায় পুর ভরছে ব'সে-ব'সে—আসামাত্র ভেজে দেবে গরম-গরম; আর বারান্দায় ব'সে রামের মা আনারস কাটছে, টুকরোগুলো বঁটি থেকেই পড়ছে শাদা পাথরের থালায়, আর তার বাঁ দিকে একটি ঝুড়িতে পেঁপে আপেল কমলা-লেবু কত

কী। কাজ খুঁজে না পেয়ে শাশ্বতী আবার ঘরের দিকেই ফিরলো, চলতে-চলতে বললো, 'কেমন লাগে রে তোর ভাবতে ?'

'কী ভাবতে ?'

'যে বড়দি আর—তাঁর খাওয়া-পরা কিছুই-তো আর আমাদের মতো থাকলো না !'

'বাজে নিয়ম সব !'

'আজকাল অনেকেই-তো মানে না ও-সব। কিন্তু বড়দি বোধহয়—' ভাবতেই পারি না রে। ঐ শাদা কাপড় !' শাশ্বতী থামলো, নিশ্বাস ছাড়লো। 'কী-রূপ বড়দির, আর কী-বা বয়স !'

বড়দির সম্বন্ধে এই অত্যন্ত সংগত, স্বাভাবিক সহানুভূতির কথা শুনে হঠাৎ জামাইবাবুর জন্য ভীষণ একটা কষ্ট হ'লো স্বাতীর। ছোড়দি যেন জামাইবাবুকে প্রায় দোষ দিচ্ছে ম'রে যাওয়ার জন্য। সর্বনাশ হ'লো বড়দির ; কিন্তু সে-তো শুধু মুখের কথা, কথার কথা ; সত্যি সর্বনাশ হ'লো অন্য জনেরই—যে মরলো তারই সর্বস্ব গেলো। স্বাতীর একটা ঝাপসা ধারণা হ'লো যে শোকার্তের জন্য আমাদের যে-সহানুভূতি জাগে, তাও মৃত মানুষটিকে ভুলে যাই ব'লেই, মৃত্যুকে ভুলে থাকি ব'লেই। মৃত্যু এত ক'রেও পারলো না মানুষকে দিয়ে তাকে মনে রাখাতে।

দু-বোনে এলো বাবার ঘরে। সেখানে বাবার বড়ো খাটে আর শাশ্বতীর পুরোনো দিনের ছোটো খাটে পরিষ্কার বিছানা তৈরি, বড়োটা সুজনিতে আর ছোটোটা চিকনপাটিতে ঢাকা ; সব ঠিক আছে। বাবা কিছু ভোলেন না, সময়মতো সব করেন, করান, কারো জন্য ফেলে রাখেন না কিছু।

রাখলে এখনকার মতো ভালো হ'তো, কেননা ঘড়ির কাঁটা আটটার দিকে যত এগোলো, ততই ক'মে এলো ছু-বোনের কথাবার্তা, আর কেমন-একটা ছটফটানি শুরু হ'লো ছু-জনেরই ভিতরে-ভিতরে। একবার এখানে, একবার ওখানে একটু-একটু ক'রে ব'সে শেষ পর্যন্ত বাইরের ঘরে এলো তারা। সেখানে চেয়ারগুলি তেমনি একদিক ঘেঁষে-ঘেঁষে আছে, অন্য দিকে ডালিমের বিছানা তেমনি সুজনি-ঢাকা, টেবিলে বইপত্র গুছোনো। তার গোল টাইমপীসটিতেও রোজ দম দিতে ভোলেনি স্বাতী।

একটু দূরে-দূরে বসলো ছু-বোনে। শাশ্বতী ব'সেই বললো, 'দরজাটা খুলে দে, স্বাতী।'

স্বাতী উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের দরজা খুলে দিয়ে আবার বসলো।

একটু পরে শাশ্বতী বললো, 'পরদাটা সরে গেলো যে। টেনে দে। আচ্ছা, তুই থাক—'

শাশ্বতী নিজেই উঠলো, পরদা টেনে দিয়ে বসলো অন্য একটা চেয়ারে। একটু পরে বললো, 'গরম—না?'

স্বাতী উঠে পাখা খুলে দিয়ে আবার বসলো অন্য একটা চেয়ারে।

একটু পরে শাশ্বতী বললো' 'কী-জোর হাওয়া—একটু কমিয়ে—' নিজেই উঠে পাখা কমিয়ে আবার বসলো প্রথম যেটায় বসেছিলো সেই চেয়ারে। ব'সেই চোখ পড়লো ডালিমের টাইমপীসটায়। 'আটটা-কুড়ি!' শাশ্বতী যেন আঁৎকে উঠলো।

'কুড়ি!' স্বাতীরও গলা কেঁপে গেলো, যেন আটটা বেজে কুড়ি মিনিট হওয়া আর কখনো সে শোনেনি।

পর-পর খানিকক্ষণ দু-জনেই চেষ্টা করলো গোলমুখো, টেবিল-ঘড়িটার দিকে না-তাকাতে, আর দু-জনেরই চোখ ঐ শাদা-কালো গোল মুখের উপরেই পড়তে লাগলো বার-বার ?

শাশ্বতী বললো, 'গাড়ি ঠিক ক-টায় ?'

'ঠিক জানি না।'

'টাইমটেবল নেই ?'

স্বাতী মাথা নাড়লো।

'খবরকাগজ ?'

'দেখছি।' স্বাতী উঠলো, খবরকাগজটা খুঁজে পেলো খাবার টেবিলেই, নিয়ে এসে ছোড়দির হাতে দিয়ে অন্য একটা চেয়ারে বসলো।

তাড়াতাড়ি, ব্যস্ত হাতে, যেন এর উপর জীবনমরণ নির্ভর করছে, শাশ্বতী কাগজ ওল্টাতে লাগলো। 'কই রে?—কোথায় ?—কী-কাগজ এটা ?—এই-যে—পেয়েছি। নাম কী গাড়ির ?'

'তা তো জানি না।'

'তাও জানিস না ?' শাশ্বতী প্রায় খেঁকিয়ে উঠলো। 'ঢাকা মেল—না, ঢাকা মেল কী ক'রে হবে—মৈমনসিং থেকে তো—মৈমনসিং থেকে কোন গাড়িতে পৌঁছয় জানিস না ?'

স্বাতী উত্তর দিলো না।

'কী-মুশকিল !' কাগজটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেললো শাশ্বতী। স্বাতী নিচু হ'য়ে হাত বাড়িয়ে একটা পাতা তুলে নিলো, হাঁটুর উপর ছড়িয়ে চোখ নামিয়ে রাখলো সেখানে।

শাশ্বতীও নিচু হ'লো, আর-একটা পাতা তুলে নিলো. কিন্তু সেটা চোখের সামনে না-ধ'রে হাতের মধ্যে গোল ক'রে পাকাতে লাগলো আর খুলতে লাগলো, আর কয়েকবার এ-রকম করার পর হঠাৎ তার হাত থেমে গেলো, একটু শান্তভাবে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে ঠিক সময় হয়েছে এতক্ষণে।'

'নাকি ?' স্বাতী কাঁপলো, তাকালো, উঠলো। সঙ্গে-সঙ্গে শাশ্বতীও উঠলো। শাশ্বতী দেখলো স্বাতীর মুখ ফ্যাকাশে, ঠোঁট শুকনো। স্বাতী দেখলো শাশ্বতীর মুখ শাদা, ঠোঁট ফ্যাকাশে। তারপর কোনো কথা না-ব'লে দু-জনেই ব'সে পড়লো আবার : শাশ্বতী যেটায় ব'সে ছিলো স্বাতী বসলো সেটায়, আর স্বাতী যেটায় ব'সে ছিলো সেটাতে বসতে গিয়েও ফিরলো শাশ্বতী, স্বাতীর ঠিক পাশের চেয়ারটায় বসলো।

কথা বলার চেষ্টাই আর করলো না তারা। দু-জনে ব'সে থাকলো পাশাপাশি ; দু-জনেই তাকিয়ে থাকলো সামনের দিকে, দরজার দিকে, পরদার ফাঁকে রাস্তার দিকে। দু-জনেই শুকনো শাদা ফ্যাকাশে, আর দু-জনেই ভিতরে-ভিতরে কাঁপছে। পাশাপাশি, কাছাকাছি, প্রায় হাতে হাত ছুঁইয়ে, অথচ কেউ কারো দিকে না-তাকিয়ে, আর একটুও না-ন'ড়ে, এমন ক'রে তারা ব'সে থাকলো যে রাস্তা থেকে কারো চোখে পড়লে তার মনে হ'তো যে বিশেষ-কোনো মনোহর ভঙ্গিতে ছবি তোলাতে বসেছে দুই তরুণী।

...কিন্তু মেরুনরঙের ট্যাক্সিটা যখন ঝিলিক দিলো জানলায়, দু-জনে শান্ত উঠলো, আস্তে হাঁটলো—যদিও কেউ কারো দিকে তাকালো না—কয়েক পা মেঝে পার হ'য়ে পরদা

ঠেলে বেরোলো, দাঁড়ালো বাইরের সিঁড়িতে, পাশাপাশি; কেউ কারো দিকে না-তাকিয়ে।

প্রথমে লাফিয়ে নামলো আতা তাতা দুই বোন—কতো বড়ো হ'য়ে গেছে!—তারপর ছোটন, কী ক'ষে এঁটেছে হাফপ্যান্টের বেল্টটা!—তারপর গান্ধিটুপি এঁটে লম্বা, গম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ ডালিম—টুপি কেন? বাঃ, ন্যাড়া হয়েছিলো না? আর ভাতে ভাত খেয়ে মোটাও হয়েছে!—সেবারে তাকে আনা হয়নি, আর এবারে সে-ই নিয়ে এসেছে সকলকে—আর একটা ট্যাক্সিতেই, সকলকে ধ'রে গেছে এবার।

বাবা নামলেন বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে—এমন-আর বাচ্চা কী এখন, আর কী-রকম হাসছে শাদা-শাদা দাঁত দেখিয়ে—কী মিষ্টি! অন্য সব কথা ভুলে গেলো স্বাতী, সিঁড়ি থেকে রাস্তায় নামলো, বাবার কোল থেকে নিজের কোলে নিলো, বুকে চেপে ধরলো, গালে চুমু খেলো। আর এই নতুন মানুষটির মুখের দিকে একবার মাত্র চোখ ফেলেই সরু, ছোটো, কিন্তু বেশ জোড়ালো গলায় হঠাৎ কেঁদে উঠলো বাচ্চাটি।

'ছী-ছী, মাসির কোলে গিয়ে নাকি কাঁদে! মাসি—ছোটোমাসি—'

স্বাতী গলা শুনে চোখ ফেরালো। শাদা : শাদা কাপড়, শাদা সিঁথি : কিন্তু বড়দি। চোখে দেখার প্রথম মুহূর্তটিকে আবছা লাগলো স্বাতীর।

'ওকে দে আমার কাছে,' ব'লে শ্বেতা সুখী, দুঃখী, হাসি-হাসি, ছলছলে, ছলোছলো চোখে স্বাতীর দিকে একটুখানি তাকিয়ে

একটুখানি আদর করলো তার গালে। স্বাতী কেঁপে উঠলো, চোখ নামালো, কয়েক ফোঁটা চোখের জল দৌড়ে নামলো পর-পর তার গাল বেয়ে।

বাচ্চাকে নিয়ে সিঁড়ি উঠে শ্বেতা বললো, 'কী, শাশ্বতী? বিজু কই?'

'বিজু—' শাশ্বতী একটা মিথ্যে বানাবার চেষ্ট করলো, কিন্তু দরকার হ'লো না। ঠিক যখন শ্বেতা বাড়িতে ঢুকছে, সেই মুহূর্তটিতে ভিতর থেকে ছুটে এলো বিজু, এইমাত্র ঘুমভাঙা, এলোমেলো চুল, কাপড়টা লুঙ্গির মতো ক'রে কোনোরকমে জড়ানো, গায়ে একটা বোতাম-খোলা, বুকের-চুল-দেখানো ডোরাকাটা রঙিন বিলেতি রাত-জামা। বড়দিকে দেখেই একটু থমকে দাঁড়ালো সে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তার মুখের বিশ্রী, বদ, বাঁকাচোরা একটা চেহারা হ'লো, হঠাৎ ঘোড়ার মতো লাফিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলো বাচ্চাসুদ্ধ বড়দিকে; হাউহাউ ক'রে লুটিয়ে কেঁদে পড়লো।—'ও—ও বড়দি! ও—ও জামাইবাবু! জামাইবাবু—উ!'

বিজুর ধাক্কায় বাচ্চাটি প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিল কোল থেকে, শ্বেতা কোনোরকমে সামলে নিলো, চেষ্টা ক'রে স'রে দাঁড়ালো, আর বিজু যেন আশ্রয় হারিয়ে এলিয়ে প'ড়ে গেলো শ্বেতার পায়ের কাছে মেঝেতে। ওঠার চেষ্টা করলো না, মুখ ঢাকলো না, কান্নার বেগে অবিশ্বাস্য সব ভঙ্গি হ'তে লাগলো তার মুখের, আর ভাঙা, চড়া, সাংঘাতিক আওয়াজে এক-একটা খাবি-খাওয়া কথা বেরোতে লাগলো তার গলা দিয়ে: 'জামাইবাবুর মতো— আর কে! কে আমাকে টাকা দিয়েছিলো—কার টাকা নিয়ে আমি

আজ—ও—ও জামাইবাবু—ওঃ-হো-হোঃ!' দু-হাঁটু উঁচু ক'রে, দু-হাত পিছনে ছড়িয়ে, দু-হাতে মেঝে আঁকড়ে, রঙিন ডোরাকাটা বোতাম-খোলা জামার ফাঁকে বুকের কালো-কালো চুল দেখিয়ে—ব'সে-ব'সে বিকটভাবে কাঁদতে লাগলো বিজন।

ট্যাক্সি বিদেয় হয়নি তখনো, প্রকাণ্ড শিখ ট্যাক্সিওলা দাড়িগোঁফের ঝোপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রাজেনবাবুও রাস্তায়, হরি মাল তুলতে-তুলতে থেমে গেছে, স্বাতী আর ডালিম উঠতে-উঠতে থমকে গেছে সিঁড়িতে, রাস্তাতেও দাঁড়িয়ে গেছে দু-একজন। দরজাটা হাঁ-করা, পরদাটা সরানো, সকলেই দেখছে, শুনছে; আশেপাশের বাড়ি ক-টিতেও পৌঁচচ্ছে বিজনের এই আন্তরিক, অকৃত্রিম, মর্মস্পর্শী শোকোচ্ছ্বাস।

ঘরে শাশ্বতী দাঁড়িয়ে থাকলো মূর্তির মতো; আতা তাতা ছোটন গোল-গাল চোখে তাকিয়ে থাকলো অবাক; শ্বেতা চেষ্টা করলো এক হাতে ভাইকে আরেক হাতে বাচ্চাকে সামলাতে। আর বাইরে ডালিম ঘন-ঘন তাকাতে লাগলো ছোটোমাসির দিকে; কিন্তু ছোটোমাসি মুখ তুললেন না, নড়লেনও না, আর সেও তাই আর-কিছু ভেবে না-পেয়ে সিড়িতেই দাঁড়িয়ে থাকলো রাস্তার দিকে পিছন দিয়ে, আর দু-জনের মাঝখানে সাবধানে পথ ক'রে শেষ মালটা ঘরে তুললো হরি। রাজেনবাবু ভাড়া মেটালেন, গাড়ির ভিতরটা দেখলেন, আর ট্যাক্সির সঙ্গে-সঙ্গে প্রকাণ্ড শিখ চ'লে যেতেই গলিটা হাঁফ ছাড়লো। রাজেনবাবু ঘরে গেলেন না, সিঁড়িতে উঠলেন না, বিজুকে চোখে দেখেও দেখলেন না, কানে শুনেও শুনলেন না। বিজুর কথা কিছুই ভাবছিলেন না তিনি, আর-কিছুই

ভাবছিলেন না। ঘুম ভেঙে প্রথম যে-কথা আজ মনে পড়েছে আর তার পরেও বার-বার, সে-কথাই ভাবছিলেন আবার ভাবছিলেন সেই দিনটির কথা, শ্বেতা যেদিন জন্মালো। এই প্রথম বেলেঘাটার গরিব বাড়িতে সেই আঁতুরঘর, দরজায় দাঁড়িয়ে সেই প্রথম দেখা; দাইয়ের কোলে এইটুকু একটা ছোট্ট লাল শরীর; আর খাটের উপর এলানো চুল, চোখবোজা শাদা মুখ, লেপের বাইরে শাদা একটি হাত। সেই শাদা দেখে 'শ্বেতা' কথাটা মনে এলো। সেই শ্বেতা।

৪

আবার পুজোর ছুটি, আবার কলকাতার বাইরে যাওয়ার ধুম। রেল-টিকিট এবার যেন অন্যবারের চেয়েও শস্তা ; রাস্তায় বেরোলেই চোখে পড়ে পিছনে মাল-বাঁধা ট্যাক্সি।

শাশ্বতীর শ্বশুরবাড়ির দল দেওঘর গেছে, শ্বশুরের বাড়ি আছে সেখানে। হারীত শাশ্বতীরও যাবার কথা ছিলো হারীতের ছুটি হ'লেই, কিন্তু আপিশের শেষ দিনটিতে বাড়ি ফিরে হারীত জানালো তার যাওয়া হ'লো না।

শাশ্বতী বললো, 'কী হ'লো ?'

'এখানেই থাকতে হচ্ছে আমাকে।'

'কেন ?'

'অগ্রণী সংঘের নাম বদলে প্রতিরোধ-সংঘ হ'লো, কিন্তু তাতেই তো হ'লো না, নতুন ক'রে গড়তে হবে সমস্তটা। কথা হচ্ছে কবে থেকেই, কাজ কিছু হয়নি। কিন্তু এখন আর দেরি না। এই ছুটিতেই—বম্বে থেকে ঠাণ্ডানি আসছেন এইজন্য। এদিকে মকরন্দ চ'লে যাচ্ছে বিল্লিবকম।'

'তাহ'লে তুমি কেন যেতে পারো না ?'

'সেইজন্যই। মকরন্দ বড্ড খেটেছে ক-মাস, ডাক্তার বলেছে বিশ্রাম নিতে। ওকে যেতেই হবে।'

'মকরন্দ মুখুয্যের তিন-ডবল তো তুমি খাটো।'

'তর্ক কোরো না।' হারীত কথা বলছিলো ঘরের মধ্যে ঘুরতে-

ঘুরতে : প্রথমে কোট খুলে হ্যাঙ্গরে এঁটে ব্র্যাকেটে লটকালো, তারপর আলনার ধারে এসে জুতো ছাড়লো, টাইটাকে ঝুলিয়ে দিলো আলনার গলায়, তারপর টেবিলের ধারে এসে দেখলো কোনো চিঠিপত্র আছে কিনা। তার চেয়ারটায় শাশ্বতী ব'সে ছিলো হাতলে হাত রেখে। জিগেস করলো, 'বসবে ?'

'না না, তুমি বোসো। আমি—' হারীত আবার চললো বাথরুমের দিকে—'আমার যাওয়া হ'লো না তা তো দেখছো। তুমি যাও।' শেষের কথাটা বললো বাথরুমের দরজা থেকে মুখ ফিরিয়ে। কিন্তু হারীতের কথা শোনার জন্য ঘরের মধ্যে নানা জায়গায় শাশ্বতী তার চোখকে আর পরিশ্রম করালো না।

চা খেতে-খেতে হারীত আবার কথা তুললো : 'আগে জানলে ওদের সঙ্গেই তোমাকে পাঠিয়ে দিতাম। কিন্তু ঠাণ্ডানির টেলিগ্রাম আজই মাত্র এলো।'

শাশ্বতী বললো, 'এখান থেকে দেওঘর আমি একাই যেতে পারি।'

'নিশ্চয়ই !' হারীত খুশি হ'লো। 'দিনের গাড়িতে যাবে, এখান থেকে আমি তুলে দেবো, ওখানে ওরা স্টেশনে থাকবে। বদল-টদল নেই—মুশকিল আর কী। কবে যেতে চাও ? কাল ?'

'আমি যাবো না।'

'যাবে না ? কেন ?'

'না, যাবো না।'

হারীত পর-পর তিনটে-চারটে বেগুনি খেয়ে ফেললো। কেন-যে এ-সব মান-অভিমানগুলো এখনো যাচ্ছে না দেশ থেকে !

হারীত একদম পছন্দ করে না এ-সব ; শুধু-যে পছন্দ করে না তা নয়, এর সামনে পড়লে অসহায় লাগে নিজেকে। কী করতে হবে, বলতে হবে বোঝে না, যেন বোকা ব'নে যায়, আর তাইতে ভিতরে-ভিতরে এমন রাগতে থাকে যে ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত বিশ্রী হ'য়ে ওঠে তার জন্যই। রাগের চড়তি মুখটাকে মনে-মনে চেপে ধ'রে নরম সুরে বললো, 'যাবে না কেন ? ভালো লাগবে তোমার, আর শরীরও সারবে।'

'আমার কি অসুখ নাকি যে সারবে ?'

'না, না—এই-তো একঘেয়ে জীবন, আর খাঁচার মতো ফ্ল্যাট—মাঝে-মাঝে বাইরে একটু ঘুরে এলে তবু—'

'আমার একঘেয়ে লাগে না।'

হারীত বিলেতি ধরনে হাতের পাতা উল্টিয়ে বুঝিয়ে দিলো এ-সব বাজে কথার সময় তার নেই! ইংরেজিতে বললো, 'যা তোমার খুশি।' তারপর বাংলায় বললো, 'আমি শুধু এই বলতে চেয়েছিলাম যে আমার জন্য তোমাকে আটকে থাকতে হবে না। তুমি স্বাধীন ; নিজের ইচ্ছেমতো চলবে।'

'যদি বলি তুমি যাবে না ব'লেই আমার যাবার ইচ্ছে নেই ?'

হারীত নিচু হ'য়ে চা খাচ্ছিলো, এক টানে মুখ তুললো স্ত্রীর দিকে। বাঁকা হেসে জবাব দিলো, 'তাহ'লে আমি বলবো তোমার অসুখ করেছে, আর সে-অসুখ সারাবার জন্যই তোমার যাওয়া উচিত।'

এবার শাশ্বতীও হাসলো একটু বাঁকা ক'রে। 'আমি গেলেই তুমি যেন খুশি হও ?'

'ওঃ!' ঐ একটিমাত্র জোরালো আওয়াজ ক'রেই হারীত তার মনের ভাব ব্যক্ত করলো।

আবার জুতো-টুতো প'রে হারীত পাঁচ মিনিটের মধ্যে বীরদর্পে বেরিয়ে গেলো। কোথাও যাবার কথা ছিলো না সেদিন; বাড়িতেও কোনো কাজ ছিলো না; অনেকদিনের মধ্যে এই একটা সন্ধ্যা ফাঁকা ছিলো তার: আর সত্যি বলতে, মনে-মনে সে এ-ই ভেবেছিলো যে সন্ধের পর শাশ্বতীকে নিয়ে বেরোবে দরকারি কয়েকটা জিনিশ কিনতে—নিউ মার্কেটে আসবে, শাশ্বতী আবার ভালোবাসে নিউ মার্কেটে বেড়াতে। সব ঠিক হ'য়েও দেওঘরে যাওয়া হ'লো না, এটা শাশ্বতীর খারাপ লাগবে ব'লেই তার খারাপ লাগছিলো; তবে শাশ্বতীর আশাভঙ্গ হবে না, তার যাবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে, এমনকি, দুটো দিন ছিনিয়ে তাকে দেওঘরে রেখেও আসবে—এও সে ভেবেছিলো মনে-মনে। কিন্তু যে-রকম ভেবেছিলো সে-রকম কিছুই হ'লো না: উল্টোটাই হ'লো। তার দোষ? শাশ্বতীর দোষ? হারীত একা-একাই নিউ মার্কেটে এলো; নিজের জন্য দুটো গেঞ্জি, ক্যালিকো মিলের আধ-ডজন রুমাল, আর শাশ্বতীর জন্য দুটো রঙিন কাঁচুলি আর একটা খোঁপার জাল কিনলো —এ-সব আবার বালিগঞ্জে পাওয়া যায় না—আর ফাঁকে-ফাঁকে এ-কথাটা ভাবলো একটু। না, কারোরই দোষ না, এ-ই নিয়ম। এ-রকম হয়েছে অনেকবার এর আগে; এ-রকমই হবে এর পরে অনেক বার, আরো অনেকবার। যা ভাবা যায়, যার জন্য মন তৈরি থাকে, ঠিক তার উল্টোটাই হবার। পর-পর সাজানো আছে সব: গুম হ'য়ে থাকা, থমথমে হাওয়া, তারপর রাত্রে, কোনো-এক রাত্রে

সব ভুলে যাওয়া, সব ফিরে পাওয়া। কিন্তু সে আর কতক্ষণ ক-মিনিট? তারপর ক্লান্ত হ'য়ে ঘুম, আর ঘুমের পরে দিন। আর পরের দিনই যদি আবার কিছু ঘটে, তুচ্ছতম কিছু, তাহ'লে আবার তা-ই, ভাবনার উল্টো, ইচ্ছার উল্টো, মুখ-ভার, মন-ভার, অস্বাস্থ্যকর স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া, তারপর আবার রাত্রি। কী ক্লান্তিকর দাম্পত্য!

সে-রাত্রেও তা-ই হ'লো। আর তারপর শাশ্বতী খুব ছোট্ট গলায় বললো, 'আমি চলে গে'লে তুমি খুশি হও?'

'কী-সব বাজে!'

'আমি থাকলে তুমি খুশি হও? আমি চ'লে গেলে তোমার কষ্ট হবে আমার জন্য?'

হারীত বিছানার মধ্যে নড়লো একটু। কী-সব প্রশ্ন—মাথায় একটু মগজ থাকলে কী হয়?

'বলো না!'

'বাজে কথার আমি জবাব দিই না!' হারীত এমনভাবে কথাটা বললো যেন উত্তরটা স্বতঃসিদ্ধ, তাই না-বললেও চলে।

কিন্তু শাশ্বতী তাতে তৃপ্ত হ'লো না। 'না, বলো। আমি চ'লে গেলে কষ্ট হবে তোমার?'

অন্ধকারে শাশ্বতীর চোখ স্পষ্ট দেখতে পেলো হারীত। নিজের চোখ বুজে ফেললো; ভাবলো মিথ্যে, মিথ্যে না-বলিয়ে কিছুতেই ছাড়বে না? আর মিথ্যেটা শুনলেই কি খুশি হবে? এড়িয়ে বললো, 'কর্তব্যের কাছে কষ্টকে আমি গণ্য করি না।'

'কোনটা তোমার কর্তব্য?'

'ছুটিতে কলকাতায় থাকা।'

'আর আমার কর্তব্য দেওঘর যাওয়া?'

'না, তোমার কর্তব্য এই,' ব'লে হারীত স'রে এসে স্ত্রীর বালিশে মাথা রাখলো। কর্তব্যকে অবহেলা করতে পারলো না শাশ্বতী। প্রায় এক মিনিট পরে নিশ্বাস ছাড়লো, লম্বা নিশ্বাস, সুখের। আর হারীতও ছোট্ট, গোপন একটা নিশ্বাস ছাড়লো একেবারে স্পষ্ট মিথ্যেটা বলতে হ'লো না ব'লে। তার জিৎটাকে পাকা করার জন্য ওখানেই শুয়ে থাকলো।

গুনগুন নরম আওয়াজে শাশ্বতী বললো, 'ছাখো, আমাদের যাওয়া হ'লো না, ভালোই হ'লো।'

'ভালো কেন?'

'এই সেদিন বড়দির এ-রকম—আর এর মধ্যেই আমরা ফুর্তি ক'রে বেড়াতে যাবো—মনটা কেমন লাগছিলো আমার।' জীবনের উষ্ণতা, পরম উষ্ণতার তলানিটুকু চাখতে-চাখতে হঠাৎ বড়দির জন্য একটা বুক-ভাঙা কষ্ট হ'লো শাশ্বতীর, তার এখনকার এই সুখটাকে যেন অপরাধের মতো লাগলো। সুখের সঙ্গে দুঃখ মিলে সুখের স্বাদ বাড়লো: স্বামীর সঙ্গে নিজেকে একেবারে এক মনে হ'লো, যেমন আগে কখনো হয়নি। মুখ-চাপা আবছা গলায় বললো, 'সত্যি, স্বামী না-থাকলে মেয়েদের কিছুই থাকে না।'

সেই পুরোনো কথা! হিন্দুধর্মের ভূত! কিন্তু তার যুক্তি, তর্ক, আপত্তির তৈরি ফৌজটাকে হারীত হুকুম ছাড়লো না; ঘুম জড়াচ্ছিলো চোখে; তাছাড়া সেই মুহূর্তটিতে তারও অলস লাগছিলো, তারও; অলস আর সুখী।

ছোট্ট নিশ্বাসের সঙ্গে শাশ্বতীর কথা বেরোলো—'বড়দির দেওরদের কথা-তো শুনেছো ?'

কী-যেন একবার শুনেছিলো, ঘুমের সিঁড়িতে হোঁচট খেলো হারীত। 'হ্যাঁ—এ-রকমই তো—' বলতে-বলতে হারীত নেমে এলো জাগার সমতলে। 'হিন্দু বিধবাকে কে না ঠকিয়েছে মনু-মান্ধাতার আমল থেকে আজ পর্যন্ত !' ভূতের ল্যাজে শুড়শুড়ি দেবার সুখটাকেও শেষ পর্যন্ত হাতছাড়া করলো না।

'আর এই ভাইদের জন্য জামাইবাবু শুনেছি—বৈমাত্রেয় তো, বয়সে অনেক ছোটো, বলতে গেলে বড়দির কাছেই মানুষ তারা।'

'সেই তো !' হারীত কথা বলার জন্য স'রে এলো নিজের বালিশে। 'আমাদের জয়ন্ট ফ্যামিলি মানেই তো এই ! সকলের জন্য সব করো, নিজের স্ত্রীপুত্র ভাসিয়ে দাও ! তবু কি চোখ খোলে আমাদের ? প্রমথেশবাবু বোধহয় রেখেও যাননি বেশি কিছু ?'

'সে-রকমই তো শুনলাম', শাশ্বতী সরু গলায় কবুল করলো, যেন তারই দোষ এটা।

হারীত একটু গড়ালো, তারপর বালিশের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে উপুড় হ'লো। এটা তার ঘুমের আগের সবচেয়ে আরামের শোওয়া। শাশ্বতীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'এত অপব্যয় !'

হারীতের কথায় অনেকটা সহানুভূতিও ছিলো, কিন্তু শাশ্বতীর একটু ব্যথা লাগলো। জামাইবাবুর অপব্যয়ের ফলে সেও তো সুখী হয়েছিলো কত, আর এই সুখী হওয়া, সুখী করাটাই কি পৃথিবীতে সবচেয়ে বাজে ? বাবার কাছে যা শুনেছিলো তা-ই শোনাতে

চাইলো স্বামীকে ; খুব নিচু গলায়, যে-সুরে কোনো ভদ্রলোকের কোনো গোপন বদভ্যাসের উল্লেখ করে আরেকজন ভদ্রলোক, সে-রকম লাজুক সুরে বললো, 'শুধু অপব্যয় না। অনেক দিয়েও দিতেন।'

'দিয়ে দিতেন !'

'এই সাহায্য করতেন আরকি অনেককে। অনেক দুঃস্থ পরিবার, গরিব ছাত্র—যে এসে যখন চাইতো—'

'সেটা তো আরো অপব্যয় !' হারীত অস্ফুট হাসলো। 'এত অভাব সংসারে—কতটুকু তার মেটাতে পারে একজন মানুষ ? কিছুই হয় না, লাভের মধ্যে সে-ও গরিব হ'য়ে পড়ে। এর একমাত্র উপায় হচ্ছে এমন ব্যবস্থা যাতে গরিব কেউ থাকবেই না। অবশ্য বড়োলোকও না !' কথাটা শেষ ক'রে হারীত ভাবলো যে ব্যাঙ্কে যেটা সে মাসে-মাসে জমাচ্ছে, সেটাকে আদ্ধেক ক'রে আর-একটা ইনশিওরেন্স-পলিসি নিলে হয়। হঠাৎ ম'রে গেলে কিন্তু ইনশিওরেন্সেই দারুণ লাভ।

এর পর শাশ্বতী আর কথা বললো না ; চুড়ির রুনঠুন আওয়াজ ক'রে পাশ ফিরলো। হারীতও চোখ বুজলো, ভাবতে আরম্ভ করলো—প্রতিরোধ সংঘের ব্যাপারে কী-কী করবে। কিন্তু একটু পরে আবার শুনলো চুড়ির আওয়াজ। শাশ্বতীর গলা এলো, 'ঘুমুলে ?'

'না,' হারীত চোখ বুজেই জবাব দিলো।

একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে শাশ্বতী বললো, 'বিজুকেও দু-হাজার টাকা দিয়েছিলেন জামাইবাবু।'

'বিজনকে ?' হারীত চোখ খুলে তাকালো। 'কেন ?'

'বিজু চেয়েছিলো আরকি। এতদিন কেউ জানতো না; বিজু নিজেই ব'লে ফেললো সেদিন।'

ঘুম ছুটে গেলো হারীতের, অনুশোচনার কামড় পড়লো মনে। এত সোজা! তাহ'লে সেও তো পারতো পার্টির জন্য মোটারকম একটা চাঁদা বাগাতে; পার্টির ঠিক নাম না-ক'রে একটু ঘুরিয়ে বললেই নিশ্চয়ই দিতেন; ঈশ্‌শ্‌—এমন একটা সুযোগ পেয়েও হারালো! ঐ বিজন—তাকে এক কথায় দু-হাজার! আর তার কিনা একবার মনেও হ'লো না কথাটা! লোকটাকে ফ্যাশিস্ট ঠাউরে গর্জালো শুধু! সত্যি—ঠাণ্ডানির মতো ঠাণ্ডা মাথা হ'লে তবে-তো কাজ হয়!

বিছানায় উঠে ব'সে হারীত বললো, 'বিজন করছে কী টাকা দিয়ে ?'

'ও-তো বলে ব্যবসা করছে।'

'কিসের ?' হারীত এ-প্রসঙ্গ ছাড়তে পারলো না।

'আমি ঠিক জানি না। কী-সব যুদ্ধের—'

'যুদ্ধের ? ভালো।'

'ভালো ? এ নিয়ে তো বাবার আর-এক অশান্তি—'

'কেন ?'

'ও-সব নাকি চুরি-জোচ্চোরির হরির লুঠ ?'

হারীত দরাজ হাসলো। অন্ধকারে শাশ্বতী দেখতে পেলো তার শাদা দাঁতের সারি। জিগেস করলো, 'তা নয় ?'

'বাবাদের ও-রকম মনে হ'লেও ছেলেরা কি আর ব'সে থাকবে

আর যুদ্ধের কাজে সাহায্য করা এখন প্রত্যেকেরই কর্তব্য। রাশিয়াকে বাঁচাতে হবে, যেমন ক'রে হোক!'

বিজু কিছু-একটা ক'রে হিটলারকে হটিয়ে দিচ্ছে, এটা কল্পনা করা শাশ্বতীর পক্ষে শক্ত হ'লো। চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে বললো, 'তুমি ব'সে আছো কেন? শোও না।'

'হ্যাঁ, শুই।' শুতে-শুতে বললো, 'বিজু বেশ কাজের ছেলে দেখছি।'

'সে কি আর এমনি-এমনি—ওকে চালাচ্ছে প্রবীর মজুমদার।'

'কে? ও—সেই মজুমদার! তাহ'লে তো স্বাতীর সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে ভালোই হ'তো। হ'লো না কেন?'

কথা শুনে শাশ্বতী স্তম্ভিত হ'লো। একটু পরে বললো, 'বিয়ে-তো দু-জনের; তার মধ্যে একজনের অমত থাকলে কী ক'রে হয়।'

হারীতের মনে পড়লো এ-রকম একটা কথা কবে যেন সে-ই বলেছিলো শাশ্বতীকে। তাড়াতাড়ি বললো, 'তাও তো বটে। স্বাতী আবার বেজায় রোমান্টিক। কবিতা-টবিতা পড়ে। ভালো না।'

'ভালো না কেন?'

প্রশ্নের উত্তর দিলো না হারীত। একটু এপাশ-ওপাশ ক'রে স্থির হ'লো বিছানায়, ঘুম-জড়ানো গলায় জিগেস করলো, 'মজুমদারের আর সাড়া-শব্দ নেই?'

'নাঃ!'

'আর স্বাতী কী বলে?'

'কী আবার বলবে।' শাশ্বতী পা গুটিয়ে শুলো ঘুমের জন্য তৈরি হ'য়ে। 'কাল একবার যাবে?'

'উঁ ?'

'ও-বাড়িতে কাল—'

'হুঁ।'

'যাবে ?'

'হ্যাঁ। চুপ করো এখন—বড্ড—' কথা শেষ না-ক'রেই হারীত ঘুমিয়ে পড়লো।

শাশ্বতী, একা, জেগে রইলো চোখ বুজে। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে এতগুলি কথা স্বামীর সঙ্গে বললো অনেকদিন পর। বোধহয় সেইজন্যই, আর স্বামীর সঙ্গে একটা নতুন, নিবিড় ঐক্যবোধের ফলে চোখে যেন একটুও আঠা ছিলো না তার। এতক্ষণ যাদের নিয়ে কথা বলেছে তাদের কথা আরো ভাবলো, পর-পর ভেসে উঠলো তাদের মুখ বোজা চোখের অন্ধকারে। বড়দি, জামাইবাবু, বাবা, বিজু, মজুমদার, স্বাতী। আর তারপর, যদিও তাকে নিয়ে কোনো কথা হয়নি, তবু সত্যেন রায়কেও মনে পড়লো শাশ্বতীর, ঘুমোবার আগে সত্যেন রায়কেও সে ভাবলো একটু।

রাত্রে শেষ যে-কথা বলেছিলো, বলতে চেয়েছিলো, পরদিন সকালে সে-কথাই আবার বললো, 'একবার যাবে নাকি ও-বাড়িতে ?'

'এখন ?' তক্ষুনি পৌঁছনো একটা চিঠি পড়তে-পড়তে হারীত জবাব দিলো। 'এখন আমাকে ছুটতে হচ্ছে শ্যামবাজার।' চিঠিটা খামে ভ'রে বললো, 'তুমি যাও।'

'আমি তো যাবোই। রোজই যাচ্ছি।'

'আমিও যাবো,' হারীত ঝাপসা হাসলো। 'কাল—নিশ্চয়ই !'

'বড়দি আসার পর সেই একদিনের পরে তো আর যাওনি। এখন ছুটি হ'লো, গেলে পারো মাঝে-মাঝে।'

'যাবো।'

'বড়দি, মনে হচ্ছে, এখানেই থেকে যাবেন,' ব'লে শাশ্বতী হারীতের দিকে তাকালো, কিন্তু মুখ দেখতে পেলো না, কারণ হারীত তখন নিচু হ'য়ে টেবিলের দেরাজে কী খুঁজছে। নিচু হ'য়েই জবাব দিলো, 'তাহ'লে আর তাড়া কী।'

কথাটা হারীত বুঝলো না দেখে শাশ্বতী একটু দেরি করলো। দেরাজ থেকে কয়েকটা কাগজ বের ক'রে যখন সে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, তখন আবার বললো, 'বাবা বোধহয় বড়দিকে তাঁর কাছেই রাখবেন।'

'বরাবর?'

'তা-ই তো মনে হয়। আর তা-ই তো ভালো—কী বলো?'

একটু হেসে হারীত যেন বোঝাতে চাইলো এ-বিষয়ে স্ত্রীর সঙ্গে তার মতভেদ নেই। হারীত শুনতে চাচ্ছে না, অন্য কথা ভাবছে, তা বুঝেও শাশ্বতী কথা না-ব'লে পারলো না; নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিলো, 'ভালো বইকি! দেওরদের দয়ার চাইতে হাজারগুণে ভালো। কিন্তু বাবার আর ছুটি হ'লো না! কোথায় এখন পেনশন নিয়ে জিরোবেন, এর মধ্যে কী হ'য়ে গেলো!'

'শিগগিরই পেনশন?'

'বাঃ, তোমাকে বললাম না সেদিন—'

'ও, হ্যাঁ। হ'য়েই গেছে, না?'

'তা বলতে পারো। লম্বা ছুটি চলছে এখন, তারপরেই—'

'তাহ'লে তো—' হারীতের কপালে রেখা পড়তে-পড়তে মিলিয়ে গেলো, তখনই আলোর দিকটা দেখতে পেলো সে। 'তা পেনশন তো আছে—ব'সে—ব'সে আদ্ধেক মাইনে কম কথা না, আমাদের সব চাকরিতে তো কিছুই নেই—কী-যে হবে বুড়োবয়সে!—আর তোমার বড়দিও ওখান থেকে কিছু তো পাবেন?'

'কিন্তু দায়িত্ব বাবারই তো, প্রকাণ্ড দায়িত্ব। তা-ই তো আমি বলি বাবাকে, "তুমি ভেবো না; আমরা তো আছি।" '

'আমরা' মানে এখানে কে-কে, আর 'আছি' অর্থই বা কী, সেটা একটু চিন্তা ক'রে হারীত সাবধানী জবাব দিলো, 'এ-সব নিয়ে বেশি ভাবাই ভুল, কিছু করবার নেই যখন।'

'তা কেন?' শাশ্বতী তখনই বললো। 'আমরা যে কাছেই আছি, সুখে দুঃখে সবটাতেই আছি এ-ই তো অনেক। আর বড়দির দিকটাও ভেবে ছাখো! চোদ্দ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিলো; সেই বাড়ি, সেই সব, তাঁরই সব;—আজ হঠাৎ এক কথায় ছেড়ে চ'লে আসা কি সোজা কথা।'

স্ত্রীর মুখে 'আছি'র ব্যাখ্যা শুনে হারীত আশ্বস্ত হ'য়েছিলো, অমায়িকভাবে বললো, 'সে তো সত্যি। আর তাই তো ওখানে যেতে কেমন অপ্রস্তুত লাগে আমার। ও-সব সান্ত্বনা-টান্ত্বনা আমার আসে না, জানো তো।'

'সান্ত্বনা!' শাশ্বতী গম্ভীর হ'য়েই কথা বলছিলো, এবার আরো গম্ভীর হ'লো। 'এর কি কোনো সান্ত্বনা আছে, আর কাকেই বা সান্ত্বনা? দরকার হ'লে তোমাকেই সান্ত্বনা দিতে পারেন বড়দি। বড়দি আশ্চর্য।'

হারীত আলগোছে একটু বসেছিলো চেয়ারটায়, হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো। অনেক হয়েছে গার্হস্থ্য জীবন—এখন পৃথিবী তাকে ডাকছে। তাড়াতাড়ি বললো, 'আচ্ছা—চলি।'

শাশ্বতী বললো, 'আমিও যাই।'

নড়াচড়ার হাওয়া দিলো ঘরের মধ্যে। দু-জনে দু-কোণে, পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কাপড় পরলো। শাশ্বতীর পিছনে দাঁড়িয়ে আলমারির লম্বা আয়নায় চুল আঁচড়ে নিলো হারীত। হারীতের মনিব্যাগ থেকে শাশ্বতী কিছু খুচরো নিলো তার হলদে হাতব্যাগে।

ট্র্যামস্টপে দাঁড়িয়ে শাশ্বতী জিগেস করলো, 'তোমার ফিরতে ক-টা হবে?'

'ঠিক নেই। অনেক ঘোরাঘুরি আছে।'

'আমি বারোটার মধ্যে ফিরবো।'

'বেশ।'

ট্র্যাম খালি ছিলো, পাশাপাশি বসতে পেলো দু-জনে। হারীত ভাবলো—যা ভাবতে গিয়ে কাল রাত্রে বাধা পেয়েছিলো, ঠাণ্ডানি পৌঁছবার আগে কতটা গুছিয়ে রাখতে পারবে চারদিক; আর শাশ্বতী ভাবলো—সেই বড়দির কথাই ভাবলো। তারও ভয় ছিলো হারীতের মতোই; কিন্তু হারীত তো সে-দৃশ্য ছাখেনি, বিজুর সেই হাত-পা-ছোঁড়া চ্যাঁচামেচির দৃশ্য। একঘর স্তম্ভিত মানুষের মধ্যে বড়দিই টেনে তুললেন বিজুকে, হাতে ধ'রে ঘরে নিয়ে গেলেন, কথা ব'লে-ব'লে ঠাণ্ডা করলেন—যেন এটা বিজুরই ব্যাপার!' ঠিক আগের মতোই—না, ঠিক না—শান্ত, মানুষটা যেন

শান্ত হ'য়ে গেছে মনের মধ্যে, তাছাড়া আগের মতোই। কাছে গেলেই ভালো লাগে—তেমনি—কিন্তু তাঁর কেমন লাগছে কে জানে। আগে ভাবতাম বড়দি খুব সুখী মানুষ, ভরপুর সুখী, আর সেই সুখই চলতে-ফিরতে উপচে পড়ে সাবধানে। কিন্তু এখন? নিজে যে সুখী না, সে কি পারে অন্যকে সুখী করতে? না কি নিজের সুখী হবার কথাই নেই এতে? না কি সুখ বলতে যেটাকে ভাবছি—কে জানে! এই-যে এসে পড়লাম।

হারীতের কাছে চোখে বিদায় নিয়ে শাশ্বতী নামলো, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলো হারীতের ট্র্যাম বেঁকে গেলো ডান দিকে। প্রতিরোধ সংঘের খুঁটিনাটিতে ডুবে ছিলো হারীত, কিন্তু একটু পরে যখন বুড়োমতো একজন লোক পোঁটলা-হাতে তার পাশে বসলো, তখন তার শাশ্বতীকে মনে পড়লো। মনে হ'লো, এইরকম একটা ট্র্যামেই সে শাশ্বতীর সঙ্গে চলেছে—কিংবা ট্রেনের কামরায় —লম্বা পথ, স্টেশন কম, মাঝে-মাঝেই এমন হয় যে কামরাটায় আর-কেউ থাকে না, তখন বাধ্য হ'য়েই কাছাকাছি হ'তে হয় দু-জনকে। কিন্তু হারীতের এ-সব ভাবনার শাশ্বতী কিছু জানলো না; নিশ্চিন্তে রাস্তা পার হ'য়ে টালিগঞ্জের ট্র্যামের জন্য দাঁড়ালো।

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখতে পেলো সত্যেনকে। সত্যেন লাজুক হেসে উঠে দাঁড়ালো।

'বসুন, বসুন। আপনি—কতক্ষণ?'

'এই তো।'

'একা যে?' শাশ্বতী এদিক-ওদিক তাকালো। 'ওরা জানে না?'

'জানি না।'

উত্তরটা মজার লাগলো শাশ্বতীর। একটু হেসে 'আচ্ছা আমি—' ব'লে পা বাড়ালো সে। তার ঘুরে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা, সত্যেন দেখলো, কোথায় যেন একটুখানি স্বাতীর মতো। তাড়াতাড়ি বললো—ব'লে ফেললো, 'বস্থন না এখানে।'

'বসবো? আচ্ছা—' একটু দ্বিধা শাশ্বতীর গলায়, সেই সঙ্গে খুশিও। 'আপনি বস্থন।'

এ-সব সৌজন্যবিনিময়ের পর তু-জনেই বসলো, আর তারপর সত্যেন সৌজন্যসূচক প্রশ্ন করলো : 'হারীতবাবু ভালো আছেন?'

'হ্যাঁ।—আমাদের ওখানে আস্থন না একদিন,' ফশ ক'রে ব'লে ফেললো শাশ্বতী। আর সঙ্গে-সঙ্গে সত্যেন সাড়া দিলো, 'নিশ্চয়ই! কবে বলুন।'

এতটা উৎসাহ শাশ্বতী আশা করেনি, মনে-মনে একটু ফাঁপরে পড়লো। এদিকে হারীতের আবার ঠাণ্ডানি, আর তাকে না-জানিয়ে ভদ্রলোককে আসতে ব'লে কি বিপদে পড়বে আবার? কয়েক সেকেণ্ড পরে বললো, 'আপনি কবে ফ্রী আছেন?'

'ফ্রী? আমি রোজই ফ্রী। আপনি কি ভাবছেন আমি মস্ত একজন এনগেজমেন্টওয়ালা?'

'আমিও না। আমার মতে একদিনে একটাই যথেষ্ট।'

সত্যেন হঠাৎ একটু লাল হ'লো। শাশ্বতী আড়চোখে সেটা লক্ষ্য ক'রে আবার বললো, 'সেই একটা অবশ্য খুব মনের মতো হওয়া চাই।'

'আমার কোনো-কোনোদিন একটাও থাকে না।'

'সেই আপনার ফাঁকা তারিখের একটাই বলুন আমাকে,' শাশ্বতী চমৎকার সুযোগ নিলো।

শাশ্বতীর হাসি-হাসি মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনের যেন বোকা লাগলো নিজেকে, আর সেটাও মনে-মনে ভালো লাগলো। কিন্তু বাইরে দুটো ভাবই লুকোবার জন্যই গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'এর পরে সবই ফাঁকা তারিখ। আমি চ'লে যাচ্ছি।'

'কোথায়—?' শাশ্বতী যেন চমকালো একটু।

'প্রথমে রাঁচি—'

'ও, তা-ই বলুন। আমি ভাবলাম—কবে যাচ্ছেন?'

আগের কথাটার গুরুত্ব বজায় রাখতে হ'লে এখন খুব কাছের একটা নির্দিষ্ট তারিখ জানাতে হয়, কিন্তু সত্যেনের মুখে কথা জুটলো শুধু একটা অস্পষ্ট 'শিগগিরই'। এবার সত্যি তার মন খারাপ হ'য়ে গেলো। ছ-টা দিন কেটে গেলো কলেজ-ছুটির পরে। এবার সে তাক করেছে ছোটোনাগপুর; রাঁচি, তোপচাঁচি, হাজারিবাগ, সেখান থেকে বাস্-এ ক'রে গিরিডি—পরেশনাথ পাহাড়ে উঠবে, পাহাড়চুড়োর ডাক-বাংলোয় রাত কাটাবে, সবশেষে মহেশমণ্ডায় ক-দিন বিশ্রাম—সেখানে চেনা একজনের বাড়ি আছে—চমৎকার সাজিয়েছিলো সব মনে-মনে। এত শুনেছে ও-অঞ্চলটার কথা, আর এত ভালো লেগেছিলো সেবার দিল্লি থেকে ফেরার পথে সেই পাহাড়ি দেশের ভিতর দিয়ে ঘণ্টা দুই দুপুর। ট্রেন বোঝাই হ'য়ে সবাই চ'লে গেলো কলকাতা ছেড়ে; আর এখন এই দুর্গাপূজার ক-দিন তো শুধু ঢাকঢোলের ডামাডোল—ছি, এ-সময়টায় কোনো ভদ্রলোক থাকে কলকাতায়?

—থাকে না? এ-বাড়ির সবাই তো আছে, থাকে।—'আপনারা যাচ্ছেন না কোথাও?' বলবার একটা কথা খুঁজে পেলো সত্যেন।

'আমরা? না। আমাদের যাওয়া কি সোজা।'

আমার তো সোজা, সত্যেন ভাবলো, আমার তো কোনো বাধা নেই। কিন্তু যাচ্ছি না কেন? ছ-টা দিন কেটে গেলো ছুটির! এই পুজোভিড়ের বিচ্ছিরি কলকাতা—ওদিকে টোল-পড়া সবুজ পৃথিবী। রোজ ভাবছি আজ যাবো, রোজ ভাবছি কাল। ভাবছি কেন?

'ছোড়দি! কখন?'

'এই এলাম। আমাদের যাওয়া হ'লো না রে দেওঘর।'

'হ'লো না তো? আমি আগেই ভেবেছিলাম—'

'আমারও বেশি ইচ্ছে ছিলো না এবার,' হারীতের অনুপস্থিতিতে শাশ্বতী স্বচ্ছন্দে স্বীকার করলো। 'বিশ্রামের দরকার তোর হারীতদারই, কিন্তু তিনি নড়বেন না।'

'অগ্রণী সংঘ বুঝি?'

'অগ্রণী না রে, প্রতিরোধ।'

'প্রতিরোধ!' স্বাতী হেসে উঠলো, আর শাশ্বতীও নির্ভয়ে হাসলো এই সঙ্গে।

দু-বোনের এই কথাবার্তার সময়টুকুতে সত্যেন প্রথমে স্বাতীর, তারপর শাশ্বতীর মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু একজনের চোখও যখন তার দিকে ফিরলো না, তখন সে উদাসভাবে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকলো। অন্তত চেষ্টা করলো ভাবটা যাতে উদাস দেখায়। স্বাতীকে আজ বড্ড সুখী মনে হ'লো সত্যেনের, ছোড়দিকে দেখে বড্ড খুশি; এত খুশি হবার কী আছে ভেবে পেলো না সে। তার

মনে তো সুখ নেই, তার মন তো অবিরত অস্বস্তিতে কাঁটা হ'য়ে আছে। দু-বোনের মিলিত হাসির শব্দটাও যেন কাঁটার মতো তাকে বিঁধলো। সে কেন—সে কোথায়? এই সকালবেলায় এখানে এসে ব'সে আছে কেন? আর কিছু কি তার করবার নেই? কেমন ক'রে সময় কেটে যাচ্ছে! ইএটসের অ্যান্থলজিটা কিনেছে সেদিন—পাতাও ওল্টায়নি—মম-এর গল্পের বইটারও না—সেটা অবশ্য পথে পড়বে ব'লেই কিনেছে। সত্যেন নিজেকে দেখতে পেলো চলতিট্রেনের জানলা-কোণে ছোটোগল্পের বই হাতে, আর মাঝপথের ডাক-বাংলোর ভোরবেলায় বারান্দায় ব'সে কবিতার বই—আঃ!—সে যাবে—নিশ্চয়ই—কাল—হ্যাঁ, কালই—

'চলো, ভিতরে চলো,' স্বাতী বললো শাশ্বতীকে।

'আপনি—' শাশ্বতী সত্যেনকে লক্ষ্য করলো।

স্বাতী বললো,'উনি একটু বসবেন,' তারপর সত্যেনের দিকে—এই প্রথম—তাকিয়ে আবার বললো 'একটু বসুন।'

'আমি—' সত্যেন কী-যেন বলতে চাইলো, কিন্তু পরের কথাটা তার মুখ দিয়ে বেরোবার আগেই বোনেরা চ'লে গেলো ভিতরে।

একটু পরে স্বাতী ফিরে এসে সত্যেনের মুখোমুখি চেয়ারটায় বসলো। দু-জনে দু-জনের দিকে তাকিয়েই একসঙ্গে চোখ নামিয়ে নিলো। আবার যখন চোখোচোখি হ'লো, স্বাতী স্থিরচোখে আবছা গলায় বললো, 'কী?'

সত্যেন দেখতে লাগলো তার একটু-লাল-হওয়া মুখ, ভিজে-ভিজে চিকচিকে চোখ, আর ভিজে-ভিজে ঠোঁট দুটির একটু-বাঁকানো ভঙ্গি। রোজ ছাখে এ-রকম, তবু কত যেন দেখার বাকি।

'আজ যে সকালেই ?'

এবারেও সত্যেন কথা বললো না। ভাবলো, এই ছোড়দির সঙ্গে কথা বলছিলো, আর এই এখন—কত আলাদা এ-দুটো। কোনটা বেশি ভালো ? দুটোই দুটোর চেয়ে ভালো।

স্বাতী বললে, 'খুব গল্প জমেছিলো আপনাদের।'

'আমাদের ?' ব'লেই কথাটার মানে বুঝলো। 'হ্যাঁ—কিন্তু তোমাকে দেখেই তোমার ছোড়দি আমাকে একদম ভুলে গেলেন।'

'আমি ভাবলাম ছোড়দির গলা না ? কিন্তু কার সঙ্গে ?' এই নির্জলা মিথ্যেটা স্বাতী অক্লেশে উচ্চারণ করলো। জানলা দিয়ে রাস্তাতেই দেখেছিলো সত্যেনকে—দাদাও ছিলো সেখানে, আর দাদাই মিটিমিটি হাসছিলো আর বেশি-বেশি কথা বলছিলো তার সঙ্গে। কথা কিছু না—এই আরকি। দাদাটা এমন—'

'সত্যি—ছোড়দির গলা !' সত্যেন হাসলো, 'আর চোখে দেখলে তো কথাই নেই।'

'তাই তো দেখলাম,' স্বাতী না-হেসে জবাব দিলো।

বাইরে থেকে ডালিম এলো ঘরে। 'ছোটোমাসি—' সত্যেনকে দেখে থমকালো।

'এনেছিস ?'

ডালিম গলা নামিয়ে বললো, 'বিলিতি পেলাম না—সালিমলি।'

'দেখি।'

লম্বা ডালিম একটু আড় হ'য়ে দাঁড়ালো—যাতে সত্যেনবাবুর দিকে ঠিক পিছন ফেরানো না হয়, অথচ তিনি দেখতে না পান।

এতদিনে তার মাথায় আঁটো কালো টুপির মতো নতুন চুল গজিয়েছে। মৈমনসিং থেকে নতুন ক'রে যে-শ্যামলিমা নিয়ে এসেছিলো কলকাতার কলের জলে তা ধুয়ে গেছে আবার। মুখের ভাবটা আগের চেয়েও গম্ভীর, কিন্তু গালের এখানে-ওখানে হঠাৎ এক-একটা পাৎলা কোঁকড়া চুল নির্ভুল জানিয়ে দেয় তার অতি তরুণ বয়সটাকে। তার আধখানা মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেনের মনে পড়লো তারও একদিন ও-বয়স ছিলো, কিন্তু ও-রকম কোনো মাসি ছিলো না।

স্বাতী ডালিমের হাত থেকে জিনিশটা নিলো, উপরের কাগজটা সরিয়ে নেড়ে-চেড়ে দেখলো একটু।

উদ্বিগ্ন চাপা গলায় ডালিম জিগেস করলো, 'ঠিক আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'রং মিলবে তো ?'

'মনে তো হয়।'

ঐ রং মেলাবার জন্য কত দোকান সে ঘুরেছে, ভবানীপুরেও না-পেয়ে ধরমতলায় চ'লে যেতে হয়েছিলো, এ-সব আর বলা হ'লো না ; তার পরিশ্রমের আপাতত ঐটুকু মাত্র পুরস্কার নিয়ে, সত্যেনবাবুর দিকে একটা দ্রুত কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে, নিজেই একটু লাল হ'য়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেলো ভিতরে।

স্বাতীর কোলের উপর ছড়ানো শাদা আর ব্রাউন উলের দিকে তাকিয়ে সত্যেন বললো, 'তুমি—বোনো নাকি ?'

'আমি কি আর বুনি—তবে ডালিম ধরেছে তার একটা জম্পর চাই।' ব্রাউন উলটাকে তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ করলো স্বাতী।

নিচু মুখেই আবার বললো, 'ভালোই হ'লো আমার, ডালিমের তাড়ায় বড়দির কাছে শেখা হচ্ছে।'

'মা-র চেয়ে মাসির হাতই বুঝি ওর পছন্দ?'

'বড়দির বানানো একটা আছে ওর—তবে সাংঘাতিক লম্বা হ'য়ে গেছে কিনা হঠাৎ। আমি ভাবছি সেইটে খুলে ফেলে—আচ্ছা,' হাতের তুটো উল তু-হাতে রেখে স্বাতী মুখ তুললো. 'আপনার কোন রংটা পছন্দ?'

'আমি ঠিক—' মেয়েদের এ-সব বোনা-টোনার ব্যাপারে তার মনের আদিম গভীর অবজ্ঞার চোখে সত্যেন তাকালো, কিন্তু তাকিয়েই দেখতে পেলো, স্পষ্ট বুঝলো যে মানবজীবনে এই উল বোনা ব্যাপারটিরও গুরুত্ব কম না।

'আমার যেটা পছন্দ ডালিমের কি আর সেটা হবে।'

'হবে না! ডালিমের আদর্শই তো—সত্যেনবাবু।'

স্বাতী নামটা উচ্চারণ করলো একটু নিচু গলায়, একটু অস্পষ্ট ক'রে আর স্বাতীর মুখে নামটা শুনে সত্যেনের প্রায় বিশ্বাসই হ'লো না যে ঐ সত্যেনবাবু আর-কেউ না, সে নিজেই। একটু পরে বললো, 'তা তো জানতাম না।'

'বাঃ, ওর প্রাণপণ চেষ্টাই-তো—কী-রকম কোঁচা ঝুলিয়েছে আর পাঞ্জাবি পরেছে দেখলেন না? একটুও মানায়নি কিন্তু।'

'আদর্শমতো চললে উলের জামা কিন্তু পরাই হয় না ওর।'

স্বাতী কপট সরলভাবে বললো, 'কেন? আপনি ও-সব পরেন না?'

'আমি!' কপটতা বুঝেও, কিংবা সেইজন্যই, সত্যেনের আত্মসম্মান আহত হ'লো।

'পরুন না একটা। বড়দিকে বলবো বুনে দিতে? এত সুন্দর বোনেন বড়দি—' ব'লে স্বাতী হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরালো।

ধ্বক ক'রে উঠলো সত্যেনের বুকের মধ্যে। কতবার দেখেছে হাতের ঐ ভঙ্গি, আর যতবারই দেখেছে—! কিন্তু ভালো যত লাগলো খারাপও তত লাগলো তার; স্বাতীর স্বাধীনতায়, অবাধ সাহসে সে যেন মরমে ম'রে গেলো। আরো, আরো প্রবল, আগের চেয়ে আরো অনেক তীব্র হ'য়ে তার মনে ফিরে এলো চলতি ট্রেন, মস্ত রাত, অচেনা সবুজ ভোরবেলায় কবিতার বই! কবে যাবে? কাল—কাল কেন?—আজ—আজই যাবে।

সত্যেনের নিচু-হওয়া মুখের দিকে একটু ঝুঁকে তাকিয়ে স্বাতী আবার বললো, 'পরবেন? তাহ'লে আজই বলি বড়দিকে।'

সত্যেন মুখ তুলে বললো, 'না।'

সত্যেনের ভাবের বদলটা তখনো না-বোঝার ভান করলো স্বাতী। তেমনি সহজ সুরে বললো, 'আচ্ছা, বোনা তো হোক। যদি আপনার ভালো না লাগে, তখন না হয়—'

'শোনো,' সত্যেনের গম্ভীর গলা স্বাতীর কথায় বাধা দিলো। 'আজ-যে সকালেই এসেছি তার কারণ আছে। এসেছি এইজন্য যে পরে আর সময় হবে না। আমি আজই চ'লে যাচ্ছি।'

স্বাতী একটু চুপ-ক'রে থাকলো, তারপর বললো, 'ও।'

'রাঁচি এক্সপ্রেসে যাচ্ছি,' অকারণে জানালো সত্যেন। 'প্রথমে রাঁচি যাবো—তারপর—'

'সে-সব আপনার লম্বা-লম্বা চিঠিতেই জানতে পারবো আশা করি।'

সত্যেন বললো, 'আমার চিঠি তোমার ভালো লাগে না, জানি।'

'লাগে না ? এত সুন্দর বর্ণনা আপনার !'

'সত্যি, চিঠি লিখতে আমি পারি না।'

স্বাতী মুখ নামিয়ে উলের বল দুটোকে কাগজে জড়াতে লাগলো।

একটা অদ্ভুত মুগ্ধতা নিয়ে সত্যেন নধর বল দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলো। কিন্তু একটু পরেই জড়ানো শেষ হ'লো, শাদা আর ব্রাউন রং আর দেখা গেলো না। একটু অপেক্ষা করলো 'সত্যি যাচ্ছেন ?' কথা শোনার জন্য, কিন্তু ডালিমের কেনা প্যাকেটটি হাতে ক'রে স্বাতী উঠে দাঁড়ালো।

সত্যেনও উঠে দাঁড়ালো সঙ্গে-সঙ্গে।

স্বাতী বললো, 'যাচ্ছেন ?'

'হ্যাঁ—তা—বড়দির সঙ্গে কি দেখা হ'তে পারে একবার ?'

'বসুন।'

আর পরের মুহূর্তেই সত্যেন দেখলো সে একা ব'সে আছে ঘরের মধ্যে। ব'সে-ব'সে চেষ্টা করলো আজ রাত্রের রেলভ্রমণের কথা ভাবতে—ভোরবেলা মুরিতে চা—ক-ঘণ্টা পরে রাঁচি—খুব উৎসাহ নিয়ে ভাববার চেষ্টা করলো। আর যেই পরদার এ-পাশে শ্বেতার আভাস দেখলো—শ্বেতা ভালো ক'রে ঘরে আসবার আগেই—দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'বাইরে চ'লে যাচ্ছি আজ, তাই ভাবলাম একবার দেখা ক'রে যাই আপনার সঙ্গে।'

'আজ ?' পিছন থেকে প্রশ্ন করলো শাশ্বতী।

সত্যেনের মনে পড়লো একটু আগেই এঁর কাছে সে অন্যরকম বলেছিলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'হ্যাঁ, আজই যাই। ছুটির দিনগুলো নষ্ট হচ্ছে মিছিমিছি—' কথাটা উপস্থিত ব্যক্তিদের পক্ষে সম্মানের নয় তা বুঝতে পেরে তখনই আবার জুড়লো, 'ফিরে এসে—যদি তখনো আপনার অনুমতি থাকে—একদিন যাবো আপনার ওখানে।'

হারীতের এই অনিশ্চিন্ত ব্যস্ততার মধ্যে সত্যেনকে নিমন্ত্রণ করার প্রশ্ন যে আর উঠলো না, শাশ্বতী মনে-মনে তাতে স্বস্তি পেলো, কিন্তু মুখে বললো, 'আমার অনুমতির জন্য আপনার ব্যস্ততা তো দেখতেই পাচ্ছি। পাছে সত্যি যেতে হয়, সে-ভয়ে আজই কলকাতা ছাড়ছেন!'

শ্বেতা বললো, 'বোসো।'

'বেশিক্ষণ বসবো না।'

'একটু বোসো।'

সকলে বসবার পর শ্বেতা বললো, 'দেশে যাচ্ছো বুঝি ?'

ঈষৎ হেসে সত্যেন তার প্রিয় জবাব দিলো : 'দেশ ব'লে আমার কিছু নেই।'

শ্বেতাও হাসলো কথা শুনে। 'দেশ কি আর আলাদা কিছু ? যার যেখানে স্বজন, সেখানেই তার দেশ।'

'স্বজন মানে আত্মীয় ?'

করুণা ফুটলো শ্বেতার চোখে, দেখতে কৌতুকের মতো। 'তুমি বুঝি আত্মীয় ভালোবাসো না ?'

'কারা-কারা আমার আত্মীয় তা প্রায় মনেই নেই,' একটু বাহাত্বরির সুর লাগলো সত্যেনের কথায়।

'তাঁরাও খোঁজ-খবর নেন না তোমার?'

নীল পরদাটার দিকে এটুকু সময়ের মধ্যে তৃতীয়বার তাকালো সত্যেন। মুহূর্তমাত্র দেরি ক'রে একটু নিস্তেজ গলায় জবাব দিলো—'খোঁজ-খবর আর কী।'

'কে আছেন তোমার এখানে?'

'এখানে?' সত্যেন একটু থামলো। 'এক মামা ছিলেন, তিনি—তিনি আর নেই!'

'মামিমা? মামাতো ভাই-বোন?'

'তারা আছে।'

'ক-জন?'

শ্বেতার এত খবর জানতে চাওয়ায় সত্যেন অবাক হ'লো। অনিচ্ছায় জবাব দিলো, 'এক বোন—দু-ভাই।'

'বোন ছোটো?'

'না, না, মামিমার মেয়েই বড়ো—তার বিয়েও হ'য়ে গেছে।'

'এখানেই থাকে?'

'না। সে থাকে—' কোথায় না থাকে বুলু? বাজিতপুর? পাবনা?—যাকগে। 'সে পাবনায় থাকে,' ব'লে কথা শেষ করলো সত্যেন।

'মামিমার কাছে যাও না মাঝে-মাঝে?'

'হ্যাঁ—না—মাঝে-মাঝে ঠিক না—এই—' সত্যেনের গলা

মীইয়ে এলো শেষের দিকে। এইমাত্র সে বুঝলো যে মামিমার কাছে শেষ কবে গিয়েছিলো সত্যিই তা মনে করতে পারে না।

'মামিমা তো আসেন তোমাকে দেখতে?'

'না, তিনি ঠিক—মানে, অনেক দূরে থাকেন তো, সে-ই বরানগর!' আর সে-ই বরানগর থেকে মামিমার দশ বছরের ছেলে খুঁজে-খুঁজে এই টালিগঞ্জে এসেছিলো একদিন, টুকরো কাগজে জোলো কালিতে দশটা টাকা চেয়েছিলেন মামিমা। টাকা সে তক্ষুনি দিয়েছিলো, আর ব'লে দিয়েছিলো—'মা-কে বোলো আমি শিগগিরই একদিন যাবো।' আর তারপর কতদিন কেটে গেলো!

এর পরে শ্বেতা বললো, 'এক মামাই তোমার?'

'হ্যাঁ।' সত্যেন ওখানেই থামতে চেয়েছিলো, কিন্তু ইচ্ছাকে ডিঙিয়ে তার ভিতর থেকে যেন অন্য-কেউ কথা ব'লে ফেললো, 'বড়ো ভালোমানুষ ছিলেন মামা—আর অনেকটা অল্প বয়সেই—'

নিজের কথাটা নিজের কানে শুনতে পেয়ে সত্যেন প্রায় জিভ কামড়ে থেমে গেলো। এ-সব কেন বলছে, আর কাকে বলছে? যে নিজেও—আর এই সেদিন! প্রমথেশবাবুর গোলগাল হাসিমুখটা একবার মনে পড়লো তার, সেই সঙ্গে মামাকেও মনে পড়লো—ভালোবাসতেন তাকে, খুব টানাটানির সংসারেও বাড়িতে আর হৃদয়ে একটু জায়গা রেখেছিলেন তার জন্য—তারপর তার অসতর্কতার পরিণাম দেখার জন্য একটু ভয়ে-ভয়ে শ্বেতার মুখের দিকে তাকালো।

কিন্তু শ্বেতা জিগেস করলো, 'কী করতেন তিনি?'

'মামা? স্কুলমাস্টার ছিলেন। আর তাই মামিমা এখন—'

বলতে-বলতে আবার থেমে গেলো সত্যেন।—সত্যি, কী-কষ্টে পড়েছেন মামিমা! বরানগরে ঐ একটা বস্তিপাড়ায়—!

'বড়ো ছেলে কত বড়ো?'

বড়দির মুখে সত্যেন দেখলো যে-কথা সে বলেনি তা তিনি বুঝেছেন। 'খুব ছোটো না,' সে যেন আশ্বাস দিলো—নিজেকেই—'বড়োটি একটা কাজও পেয়ে গেছে।'—কিন্তু কী-বা কাজ—কারখানায় মজুর খাটা! আর যে-বয়সে কলেজে পড়ার কথা সে-বয়সেই! কী হবে এদের?—'তবু,' এই 'তবু'টা যেন তার নিজের কোনো-কিছুর সাফাই, 'ওদের কথা ভাবলেই খারাপ লাগে। আর যা-ই হোক, পড়াশুনো তো হলো না!' শেষের কথাটায় এমন সত্যিকার দুঃখের সুর লাগলো যে সত্যেনের মুখটা অন্যরকম দেখালো মুহূর্তের জন্য। শাশ্বতী—এতক্ষণ সে চুপ ক'রে শুনছিলো কথাবার্তা—একটু—অবাক হ'লো, ঐ একটা কথায় ইস্ত্রি-করা ভদ্রতা পেরিয়ে সত্যেনের ভিতরকার মানুষকে সে যেন দেখতে পেলো, ঐ একটা মুহূর্তে অনেক বেশি চিনে ফেললো তাকে। আর, বড়দির কাছে এলেই কেন ভালো লাগে তাও বুঝলো সঙ্গে-সঙ্গে। বড়দি নিজের কথা বলেন না, অন্য জনের বিষয়েই কথা বলেন—যেন সকলের জীবনেই তাঁরও কিছু অংশ আছে—আর এটাই তাঁর স্বভাব, যেমন সুখের সময়ে, তেমনি দুঃখের দিনেও, আর এ-জন্যই দুঃখী মানুষ তাঁকে মনে হয় না কখনো—এখনো। শাশ্বতী আর-একবার তাকালো সত্যেনের ঈষৎ-লজ্জা-পাওয়া মুখের দিকে, দৈবাৎ সত্যেনও তাকালো তখন—ত্রস্তে চোখ সরিয়ে নিলো। সেও বুঝলো এখন তাকে অন্যরকম

দেখাচ্ছে এঁদের চোখে, যে-রকমটা সে দেখাতে চায় না; লুকোতে চায়, লজ্জার ভাব ছড়ালো তার মুখে ;—তার অভ্যাস, তার চেষ্টা কোনো কাজে লাগলো না ; যা বলতে চায়নি, চায় না, কখনো কোথাও বলে না, তা-ই ব'লে ফেললো। কখনো কোথাও বলে না ? কিন্তু আর কোথায়, আর কখন কেউ শুনতে চেয়েছে এ-সব ?

নীল পরদা নড়লো, ঘরে এলো—আতা। চা-বাসন-সাজানো একটি পিতলের ট্রে সাবধানে তু-হাতে ধ'রে সে ঘরে এলো ; মুখ নিচু রেখে টিপিটিপি পায়ে এগিয়ে এসে মাঝের গোল টেবিলে ট্রেটা নামালো, তার পরেই ক্ষিপ্রতর গতিতে অন্তর্হিত হ'লো আবার পরদার ওপারে। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই, তাতা বিত্যুতের মতো ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো মা-র গায়ের উপর।

তার বাবড়ি চুলে হাত রেখে শ্বেতা বললো, 'কী রে ?'

'ম্‌মা—'

'কী ?'

'মা—!' আতা মা-র কোলে মুখ ঘষলো তু-বার।

মেয়ের মাথাটি তু-হাতে তুলে ধ'রে নিজের মুখ তার কাছে নামিয়ে শ্বেতা বললো, 'কী ? চুপে-চুপে বলো।...উঁ ?...ও, বুঝেছি। হ্যাঁ, খুব দোষ হয়েছে দিদির। আমি ব'কে দেবো।'

শাশ্বতী বললো : 'দিদি চায়ের ট্রে এনেছে, তাই বুঝি—?'

'সত্যি তো, ও বুঝি আর পারতো না আনতে ? দিদির চেয়ে ভালোই পারতো। তা তুমি এক কাজ করো, খুব ভালো-ভালো মশলা নিয়ে এসো তো একটা প্লেটে সাজিয়ে। আর ছোটোমাসিকে এখানে আসতে বলো।'

'ছোটোমাসি রাগ করেছে।'

'রাগ করেছে। কেন?'

'দিদির উপর রাগ করেছে। শোনো মা, আগে চা দিয়ে পরে তো গরম জল ঢালতে হয়—এ আর কে না জানে?—আর দিদিটা এমন—'

'সত্যি, দিদি কিচ্ছু পারে না! ছোটোমাসিকে বলো গিয়ে এখন আর রাগ করতে হবে না—মা তোমাকে ডাকছেন।'

তাতা খুশি হ'য়ে বাবড়ি দুলিয়ে চ'লে গেলো, যেতে-যেতে এক পলক বাঁকা চোখ হানলো সত্যেনের দিকে।

শাশ্বতী বললো, 'ওদের তুমি কী-আদরটাই দিতে পারো, বড়দি।'

'তোর মনে পড়ে, শাশ্বতী,' একটু পরে শ্বেতা বললো, 'স্বাতী ঠিক এ-রকম করতো তোর সঙ্গে?'

'শুধু আমার সঙ্গে? মেজদি-সেজদিকেও কম জ্বালিয়েছে স্বাতীটা!'

'তাতার খুব ইচ্ছে,' সত্যেনের দিকে তাকালো শ্বেতা, 'তোমার সঙ্গে ভাব করার, কিন্তু লজ্জা ভীষণ। আতাও, দেখলে না, কোনোরকমে ট্রেটা নামিয়েই পালালো!'

এতক্ষণ এ-ঘরে যা-কিছু হচ্ছিলো তা সত্যেনকে প্রায় একটা আবিষ্টতার মধ্যে টেনে এনেছিলো; শ্বেতার শেষ কথাটা-যে তাকেই বলা, তা বুঝতে একটু দেরি হ'লো তার। আস্তে-আস্তে বললো, 'আমার অনেক দোষের মধ্যে এও একটা যে ছোটোদের সঙ্গে ভাব জমাতে আমি মোটে পারি না,' ব'লে চোখ নামালো শ্বেতার দুটি শাদা পায়ের দিকে। কৌতুক ছিলো না কথাটায়,

সত্যি তখন তার মনে হচ্ছিলো জীবনের অনেক-কিছুই সে জানে না, বোঝে না, পারে না।

'চা-টা বোধহয়—' শাশ্বতী টী-পটের দিকে তাকালো। 'এই-যে স্বাতী। আয়, চা ঢাল।'

'তুমি থাকতে আমি কেন?'

শাশ্বতী হাসলো। 'তাতা ঠিকই বলেছিলো! সত্যি রেগে আছিস!'

শ্বেতা বললো, 'দেখলি তো, স্বাতীই এখনো ছেলেবেলার অভ্যেস ছাড়তে পারলো না, আর তাতা তো তাতা!'

'আচ্ছা আমিই ঢালি,' শাশ্বতী এগোলো। 'ক-চামচে চিনি আপনার?'

'স্বাতী ও-সব জানে ঠিক,' বললো শ্বেতা। 'ও তুই ওকেই দে।'

'ওকেই তো বলছি,' শাশ্বতী স'রে এলো।

কিন্তু স্বাতী একটু দূরে বসলো।

'স্বাতী, আয়!' ডাকলো শ্বেতা।

স্বাতী উঠলো, কোনো কথা না-ব'লে কাছে এসে চা ঢাললো নিচুমুখে, চায়ের খয়েরি রংটাকে দুধ কেমন আস্তে-আস্তে সোনালি ক'রে দেয়, সেইটে দেখতে-দেখতে নিজের মুখের রং-বদলটা লুকোবার চেষ্টা করলো।

সত্যেনও বোধহয় চায়ের রং দেখছিলো, কিন্তু এক পেয়ালা ঢেলেই স্বাতী যখন টেবিলটা আস্তে একটু ঠেলে দিলো তার দিকে, তখন চোখ তুলে, চোখ সরিয়ে বললো, 'আর-কেউ—আপনারা—আপনি, মিসেস নন্দী?'

'আপনার মুখে মিসেস নন্দীটা কিন্তু ভালো শুনলাম না।'

'তাহ'লে—শাশ্বতী দেবী ?'

'একেবারে দেবী ?' শাশ্বতী হাসলো।

'কেনই বা ও-সব হাঙ্গামা। তুমি ওকে ছোড়দিই ডেকো,' শ্বেতা খুব সহজে সমস্যার সমাধান ক'রে দিলো।

'ঐ আমার আরেক দোষ,' শ্বেতা-শাশ্বতীর মাঝামাঝি তাকালো সত্যেন, 'ও-সব ডাক-টাক আমার আসে না। তাছাড়া বয়সে তো আমিই বড়ো।'

'কত আর বড়ো ?'

'সেটা বলতে হ'লে একটা নিষিদ্ধ প্রশ্ন করতে হয়।'

শাশ্বতী বললো, 'আমার চব্বিশ। আপনার ?'

'আমার ছাব্বিশ। চব্বিশে আর ছাব্বিশে কি তুলনা হয় ?'

'মেয়েদের চব্বিশে আর পুরুষের বত্রিশেও তুলনা হয় না।'

'হারীতবাবুর বয়স বুঝি বত্রিশ ?'

শ্বেতা হেসে ফেললো কথা শুনে, শাশ্বতী লাল হ'য়ে হাসলো, স্বাতীও একটু না-হেসে পারলো না। শ্বেতা বললো, 'তোমার চা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছে। খাও।'

'একেবারে একাই খাবো ? বড়দি একটু বলুন না ওঁকে—' সত্যেন চোখ দিয়ে শাশ্বতীকে দেখালো।

শাশ্বতী হেসে উঠে বললো, 'এই-না বললেন আপনার ডাক-টাক আসে না !'

'আসে না মানে কি আর—' সত্যেনের লাল-হওয়া মুখ থেকে

শ্বেতা চোখ সরিয়ে আনলো। 'শাশ্বতী, খা না একটু চা। স্বাতী, তুই—'

'না,' এতক্ষণে এই একটি কথা উচ্চারণ করলো স্বাতী।

'আমরা অবশ্য তেমন চা-পিয়াসী নই, তবে—আচ্ছা, স্বাতীর হাতের চা খাওয়া যাক একটু—' শাশ্বতী তার চেয়ারটা সরিয়ে আনলো। 'বড়দি, তুমি সত্যেনবাবুকে কিছু খেতে বলো।'

'না—না—আর-কিছু না। শুধু-শুধু চা-ই ভালো লাগে আমার।'

শ্বেতা বললো, 'থাক, ইচ্ছা না-হ'লে খেয়ো না।'

'আমি আবার শুধু-চা খেতে পারি না,' ব'লে শাশ্বতী হাত বাড়িয়ে একখানা বিস্কুট নিলো। শাশ্বতীর হাতে-ধরা বিস্কুটটার চেহারা হঠাৎ খুব ভালো লেগে গেলো সত্যেনের, নিজেও নিলো একটা। তারপর—যদিও মিষ্টিতে তার ঘোর অভক্তি—কথা বলতে-বলতে একটা সন্দেশও খেয়ে ফেললো, আর চায়ের পরে—যদিও কোনো-কিছু দিয়েই মুখের চায়ের স্বাদ নষ্ট করা তার পছন্দ না—লজ্জাজড়োসড়ো তাতার হাত থেকে মশলা নিয়েও মুখে দিলো, শুধু তা-ই নয়, চুলে হাত রেখে মুখ কাছে নিয়ে—নিজেও অবশ্য জড়োসড়োভাবে—তাতাকে একটা 'বাঃ!' পর্যন্ত বললো। আর সঙ্গে-সঙ্গে এ-কথাটা তার মনে হ'লো যে-আত্মীয়তাকে মুখে সে এত অবজ্ঞা করে, তারই রস এখানে ব'সে-ব'সে ভোগ করছে সে। তারপরেই ভাবলো, কিন্তু এখন আর ব'সে থাকার কোনো কারণ থাকলো না। এখন যেতেই হবে।

'আচ্ছা, যাই।' সে চায়নি, তখনই বলতে চায়নি, কিন্তু কেউ

যেন ঠেলে বের ক'রে দিলো কথাটা তার মুখ দিয়ে। আর বলা যখন হ'য়েই গেছে উঠতেই হ'লো।

শাশ্বতী বললো, 'তাহ'লে আজই যাচ্ছেন?'

তা-ই তো, আজ তো সে যাচ্ছে! কোথায় না? হ্যাঁ, রাঁচি। 'আজই যাচ্ছি,' একটু কড়া শোনালো সত্যেনের গলা।

'কবে ফিরবেন?'

'ছুটি ফুরোলে।' একটু আগে উচ্ছল ছিলো যে-মানুষটা, সে হঠাৎ কঠোর গম্ভীর স্বল্পভাষী হ'য়ে গেলো।

'আপনাদের ছুটি তো লম্বা,' শাশ্বতী আর-একটু কথাবার্তার চেষ্টা করলো। 'আর দু-চারদিন পরে গেলেও—'

'সে আর হয় না,' সত্যেন পাৎলা একটু হাসি ফোটালো ঠোঁটে।

'শ্বেতা বললো, 'সত্যি তো, যাওয়া যখন স্থির করেছো—'

ব্যাপারটাতে কোথাও যাতে ফাঁক না থাকে, সত্যেন তাই আলাদা ক'রে শ্বেতার আর শাশ্বতীর দিকে তাকিয়ে বললো, 'ফিরে এসেই দেখা করবো আপনাদের সঙ্গে। আচ্ছা যাই,' শেষের কথাটা ব'লে—এতক্ষণে, এতক্ষণ পরে—স্বাতীর দিকে চোখ ফেরালো, যেন এইমাত্রই তার মনে পড়লো যে দিদি দু-জন ছাড়া আরো কেউ ঘরে আছে। শেষ বিদায়টা সে নিয়েছিলো দরজার কাছে, তার সামনে শাশ্বতী, একটু পিছনে তাতার হাত ধ'রে শ্বেতা, আরো একটু পিছনে, বড়দির অর্ধেক আড়ালে, স্বাতী। সে তাকাতে স্বাতী একটু স'রে এলো, ফিরে তাকালো। আর রাস্তায় এসে সত্যেনের মনে হ'লো স্বাতীর সেই দৃষ্টি শেষ হয়নি, এখনো চলছে, আসছে তার পিছনে, সঙ্গে-সঙ্গে, ক্ষুর মতো পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে

এইমাত্র ঢুকে গেলো তার শরীরে। প্রায় কষ্টের মতো লাগলো তার, শরীরের কষ্ট, কষ্টে প্রায় চোখে জল এলো। দ্রুত হাঁটলো, দ্রুত এলো ট্র্যাম-রাস্তায়, ট্র্যামে উঠে বসলো হাজরা-মোড়ে রাঁচির টিকিট কিনবে ব'লে।

ভিতরে এসে স্বাতী ডাকলো, 'লোটন!'

লোটন কাছেই ছিলো, ডাক শুনে ছুটে এলো হামাগুড়ি দিয়ে।

'চল—স্নান! মাসির কাছে স্নান করবি না?'

মাসির হাঁটুর কাছের কাপড় ধ'রে লোটন টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ালো। মুখ তুলে চকচকে চোখে আওয়াজ ছাড়লো—'মাতী-ঈ! তা—ন্‌ন্‌।' বলতে-বলতে দুই ছড়ানো হাতে চাপড় দিলো মাথায়; অল্প ভাষা তাতে পুষিয়ে বেশি হ'লো, কিন্তু এমন বেগ দিলো যে দাঁড়ানো থেকে ধপাশ্‌ হ'লো মেঝের উপর।

স্বাতী হেসে উঠে বললো, 'মাসির কাছে তো?'

ব'সে-ব'সে হাত বাড়িয়ে দিলো লোটন। 'মাতী! কোয়ে?'

'না, কোলে না!' স্বাতী কয়েক পা পিছনে সরলো। 'চ'লে এসো হেঁটে-হেঁটে। এসো!'

লোটন নাকি সুরে গলা চড়ালো, 'কোঞে!'

'আচ্ছা, কোলে নেবো—আগে বলো কার কাছে স্নান করবে!'

'ম্‌মা—'

'মা! তা-আ-আ হ'লে তোমার সঙ্গে আড়ি!' স্বাতী গাল ফুলিয়ে চোখ ঘোরালো।

'মাতী-ঈ-ঈ!' 'ঈ' টাকে টানতে গিয়ে লোটন কান থেকে

কান পর্যন্ত ঠোঁট দুটোকে ছড়িয়ে দিলো, মুখে বুড়বুড়ি উঠলো তার, চোখ গোল-গোল হ'লো।

'না! তোমার সঙ্গে আড়ি!' স্বাতী ভুরু বাঁকালো, মুখ ফেরালো।

'নে, রঙ্গ রাখ,' শ্বেতা হাসলো। 'আর ঐ-তো এক রঙ্গ রোজ-রোজ।'

এবার চোখ বড়ো ক'রে ধমকের সুরে স্বাতী বললো, 'ঠিক ক'রে বলো কার কাছে স্নান করবে!'

মুখের দিকে তাকিয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো লোটন।

'মা-র কাছে?'

লোটন জোরে মাথা নাড়লো, যেমন ক'রে মানুষ 'না' বলে।

'মাসির কাছে তো?'

তেমনি ক'রেই আরো জোরে মাথা নাড়লো লোটন।

'দূর বোকা। কিছু পারিস না এখনো!' স্বাতী রাজি-হওয়ার মাথা-নাড়া দেখালো, আর লোটন তক্ষুনি সেটা শিখে নিয়ে সেই-যে দম দেয়া পুতুলের মতো মাথা নাড়তে লাগলো, সে আর থামেই না।

'হয়েছে, হয়েছে আর না। এবার চলো। তানন্!' স্বাতী কোমড়ে আঁচল জড়িয়ে তৈরি হ'লো।

'বড়দি! সত্যি দেখি স্বাতী ওকে নিয়ে চললো,' ব্যস্ত হ'লো শাশ্বতী।

শ্বেতা বললো, 'মেয়েটাও কম না! আর-কাউকে যেন চেনেই না এখন।'

'আর স্বাতীর ভাবটা! সত্যি যেন পারবে স্নান করাতে!' শাশ্বতী হাসলো।

'করায় তো দেখি মাঝে-মাঝে।'

'পারে? স্বাতী পারে?' ঠিক এ-সময়টায় শাশ্বতী এলো অনেকদিন পর, ব্যাপারটা তাই তার কাছে নতুন।

'পারি কিনা ছাখো!' ব'লে স্বাতী লোটনকে পিঠে নিয়ে চ'লে এলো ভিতরদিকের বারান্দায়।

শাশ্বতী নিজে কোনো শিশুকে নাড়াচাড়া করেনি—করতে হয়নি এখনো—তাই বড়দির নিশ্চিন্ত ভাব দেখেও তার অবিশ্বাস ঘুচলো না। 'ভালো করলে না, বড়দি; ওর একটা হাত-পা না ভেঙে ফেলে স্বাতী।'

'আরে না!'

'চলো, দেখি—'

শাশ্বতী বারান্দায় এলো, শ্বেতাও এলো একটু পরে। ততক্ষণে স্বাতীর দুই সহকারিণী মহা উৎসাহে লাফাতে লেগেছে: আতা একটানে খুলে ফেলেছে লোটনের গায়ের ফ্রক, তাতা একছুটে নিয়ে এসেছে বাথরুম থেকে সাবান তোয়ালে তেলের বাটি, আর তাদের সোর শুনে ছোটন হাপ্প্যাণ্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে মজা দেখতে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্বাতীর গা ঘেঁষে উদাসভাবে হেঁটে যেতে-যেতে বিজন বললো, 'কী রে, চ'লে যাচ্ছে নাকি আজ?'

স্বাতী না-শোনার ভাণ করলো।

একটু দূরে স'রে, ঠিক স্বাতীর দিকে না-তাকিয়ে বিজন আবার বললো, 'সত্যি যাচ্ছে নাকি?'

'কী বলছিস তুই!' স্বাতী অর্ধেক চোখ তুললো বিজনের দিকে।

'সত্যেন নাকি চ'লে যাচ্ছে ?'

'চ'লে আবার যাবে কোথায় ?' মনের কথাটা স্বাতী প্রায় মুখেই ব'লে ফেলেছিলো, সামলে নিয়ে বললো, 'তুই আজকাল বড্ড বাড়ি থাকিস, দাদা !'

শ্বেতা বললো, 'বেচারা ! বাড়িতে থাকে না ব'লেও বকুনি খায়, আবার থাকলেও কেউ খুশি না !'

'দেখলে তো, বড়দি ! ছুটির দিনেও যে নিশ্চিন্তে জিরোবো—'

'এই-না তোর এত কাজ যে রোববারেও ছুটি নেই ?'

বিজন তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হ'য়ে বললো, 'ছুটি-অছুটি আমার ইচ্ছেমতো। চাকরি তো করি না কারো !'

'তাই ব'লে ঐ ছেড়া গেঞ্জিটা প'রে ঘুরঘুর করছিস কেন এখানে ?' দেখাচ্ছে কী !'

হাত বেঁকিয়ে গেঞ্জির ফুটোয় পিঠ চুলকোতে-চুলকোতে বিজন বললো, 'যাই, সত্যেনকে একটা কথা ব'লে আসি। বাড়ি গেলো নাকি রে এখন ?'

শাশ্বতী নিচু গলায় শ্বেতাকে বললো, 'ভারি ফাজিল হয়েছে বিজুটা !'

স্বাতী কিছুই বললো না ; মেঝেতে আসনপিঁড়ি হ'য়ে ব'সে লোটনকে জাপটে শোওয়ালো কোলের মধ্যে, আর লোটন তার অভ্যেসমতো হাত-পা ছুঁড়ে আসর জমালো।

'কী মজা !' হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলো তাতা।

ছোটন বললো, 'এ মা ! এ আবার একটা মজা কী !'

'মজা না ? খুব মজা !'

'মোটেও না!'

'তবে তুই যা এখান থেকে!'

কিন্তু ছোটন নড়লো না, না-মজাটাই দেখতে লাগলো। তার বোন ব'লে পরিচিত ঐ ছোট্ট মানুষটাকে সে খুব ভালো চোখে গ্যাখে না; বিচ্ছিরি, নোংরা, এখনো বিছানায় ইয়ে করে—ছি!—আর বুদ্ধিও তেমনি, সেদিন তার লাট্টুটাই মুখের মধ্যে পুরে দিয়েছে—জিভ-টিভ কেটে এক কাণ্ড—মা আবার উল্টে তাকেই বকলেন! এদিকে ও-যে অমন বোকা, লাট্টু খেতে হয় না তা পর্যন্ত জানে না—তার আর কিছু না!

মাসির তেল-মাখা হাতটা গায়ে লাগতেই লোটন এমন-এক ডিলিক দিলো যেন উল্টে ডিগবাজি খাবে।

আতা তাড়াতাড়ি বললো, 'হাত ধরবো ছোটোমাসি?'

'আমি পা!' জুড়লো তাতা।

'না বড়দি,' শাশ্বতী শাসালো, 'আজ কিছু আছে তোমার মেয়ের কপালে!'

স্বাতী এবার মন দিয়ে কাজে লাগলো। প্রথমে আস্তে, সাবধানে, তারপর নির্ভয়ে, স্বচ্ছন্দে, লোটনের মিষ্টি, নরম, গরম শরীরটার উপর দিয়ে নানা ভঙ্গিতে নড়তে লাগলো তার হাত;—প্রথমে এক হাত; তারপর লোটন যখন ছটফটানি থামিয়ে আরামে গা এলিয়ে গর্‌র্‌র্‌ আওয়াজ ক'রে-ক'রে দর্শকদের খুশি করতে লাগলো—তখন দু-হাত;—বড়দিকে যে-রকম দেখেছে, ঠিক সে-রকম ক'রেই চেষ্টা করলো বুলোতে, চাপড়াতে রগড়াতে: গলার ভাঁজে-ভাঁজে, আঙুলের ফাঁকে-ফাঁকে তেলের ফোঁটা মিশিয়ে

দিলো, ছোট্ট টুকটুকে কান ছুটিকেও ভুললো না ; চুপচাপ নিচু চোখে, চুপচাপ গম্ভীর মুখে নিজেরই অজান্তে তৈরি হ'তে লাগলো ভবিষ্যতের জন্য। ভবিষ্যৎ কাছে এসে গেছে, সে জানে। ভিতরে-ভিতরে কাঁপছে সে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম যেমন দূর-চাকার মাটি-তলার ধাক্কায় অনেক আগে থেকেই একটু-একটু কাঁপে। আর তাই, ট্রেনের ঘণ্টা পড়লে প্ল্যাটফর্মে যেমন ব্যস্ততা, তেমনি তারও সমস্ত শরীরে কাজের ঢেউ উঠেছে এখন, হাতের কাজ, নড়াচড়ার, চলাফেরার ;—সে এত বেশি বেঁচে আছে যে খানিকটা তার খরচ ক'রে না-দিলে বাঁচে না। টান হ'য়ে আছে বুকের মধ্যে সব সময়, দপদপ করছে আঙুলের ডগা, ক্লান্তি কাকে বলে ভুলে' গেছে, শান্তি কাকে বলে তাও ভুলেছে।···চ'লে যাবে? আজ চ'লে যাবে? না, যাবে না, যাবে না ; আমি বলছি যাবে না।

লোটন ছুঁচোলো গলায় কেঁদে উঠলো হঠাৎ।

'এই রে!' শাশ্বতী বললো, 'চোখে গিয়েছে!'

'না, না, কিছু হয়নি! বা—বা কী সুন্দর তেল মাখে লোটন,' বড়দির সুর অবিকল নকল করলো স্বাতী, 'একটু কাঁদে না—ছাখো তোমরা সব—কেউ পারে না এ-রকম—'

'ভারি তো!' ছোটনের গলা শোনা গেলো, 'আমি ওর চেয়ে কত ভালো পারি!'

'সে তো সত্যি! লোটন তো দাদাকে দেখেই শিখেছে এত সুন্দর নাইতে!'

এ-কথা শুনে দায়িত্বপূর্ণ দাদার মতোই গম্ভীর হ'লো ছোটন।

শ্বেতা বললো, 'দিস-তো ওকে ধ'রে একদিন ভালো ক'রে

নাইয়ে ! আমি ডাকলে তো মাথা পাতে না, তা তোর কাছে বোধহয়—'

• ছোটন বললো, 'ধ্যেৎ !'

'ছোটনের বুঝি স্নানে তেমন উৎসাহ নেই,' বললো শাশ্বতী।

'মামার ধাত !' শ্বেতা হাসলো। 'যা কাণ্ড ক'রে এক-একদিন নাওয়াতে হ'তো বিজুকে !'

'আমার বিষয়ে কী বলছো তোমরা ?' বলতে-বলতে বিজু দরজার ধারে দাঁড়ালো। ছেঁড়া গেঞ্জি ঢাকবার জন্য কুঁচকোনো একটা সিল্কের পাঞ্জাবি পরেছে—আরো বদ দেখাচ্ছে তাতে—হাতে জ্বলছে সিগারেট। শাশ্বতী শ্বেতার দিকে তাকিয়ে বললো, 'তুমি ওকে কিছু বলছো না, বড়দি, তোমার সামনেই সিগারেট খাচ্ছে !'

'বড়দি ও-সব মাইণ্ড করেন না।' বিজন গম্ভীরভাবে সিগারেটে টান দিলো, তারপর দু-পা এগিয়ে লোটনের দিকে তাকালো।

'এঃ !' বিজন নাক কুঁচকে বললো, 'শর্ষের তেল !'

'ছাখো বড়দি, হয়েছে ঠিক ?' ব'লে স্বাতী আর-একবার হাত বুলিয়ে গেলো ছোটো, নগ্ন, নরম, মসৃণ শরীরটাতে। সেদিকে তাকিয়ে শাশ্বতী ভাবলো ও-রকম একটা হ'য়ে-ট'য়ে পড়লে মন্দ কী—কিন্তু হারীত কিছুতেই রাজি না।

বিজন বললো, 'শর্ষের তেলে রং কালো হয় ; অলিভ অয়েল মাখাতে হয় বাচ্চাদের।'

'নাকি ? আর কী-কী করতে হয় বল তো ?'

বিজন খোশমেজাজে হাসলো, 'আচ্ছা, সব এনে দেবো তোমাকে বড়দি, ভেবো না।'

'যাক। এতদিনে, বড়দি, তুমি নিশ্চিন্ত হ'লে,' ব'লে চিক্কণ লোটনকে কোলে ক'রে স্বাতী উঠে দাঁড়ালো।

'দেখবি, দেখবি।' আধ-পোড়া সিগারেট ঠোঁটের ফাঁকে ঝুলিয়ে চোখ মিটমিট করলো বিজন।

স্বাতী উঠোনে নামলো, সেখানে টবে ক'রে লোটনের স্নানের জল রোদে গরম হচ্ছিলো অনেক আগে থেকেই। লোটন গলাজলে ব'সে থাবা মেরে-মেরে জল ছিটোতে লাগলো, আর কণ্ঠের আশ্চর্য কসরৎ দেখিয়ে সব ক-টা ব্যঞ্জনবর্ণ অভ্যাস করতে লাগলো তারস্বরে; আর তাকে দেখতে-দেখতে, তার খুশিতে খুশি হ'তে-হ'তে স্বাতীর মনে একটু আগে যে-উদ্বেগ উঠেছিলো, তা হঠাৎ একেবারে মিলিয়ে গেলো। মনের মধ্যে নিশ্চিত জানলো যে সত্যেন যাবে না, যেতে পারে না।

আতা ঘটি ক'রে জল ঢাললো লোটনের মাথায়, তাতা গায়ে একটু সাবান না-বুলিয়ে ছাড়লোই না, ওদের দু-জনেরও আদ্ধেক স্নান হ'য়ে গেলো লোটনের দাপাদাপিতে, আর ওদের হাত থেকে লোটনকে উদ্ধার করতে গিয়ে প্রায় স্বাতীরও। লোটন হাসলো, আতা-তাতা হাসলো, স্বাতীও হাসলো সঙ্গে-সঙ্গে, আর মাথার উপর আকাশে ভেসে বেড়ালো শরতের শাদা মেঘ, আর শান্ত একটি আকাশ তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখতে লাগলো।

'ওরে! আর না! তোল!' শ্বেতা ডাকলো বারান্দা থেকে।

কিন্তু তোলা কি সোজা! লোটন কেবল বলে, 'ন্‌না—তান্‌নন্‌!' আর টবের কড়া আঁকড়ে থাকে দু-হাতে—এটুকু-টুকু তো মুঠি, কিন্তু জোর কী!—মাসিকে একদম হারিয়ে দিলো দু-বার, মুখ-টুক

ভিজিয়ে দিলো, আর তাতে স্বাতীর এত মজা লাগলো যে পরের বার আর চেষ্টাই করতে পারলো না।

'রোজই এ-রকম করে, বড়দি?' শাশ্বতী জানতে চাইলো।

'মাসির কাছে একটু বেশি করে। সব বিদ্যে দেখানো চাই তো।'

শাশ্বতী উশখুশ করলো। অতক্ষণ ভিজে গায়ে থেকে জ্বর-টর হবে না তো মেয়েটার? কড়া ধ'রে নাচতে-নাচতে উল্টে পড়বে না তো হঠাৎ? চেঁচিয়ে বললো, 'স্বাতী, তোল!' তারপর নিজেই উঠে দাঁড়ালো। মনের মধ্যে আবছা একটা ইচ্ছা জাগছিলো তার, উঠোনে গিয়ে ওদের সঙ্গে দাঁড়াবার, লোটনকে একটু কোলে নেবার; এতক্ষণে যেন নিজের কাছেই একটা ছুতো পেলো। 'আমিই ওকে নিয়ে আসি, বড়দি,' ব'লে সিঁড়ির দিকে এগোলো সে, কিন্তু স্বাতী তখনই নিয়ে এলো লোটনকে, গলার চীৎকার আর গায়ের জল সুদ্ধু মেঝেতে নামিয়ে দিলো, হাঁটু ভেঙে ব'সে মুছিয়ে দিতে লাগলো তোয়ালে দিয়ে।

বড়দি আস্তে বললেন, 'স্বাতী আমাকে দে।'

'আমিই পারবো,' স্বাতী ঘাড় বেঁকিয়ে নিজের ভিজে মুখটা কাঁধের কাপড়ে মুছে নিলো। 'কি-দুষ্টু, বড়দি, তোমার—' কথা থেমে গেলো মুখের দিকে তাকিয়ে। বড়দির চোখের ভাব বদলে গেছে—কী? স্বাতীর চোখ দ্রুত সরলো ছোড়দির, দাদার দিকে, দু-জনেই কেমন সামনের দিকে তাকিয়ে—কী হয়েছে? স্বাতী লোটনকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো, আর তখনই, ফিরে তাকানোর আগেই, তার মনের তলায় লাফিয়ে উঠলো কী হয়েছে;

তাই উঠোনের মধ্যিখানে রোদ-লাগা লালচে মুখে সত্যেনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটুও অবাক হ'লো না।

বিজন তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে অভ্যর্থনা করলো, 'আসুন।'

এতক্ষণে—স্নানের টবটা দেখে, সকলকে দেখে—সত্যেন বুঝলো যে পিছনের দরজা দিয়ে হঠাৎ এ-রকম বাড়ির মধ্যে চ'লে আসাটা একেবারেই শোভন হয়নি। 'আমি—আমি—' ওটুকু ব'লেই থেমে গেলো।

'আসুন,' আরো দরাজ গলায় বিজন বললো।

'ওদিকের দরজাটা বন্ধ ছিলো—কারো সাড়া পেলাম না—তাই ভাবলাম—ভাবলাম একবার—' কী ভেবেছিলো? সকালবেলায় অতক্ষণ কাটিয়ে গিয়ে এক্ষুনি কেন আবার এসেছে এই ব্যস্ত চড়া বেলার অসময়ে? আর-একবার, শুধু আর-একবার চোখে দেখতে!

'তাতে কী হয়েছে? আসুন, বসুন এসে।'

'না, না, এখন আর—' সত্যেনের মন চাইলো দৌড়ে আবার বেরিয়ে যেতে, কিন্তু তার শরীর নড়তে পারলো না—মানে, কলের মতো নড়লো, পা টিপে-টিপে উঠে এলো বিজনের পিছনে সিঁড়ি ক-টা।

'বসুন। এই যে—না, ও-ঘরে চলুন—' বিজনের নড়াচড়ায় ভদ্রতা ঝ'রে পড়লো।

'কেন, এখানেই বোসো না,' লোটনকে জাঙিয়া পরিয়ে শ্বেতা উঠে দাঁড়ালো।

'না, না এখানে কী—আসুন—আমার সঙ্গে। মানে,' বিজন একটু থামলো, 'আপনার যা ইচ্ছে।'

ইচ্ছে! কথাটার অর্থ সত্যেন যেন বুঝতে পারলো না; কেমন নিঃসাড়মতো ব'সে পড়লো সেই ভেনেস্তা চেয়ারটাতেই, বিজন যেটা প্রথমে এগিয়ে দিয়েছিলো।

বিজনও বসলো, ঘরোয়াভাবে আলাপ আরম্ভ করলো, 'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এখন? টিকিট কিনে আনলাম। এই-যে—' কোনো দরকার ছিলো না, এ-রকম কেউ করেও না সাধারণত, তবু পকেট থেকে বের করলো সবুজ রঙের রেল-টিকিটটা। অনর্থক, কতগুলি টাকা একদম জলে ফেলে, একেবারে সেকেণ্ড ক্লাশই কেটেছে, যাতে এর পর কিছুতেই তার না-যাওয়া না হয়, যাতে অন্তত ঐ টাকা ক-টাই তাকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় রাঁচিতে। টিকিটটা আঙুলে ধ'রে ঘোরালো একটু—যেন সবাইকে দেখাতে চায়—তারপর নিজে চোখ ফেরালো এদিক-ওদিক। দেখলো দিদি দু-জনকে দরজার ধারে পাশাপাশি, স্বাতীকেও দেখলো—আবছা দেখলো—একটু দূরে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো। আড়ষ্ট, অস্পষ্ট, স্বাতী দাঁড়িয়ে ছিলো অর্ধেক মুখ ফিরিয়ে: সত্যেনকে চোখে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে যেন আয়নার মধ্যে নিজের চেহারাটা দেখতে পেয়েছিলো সে—চুল-টুল খুলে একাকার, শাড়িটা তেলে-জলে মাখামাখি;—বদলে আসবে? —না। চ'লে যাবে এখান থেকে?—না। এখানেই থাকবে?—না। থাকলো ওখানেই, আর প্রতি মুহূর্তে ভাবলো কেন আছি, আর ভাবতে-ভাবতে দাঁড়িয়ে থাকলো না-ন'ড়ে, না-ব'লে, না-দেখে।

'যাচ্ছেন বুঝি কোথাও?' বিজন, ভালোমানুষ, জিগেস করলো।

সত্যেন খুব গম্ভীর গলায় বললো—'আজ যাচ্ছি রাঁচি। আপনি রাঁচি গিয়েছেন, বিজনবাবু?'

'বোসো তোমরা—' শ্বেতা ভিতরে এলো লোটনকে নিয়ে, আর একটু পরে শাশ্বতীও এলো সেখানে, মুখে আঁচল চেপে নিঃশব্দে কিন্তু প্রবলবেগে হাসতে লাগলো।

'কী রে? কী হ'লো?'

শাশ্বতী কথা বলতে পারলো না, হাসির ঠেলায় কাঁপতে-কাঁপতে দিদির কাঁধে মুখ গুঁজলো।

লোটনের গায়ে পাউডর দিতে-দিতে শ্বেতা বললো, 'গ্যাখো কাণ্ড! হাসছিস কেন ও-রকম?'

'আবার বিজন-বাবু—!' হাসির ফাঁকে ঠাশ করে আওয়াজ বেরোলো শাশ্বতীর।

'ভালো তো। বিজুকে বাবু বলার একজন হ'লো এতদিনে!'

'আর বিজুটাও কম না! কেমন আলাপ জুড়লো এদিকে সাত জন্মে একটা কথা বলে না সত্যেনের সঙ্গে!'

'তা এতদিন তো আর—' শ্বেতা কথা শেষ না ক'রে লোটনের ভাঁজ করা জামাগুলি তুলে-তুলে দেখতে লাগলো।

'সত্যি!' হাসি-থামা অন্য গলায় শাশ্বতী বললো, 'কেন-যে সত্যেন যাচ্ছে—'

'কেন, ঘুরে আসা তো ভালোই।'

'ভালো? এদিকে—বাবার গলা না?'

পাৎলা শাদা মলমলের একটা বেনিয়ান শ্বেতা পরিয়ে দিলো লোটনকে।

'বাবা গিয়েছিলেন কোথায় ?'

'তোর নাকি পুজোর শাড়ি পছন্দ হয়নি—'

'ও-মা ! পছন্দ আবার হ'লো না কবে ? আমি শুধু বলেছিলাম—'

'ঐ হ'লো। ওটুকু খুঁতই বা থাকে কেন।'

'তাই ব'লে আবার বদলাতে গেলেন ? সত্যি—'

শ্রান্ত চেহারা নিয়ে রাজেনবাবু ঘরে এলেন। তাঁর হাতের কাগজের বাক্সটা দেখেই শাশ্বতী ব'লে উঠলো, 'এ তোমার ভারি অন্যায় বাবা !'

'ছাখ-তো অন্যায়টা কেমন,' বাক্সটা মেয়ের হাতে দিলেন রাজেনবাবু।

ডালাটা অল্প তুলে উঁকি দিয়েই শাশ্বতী তার মত জানালো : 'খুব সুন্দর !'

'না-দেখেই ?'

খুলে ভালো ক'রে দেখার জন্য তার মনের চঞ্চলতা শাশ্বতী সামলে নিলো। মনে পড়লো এ-সব শাড়ি বড়দি আর পরেন না, পরবেন না ; তাই লজ্জা করলো একটু।

'আমি একটু দেখেই ভালো জিনিশ চিনতে পারি। কিন্তু কেন বলো তো তুমি আবার—বরং ঐ জরিপাড় ধুতিটা বদলে আনলে ঠিক হ'তো।'

'কেন ?' জিগেস করলো শ্বেতা।

'উনি ও-সব ভালোবাসেন না। বলেন, জামাই-কাপড়—'

'তবে ঠিকই আছে,' শ্বেতা বললো। 'এখানকার তো জামাই সে।'

'আর ধুতি পরেই বা ক-দিন বছরে! মিছিমিছি—'

শ্বেতা সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলো, 'কম পরে ব'লেই তো ভালো পরতে হয়।'

'হ্যাঃ!' ঐ আওয়াজটা ক'রে কী-যেন একটা বলতে-না-পারা কথাকে শাশ্বতী পিষে দিলো, আর তার পরেই বললো, 'সত্যেনকে দেখলে, বাবা?'

'হ্যাঁ, দেখা হ'লো।'

'আমরা সবাই চ'লে এলাম—ভালো দেখাচ্ছে কি?'

'সত্যেনের কথা বলছিস? তাকে তো চ'লে যেতে দেখলাম।'

'চ'লে গেলো এর মধ্যে? এলোই তো এইমাত্র।'

রাজেনবাবু কিছু বললেন না।

'সকালেও এসেছিলো একবার।'

রাজেনবাবু এবারেও কিছু বললেন না। শাশ্বতীও কথা পলো না আর, শ্বেতা ছোট্ট লাল চিরুনি দিয়ে লোটনের চুল আঁচড়ে দিতে লাগলো, আর একটু পরে রামের মা এলো লোটনের দুধের বাটি নিয়ে।

শাশ্বতী হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকলো, 'স্বাতী!' উত্তর না-পেয়ে আবার ডাকলো। তারপর একটু ন'ড়ে-চ'ড়ে, একটু-যেন উদ্বিগ্ন স্বরেই বললো, 'স্বাতী কোথায়?'

'দিদিমণি তো নাইতে ঢুকলেন,' রামের মা-র ফিশফিশে গলা শোনা গেলো।

আবার চুপ। তিনজনের একজনও অন্যজনের দিকে তাকালো না; আর মিনিটখানেক এ-রকম কাটবার পর রাজেনবাবু আস্তে-

আস্তে অন্য ঘরে চ'লে গেলেন। শাশ্বতী তখনো কথা বললো না, শ্বেতাও না ; মা-র কোলে শুয়ে লোটন দুধ খেতে লাগলো চকচক ক'রে, আর বাটি খালি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই ছবির মতো ঘুমিয়ে পড়লো।

শাশ্বতী বাড়ি ফিরলো, বাড়ির খাওয়া-দাওয়া চুকলো, সারা পাড়া দুপুর-চুপ। তারও মধ্যে আরো চুপ রাজেনবাবুর বাড়িতে স্বাতীর ঘরটি ; সেখানে শাশ্বতীর পুরোনো খাট আবার পড়েছে—আতা তাতা রাত্রে শোয়—আর এখন সেখানে ঘুমিয়ে আছে লোটন। তার বোজা চোখের ফোলা-ফোলা, ফিকে-গোলাপি, আবার একটু নীলচে পাতা দুটি মস্ত দেখাচ্ছে এখন। কিন্তু ঘরে আর যে দু-জন আছে, এই সুন্দর দৃশ্যটি তারা দেখছে না ; শ্বেতা ব'সে আছে মেয়ের দিকে পিঠ ফিরিয়ে উঁচু-করা হাঁটুতে থুতনি রেখে, আর স্বাতীর নভেল-পড়া বেতের চেয়ারটিতে ব'সে রাজেনবাবু মেঝের একটা বিশেষ অংশ মন দিয়ে দেখছেন। দেখে মনে হয় এ-ভাবেই কিছুক্ষণ ব'সে আছে দু-জনে ; চুপ, যেন চিন্তিত। একটু পরে শ্বেতা নিচু গলায় বললো, 'তাহ'লে, বাবা ?'

রাজেনবাবু মেঝে থেকে চোখ তুললেন।

শ্বেতা বললো, 'সবই তো ভালো ; এক—কেউ নেই ছেলেটির—'

'কেউ নেই কেন ? আমরা আছি !' ব'লে রাজেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। যেতে-যেতে থামলেন স্বাতীর ছোট্ট আলনার কাছে। শাড়ি, জামা ; তলায় রাখা তিন জোড়া জুতো, দু-জোড়াই কোন জন্মের পুরোনো, কিছু ফেলতে ওর মন সরে না। স'রে

এলেন টেবিলের কাছে ; সেই কবেকার বেতের শেলফটি বইয়ের ভারে বাঁকা ; নিচের তাকে স্কুলের বইগুলি ধুলোপড়া—নীল মলাটের অ্যাটলাসটা—টেবিলে এখনকার বই, গল্পের-বই, খাতা। একটা খাতা খুললেন ; পোর্শিয়ার চরিত্র লিখেছে, তা-ই পড়লেন একটু, চশমা ছাড়া ঝাপসা দেখলেন, তবু দেখতেই লাগলেন, আর সামনের দেয়াল থেকে তাঁকে দেখতে লাগলো ধুলো-পড়া কাচের আড়ালে ছবি-হ'য়ে-যাওয়া শিশিরকণার ঝাপসা চোখ। রাজেনবাবু তা জানলেন না।

খাতা বন্ধ ক'রে জায়গামতো রেখে পাশের ঘরে এলেন। আতা তাতা ছোটন লুডো খেলছে সেখানে, তাঁকে দেখেই তাতা আহ্লাদি গলায় ব'লে উঠলো—'দাদু খেলবে আমাদের সঙ্গে ?'

'খেলবে ?' আতা তাকালো। 'তাহ'লে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ করি। ছোটোমাসিকে এত বললাম—চারজন না-হ'লে তো জমে না খেলা।'

'আমি আর দাদু !' ছোটন আসনপিঁড়ি হয়ে জাঁকিয়ে বসলো।

'আচ্ছা তোমাদের এ-পার্টি শেষ হোক,' বলে রাজেনবাবু বারান্দায় এলেন। উঠোনে অর্ধেকটা ছায়া পড়েছে, তারে কাপড় শুকোচ্ছে, কোথায় একটা কাক ডাকছে কা-কা, আর স্বাতী ব'সে আছে সিঁড়িতে চুপ ক'রে। রাজেনবাবু ডাকলেন না, কাছে গেলেন না, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পিছন থেকে দেখতে লাগলেন। একটু পরে স্বাতী ফিরে তাকালো।

রাজেনবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার পানের ডিবেটা দেখেছিস নাকি রে ?'

'ছিলো তো ওখানেই—দেখছি—' স্বাতীও তাড়াতাড়ি উঠলো।

'আচ্ছা থাক, আমিই খুঁজে নেবো।'

'আমি এনে দিচ্ছি—'

'স্বাতী—'

স্বাতী যেতে-যেতে থামলো। রাজেনবাবু মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, কিন্তু স্বাতী দাঁড়ালো না, তাকালো না, বাবার চোখ এড়িয়ে চ'লে এলো সেখান থেকে। এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম, বাবার কাছে তার লজ্জা করলো।

এলো বড়দির কাছে। ঘুমোচ্ছেন। আর-একবার তাকিয়ে ভুল ভাঙলো। বড়দি শুয়ে আছেন কপালে হাত রেখে, আর চোখ-চাপা হাতটির তলা দিয়ে চোখের দু-কোণ বেয়ে-বেয়ে পরিষ্কার দুটি জলের রেখা নেমে এসেছে নাকের ধার দিয়ে বেঁকে ঠোঁটের কাছে, ঠোঁট একটু ফাঁক, শাদা গলার উপর সরু একটি নীল শিরা খুব আস্তে কাঁপছে। স্বাতী থমকালো, অবাক হ'লো, চোখ ফেরাতে পারলো না। বড়দিও কাঁদেন? আর সে ভেবেছিলো—ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলো—যে বড়দি মনের দুঃখ চমৎকার লুকোতে পারেন। লুকোতে!—দুঃখ না-লুকিয়ে উপায় কী এই পৃথিবীতে—দুঃখের জায়গা কোথায়, সময় কোথায়? কিন্তু যদি কখনো সময় হয়? এইরকম নিরিবিলি দুপুরবেলা, আর সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, সেইসব অন্ধকার বড়ো-বড়ো রাতগুলি—সে কী জানে তার, বড়দির দিন-রাত্রির কথা সে কী জানে? আর দুঃখেরই বা কী জানে—কী জানতো, আজকের আগে পর্যন্ত দুঃখেরই বা কী জানতো সে?

যেই কথাটা ভাবলো, যেই মনে পড়লো সত্যেন আজ ঠিকই চ'লে যাচ্ছে, অমনি যেন সত্যি তার বুক ফেটে কান্না এলো। কিন্তু কোথায় গিয়ে কাঁদবে, কোথায় লুকোবে, কেউ-না-কেউ দেখে ফেলবেই, কী বলবে তখন? বড়দির কাছেই সে সবচেয়ে নিশ্চিন্ত—ছিলো—কিন্তু বড়দিও যদি নিজের কান্না দিয়ে তাকে পর ক'রে দেন!

স্বাতী ফিরে যাচ্ছিলো, কিন্তু শ্বেতার চোখ খুলে গেলো। একটু তাকিয়ে থেকে ভিজে-ভিজে গলায় শ্বেতা ডাকলো, 'স্বাতী, আয়।'

স্বাতী দাঁড়ালো।

'আয়।' শ্বেতা, আস্তে কেশে, আবার ডাকলো। সে-যে কাঁদছিলো, সেটা মেনে নিলো তার চোখের দৃষ্টি, কিন্তু কান্না থেমেও গেলো তখনই, শুধু গলার আওয়াজে তার স্মৃতি রইলো।

স্বাতী এগিয়ে এলো, বসলো বড়দির শিয়রে।

'শুবি? শো।' শ্বেতা একটু সরলো, আর সেই সঙ্গে হাতের উল্টো পিঠে আস্তে মুখ মুছলো।

স্বাতী শুয়ে পড়লো বড়দির পাশে, গায়ে গা লাগিয়ে; দু-বোনে পাশাপাশি শুয়ে থাকলো কেউ কোনো কথা না-ব'লে।

'হিঁয়াওঁ!' ঘুমোনো লোটন কেঁদে উঠলো।

শ্বেতার বাঁ হাতটি নড়লো একবার। 'ঈশ! ভিজিয়ে একেবারে—' উঠে ব'সে কাঁথা বদলে দিলো, মেয়ের পিঠে চাপড় দিতে-দিতে বললো, 'এ-মেয়েটা বিষম হিশুনি! এ-জন্যই দেখতে পারি না এটাকে!'

ও-কথা শুনে স্বাতীর মনে হ'লো বড়দি তার কাছে ফিরে

এলেন। আবার সহজ হ'লো হেসে বললো, 'তুমি কেবল ওর নিন্দে করো, বড়দি! লক্ষ্মী মেয়ে—সে-ই কখন থেকে ঘুমোচ্ছে।'

'খাওয়া আর ঘুম ছাড়া আছেই বা কী!'

'কী-ই বলো!' স্বাতীর গলায় ঢেউ দিলো 'রোজ কথা শিখছে না নতুন-নতুন? আর দেখতে কী সুন্দর!'

'নাকি?' শ্বেতা আড়চোখে মেয়েকে দেখলো।

'ও তোমার সক্কলের চেয়ে সুন্দর হবে দেখো,' বেমালুম বাবার কথা চুরি ক'রে স্বাতী বললো।

'আমি তো দেখি না! কুচ্ছিৎ কপালটা!' ব'লে শ্বেতা সেই কুচ্ছিৎ কপালে তিনটি আঙুল ছোঁওয়ালো।

লোটনের ফোলা-ফোলা চোখের লালচে মুখে চোখ রেখে স্বাতী বললো, 'আমার ওকে এত ভালো লাগে বলবো কী, বড়দি!'

'ক-দিন আর! এর পরেই এক ঝুড়ি দাঁত, টাশ-টাশ কথা—আর ঠাশ-ঠাশ চড়!'

স্বাতী আওয়াজ ক'রে হেসে উঠলো।—'তখন বুঝি আর ভালো না?'

'এ-রকম কি আর।'

স্বাতী একটু ভাবলো। শিশু সুন্দর, খুব সুন্দর, কিন্তু সে-তো অন্যদের—বড়োদের—উপভোগের, তাতে তার নিজের কী? সে তো জানে না সে সুন্দর, সে-যে আছে তা-ই ভালো ক'রে জানে না, আর তা যেদিন জানবে সেদিনই এই সুন্দরের খতম। না, লোটনকে দেখতেই ভালো, লোটন হওয়াটা ভালো না। বেচারা—ঘুমিয়েই চব্বিশ ঘণ্টার ষোলো ঘণ্টা কাটিয়ে দিচ্ছে; কত বছর,

আরো কত বছর লাগবে তার এখানে পৌঁছতে, যেখানে আমি এখন আছি, যেখানে এসে মানুষ জানতে পারে সে বেঁচে আছে; জানতে পারে সে কী চায়, সত্যি কী চায়, আর শুনতে পায় বুকের মধ্যে এই ঢিপঢিপ কথা যে সত্যি সে যা চায় তা-ই পাবে, সত্যি যা চায় তা-ই হবে, হ'তেই হবে, না-হ'য়েই পারে না।

নিজের বুকের ঢিপঢিপ কথা কানে-কানে শুনতে-শুনতে স্বাতী বললো, 'আমার কিন্তু মনে হয় বড়ো হওয়াটা আরো ভালো।'

'হ্যাঁ, ভালোই তো,' শ্বেতা সায় দিলো। 'নিজের হাতে-পায়ে চলে—নির্ঝঞ্ঝাট।'

'বেশি যেন তুমি খুশি না তাতে?'

'খুব একটা খুশিরই বা কী,' শ্বেতা আবার শুয়ে পড়লো স্বাতীর পাশে। 'প্রথম তিন বছরের মতো কি আর-কিছু?'

কী বলতে গিয়ে স্বাতী থেমে গেলো। অন্য-একটা কথা—অদ্ভুত কথা—মনে হ'লো তার: এই 'প্রথম তিন বছর' বড়দির জীবনে লোটনই শেষ, আর বাবার জীবনে শেষ হয়েছিলো তারই সঙ্গে। বড়দির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে সে যেন বাবার মুখটা দেখতে পেলো, একটু আগে-যে দেখা হ'লো সেই কেমন-কেমন, বলতে-না-পারা মুখটা, তারপর বাবা যেন মা হ'য়ে গেলেন: অসুখ না, কষ্ট না, পান-খাওয়া টুকটুকে ঠোঁটের ঝলমলে মা; আর দেখতে-দেখতেই রং মুছে গিয়ে আবার সব শাদা হ'লো। হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'আচ্ছা বড়দি, পান খাও না কেন?'

শ্বেতা উত্তর দিলো না।

'কেন খাও না? ওতে কী দোষ।'

'দোষ আর কী।'

'তবে?—কেন?'—স্বাতী আবেগ দিয়ে বলতে লাগলো, যেন এই পান খাওয়া আর না-খাওয়াটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। 'কেন খাও না? তুমি-তো ভালোবাসতে—'

'উনিও খুব ভালোবাসতেন,' ছোট্ট গলায় শ্বেতা বললো।

এই প্রথম স্বাতী শুনলো বড়দির মুখে সেই মানুষের কোনো কথা, যে-মানুষ আর নেই, আর যার না-থাকাটা এর মধ্যেই সবাই মেনে নিয়েছে। সবাই—; কিন্তু একজন না, আর সেই একজনের কাছে কেমন লাগে অন্য সকলকে? স্বাতী আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিলো; তার মনের অনেক তলার চুপি-চুপি কান্না আবার যেন বেরিয়ে আসার ছুতো পেলো। পাশের ঘর থেকে উড়ে এলো ফুর্তির আওয়াজ—লুডো খেলছে ওরা। সময় কাটাবার কত উপায় বের করেছে মানুষ, তবু সময়টাই সমস্যা, তবু জীবনে এমন সময় আছেই যখন সময় আর কাটে না।—চ'লে যাবে!—একটা হাতুড়ির বাড়ি দিলো স্বাতীর হৃৎপিণ্ড—চ'লে যাবে? তাহ'লে আমি এখন কী করি?

কী করি, সত্যেনও তখন ভাবছিলো, কী করি। রাত্রি দূরে এখনো, স্টেশনে রওনা হবার সময় হ'তে আরো অনেক দেরি। অন্তত ছ-ঘণ্টা! আর এই ছ-ঘণ্টা তাকে এমনি ক'রেই কাটাতে হবে, এমনি চুপচাপ আরাম-চেয়ারে এলিয়ে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, না-বেঁচে; কেননা সবচেয়ে যেটাকে সে ভয় করেছে, প্রাণপণে যেটাকে সে এড়িয়েছে, আজ এতদিন পরে হঠাৎ তারই খপ্পরে সে

প'ড়ে গেছে, আজ এই ছ-ঘণ্টা সময়—যতক্ষণ-না হাওড়ার বাস্‌-এ চ'ড়ে বসতে পারে—ততক্ষণ তার কিছু নেই, কিছু করার নেই।

সত্যেন এদিক-ওদিক তাকালো। পরিষ্কার ঠাণ্ডা ঘর: বই-বোঝাই শেলফ দুটোয় সাহিত্যের অধিপতিরা সারি-দাঁড়িয়ে: টেবিলে, হাতের কাছে টাটকা কয়েকটা। তার মনে পড়লো ভবানীপুরের মেস থেকে এসে স্বর্গ মনে হয়েছিলো এই ঘর: মনে পড়লো কোনো-এক সময়ে ভেবেছিলো শুধু বই প'ড়েই জীবন কাটিয়ে দিতে পারবে। জীবন! জীবন কত বড়ো? সে যা চায় তাই তো পেয়েছে; বেশি কিছু চায়নি, কিন্তু যা চেয়েছে তা-ই পেয়েছে: পেয়েছে কম-টাকার বেশি-ছুটির চাকরি, নিরিবিলি ঘর, কলকাতার জ্যান্ত হাওয়া, পেয়েছে সেই স্বাধীনতা, আর সেই মন, যাতে নিজের কথা সবচেয়ে কম ভাবতে হয়। কিন্তু অন্য যে-সব ভাবনা—তার মনের বই-হজম-করা সতেজ পায়চারি—কোথায় তারা? বই, তোমরা আজ ফেল হ'লে কেন? যে-সুন্দর, ছোটো ফ্রেমটাতে জীবনটাকে সে বেঁধে নিয়েছিলো—যার মধ্যে, আর যা-ই হোক সময় কাটাতে-ভাবতে হ'তো না কখনো—তাতে কি আর কুলোচ্ছে না? জীবনটা কি বেড়ে গেলো হঠাৎ? আরো কোনো চাওয়া কি তার বাকি আছে?—কিন্তু চাওয়া তো শুধু না, চাওয়া মানেই পাওয়া, নয়তো চাই-চাই ব'লে গলা শুকিয়ে মরতে পারে না তো! চাওয়া মানেই পাওয়া—বেশি-কমের কথা নেই এতে; কেননা যার কাছে যেটা বেশি, বড়ো, সে তা-ই চায়—চাইলেই পাওয়া যায়, আর তা যদি না হয়, তবে তো না-চাওয়া ছাড়া উপায় নেই মানুষের!

ছবি ভেসে উঠলো সত্যেনের মনে। সেই যেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটি মেয়েকে দেখেছিলো মাঠ পার হ'য়ে হেঁটে আসতে। বর্ষাকাল তখন ; নতুন এসেছে এ-বাড়িতে ; বৃষ্টির পর রোদ উঠেছে বিকেলে। একই সঙ্গে দেখেছিলো লাল আকাশ, ছড়ানো মাঠ, আর—মেয়েটি যখন কাছে এলো, চিনলো, তার কালো চুলে হলদে রোদের ফিতে। কত আত্মস্থ ছিলো তখন, নির্লিপ্ত, সুন্দরকে সুন্দর ব'লেই ভালোবাসতো। আর এখন ? অন্য ছবি এবার। চড়তি বেলা, ব্যস্ত বাড়ি, তার মধ্যে হঠাৎ···উঠোনের মধ্যে দাঁড়িয়ে—সে। কী ভেবেছিলো, সবাই ? কী ভেবেছিলো, যখন সে ঐ টিকিটটা বের করেছিলো পকেট থেকে ! একটা কথা হ'লো না, ভালো ক'রে চোখেও যেন দেখলো না। অনর্থক—সব অনর্থক ! কোনো মানুষকে দেখে-দেখে আরো যদি দেখতেই শুধু ইচ্ছে করে তবে-তো তাকে না-দেখাই ভালো। তারপর, তখনই, আরও হঠাৎ তার চ'লে আসাটা—ঠিক বেরোবার মুখে ওর বাবার সঙ্গে দেখা—কী-যেন তিনি বলেছিলেন, কোনো জবাব দেয়নি, পাছে কথা বলতে দাঁড়ালেই তিনি আবার বসতে বলেন, আর সে-ও রাজি হ'য়ে যায়। বোকামি—সমস্তটাই বোকামি ! সুন্দরের ধর্মই ক্ষণিকতা ; সুন্দরের শর্তই এই যে নিজের জন্য তাকে আমরা চাইবো না। তাজমহলে বাস করা যায় না, কষ্টিপাথরের পার্বতী মন্দিরেই মানায়, পুরীতে যারা বারো মাস থাকে তারা সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকায় না। তাই রক্তমাংসের মানুষ সুন্দর হ'তে পারে না, যদি সুন্দর লাগে, ভালো লাগে, যে-কোনো কারণে কোনো জ্যান্ত মানুষকে ভালো লাগে যদি, তাহ'লে তাকে আমরা চাই—চাই—আর সেই তাতাথৈ

ইচ্ছায় কোথায় সুন্দর! আর তাই মানুষকে ভালোবাসতে সাবধান: কবিতা ভালোবাসো, প্রজ্ঞা ভালোবাসো, আকাশ ভালোবাসো— কিন্তু কোনো জীবন্ত মানুষকে ভালোবাসতে খুব সাবধান। এই-তো সে, সভ্য মানুষ, শিক্ষিত ভদ্রলোক, সতেরো বছরের বাচ্চা-ছেলের মতো আকাট বোকামি ক'রে এলো তখন, আর এখন—যদিও তার কোনো অভাব নেই, দুঃখ নেই—যেন চেয়ারে ব'সে-ব'সে অথই জলে খাবি খাচ্ছে।

একটা উপমা মনে এলো সত্যেনের। তীরে দাঁড়িয়ে নদীর সুন্দর দৃশ্য দেখছিলো, ভালো লাগছিলো, আরো, আরো ভালো; যত ভালো লাগছে ততই আরো ভালো ক'রে দেখতে গিয়ে স'রে আসতে-আসতে হঠাৎ জলের মধ্যেই প'ড়ে গেছে। বাঁকা, চোরা, কুটিল, পিছল জল; এখানে চাপ, ওখানে টান, সেখানে ধাক্কা; যত নরম, তত নাছোড়;—আর, যদি কখনো পায়ের তলায় মাটি ঠেকে, তাও পিছল। কিন্তু তুমি তো জানতে, সত্যেন নিজেকে নিজে বললো, তুমি কি জানতে না যে জল এ-রকম? নিজেই উত্তর দিলো, কী ক'রে জানবো, আগে তো কখনো জলে পড়িনি। তবে এটা তো জানতে জলের অত কাছে গেলে প'ড়ে যেতে পারো? এবার আর উত্তর দিলো না সত্যেন।

মরীয়া হ'য়ে হাত তুললো সে; আঙুলের ভঙ্গী হ'লো যেন টেবিলে পর-পর শোওয়ানো তিনটি বইয়ের উপরেরটিকে আঁকড়ে ধরবে, কিন্তু তারপরেই সেই হাত ভিজে ন্যাতার মতো ঢ'লে পড়লো কোলের উপর। বৃথা! বই দিয়ে মুখ লুকোবে কার কাছে? কার কাছে লুকোবে যে তার সমস্ত মন প'ড়ে আছে ঐখানে, ঐ

বাড়িটায়, দু-মিনিট দূরে, কিন্তু এখন যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্তে। লুকোতে হবে না, আর ভাবতে হবে না, আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরেই রাত্রি, রেলগাড়ি, অন্য দেশ। কী আছে সেই অন্য দেশে? শান্তি আছে? মুক্তি আছে? আশ্রয় আছে? না—তার এই ঘরে এখন যা আছে সেখানেও তা-ই—শূন্যতা, শুধু শূন্যতা। তবু, এই যাওয়াটা একটা চেষ্টা অন্তত; একজন মানুষ, মাত্র একজন মানুষ যেখানে নেই, সেখানে কিছুই নেই, এই অসম্ভব অবস্থাটাকে অস্বীকারের চেষ্টা, আর চেষ্টা করতে গিয়ে হয়তো তার শক্তি বাড়বে, খুঁজে পাবে নিজেরই মনের পলিমাটির তলায় আরো পুরোনো পাথর। কিন্তু ফিরে তো আসবে? তারপর আবার—? না, ফিরে এসে এ-বাড়ি ছাড়বে, এ-পাড়া ছাড়বে, ছেড়ে দেবে কলেজে মেয়েদের ক্লাশ। দেখা না-হ'লেই ঠিক হবে সব। শূন্যতার ধূ-ধূ রাজ্য পার হ'য়ে আবার ফিরে পাবে নিয়মের আরাম, অভ্যাসের আশ্রয়, তার সম্পূর্ণ সত্তা, তার স্বাধীন মন। ঠিক, এই ঠিক!

নিজের ছাড়পত্র নিজেই লিখে, সই ক'রে, তার একটু হালকা লাগলো। একটু বেশি হালকা: যেন ডাক্তার বলেছে ভয় নেই, ব্যামো সারবে, কিন্তু একটি পা কেটে ফেলা চাই। তারপরেই মনে হ'লো: আর তো দেখা হবে না, তাহ'লে আজ আর-একবার—। মনে হ'তেই উঠে বসলো চেয়ারে, হঠাৎ যেন বেঁচে উঠলো, ফিরে পেলো বাস্তবের পৃথিবীটাকে। আবার যাবে? ঐ দুপুরবেলার পর আবার! সত্যেন মনের চোখে দেখলো সেই তিনটে ছাইরঙের সিঁড়ি, সবুজ দরজা, উল্টোদিকের নীল পরদাটা, আর সেই পরদা সরিয়ে স্বাতী এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। কী বলবে? কোনে

কথা নেই, আর নয় তো এত কথা আছে যে কখনো শেষ হবে না। এতদিন ধ'রে এত কথার পরেও তবু-তো সব কথাই বাকি থাকলো —বাকিই থাক। কী হবে গিয়ে—সত্যেন আবার এলিয়ে পড়লো চেয়ারে—গিয়ে তো সেই চ'লেই আসতে হবে আবার।

বাড়ি, সিঁড়ি, দরজা, মিলিয়ে গেলো; তবু দাঁড়িয়ে থাকলো স্বাতী, তার পিছনে নীল পরদাটা, শূন্য-হ'য়ে-যাওয়া বিশ্বে শুধু স্বাতী, যেমন মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকলে মনে হয় আকাশের গায়ে ঐ শাদা মেঘ ছাড়া কোথাও কিছু নেই। নড়লো না, সরলো না, স্থির দাঁড়িয়ে থাকলো। স্বাতীর চোখ, চোখের ভিজে-ভিজে আভা, তাও দেখতে পেলো সত্যেন—যেন অপেক্ষা করছে, কেউ কিছু বলবে ব'লে, কোথাও কিছু ঘটবে ব'লে অপেক্ষা করছে। স্বাতী অপেক্ষা করছে তার জন্য;—কিছু সে বলেনি, কিছু সে ভুলে গেছে; আর সেইটে মনে পড়লে, সেইটে বলা হ'লেই সব মিটে যাবে, সব ঠিক হবে।

এতক্ষণ শূন্যতা ছিলো, অশান্তির জায়গা জুড়লো এবার। এটা তার একলার ব্যাপার নয়; আর-একজনেরও অংশ আছে, তার সমান-সমানই অংশ। অথচ এতক্ষণ সে নিজের কথাই শুধু ভাবছিলো, সে কেমন ক'রে ফিরে পাবে তার শান্ত জীবন, তা-ই ভাবছিলো শুধু, আর সেজন্য দুঃখ মেনে নিতে প্রস্তুত করছিলো নিজেকে। তার জীবন! আর কি তার জীবনের উপর কর্তৃত্ব আছে তার? সে কি ইচ্ছে করলেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেতে পারে, যদি ইচ্ছাটাও তার একলার না হয়, আর-একজনেরও? নিজেকে দুঃখ দিতে পারে, কিন্তু অন্যকে? স্বাতীকে? সে কি স্বাতীকে দুঃখ দিতে পারে?

দায়িত্ব, দায়িত্বের ভার সত্যেনের মাথা নামিয়ে দিলো কাঁধের উপর, চোখ বুজিয়ে দিলো। চেষ্টা করলো না-ভাবতে, কিছু না-ভাবতে, একটা ঝাপসা, ঝিমোনো ছায়ার মধ্যে মিলিয়ে যেতে। কিন্তু চোখ তাকিয়ে আছে তার দিকে, ভিজে-ভিজে আভার চিকচিকে চোখ, বোজা চোখের অন্ধকারে জেগে আছে, দেখছে তার চোখের ভিতরে, মনের ভিতরে, বিঁধছে তার শরীরে, বিঁধছে। সেই চোখ থেকে ছাড়া পেতে সত্যেন চোখ খুলে ফেললো, আর সামনের মেঝেটার দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলো যে এখন একটিমাত্র উপায় আছে তার—তাদের—; সে-উপায় বিয়ে।

বিয়ে! কথাটা অদ্ভুত শোনালো তার কানে। কেন, নিজেকে প্রশ্ন করলো, এর মধ্যে কখনো কি কথাটা উঁকি দেয়নি তোমার মনে? হয়তো—কিন্তু তাই ব'লে সত্যি? সত্যি তো হবেই কখনো। তাই ব'লে এখনই! তা-ই তো ভালো, সবচেয়ে ভালো—স্বাভাবিক। স্বাভাবিক? না গতানুগতিক? তাহ'লে-তো সবচেয়ে গতানুগতিক বেঁচে থাকাটা।

সত্যেন একবার মনটাকে দৌড় করিয়ে আনলো তার প্রথম যৌবনের বছরগুলির উপর দিয়ে। সব অর্থেই স্ত্রীলোকবর্জিত জীবন তার। অভাববোধ ছিলো? হয়তো, কিন্তু অধৈর্য ছিলো না। অনেক দেখেছে সহপাঠীদের মধ্যে—যুবতীদের সঙ্গ পেতে অন্তহীন উদ্যম তাদের। আরো সাহসী যারা, তাদেরও দেখেছে। বীরদের বিদ্রূপ মেনে নিয়ে নিজেকে বাজে খরচ না-ক'রে ঐ বছরগুলি সে কাটিয়ে দিতে পেরেছিলো কিসের জোরে? অন্যদের চেয়ে সে ভালো ব'লে না—ঈশ্বর জানেন—বুদ্ধিমান ব'লেও না—নিঃসাড় ব'লে তো

নিশ্চয়ই না ; তার কারণ বোধহয় এই যে অল্প বয়স থেকে কবিতা প'ড়ে-প'ড়ে এ-বিষয়ে একটা কল্পনা জেগেছিলো তার, আর সেই কল্পনার কাছে গোপন, খুব গোপন একটা প্রতিজ্ঞায় সে আবদ্ধ ছিলো। কখনো মনে হয়েছে সেই কল্পনার ছবি হয়তো কোনো মানুষের মধ্যে দেখবে, কিন্তু তার মধ্যে বিয়ের কোনো কথা ছিলো না, অন্তত বাধ্যতা ছিলো না। বিয়ে ? না-ই বা হ'লো—আর হয় যদি তো হবে কোনো-একদিন। এইরকমের হালকা টোকায় এতদিন সে কথাটাকে মনের এ-পাশ থেকে ও-পাশে সরিয়ে দিয়েছে ; কিন্তু এখন আর পারলো না, কথাটা হঠাৎ কাঁটার মতো এঁটে বসলো।

হঠাৎ ? হঠাৎ ব'লে কিছু নেই, সবই আমরা ইচ্ছে ক'রে ঘটাই। বলো, সত্য বলো, তিন বছর আগে এক সকালবেলায় কলেজের ক্লাশ-ঘরে বই থেকে চোখ তুলে তুমি কি তোমার কল্পনার ছবি বাস্তবে দেখেছিলে ? না কি এই তিন বছরে একটু-একটু ক'রে তুমি তোমার কল্পনাকেই ছেঁটে-কেটে মিলিয়ে নিয়েছো তার সঙ্গে ? বলো, কবুল করো, এটা কি আকাশ থেকে পড়লো তোমার উপর, না কি তুমিই দিনে-দিনে এটাকে বানিয়েছো, তারপর খড়-মাটির-রঙের মধ্যে প্রাণ দিয়েছো তুমি ! শুধু আমি ? দু-জনেই, দু-জনেই ; দু-জন ছাড়া কি হয় ? কিন্তু দু-জন আর কোথায় ; দু-জনের এখন এক জীবন ; এখন তোমরা এক।

সত্যেনের মেরুদণ্ড বেয়ে শিউরানি নামলো ঠাণ্ডা। তারা এক ! কখনো আর আলাদা হবে না ! আর তার মানেই বিয়ে ? হৈ-চৈ, পৈতে-পরা মূর্খ পুরুৎ, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ ! দু-জনের মধ্যে যা জন্মালো, বড়ো হ'লো, সেই জীবন্ত সুন্দরকে

ঢোল পিটিয়ে বিশ্বসংসারে রটানো! কিন্তু তা ছাড়া আর উপায় কী? আর কোন উপায় আছে যাতে চোখ ভ'রে দেখা যায়, সব কথা বলা যায়, চ'লে আসতে হয় না! আর কোন পথ আছে যাতে ফিরে আসা নেই?

প্রশ্নটি একটু-যেন ভেসে থাকলো তার মনের উপর, কোনোদিক থেকে কোনো উত্তর না-পেয়ে আস্তে ডুবে যেতে লাগলো, আর তখনই মস্ত ঘোলা ঢেউ তুলে ফিরে এলো সব—সেই সব, তার রাঁচির টিকিট; দু-বার ক'রে বিদায় নেয়া, তার একটু আগের কত-কিছু সংকল্প। কোনটা? তাকে মনস্থির করতে হবে—আজই; এখনই। যদি যায়, সেটা শুধু কলকাতা ছেড়ে বেড়াতে যাওয়া হবে না, ছেড়ে যেতে হবে এই সমস্তটা জীবন, যে-জীবন তার—হ'তে পারতো, হ'তে পারে। আর আজ যদি না যায়—তাহ'লে আর দেরি করতেও পারবে না। কোনটা?

সত্যেন চেয়ার ছেড়ে উঠলো। মনে হ'লো তার শরীরের কোনো ওজন নেই, মেঝের উপর দিয়ে ভেসে-ভেসে চ'লে যাচ্ছে। শোবার ঘরে এলো, আয়নার সামনে চুল আঁচড়ালো, অচেনা লাগলো নিজের মুখ। ব'সে-ব'সে আর ভাবতে পারে না—বাইরে, যেখানে হয়, কাটিয়ে আসবে, আরো-তো কয়েক ঘণ্টা সময় আছে, অন্তত কয়েকটা ঘণ্টা তাকে নিশ্চিত কিছু করতে হবে না। পকেটে টাকা নিলো; হঠাৎ মনে পড়লো শিলং, যেদিন শেষ চিঠিটা পেয়েছিলো, আর পেয়েই ট্রেন ধরতে ছুটেছিলো। সেদিনই বুঝেছিলো আজকের মতো একটা দিন আসবে, আসবেই। সব বুঝেছে, সব জানে, স্বাতীও জানে,

ও-বাড়ির সকলেই বুঝেছে এতদিনে—এতক্ষণ শুধু ভাণ, নিজের কাছে নিজের মান বাড়ানো। যা-ই করুক, যা-ই ভাবুক, পারবে নাকি এখন কলকাতা ছাড়তে? পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে!—সত্যেন বেগে বেরিয়ে এলো রাস্তায়; দ্রুত হাঁটলো রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে, ডান দিকের গলিটার দিকে—শাদা একতলাটার দিকে—ফিরেও তাকালো না; সোজা চ'লে এলো ট্র্যাম-রাস্তায়, ট্র্যামে উঠে একেবারে এসপ্লানেড।

মেট্রো সিনেমার সামনে দাঁড়ালো, যেন সে এ-জন্যই এসেছে। সেখানে টিকিট না-পেয়ে এলো অন্য-একটায়, ঢুকে পড়লো। ছবি আরম্ভ হ'য়ে গেছে তখন। ঘরের নীলচে অন্ধকার, অতগুলি একভাবের মানুষ, আর পরদার উপর কড়া আলোয় দেখানো ছায়া-ছবি—সব মিলিয়ে একটু উপশম আনলো তার মনে। নিবিষ্ট হ'তে চেষ্টা করলো। দুই বন্ধু একই মেয়েকে ভালোবাসে; একজনকে সে বিয়ে করলো, আর-একজন দেশ ছাড়লো নাবিক হ'য়ে। সময় কাটলো। নাবিক ফিরলো, আবার দেখা হ'লো, আর দেখামাত্র তার প্রেমেই প'ড়ে গেলো মেয়েটি। নাবিক কিন্তু বন্ধুকে ঠকাতে রাজি না; এদিকে স্বামী ব্যাপার বুঝে সান্ত্বনা খুঁজলো এক নাচওয়ালিতে, তাতে আবার স্ত্রীর আঁতে ঘা লাগলো। টানা-পোড়েন চললো; সময় আর কাটে না। সত্যেনের মনে হ'তে লাগলো চেয়ারটা তেমন আরামের না, লোকেরা বড্ড কাশছে, এবার-তো শেষ হ'লেই পারে। যুদ্ধ বাধলো—সব সমস্যার সমাধান—স্বামী আকাশে পাইলট, নাবিক ডুবো-জাহাজে কাপ্তান, আর দুই বীরের ফটোগ্রাফ নিয়ে মেয়েটি গদ্‌গদ—এবার

গড সেভ দি কিং বাজলেই হয় ; কিন্তু সত্যেন তার আগেই উঠলো, বেরিয়ে এলো মিটমিটে চোখে হলদে-হওয়া রোদ্দুরে। এখনো এত বেলা! তাহ'লে—? আচ্ছা, এক পেয়ালা চা। চৌরঙ্গিতে এসে প্রথম যে-রেস্তোরাঁটা পেলো, সেটাতেই ঢুকে পড়লো।

সে বসতেই পাশের টেবিল থেকে একজন ব'লে উঠলো, 'আ-রে! সত্যেন!'

সত্যেন মুখ ফিরিয়ে দেখলো, মটন-চপের গায়ে কাঁটা বিঁধিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে কিরণ বক্সি। কিন্তু যে-কিরণকে সে চিনতো, যে তার সঙ্গে চার বছর কলেজে পড়েছিলো, সেই খদ্দরপরা খোঁচাদাড়ি কিরণ বক্সি না ; গরদের পাঞ্জাবি, সোনার বোতাম, ফিটফাট চুল ; সবসুদ্ধু একটা একদম-নতুনের চোখে-পড়া চকচকানি।

'এসো না এই টেবিলেই!' কিরণ অন্য হাতটা শূন্যে নাড়ালো। আর সত্যেন তার মুখোমুখি চেয়ারটায় বসতে-না-বসতেই আবার বললো, 'কতকাল পর দেখা! তারপর—কী-খবর?'

'খবর-তো তোমার,' সত্যেন একচোখ তাকালো কিরণের গালের দিকে—দাড়ি তো কামায়নি, যেন ছাল ছাড়িয়ে নিয়েছে, আবার পাউডরও!—'কী-ব্যাপার?'

'আর বোলো না ভাই, একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো এর মধ্যে,' বলতে-বলতে কিরণের চিকচিকে গালে হাসির দুটি বড়ো-বড়ো ভাঁজ পড়লো।

'কবে?'

'ষোলই শ্রাবণ।' কিরণ গম্ভীর গলায় দিন-ক্ষণ জানালো,

যেন তার বিয়ের তারিখটা সত্যেনের কাছেও—সকলের কাছেই—বিশেষ-একটা দিন। 'তোমাকে খবর দিতে পারিনি—বড্ড হঠাৎ—আর কোথায় আছো তাও ঠিক—'

'তাতে কী হয়েছে। চপটা খাও।'

'হ্যাঁ, এই-যে। তুমি—তুমি কী খাবে, বলো।'

'চা।'

'আর···কিছু না?···কিচ্ছু না? কিছু খাও! যা তোমার ইচ্ছে। আমি খাওয়াচ্ছি!'

সত্যেন একটু হাসলো।

'আহা—খাও না কিছু!' কিরণ সহৃদয়তায় উদ্বেল হ'লো, 'চপ-কটলেট ভালো না লাগে অন্য কিছু? স্যাণ্ডউইচ? কেক? ঠিক—কেকটাই তোমার পছন্দ—মনে নেই কর্নফুলি কেবিন?'

সত্যেন ভাবলো, কিরণ যে-রকম বলছে সে-রকম ঘনিষ্ঠতা ওর সঙ্গে আমার ছিলো কি? আর সেই ফাঁকে কিরণ হাঁক দিলো, 'বোয়!'

বোয় এনে সত্যেনের সামনে কেক রাখলো, কিশমিশঘন পুষ্ট একটি আধো-চাঁদ। কিরণ খুশি হ'য়ে বললো, 'বে-শ! একা ব'সে খেতে কি ভালো লাগে!'

'একাই তো খাচ্ছিলে।'

'তুমি তো আসোনি তখন।' এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হ'য়ে কিরণ ফিরে গেলো তার মটন-চপে—আর আগের কথায়। চিবোতে-চিবোতে বললো, 'হ্যাঁ, বন্ধু-বান্ধব অনেকেই বাদ প'ড়ে গেলো।

আর দেখাশোনাও হয় না—সবাই ব্যস্ত—বেশ ছিলো স্টুডেন্ট-লাইফটা—কী বলো ?' ব'লে পিঠ-চাপড়ানো হাসলো।

সত্যেন বললো, 'তোমার ওকালতি কেমন ?'

'আর সে-কথা ! আলিপুরে বেরোচ্ছিলাম—ট্রামভাড়াটাও পোষাতো না। এখন ইনকম-ট্যাক্স ধরেছি, এটাতে একটু আশা হচ্ছে—আমার শ্বশুর আবার আই. টি. ও. কিনা।'

'আই. টি. ও. ?'

'ইনকম-ট্যাক্স অফিসার। বুঝছো না—ওটা একটা মস্ত ব্যাকিং ! আর ইনকমট্যাক্সের প্র্যাকটিসে পয়সাও চটপট।—ইশ, একটু ধার নেই ছুরিটায় !'

'কেনই-বা ও-সব হাঙ্গামা। হাত দিয়েই খাও,' সত্যেন আঙুলে ভেঙে একটু কেক মুখে দিলো।

'সত্যি ! ছুরি-কাঁটা দিয়ে কিছু কি ঠিকমতো খাওয়া যায় !' কিরণ ও-সব সরিয়ে রেখে হাত লাগালো, কিন্তু একটু পরেই ব'লে উঠলো, 'এঃ !'

'কী হ'লো ?'

কিরণ ভরামুখে দুঃখীস্বরে বললো, 'ঝোল প'ড়ে গেলো পাঞ্জাবির হাতায় !'

সত্যেন তাকিয়ে দেখলো কিরণের মুখে একটা সত্যিকার হায়-হায় ভাব। তার জামার হাতার দিকে চোখ নামিয়ে বললো, 'কই, বোঝা তো যাচ্ছে না কিছু।'

'যাচ্ছে না ?' মুখের মটনটা ভালো ক'রে না-চিবিয়েই কিরণ গিলে ফেললো। হাতটা উঁচু ক'রে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো,

তার আংটির হিরে ঝিলিক দিলো সত্যেনের চোখে। একটু পরে বললো, 'এখন জামার রঙে মিশে আছে, কিন্তু শুকোলেই—; ধুয়ে ফেলবো এখনই ?'

সত্যেন বললো, 'না, না ; তাতে আরো ছড়াবে, আর ইস্ত্রিও নষ্ট হবে।'

'ঠিক ! তাহ'লে এই থাক—কী বলো ? ইশ্‌শ্‌!' গরদের উপর ঈষৎ ভারি-রঙের ক্ষুদ্র বিন্দুটির দিকে শোকের চোখে শেষবার তাকিয়ে কিরণ হাত নামালো, ঠিক হ'য়ে বসলো। অনেকটা নিস্তেজ গলায় বললো, 'তারপর—তুমি তো সেই কলেজেই—এখন কোত্থেকে ?'

'একটা ফিল্ম দেখে এলাম।'

'কোনটা ?'

সত্যেনের মনে পড়লো যে ফিল্মটার নাম সে জানে না, বাইরের দেয়াল-ছবিও লক্ষ্য করেনি। অগত্যা হাউসটার নাম করলো।

'ও। "এগুস মীটিং" দেখে এলে ? কেমন ?'

'মন্দ না।'

'ভালো শুনেছিলাম—জ্যানেট গ্রীন আছে—আমার আর দেখা হ'লো না।'

'কেন ?'

'আর বোলো না। অনীতা আবার বাংলা ফিল্মের পোকা—অনীতা আমার স্ত্রীর নাম। কেমন নাম ?'

'অমিতা খুব ভালো নাম।'

'অমিতা না, অ-নীতা।' কিরণ আওয়াজ ক'রে হেসে উঠলো। 'সব্বাই এ-ভুলটা করে। বেশ নতুন—না ?'

সত্যেন বললো, 'হ্যাঁ'।' ভাবলো, মা-বাবারা একটু ভেবে-চিন্তে নাম রাখলে তো পারেন, যাতে একটা মানে অন্তত হয়। অনিলেন্দু আর অনীতায় দেশ-তো ছেয়ে গেলো।

'হ্যাঁ—ঐ বাংলা ফিল্মগুলো, জানো-তো, দু-চক্ষের বিষ আমার, কিন্তু কী করবো, দায়ে প'ড়ে যেতেই হয়—এই সপ্তাহেই দুটো হ'য়ে গেলো। আর এও ভাবি যে আমরা কেউই যদি না যাই, তাহ'লে একটা দিশি ইণ্ডাস্ট্রি গ'ড়েই-বা উঠবে কী ক'রে।'

সত্যেন বললো, 'সে-তো ঠিক।'

'না হে, বিয়ে করলে আর স্বাধীনতা থাকে না। এই-তো এই ছুটিটা—ছুটিতে-তো মানুষ একটু বিশ্রাম করে—আমার কেটে যাচ্ছে কেবল শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়দের বাড়ি ঘুরে-ঘুরে। এখন যেতে হবে দু-জায়গায়; প্রথমে ক্রীক রো, সেখান থেকে ফড়েপুকুর; এক বাড়িতে অসুখ, আর-এক বাড়িতে এক বৌদির নতুন বাচ্চা হয়েছে—কেমন আছে-টাছে এই আরকি।' খুব যেন বিরক্ত ভাব ক'রে কিরণ প্লেটটার দিকে তাকালো, তারপর চপের শেষ অংশটুকু মুখে পুরলো।

সত্যেন বললো, 'সেইজন্য মজবুত হ'য়ে নিচ্ছো?'

'হ্যাঁঃ—তা—তা বলতে পারো!' কিরণ খুব হাসলো কথাটা উপভোগ ক'রে।

'কিন্তু একা যে?'

কিরণের হাসিমুখ নিমেষে গম্ভীর হ'লো। একটু নিচু গলায় বললো, 'সেই তো! সব ঠিকঠাক, মা-র হঠাৎ শখ উঠলো বৌকে

নিয়ে কোথায় বেড়াতে যাবেন। বোয়!' রাগি আওয়াজে হাঁক দিলো, 'ফিঙ্গার বোল।'

'তাই বুঝি রাগ ক'রে বাড়িতে চা খাওনি?'

কিরণ জলের বাটিতে আঙুলে আঙুল ঘ'ষে হাত পরিষ্কার করলো। রুমালে মুছে বললো, 'মায়েদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, আর স্ত্রীরা—তাঁরা সকলকে খুশি রেখে চলবেন—তোমাকে ছাড়া। ছাখো-না, অসুখও এমন-কিছু না, বাচ্চার মা-ও ভালো আছে—আমার একলা যাবার কি কোনো মানে হয়? কিন্তু না যদি যাই—' কিরণ মাথা নাড়লো, ঠাণ্ডা-হ'য়ে-যাওয়া চা-টা এক ঢোঁকে গিলে কথা শেষ করলো, 'বেশ আছো হে, বেশ আছো!'

সত্যেন একটু পরে বললো, 'তোমার হয়েছে?'

'হ্যাঁ—চলো। কেকটা তো খেলেই না, দেখছি—বিল কিন্তু আমি।' কিরণ বিল মিটিয়ে উঠলো, আস্তিন সরিয়ে সোনার কব্জিঘড়ি দেখলো। তার চোখের ভাব বদলে গেলো একটু, আপশোষের ছোট্ট আওয়াজ বেরোলো।

সত্যেন বললো, 'ওটা কিন্তু চোখেই পড়বে না কারো, যদি-না তুমি দেখিয়ে দাও।'

'হ্যাঃ!' কিরণ সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো, ন'ড়ে-চ'ড়ে বললো, 'আর কাচালে তো উঠেই যাবে।'

'হ্যাঁ, কাচালে নিশ্চয়ই উঠবে,' সত্যেন আগে রাস্তায় নামলো। 'তুমি-তো এখন ক্রীক রো?'

'আর বলো কেন!' কিরণের গালে আবার হাসির ভাঁজ

পড়লো। চৌরঙ্গি পার হ'তে-হ'তে বললো, 'তা তোমার খবর তো কিছুই শোনা হ'লো না। সেই মেস-এই—?'

• বেদম আওয়াজে একটা লরি গেলো; জবাব দেবার দরকার হ'লো না।

'বেশ লাগলো তোমার সঙ্গে দেখা হ'য়ে,' কিরণ কথা চালালো। 'এসো না একদিন আমার ওখানে—মনে আছে তো সর্দার শঙ্কর রোড?—কালই এসো না, অনীতাও খুশি হবে খুব! এসে চা খাবে বিকেলবেলা, ঠিক?'

ফুটপাতে উঠে সত্যেন বললো, 'খুব সুখের কথা, কিন্তু আমি আজ রাঁচি চ'লে যাচ্ছি।'

'রাঁচি যাচ্ছো? তা যাবেই-বা না কেন—স্বাধীন মানুষ তুমি—আর আমরা এদিকে—এই-যে তিন নম্বর বাস্। তাহ'লে ফিরে এসে—মনে থাকবে তো? আচ্ছা—' কিরণ তাড়াতাড়ি বাস্-এ উঠে পড়লো, জানলায় হাত নেড়ে বিদায় নিলো আর-একবার।

বাস্টা চ'লে গেলো, সত্যেন দাঁড়িয়ে থাকলো সেখানেই।—দিন ঢলেছে; পশ্চিম-খোলা চৌরঙ্গি সোনার পাতের মতো জ্বলজ্বলে, এক-একটা দোকানের কাচের জানলায় রোদ ঠিকরে চোখ ধাঁধিঁয়ে দিচ্ছে। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো গাড়ির স্রোত, একটার পর একটা বাস্-এর দাঁড়ানো, চ'লে যাওয়া। রোদের রং ঘন হ'লো, ল্যাম্পপোস্টের ট্যারচা ছায়া ফুটপাত পেরিয়ে ফ্যাকাশে হ'য়ে দোকানের সিঁড়িতে উঠলো। সত্যেন ফিরলো ট্র্যাম-স্টপের দিকে, পশ্চিমে মুখ ক'রে দাঁড়ালো। সবুজ ছড়িয়ে আছে ময়দান, সোনালি; ঘাস, গাছ, রাস্তা, বেঞ্চি, বাচ্চাদের

খেলা, পাথরের মূর্তি, সব নিয়ে সোনালি ; কমলারঙের, লালচে ; দূরে আবছা ঢিপির মতো ফোর্টটাকে স্পষ্ট দেখা গেলো পলকে ; ইডেন-গার্ডেনের দিকটা সবুজ থেকে নীলচে হ'লো। সত্যেন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো একটার পর একটা ট্র্যামের দাঁড়ানো, চ'লে যাওয়া। আয়ারা আড্ডা ছেড়ে উঠলো, বিলেতি বাচ্চাদের ঘরে ফেরা শুরু হ'লো, দূরে একটি মূর্তির কালো পাথরে হঠাৎ রক্ত-রঙের রোদ পড়লো। কক্ক শব্দ উঠলো তার মাথার উপর, পাখি উড়ে এসে বসলো সামনের গাছটায়। সত্যেন ট্র্যামে উঠে পড়লো।

'ছোটোমাসী, যাবে না ?'

'হ্যাঁ, চলো।'

'চলো না !'

স্বাতী বললো, 'চলো।'

তাতা বললো, 'কখন থেকে চলো চলো বলছো ! সন্ধে হ'য়ে গেলো না এদিকে ?'

শ্বেতা বললো, 'আঃ ! কেন বিরক্ত করিস ছোটোমাসিকে।'

আতা ঠোঁট ফুলিয়ে বললো, 'বা রে ! ছোটোমাসিই তো বলছিলো কাল—'

স্বাতী শাড়িটা ঘুরিয়ে প'রে নিলো, চুলে চিরুনি ছোঁওয়ালো, দু-জনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

'আজ চিলড্রেন্স পার্কে, ছোটোমাসি !'

স্বাতী বললো, 'আজ চলো ঐ মাঠটায়।'

'না, ছোটোমাসি—'

'একটা শিউলি গাছ আছে ওখানে। বেশ ফুল কুড়োবে।'

'ওঃ, শিউলি! কত শিউলি আমাদের মৈমনশিঙে! শিউলি দিয়ে কি হবে!'

'কী দিয়েই বা কী হবে তাহ'লে?' তাতার কথা উড়িয়ে দিলো আতা। 'আমার খুব ফুল কুড়োতে ভালো লাগে। চলো!'

ছোটোমাসির মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে তাতা বললো, 'আমি অনেক বেশি কুড়োবো দিদির চেয়ে—দেখো! একটু জোরে হাঁটো, ছোটোমাসি।

দুই বোনঝিকে দু-পাশে নিয়ে স্বাতী মাঠে এলো। মাঠ আর নেই, পাড়া হ'য়ে গেছে। লাল শুড়কির রাস্তা, ইলেকট্রিকের তার, টাটকা-রং-করা ছোটো-ছোটো বাড়ি; কোনোটা এখনো হচ্ছে, কোনোটা শেষ হ'য়েও খালি, কোনোটায় শেষ না-হ'তেই লোক এসে গেছে; আর তার সেই অনুকূল-কাকার বাড়িটার—ভাড়াটে আছে সেখানে—বাইরের শাদা রঙে কালছে ধরেছে এর মধ্যেই। না, মাঠ নেই, তবু মাঝে-মাঝে ফাঁকা, আর একেবারে পশ্চিমটায় খানিকটা মাঠ আছে এখনো। জায়গাটা কেমন ছিলো আগে, তিন বছর আগে? কিন্তু এটাই-যে সে-জায়গা তা আর মনে হ'লো না স্বাতীর: সেই মস্ত মাঠ, ঘন গাছ—বাড়ির জানলা দিয়েই দেখতে পেতো তখন—সে-সব বদলে-বদলে এখন এই হয়েছে তা যেন ঠিক না, সে-সবও আছে, অন্য কোথাও আছে, চিরকাল থাকবে সেখানে। নিজের পাড়ায় নিজেকে তার আগন্তুক লাগলো, শুড়কির রাস্তা পার হ'লো তাড়াতাড়ি, বাড়িগুলির দিকে

আর তাকালো না ; পশ্চিমের এবড়োখেবড়ো মরা ঘাসের মাঠে এসে দাঁড়ালো।

'কই, ছোটোমাসি, শিউলি গাছ ?'

'এই-যে।'

'ও মা, এ—ই ! দিদি, আমাদের সেই পুকুর-পাড়ের শিউলি গাছটা ! কত্ত বড়ো !'

আতা সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'মোটেও না ! মোটেও খুব বেশি বড়ো না !'

'বড়ো না ! ছাখো দিদি—'

স্বাতী বললো, 'ঐ ছাখো ফুল প'ড়ে আছে।'

'কই ?'

'খুঁজলেই পাবে।'

'ছোটোমাসি, তুমি তুলবে না আমাদের সঙ্গে ?'

'আমি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকি ; দেখি তোমরা কে কত আনতে পারো।'

স্বাতী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো—কখনো আতা-তাতাকে, কখনো অন্য সব দিকে। জায়গাটা সুন্দর না, বরং উল্টো, কিন্তু তারও কেমন-একটা ছবি হয়েছে। একটা দিক গাছপালায় কালো,আবার আর-একদিকে রসা রোডের উঁচু-উঁচু ছাতও দেখা যাচ্ছে, আর ঐ কোণে কয়েকটা শুপুরি গাছের ছাত-ছাড়ানো ঝাঁকড়া-মাথায় সূর্যাস্তের একটু রং আটকে আছে এখনো। স্বাতীর চোখের সামনে একটা দিন, আরো-একটা দিন আস্তে-আস্তে ম'রে গেলো। জায়গাটার চেহারা বদলে গেলো হঠাৎ ; আলো নেই;

কেউ নেই ; শূন্য। আশ্বিন মাসে যেমন হয়, সারাদিনের ঝকঝকে গরমের পর শীত-করা কুয়াশার সন্ধ্যা দুঃখী মুখে পাশে এসে দাঁড়ালো। স্বাতী ডাকলো, 'আতা! তাতা!'

'যা—ই।'

স্বাতী ওদের কাছে গিয়ে বললো, 'বাড়ি এবার।'

'না ছোটোমাসি, আর-একটু,' ব'লে আবার অন্য দিকে স'রে গেলো ওরা।

স্বাতী আবার একটু পরে ডাকলো ওদের। আতা আগে এসে বললো, 'বেশি ফুল নেই ছোটোমাসি, এই ক-টা মোটে পেলাম! আর যা ধুলো আর ময়লা!'

তাতা তক্ষুনি ছুটে এসে বললো, 'এই ছাখো আমি বেশি পেয়েছি! কেমন, বেশি না?'

'অনে—ক বেশি!' কিন্তু স্বাতীর গলায় কিশোর উৎসাহ ঠিক ফুটলো না।

'কোথায় রাখি, ছোটোমাসি, ফুলগুলি?'

আতা বললো, 'আমাকে দে। আঁচলে বেঁধে রাখি সব।'

'না! আমারটা তুমি রাখো, ছোটোমাসি।'

স্বাতী হাতের মুঠোয় ফুল নিয়ে বললো, 'চলো।'

আতা বললো, 'বাড়ি তো ওদিকে।'

'চলো একটু ঘুরেই যাই।'

'হ্যাঁ—তা-ই ভালো! জানো ছোটোমাসি, এখানকার শিউলি কেমন রোগা-রোগা। আর আমাদের সেই পুকুরপাড়ের শিউলি-তলা—ঈশ! তুমি যদি একবার দেখতে, ছোটোমাসি!'

মাসির হাত ধ'রে আতা তাড়াতাড়ি বললো, 'তুমি বুঝি ফুল খুব ভালোবাসো। আচ্ছা, কোন ফুল তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে ?'

'আমি জানি !' স্বাতীর অন্য পাশে ব'লে উঠলো আতা।

'তুমি চুপ করো তো দিদি ! বলো ছোটোমাসি, কোন ফুল ?'

'কোন ফুল ?···কোন ফুল ?···' স্বাতী হঠাৎ থামলো : শুধু কথায় না, চলাতেও থামলো। একটা দূর আওয়াজ শোনা গেলো, গুমগুম। আতা তাতাও থামলো।

আতা বললো, 'কী হ'লো ?'

'শুনছো ?'

'ও-তো ট্রেন !' একটু পরে আতা আবার বললো, 'তাতে কী ?'

তাতা বললো, 'ট্রেনের শব্দ তো রোজ শুনি আমরা !'

আতা বললো, 'রাস্তায় বেরোলে দেখাও যায় কত সময়। টালিগঞ্জের ব্রিজটা কী মজার ! নিচে ট্র্যাম, উপরে রেলগাড়ি ! একদিন রেল-লাইনে উঠবে, ছোটোমাসি ?'

স্বাতী কথা বললো না, নড়লো না। নড়তে সে পারে না—তার তা-ই মনে হ'লো—যতক্ষণ না শব্দটা মিলিয়ে যায়। হাতের মুঠো শক্ত হ'লো তার : ভাবলো, ফুলগুলো নষ্ট হচ্ছে। শব্দের একটা প্যাঁচানো স্থতো লম্বা হ'য়ে খুলতে-খুলতে ফুরিয়ে গেলো। স্বাতী বুঝলো তার চোখে জল আসছে—আসতে দিলো, অন্ধকার হ'য়ে গেছে ততক্ষণে।

'চলো, ছোটোমাসি !'

স্বাতী আবার হাঁটলো, তাড়াতাড়ি এবার, কিন্তু বাড়ির—সেই বাড়ির—আরো কাছে এসে মৃদু, আরো মৃদু হ'লো তার চলা।

দরজা বন্ধ, ঘর অন্ধকার। উপরতলায় আলো জ্বলছে ; একতলাটা বন্ধ, অন্ধকার।

'উঃ!' তাতা চেঁচিয়ে উঠলো। 'দিদি আমার পা মাড়িয়ে দিলো!'

'তুই অমন পায়ে-পায়ে হাঁটিস কেন?'

'শোনো ছোটোমাসি—' তাতা আখুটে গলায় আরম্ভ করলো, কিন্তু মাসির মুখ দেখে থেমে গেলো। একটু পরে একেবারে অন্য স্বরে বললো, 'একটা কথা শোনো, ছোটোমাসি।'

মাসি তাকালো তার দিকে।

তাতা ফিশফিশ ক'রে বললো, 'এইটে তোমার সত্যেনবাবুর বাড়ি না?'

স্বাতী মাথা নাড়লো।

'আছেন এখন বাড়িতে?'

আতা হেসে উঠলো, 'কেন? তুই যাবি নাকি?'

দিদির এই একটা কথা তাতা বিনা-জবাবে ছেড়ে দিলো ; উপরের দিকে তাকিয়ে তেমনি ফিশফিশ গলায় বললো, 'আছেন বোধহয়।'

আতা বললো, 'দূর বোকা! উপরে তো অন্যেরা থাকে। আর ফিশফিশ করছিস কেন ও-রকম? যেন কী-একটা ভীষণ গোপন কথা!' আতা আবার হাসলো।

'তুমি চুপ করো-তো দিদি!' তাতা বেশ গলা চড়ালো এবার।

'চল এখন!' আতা তাড়া দিল বোনকে। 'রাস্তার মধ্যে আর দাঁড়িয়ে থাকতে হবে-না!'

বাকি পথটুকু তর্ক করতে-করতে এলো দু-বোনে। স্বাতী

তাদের গলা শুনলো, একটা কথা বুঝলো না। হঠাৎ মনে পড়লো : ফুলগুলো ? আছে হাতে। বন্ধ, অন্ধকার। ট্রেন কখন ? হাতটা ঘামছে। ফুলগুলি বাঁ হাতে নেবো ?

আতা তাতার গলা থেমে গেলো হঠাৎ। স্বাতীর কাপড়ে টান পড়লো।

'কী ?'

আগের চেয়েও ফিশফিশ গলায় আতা বললো, 'ছোটোমাসি—'

স্বাতী তাকিয়ে দেখলো, সামনেই বাড়ি। আর সিঁড়ির ধাপে দরজার ধারে সত্যেন। দরজায় আঙুলের টোকা পড়লো তিনবার।

আতা নিচু গলায় বল্লো, 'কী রে। কেউ শুনতে পায় না ? আমি যাই ওদিক দিয়ে—'

'আম্মিও !' তাতা ছুটলো আতার পিছনে। সত্যেন ফিরে তাকালো। স্বাতী তিনটি সিঁড়ি উঠলো।

সত্যেন বললো, 'আবার এলাম।'

স্বাতী কিছু বললো না।

সত্যেন বললো, 'এলাম মানে—মানে আসতেই হ'লো।'

স্বাতী কিছু বললো না। একটু চুপ ক'রে থেকে সত্যেন আবার বললো, 'আসতেই হ'লো। না-এসে পারলাম না। তা—আমার বোধহয় সময় হ'লো এদিকে।—আচ্ছা—'

স্বাতী বললো, 'না।' হাত থেকে কয়েকটা শিউলি তার পায়ের কাছে পড়লো। আবার বললো, 'না। যেয়ো না।' ভিতর থেকে দরজা খুলে গেলো।

৫

শীতের ছোটো দিন দেখতে-দেখতে ফুরোলো, সন্ধ্যা নামলো। দুটি ঘরের মাঝখানকার দরজায় দাঁড়িয়ে তরুলতা বললেন, 'সতু, এবার তৈরি হ'য়ে নে।'

সত্যেন হাসলো। আজ দিনের মধ্যে যতবার মামিমা তাকে 'সতু' ব'লে ডেকেছেন, ততবার ঐ একটু হাসি ফুটেছে তার ঠোঁটে ; ঠাট্টার হাসি, আবার যেন অন্য কিছুরও। ভাবতে কেমন মজাই লাগে যে তাকে 'তুই' বলবার, 'সতু' ব'লে ডাকবার এখন এই মামিমা ছাড়া বলতে গেলে কেউ নেই।

সত্যেন বললো, 'তৈরি আবার কী।'

কিরণ বক্সি গম্ভীর চোখে তাকালো।—'সাজবে না ?'

'সাজবো কেন ? আর সেজেই তো আছি।'

'এই ?' সত্যেনের মুখ থেকে নিচের দিকে চোখ নামিয়ে আনলো কিরণ, আবার উপরে তুলে বললো, 'তুমি এখনো আলোতে ঠোঙা পরাওনি দেখছি।'

'কী হবে ?'

'আমিও তাই বলি—কী হবে! কিন্তু আমাদের পাড়ায় এ. আর. পি-র ছোঁড়াগুলোর যা তড়পানি! না হে,' কিরণ আর-একবার উপরদিকে তাকালো, 'আলোটা বাইরে যাচ্ছে। জানলাটা বরং ভেজিয়ে দিই।'

'আরে বোসো, বোসো।'

কিরণ উঠে জানলা ভেজিয়ে দিলো। ফিরে এসে একটু নিচু গলায় বললো, 'জাপানিরা নাকি বর্মায় ঢুকে গেছে, রেঙ্গুনে বোমাও পড়েছে কাল।'

কিরণ প্রশ্নের স্থরে কথা শেষ করলো, তাই সত্যেনকে বলতে হ'লো—'তা হবে।'

'স্থবিধে ঠেকছে না ব্যাপারটা।' কিরণ ছোট্ট ক'রে বললো, 'বর্মা গেলো।'

তা গেলোই বা, সত্যেন ভাবলো। কী এসে যায়, কী আছে সেখানে? বর্মায় একমাত্র মূল্যবান ছিলো স্বাতীর মেজদি, তিনি তো কলকাতাতেই—হেমাঙ্গবাবুও, যা ভাবনাই গেছে ক-দিন তাঁর জন্য —যাক, এসে গেছেন। তাহ'লে আর বর্মার জন্য ভাবনার কী রইলো?

অখিল ভিতর থেকে এসে সত্যেনের পাশের চেয়ারটায় রাখলো একটি পাট-না-ভাঙা সিল্কের পাঞ্জাবি। সত্যেন তাকিয়ে বললো, 'কী?'

'মা তোমাকে এটা পরতে বললেন,' ব'লে অখিল হাসলো। আঁকাবাঁকা তার দাঁতের সারি, মুখটা রোগা, কিন্তু—সত্যেন ভাবলো—চোখ দুটি ভারি সজীব তো, আগে তো দেখিনি! এই অখিলই একদিন এসেছিলো দশটা টাকার জন্য—আজ কত অন্য রকম দেখাচ্ছে। একটু তাকিয়ে থেকে বললো, 'খুব তো টেড়ি কেটেছো, অখিল।'

আলতো ক'রে চুলে হাত ছুঁইয়ে অখিল ঘাড় কাৎ ক'রে লজ্জা পেলো। কিরণ বললো, 'সত্যেন নখ কেটেছো?'

আঙুলের দিকে তাকাতে গিয়ে সত্যেনের চোখে পড়লো ডান হাতের কব্জিতে বাঁধা হলদে সুতো। এটা নাকি পরতেই হবে!

একটু পরে কিরণ বললো, 'আমি ভাবছি গরদের জোড় প'রে কেমন দেখাবে তোমাকে।'

'গরদের জোড় মানে?'

'বাঃ, কী প'রে বিয়ে হয় জানো না?'

'সে-সব নিয়ম আজকালও আছে নাকি?'

কিরণ মিটিমিটি হাসতে লাগলো, যেন একটা চমৎকার প্রতিশোধ নিচ্ছে সত্যেনের উপর। আস্তে-আস্তে বললো, 'শোনো: চারদিকে লোক, অচেনা লোক, মেয়েরা—সব চোখ তোমার উপর—তার মধ্যে তুমি মূর্তিমান দাঁড়িয়ে আছো। দু-জন লোক দু-দিকে একটা কাপড় ধ'রে তোমাকে ঘিরে দিলো, আর তুমি যথাসম্ভব গাম্ভীর্য বজায় রেখে কাপড় ছেড়ে নিলে। ধুতিটা একটু ছোটোই থাকে সাধারণত, ঠিক পা পর্যন্ত পড়ে না, আর উড়ুনিটা—তা তুমি ছিপছিপে আছো, তুমি বেশ ঢেকে-ঢুকেই বসতে পারবে।'

সত্যেন ব'লে উঠলো, 'অসম্ভব!'

'বললে হবে কী; সুতি প'রে তো আর বিয়ে হয় না।'

'হয় না?' সত্যেন আঁৎকানো চোখে এদিক-ওদিক তাকালো। খপ ক'রে সিল্কের পাঞ্জাবিটা তুলে নিয়ে বললো, 'ঠিক! এইটে প'রে নিই, তাহ'লেই হবে।'

কিরণ অটলভাবে বললো, 'জামা পরাই বারণ।'

'পাগল নাকি! ভাগ্যিশ এটা ছিলো, আর মামিমাও বুদ্ধি ক'রে—' চকিতে জামা বদলে নিলো সত্যেন, রুমাল পকেটে

নিয়ে বসলো, 'কত হাঙ্গামা অনর্থক! আমি ওঁদের এত ক'রে বললাম রেজেস্ট্রি ক'রে বিয়ে হোক; ওঁরা কানেই তুললেন না।'

কিরণ হেসে বললো, 'কেন তুলবেন? তারপর তুমি যদি একদিন ব'লে বসো, "ব্যস! থাকো এবার। আমি চললাম," তখন?'

কথাটা বুঝতে একটু দেরি হ'লো সত্যেনের। কিন্তু বুঝতে পেরেই উত্তর দিলো, 'সেইজন্যই তো! যাবার কোনো উপায়ই যদি না থাকে, তাহ'লে আর না-যাবার মূল্য কী?'

'উপায় সবটাতেই আছে,' কিরণ হালকাভাবে বললো, 'আমরা উকিলরা নয় তো আছি কী করতে?'

সত্যেন কথা বললো না। তার মনে পড়লো স্বাতীর কাছেও সে এ-কথা বলেছিলো; একবার না, দু-বারও না, কয়েকবার। স্বাতী প্রথমে এমন ভাব করেছে যেন শোনেইনি, তারপর 'কী—!' ব'লে ভুরু কুঁচকেছে, আর তারপর একদিন জ্বলজ্বলে চোখে ব'লে উঠলো, 'কক্‌খনো আর এ-কথা মুখে আনবে না!'

'কেন?'

'কেন আবার? তুমি কি কখনো ছেড়ে যাবে আমাকে?'

'না। আর সেজন্যই ইচ্ছা ছাড়া আর বাধ্যতা চাই না।'

'তুমি না চাইতে পারো, আমি চাই!'

'তুমি বাধ্যতা চাও? স্বাধীনতা চাও না?'

'না। তোমাকে ছেড়ে যাবার স্বাধীনতা আমি চাই না!'

'কেন?' এর পরেও সত্যেন বলেছিলো, 'নিজের উপর যথেষ্ট বিশ্বাস নেই তোমার?'

'না-থাকলে তো তোমার মতোই অনুষ্ঠানকে ডরাতাম!' ব'লে

স্বাতী একবার তাকিয়েছিলো তার দিকে, রানীর মতো সেই দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্য নিজেকে একটু ছোটো লেগেছিলো সত্যেনের।

বাইরে থেকে নিখিল ঘরে এলো, গায়ে গরম কাপড়ের খয়েরি শার্ট, হাতে এক পয়সা দামের টেলিগ্রাফ ভাঁজ-করা। ঐ শার্টটা দেখে সত্যেনের ভালো লাগলো, তার চেনা ওটা, কত দেখেছে মামার গায়ে—আর দেখতেও অনেকটা মামার মতোই—বেশ ছেলে হয়েছে নিখিল।

কিরণ বললো, 'খবর আছে নাকি কিছু?'

'কিছু না! সকালের কথাই ঘুরিয়ে লিখেছে,' নিখিল কাগজটা ছুঁড়ে ফেললো টেবিলের উপর।

কিরণ সেটা তুলে নিয়ে তাকালো। 'তিন দিনে পনেরো হাজার লোক—'

'আরো বেশি হবে,' বললো নিখিল। 'ট্রেনে আর ওঠা যাচ্ছে না—দেহাতিরা সব হেঁটে-হেঁটেই ভাগল বা!'

'ওদের আর দোষ কী! ভালো-ভালো ভদ্রলোকেরাই—' কিরণ কথা শেষ করলো না, ভাবলো তার শ্বশুরের কথা: ভদ্রলোক এর মধ্যেই একটা বাড়ি নিয়ে ফেলেছেন রামপুরহাটে—মেয়েদের সব পাঠিয়ে দেবেন—অনীতাকেও নাকি যেতেই হবে সেখানে! কী অন্যায় জেদ!

'হ্যাঁ—রাস্তায় আর কথাই নেই এ ছাড়া!' নিখিল হাসলো। 'এইমাত্র শুনলাম একজন বলছে—'

'সত্যি, কী যে হবে!' কিরণ সত্যেনের দিকে চোখ ফেরালো। 'তোমার কী মনে হয়?'

সত্যেন অমায়িকভাবে বললো, 'কী আবার হবে। তুমি বুঝি ও-বাড়ি থেকে এলে, নিখিল?'

'হ্যাঁ। তোমাকে নিতে আসছেন ওঁরা।'

সত্যেনের হাসি পেলো। আজ বুঝি আর নিতে না-এলে যেতে পারি না? কী-সব নিয়ম! দিদিরা তো কবে থেকেই তাকে তাড়াচ্ছেন—এখন আর দেখাশোনা না, আর একেবারে বিয়ের সময়! আর তারপর কাল মেজদি—না, সেজদি—সরস্বতী তো সেজদিরই নাম?—খুব গম্ভীরভাবে বললেন—'সত্যেন, কাল কিন্তু তুমি আর এসো না—বুঝেছো তো?'—আর তাই-তো আজ সকাল থেকেই দিনটা ঝাপসা; এই দু-মাসের মধ্যে আজই প্রথম, যেদিন সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত স্বাতীর সঙ্গে একবারও তার দেখা হ'লো না।

তরুলতা কুলো হাতে ঘরে এলেন, মেঝেতে কুলো নামিয়ে সামনে আলপনা-আঁকা পিঁড়ি পেতে ডাকলেন, 'সতু, আয়।'

'আবার কী?' সত্যেন ভুরু কুঁচকালো।

'আয়। বসতে হয় এবার।'

'যত বাজে।'

'ও-সব চলবে না হে!' কিরণ বললো। 'যে যা বলবে তা-ই করতে হবে আজ!'

তা-ই তো করছি, সত্যেন ভাবলো, আমার আমিত্ব আর কিছুই থাকলো না। সকালে হ'য়ে গেলো এক প্রস্থ—মামিমা ছাড়লেন না কিছুতেই: পুরুৎ এলো, টিকিওলা পুজুরি বামুন, কলাপাতার ঠোঙা, চালকলা—উঃ!—দু-ঘণ্টা ব'সে-ব'সে কী-সব বিড়বিড়—আবার প্রপিতামহীর নাম জিগেস করে!—যেন

প্রপিতামহীর নাম কোনো জন্মে কেউ শুনেছে!—প্রহসন! কিন্তু এই প্রহসনের পরপারেই বাস্তব; এ-সব মিথ্যা তাদের খোলশ ছাড়াতে-ছাড়াতেই শেষ সত্যে পৌঁছবে। সে কি জানতো এই সত্য, যদি সে রাঁচি চলে যেতো সেদিন, দু-মাস আগের প্রথম কুয়াশার সেই সন্ধ্যায়? পৃথিবীর সব শব্দ থেমে গিয়েছিলো তখন, যখন বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে স্বাতী বলেছিলো, অনেক কথা বলেছে স্বাতী, সে-ও বলেছে; মনে হয় যেন মনের সব কথা, জীবনের সব কথা; মনে হয়েছিলো জীবন ভ'রে বললেও ফুরোবে না, কিন্তু ফুরোলো, আর কথা নেই, দু-জনে আবার প্রথম থেকে আরম্ভ না-করলে আর কথা নেই। এই সেই আরম্ভ।

'ব'সে রইলে যে?' কিরণ তাড়া দিলো, 'ওঠো।'

সত্যেন উঠলো, চিত্রি-করা পিঁড়িতে বসলো। সামনে কুলোতে প্রদীপ জ্বলছে, ধানদূর্বা কী-কী সব সাজানো। মামিমা উব-হাঁটু হ'য়ে তার সামনে বসলেন, তার মাথায় হাত রেখে, ঠোঁট নেড়ে কিন্তু আওয়াজ না-ক'রে কী বললেন, হাত সরিয়ে এনে বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে চন্দনের ফোঁটা দিলেন তার কপালে।

আমিও দিই একটু—' কিরণ এগিয়ে এসে নিচু হ'লো।

'না—না—' দু-হাত তুলে কিরণকে ঠেকাতে গেলো সত্যেন।

'রাখো তো!' কিরণ মোটা আঙুলে বেশ টিপে-টিপে চন্দন দিলো সত্যেনের কপালে। 'এই একদিনই তো বিয়ে করবে জীবনে!' স'রে এসে বললো, 'বেশ দেখাচ্ছে।'

তরুলতা ধানদূর্বা দিলেন তার মাথায়, প্রদীপসুদ্ধু কুলোটা একবার কপালে ঠেকালেন, তারপর হঠাৎ তার ডান হাতটি টেনে

নিয়ে কড়ে আঙুলে ছোট্ট কামড় দিলেন। সত্যেন তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো।

কিরণ বললো, 'বাঃ, প্রণাম করলে না মামিমাকে ?'

'থাক, থাক,' তরুলতা কুলো সরালেন, পিঁড়ি তুললেন।

'চটচট করছে,' সত্যেন আঙুল তুললো কপালের দিকে।

'না, না, মুছো না! ও-থাক—বোঝা যাচ্ছে না। আরে এতেই এ-রকম করছো তুমি, আর আমাকে যা শাস্তি করেছিলেন কাকিমারা!' কিরণ হাসলো তরুলতার দিকে তাকিয়ে।

'আমাদের শ্রীমানের সবটাতেই আপত্তি!'—তরুলতা ঘরের চেয়ার ঠিক করলেন—'তক্তাপোশের চাদরটা টান ক'রে দে তো, নিখিল।'

'বোঝা যাচ্ছে না ঠিক তো?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করলো সত্যেন।

'একটু গেলোই বা। চন্দনের ফোঁটা তো ভালো- -যখন টোপর প'রে—ইশ, একেবারে সং সাজিয়ে ছাড়ে হে!' কিরণ ফুর্তিসে হেসে উঠলো।

ঘরের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে তরুলতা বললেন, 'ত্যাখ তো নিখিল, মহেশ পান আনতে গিয়ে কোথায় লেগে রইলো।'

'আমি দেখছি—' অখিল ছুটে বেরোলো ;

'আর যে কেউ এলো না এখনো?' কিরণ এবার রাস্তার দিকে তাকালো। কোনো উত্তর না-পেয়ে আবার বললো, 'বন্ধুবান্ধব আর-কেউ এলো না ?'

'বলেছে নাকি কাউকে? ওর এক কাকা আছেন কলকাতায়, বাবার সাক্ষাৎ জ্যাঠতুতো ভাই—কত বললাম আমি তাঁকে খবর

দিতে—শুনছো কি কথা! আমি একা আর কত পারি!' তক্তাপোশের টান-করা চাদরটায় আরো দুটো টান দিয়ে তরুলতা পাশের ঘরে চ'লে গেলেন।

একা আর কত পারি! কতবার শুনলো সত্যেন! কিন্তু কমও তো পারেন না—ঐ টেবিলটাই কতবার গোছাবেন দিনের মধ্যে—এত গোছাবার কী-যে আছে! সত্যেন একবার তাকালো ঘরের চারদিকে, সব পরিষ্কার ফিটফাট, নিখুঁতরকম গুছোনো—এমনকি শেলফ দুটোয় একটাও বই কাৎ হ'য়ে নেই। হঠাৎ মনে হ'লো সে অন্য কোথাও এসেছে—আর মিথ্যেই বা কী, তার নিজের ঘর তো নেই আর। মামিমাকে নিয়ে আসতে হ'লো দু-দিন আগেই; তারপরেই অন্য এক জগৎ জেগে উঠলো এই ঘরে। লোকজন, যাওয়া-আসা, লোকজন। আবার ফাঁকা হ'লেও বিষম ফাঁকা। আজ দুপুরবেলা স্বাতীদের ফাঁকা বাড়িটাতেই একবার গিয়েছিলো সে—কেউ ছিলো না তখন—একটু অবাক লেগেছিলো স্বাতীকে ওখানে দেখতে না-পেয়ে। ডালিমের খাটটায় শুয়ে-শুয়ে সময় কাটিয়েছিলো খানিকটা।

'সত্যি? কাউকে বলোনি? কলেজের কোলীগরা?...তোমার সাহিত্যিকরা?...কাউকে না?...বাঃ!'

কিরণের আওয়াজের উত্তরে সত্যেন শুধু আবছা হাসলো।

'না, না, এটা ভালো করোনি। আগে জানলে আমিই ব'লে দিতাম কয়েকজনকে—ভবেশ চন্দ আর ফণী ভটচাযকে তো নিশ্চয়ই!'

সত্যেন বললো, 'তোমার একটু একা লাগছে বুঝতে পারছি।'

'সেজন্য বলছি না। আর কাউকে না-ব'লে আমাকেই শুধু বলেছো, এটা আমার পক্ষে তো গৌরবেরই।' কিরণ একটু অন্য রকম তাকালো সত্যেনের দিকে।

সত্যেন সলজ্জ চোখ সরালো। দৈবাৎ সেদিন চায়ের দোকানে দেখা! তা ভালেই হয়েছিলো, তবু একজনকে মনে পড়লো এই সময়ে। আর কিরণ তো ভালোই—হ্যাঁ, বেশ ভালো, তখন যাদের সঙ্গে আমি বেশি মিশতাম তাদের অনেকের চেয়েই আসলে ভালো। ছাত্রজীবনে কিরণকে সে তুচ্ছ করেছে, তাকে নিয়ে অন্যদের তামাশাতেও যোগ দিয়েছে, সে-সব মনে ক'রে সত্যেনের অনুশোচনা হ'লো।

'সতুদা, ওঁরা আসছেন!' অখিল ছুটে এলো। 'ম-স্ত গাড়িটা!' আবার ছুটে গেলো দরজার বাইরে।

একটু চুপ। সত্যেন দেখলো, বেশ ভারিক্কি চেহারা ক'রে নিখিল দাঁড়িয়েছে দরজার ধারে, মামিমা তার পিছনে, চেয়ারে কিরণ ন'ড়ে-চ'ড়ে সোজা হ'য়ে বসলো। কেমন ক'রে কেটে গেলো দিনটা! একটা দিন সে কিছু করলো না, ভাবলো না, এতদিনের উথালপাথালের পরে আজ তার অনুভূতি নেই, স্বাতীর কথা বেশ ভাবতে পারলো বুকের মধ্যে কেঁপে না-উঠে। আজ সকাল থেকে আবেগ তাকে ছেড়ে গেছে, প্রতীক্ষা ম'রে গেছে, শুধু একটা অস্তিত্ব ভেসে চলেছে সময়ের স্রোতের উপর অন্তর। দু-জনের জগৎ ছিলো এতদিন, দু-জনের নিজস্ব; এখন অন্যদের জগৎ, সকলের, কারোরই না—এখন বিজ্ঞাপন, ব্যাকরণ, ব্যবস্থা।—মিথ্যা সব!

'কী?' আস্তে একটি হাত পড়লো তার কাঁধে।

সত্যেন মুখ তুলে অরুণবাবুর সুশ্রী মুখটা দেখতে পেলো। একটু-কালো রংটা—পুরুষের পক্ষে ওটাই ঠিক রং—উড়ু-উড়ু চুলের কালো রং কানের কাছে ফিকে হচ্ছে, আর সেই ধোঁয়ারঙের উপর চশমার মোটা কালো ফ্রেমটা মানিয়েছে বেশ। এঁকে প্রথম দেখেই, শুধু চোখে দেখেই, ভালো লেগেছে তার—কথা ব'লে আরো—একটু লাজুক, কেমন আবছা ক'রে কথা বলেন, মিষ্টি শোনায়—আর প্রথম ক-বার 'আপনি' বলার পর তাকে 'তুমি' বললেন যখন!

অরুণবাবুর চশমার পিছনে বড়ো-দেখানো চোখে একবার চোখ রেখে সত্যেন বললো, 'কিরণ, ইনি—ইনি অরুণবাবু, আর—'

কিরণ হাসলো। 'থাক, থাক, ওতেই হবে। আপনি বসুন,' সত্যেনের হ'য়ে সেই ভদ্রতা করলো।

সত্যেনের পাশের চেয়ারটায় অরুণ বসলো। তরুলতা কাছে এসে জিগেস করলেন, 'আমাদের বৌমা কেমন আছেন?'

'আর বলবেন না!' অরুণ দু-চোখের কাছে দু-আঙুল ছড়িয়ে হাতটা মুখের উপর দিয়ে নামিয়ে আনলো।

'কাঁদছে খুব?'

'আমি এসে অবধি তো এ-ই দেখছি।'

'স্বয়ংবরা হ'য়েও এত কান্না?'

'আমিও তো তা-ই বলি! কিন্তু বললে কী হবে—কেঁদে-কেঁদে রোগা হ'য়ে গেলো।' মুহূর্তের জন্য অরুণের গলা অন্যরকম শোনালো, হাসির ভাবটাও মুছে গেলো মুখের।

তক্তাপোশে পা তুলে ব'সে হেমাঙ্গ তার মিহি গলায় বললো,

'শুনছো তো সত্যেন, সব কান্না কিন্তু পুষিয়ে দিতে হবে তোমাকে!'

'সেটা পুষিয়ে যাবে জেনেই তো অত কান্না!' বরপক্ষ সেজে তক্ষুনি জবাব দিলো কিরণ।

হেমাঙ্গর কথা শুনে সত্যেন একটু হেসেছিলো; কিরণের কথা শুনে আবার তা-ই করলো। এটা তার ইচ্ছার হাসি না, অনিচ্ছারও না, অনুপায়ের; আপাতত মুদ্রাদোষ হ'য়ে গেছে এটা। এখনকার মতো তার কোনো ইচ্ছা নেই, শক্তি নেই, সে থেমে আছে; তাকে ঘিরে অনেক কিছু হচ্ছে, কিন্তু সে কিছু ঘটাতে পারে না, ঠেকাতেও পারে না, সে শুধু দেখবে, শুনবে, আর মাঝে-মাঝে ঐ-রকম একটু না-হেসেই পারবে না। এখন আর শুনছেও না ভালো ক'রে; যাতে তার কোনো অংশ নেই, এ-রকম একটা দৃশ্যের মতো দেখছে মামিমার চলাফেরা; মিষ্টির থালা এনে-এনে প্রত্যেকের সামনে রাখছেন তিনি, মহেশ নিয়ে এলো ট্রেতে ক'রে অনেকগুলি জলের গ্লাশ—বাঃ, মহেশকে বেশ ফিটফাট দেখাচ্ছে তো আজ—আর অখিল পানের রেকাবি হাতে নিয়ে ঘরে এলো।

মামিমা দাঁড়ালেন কিরণের সামনে। 'একটু খাও।'

'আমি তো এসেই খেলাম।'

'যাবার সময় আবার খেতে হয়। ডালিম আর-কিছু—'

অরুণ ডালিমের দিকে তাকালো। 'ব'লে দেবো নাকি, ডালিম?'

দূরে দাঁড়িয়ে ডালিম লাল হ'লো।

'মেসোমশাই ডাকবে না কিছুতেই, সত্যেনদা ব'লে ডাকবে—এই নিয়ে ডালিম রোজ ঝগড়া করে তার মা-র সঙ্গে।'

'মেসোমশাই' কথাটা শুনে সত্যেন শিউরোলো, আর লাল-হওয়া মুখে অনেকখানি সপ্রতিভতা এনে ডালিম বললো, ' "মেসোমশাই"টা কী বিশ্রী—বুড়ো !'

'ঠিক বলেছো, ডালিম !' ব'লে উঠলো হেমাঙ্গ। 'আমরাই কি আর জন্ম থেকেই মেসোমশাই ছিলাম !' ব'লে চাঁদির ছোটো টাকে—এমন আর ছোটো কী—হাত রাখলো একবার।

এ-কথাটা শুনে হেমাঙ্গবাবুকে খুব ভালো লেগে গেলো সত্যেনের। হ্যাঁ—উনিও খুব ভালো, দেখতে একটু গম্ভীর, কথাও কম বলেন, কিন্তু বলেন বেশ। আর ডালিম—একেবারে টুকটুকে লাল হ'য়ে গেছে বেচারা—কী মিষ্টি দেখাচ্ছে !

তরুলতার দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে হেমাঙ্গ বললো, 'রাতারাতি এগারোজনের মেসোমশাই।'

সত্যেনের চোখের পাতা মিটমিট করলো, গায়ে পিন-টিন ফুটলে যেমন হয়, আর তরুলতা গম্ভীরভাবেই জবাব দিলেন, 'আপনাদের মতো বান্ধব পাওয়া ওর ভাগ্যই তো—তা আপনারাও রত্ন পেলেন।—ডালিম আর একটা সরের নাড়ু ?'

রাজি-হওয়া-হওয়া মুখে ডালিম তাকালো নিখিলের দিকে। নিখিল তার গাল দেখিয়ে বললো, 'পান খাচ্ছি।'

'ঠিক—পানই খাই !' ডালিম এমনভাবে বললো যেন মিষ্টির বদলে পান খাওয়াটা খুব নতুন আর আশ্চর্য প্রস্তাব ; পান তুলে নিয়ে মুখে দিলো।

মহেশ থালা-গেলাশ সরালো, অখিল বাঁ হাতে চুল চাপলো একবার, ডালিমের নিচের ঠোঁটে ঈষৎ লাল রং দেখা দিলো।

তরুলতা সত্যেনের সামনে এসে দাঁড়ালেন থালায় ক'রে ফুলের মালা নিয়ে। 'নে, সতু।'

'কী ?'

'প'রে নে।'

'মালা পরতে হবে ?' সত্যেন দু-হাত তুলে পিছিয়ে গেলো। 'না, না, কিছুতেই না, কিছুতেই পারবো না !'

'পারবো না কী-রকম ? আরে মালা ছাড়া যে বিয়েই হয় না ! এসো, এসো—' বৃথা ছটফটালো সত্যেন, কিরণ বক্সি জোর ক'রেই তাকে পরিয়ে দিলো মোটা, শাদা, গন্ধভরা রজনীগন্ধার মালা।

অরুণ তাকিয়ে বললো, 'বাঃ, বেশ দেখাচ্ছে। তা আপনিও নিন একটা।'

'আমি ? আচ্ছা !' কিরণ হাসলো, ছোটো একটি মালা তুলে হাতে জড়াতে গিয়ে থামলো, গোল ক'রে আস্তে পকেটে রাখলো রুমালের তলায়। অনীতাকে দিতে হবে রাত্রে।

সত্যেন এই ফাঁকে মালা খুলে ফেলছিলো গলা থেকে, কিরণ এবার হাঁ-হাঁ ক'রে পড়লো তার উপর। 'কী ছেলেমানুষি করো সব সময় ! রাখো !' এমন ধমক দিয়ে কথাটা বললো যে সত্যেন কেমন মিনিমুখে গলায় মালা নিয়েই দাঁড়িয়ে থাকলো চুপ করে। আরো মালা ছিলো থালায় ; অখিল নিলো, নিখিল নিজে নিয়ে ডালিমকেও দিলো। হঠাৎ সমস্তটা ঘর রজনীগন্ধার গন্ধে ভ'রে গেলো, আর যেন সেই গন্ধ ভালো ক'রে নেবার জন্য সকলেই চুপ ক'রে থাকলো একটুক্ষণ।

তারপর হেমাঙ্গ মুখে একটি ছোটো এলাচ দিয়ে বললো, 'এবার তাহ'লে—'

'হ্যাঁ, আর আড্ডা না। সত্যেন, চলো।' অরুণ কোঁচা ধরে উঠে পড়লো।

ডালিম এগিয়ে এলো তাড়াতাড়ি। 'ট্যাক্সি আনবো আর-একটা ?'

চারদিকে একবার পলকপাত ক'রে হেমাঙ্গ বললো, 'আর দিয়ে কী হবে ?'

গাড়ি দিয়েই বা কী হবে, সত্যেন ভাবলো। এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যায় কত বার। কিন্তু স্বাতীদের বাড়িতে হ'লেও বোধহয় গাড়িতেই যেতে হ'তো এখন ?

'দেখুন না অন্যায়টা।' কাঁধের উপর শাল ঠিক ক'রে কিরণ উঠে দাঁড়ালো। 'কাউকে বলেনি—একদম ফাঁকি দিয়েছে সবাইকে! আপনারাই বলুন, একজন বন্ধু নিয়ে বিয়ে করতে যায় কেউ ?'

'সত্যেন আজকাল একজন ছাড়া দু-জন জানে না,' অরুণ আস্তে বললো, আর কিরণ কথা শুনে হে-হে ক'রে লম্বা হাসলো। হাসির শেষ দমটা সরু ক'রে বের ক'রে দিয়ে বললো, 'আচ্ছা—হু, বৌভাতের সময় শোধ নেবো!'

সত্যেনের গায়ের কাপড়টা চেয়ারের পিঠ থেকে কাঁধে তুলে দিলো অরুণ। সত্যেন ফিরে তাকালো, একটু লাল হ'লো। ওদিকে হেমাঙ্গর মিহি গলা শোনা গেলো, 'আপনি তাহ'লে অনুমতি করুন।'

তরুলতা কথা না-ব'লে সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেন

একটু এগিয়ে এলো, হঠাৎ থেমে বললো, 'আপনি যাবেন না, মামিমা?' মামিমার ঠোঁটের হাসি দেখে আবার বললো, 'যেতে নেই বুঝি?'

'ও-সব বাজে নিয়ম!' ব'লে উঠলো অরুণ। 'চলুন আপনি।'

হাসি একটু ছড়ালো তরুলতার ঠোঁটে। 'আমি একেবারে বরণ ক'রে বৌ ঘরে আনবো।'

সত্যেনের পিছনে কিরণ চুপি-চুপি বললো, 'এ-বাড়িতেই থাকছো বিয়ে ক'রে?'

'দেখি।'

'আমাদের পাড়ায় অনেক ফ্ল্যাট খালি যাচ্ছে। বলো তো দেখি একটা।'

নতুন, সত্যেনের মনে হ'লো, সমস্তটাই নতুন। সকলেই তার কথা ভাবছে, সকলেই তার ভালো চায়, তার কাজে লাগতে চায়। ঐ-তো মামিমা, মুখে দুঃখের শ্রী, চুপচাপ মানুষ, একলা কত কাজ করলেন এসে থেকে, আর নিখিলের যা ছুটোছুটি—সত্যি, খুব অন্যায় করেছে সে এতদিন—এখন থেকে ওদের খোঁজখবর নেবে সব সময়—নিশ্চয়ই!

'তাহ'লে যাই আমরা?' অনুমতি নেবার সুরে হেমাঙ্গ আবার বললো তরুলতাকে।

চোখ সরলো সত্যেনের। মেঝের ছোট্ট জায়গাটুকুতে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সবাই—এ-ঘরে এত লোক সে কখনো ছাখেনি। সকলের মুখ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে এলো তার চোখ—সকলেই খুশি, সুখী, মামিমার মুখেও শুধুই সুখ এখন—এত সুখী হবার কী আছে?

কিছু না, সকলেই ভালো, তাই সকলেই সুখী। যেতে-যেতে চোখে পড়লো মহেশকে—কেমন দাঁড়িয়ে আছে এক কোণে, মনে পড়লো চায়ের দেরির জন্য একদিন বকেছিলো তাকে, মনটা একটু খারাপ লাগলো মুহূর্তের জন্য।

সকলে বাইরে এলো। তরুলতা দরজার ধারে দাঁড়ালেন, হাত দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে উলু দিলেন। অনভ্যাসে প্রথম বার আওয়াজ বেরোলো না, তারপর আবছা, পরের বার জোর আওয়াজ হ'লো, দোতলার বারান্দায় বেরিয়ে এলো দুটি মেয়ে, তাদের পিছনে একজন মোটা গিন্নি, একটু দেখেই দুটি মেয়ের বড়োটি ঘরে চ'লে এলো সাজতে—তারাও যাবে বিয়েতে।

ছোটো রাস্তায়, অন্ধকারে, কালো গাড়িটা প্রায় মিশে ছিলো; এইবার ভিতরের আলো জ্ব'লে উঠলো, হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিলো ড্রাইভর।

সত্যেন সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বললো, 'গাড়িটা খুব বড়ো তো!'

'বিজনের এক বন্ধু আছে মজুমদার,' পিছন থেকে অরুণ জবাব দিলো। 'তার গাড়ি। একদম নতুন।'

মজুমদারকে সত্যেন চেনে না, নামও শোনেনি এর আগে; কিন্তু শুনেই বুঝলো এই মজুমদার ভদ্রলোকও খুব ভালো—হয়তো নিজের অসুবিধে ক'রেও গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। একটু অবাকই লাগলো তার—এত ভালো আছে পৃথিবীতে অথচ এতদিন সে তার কিছুই জানতো না!

হেমাঙ্গ বললো, 'ডালিম ট্যাক্সিটায় যাও।'

'আমিও ট্যাক্সিতে,' বললো নিখিল।

বাকি সকলকেই ধ'রে গেলো মজুমদারের গাড়িতে। গাড়ির আলো নিবলো। ভিতরে অখিল আর কিরণ বসলো সত্যেনের দু-পাশে, কিরণের পাশে অরুণ, আর অখিল আর সত্যেনের মাঝখানে থাকলো বরের টোপরটা। শোলায় বানানো ঐ বিশ্রী বস্তুটার চকচকে রাংতা হঠাৎ সত্যেনের চোখে ঝিলিক দিলো। এটাও?—গাড়ি ন'ড়ে উঠলো তখনই, আর সেই মুহূর্তটিতে অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে সত্যেন ভাবলো : তাহ'লে সত্যি? সব সত্যি?

আলো-জ্বলা দরজায় তরুলতার মূর্তি স'রে গেলো, পিছনে প'ড়ে রইলো সত্যেনের বইয়ে-ঘেরা একতলার ঘর, দোতলার বারান্দা খালি হ'লো। গাড়ি আস্তে-আস্তে গলি পেরোলো; অরুণ—তার চোখে তখনো কনট সার্কাসের উজ্জ্বলতার আমেজ—রসা রোডে প'ড়ে ব'লে উঠলো, 'কী অন্ধকারই করেছে!'

হেমাঙ্গ—সে বসেছিলো ড্রাইভরের পাশে—ফিরে তাকিয়ে বললো, 'ব্ল্যাক-আউট মাটি ক'রে দিলো। খুব আলো-টালো হ'লে তো বিয়েবাড়ি!'

'সুন্দর বাড়িটি কিন্তু। কী ক'রে পেলেন?'

'কলকাতায় এখন বাড়ি পাওয়া বোধহয় শক্ত না।'

'তা সত্যি,' ব'লে উঠলো কিরণ। 'যা যাই-যাই রব! আর ঠাকুর-চাকর তো আর টেঁকানো যাচ্ছে না।'

পিছনের ট্যাক্সিতে নিখিল ডালিমের কাঁধে টোকা দিলো। 'একটা নেবেন?'

'সিগারেট?' ডালিমের চোখ বড়ো হ'লো। 'আপনি সিগারেট খান?'

'পেলে খাই,' নিখিল হাসলো। 'একটা দেখুন না—'

'না, না—' ডালিম একটু স'রে এলো, তার মনে হ'লো মা তাকে দেখছেন।

'স্টেট-এক্সপ্রেস! ফাইভ-ফিফটিফাইভ!' নিখিল এক আঙুলে সিগারেটটাকে আদর করলো।

'নাকি? যুদ্ধ না-থামলে আর কলকাতায় ফিরবেই না?' অরুণ আওয়াজ ক'রে হাসলো। 'তা ভালোই; বিয়েটাও সুবিধেমতো হ'লো, আর আপনিও বেশ বাড়িটি পেয়ে গেলেন রেঙ্গুন থেকে এসেই।'

'আপনি রেঙ্গুন থেকে এলেন?' কিরণ পিঠ সোজা করলো। 'কবে এলেন? খবর কী বর্মার?'

'উনি আর বেশি কী জানবেন,' উত্তর দিলো অরুণ। 'পার্ল-হারবরের পরের দিনই উনি জাহাজে!'

কিরণ বললো, 'বাঃ!' খানিকটা তারিফ ক'রে, খানিকটা নিরাশ হ'য়ে। নরম গদিতে আরাম করলো আবার।

অন্ধকারে দেশলাইয়ের আলোয় লাল দেখালো নিখিলের মুখটা; দু-চোখে ভয় আর সম্ভ্রম আর ঈর্ষা নিয়ে ডালিম দেখতে লাগলো। চোখা ঠোঁটে ধোঁয়া বের ক'রে নিখিল বললো, 'বিজনবাবু মাইডিয়ার মানুষ। দেখা হ'লেই সিগারেট!'

অরুণ বললো, 'ওরা সব আগেই চ'লে এসেছিলো ভাগ্যিশ! সকলকে নিয়ে এখন আসতে হ'লে বিপদেই পড়তেন আপনি।'

'বিপদ আর কী।' পলকের জন্য হেমাঙ্গর মনে পড়লো তার রেঙ্গুনের চোদ্দ বছর বাস-করা বাড়ি, বাড়িভরা ফার্নিচার, শখের

জিনিশ, তার মগ চাকর মঞ্চু, এইটুকু বয়স থেকে তার কাছে ছিলো। 'এবারে আসা মানেই যে আসা, তাও কি ভেবেছিলাম!'

'ভালো তো! এ-রকম কিছু হ'য়ে না-পড়লে জীবনেও তো আপনি বর্মা ছাড়তেন না। মহাশ্বেতা খুব খুশি!'

'সরস্বতী কিন্তু না।'

কথাটার মানে বুঝে অরুণ বললো, 'তা লক্ষ্মী-সরস্বতীরা যা-ই বলুন, পেলে আমি ছাড়বো না।'

'যুদ্ধে যাবেন?'

'তবে কি আরুইন হাসপাতালের সেকেণ্ড সার্জন হ'য়ে জীবন কাটাবো!'

সত্যেনের একটু অবাক লাগলো যে অরুণবাবুর মতো একজন চমৎকার মানুষ স্ত্রীকে ফেলে কোথাও চ'লে যেতে চাচ্ছেন। নিশ্চয়ই ঠাট্টা ক'রে বলছেন এ-সব;—সত্যি কি আর যাবেন! কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু গাড়ি তখনই ঘুরলো: এসে গেছে।

রসা রোড থেকে সাদার্ন এভিনিউ যেখানে তীব্র মোড় নিয়ে বেঁকে গেছে, সেখানে আড় ক'রে বসানো একটি দোতলা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়ালো। এ-বাড়িটাকে যেতে-আসতে লক্ষ্য করেছে সত্যেন, সুন্দর দেখায় বিকেলের আলোয়; কিন্তু—গাড়ির মোটা কাচের ভিতর দিয়ে সে তাকালো—আর ট্যাক্সি থেকে নামার আগে নিখিল অসীম আপশোষে মাত্র এক-[illegible]-পোড়া জ্বলন্ত স্টেট এক্সপ্রেসটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো—ছিঃ! এটুকুতেই চ'লে আসবে বুঝলে ধরাতো নাকি তখন?—কিন্তু এখন একেবারে অন্যরকম, ছাতে মেরাপ বাঁধা, গাড়িতে ব'সেই ভিতরের ভিড়

বোঝা যাচ্ছে, উপরের রেলিঙে ঝুঁকে রঙবেরঙের শাড়ি, নিচের সিঁড়িতে কারা সব—অন্য জগৎ এখন। অন্য, অচেনা, অদ্ভুত জগৎ, অন্যদের, সকলের।—অবাস্তব, এ কিছু না, এখনই মিলোবে, আর তারপর আবার তার নিজের জগৎ—নতুন-পাওয়া নিজের, যদিও কবে যে তা ছিলো না এখন আর মনে পড়ে না।

গাড়ি থেকে নামলো সত্যেন। ভিতর থেকে বাজনা বেজে উঠলো ঝমঝম, শাঁখ বেজে উঠলো তীক্ষ্ণ।

মহাশ্বেতা চোখ খুললো, উঠে বসলো। ছুটোর পর শুয়েছে কাল রাত্রে, আবার ভোর না-হ'তেই গায়ে হলুদ;—সারাদিন ঝিমঝিম করেছে, আর বিকেল থেকেই মাথাটা—কী শরীরই হয়েছে তার! পাছে মাথা ধরে আর সব মাটি হ'য়ে যায়, এত গোলমালের মধ্যেও জোর ক'রে খানিকক্ষণ শুয়ে ছিলো আলো নিবিয়ে, একটু ঘুমিয়ে নিয়ে এখন—হ্যাঁ, ঠিক। সে ঠিক থাকবে, কিছু বাদ দেবে না, বিয়ের ফূর্তির একটি ফোঁটাও বাদ দেবে না। কতকাল, কতকাল পরে এই জীবন! খাট থেকে নেমে আলো জ্বাললো; মুখোমুখি দাঁড়ানো আলমারির আর ড্রেসিং টেবিলের তুই আয়নায় আলো ঝলসালো, জোড়াখাটের পিছল গায়ে টাটকা বানিশ ঝিলিক দিলো। ভালো লাগলো মহাশ্বেতার: বানিশের গন্ধের খোঁচা ভালো লাগলো, নতুনের গন্ধ, নতুন জীবন—আজ রাত্রে যারা এ-ঘরে থাকবে, তাদেরই শুধু নয়, তারও, হ্যাঁ, তারও।

মহাশ্বেতা ঘরের দরজা বন্ধ করলো। আয়নার সামনে গায়ের

কাপড় ফেলে মুখে গলায় ক্রীম মাখলো, তারপর গোলাপি রঙের পাউডর বুলোতে লাগলো আস্তে-আস্তে।

দরজায় টোকা পড়লো।

'কে ?'

'আমি। সরস্বতী।'

আঁচলটা লোটাতে-লোটাতে মহাশ্বেতা দরজা খুলে আড়ালে দাঁড়ালো। সরস্বতী ভিতরে আসতেই বন্ধ ক'রে দিলো আবার।

'এতক্ষণে কাপড় পরছিস তুই!'

'এই-তো হ'য়ে গেলো।' শুয়ে থাকার জন্য চুলের যা-একটু ভাঙচুর হয়েছিলো, পাৎলা-পাৎলা আঙুলে তার মেরামত ক'রে মহাশ্বেতা খোঁপা চাপড়ালো দু'বার। সরস্বতী বললো, 'তোর চুল কিন্তু খুব আছে এখনো।'

তার মানে, মহাশ্বেতা ভাবলো, ঐ যা-একটু চুলই আছে, আর-কিছু নেই। কিন্তু চুলই-বা কী—লম্বা, কিন্তু শনের দড়ির মতো পাৎলা হ'য়ে গেছে, আর একদম টান-টান। বোনের মাথার কোঁকড়া ঘন পুঞ্জের দিকে একপলক তাকালো, শুকনো একটু হেসে বললো, 'চুল! লম্বা চুল এক যন্ত্রণা—খুলতে বাঁধতে হয়রান!'

সরস্বতী ঠোঁটের কোণে হাসলো।

'না—সত্যি!' পরনের ঢাকাই জামদানিটা ছেড়ে ফেলে মহাশ্বেতা একটু দাঁড়ালো, হাতকাটা বিলেতি শেমিজের উপর দুধ-শাদা সাটিনের পেটিকোট পরা। স্বরস্বতী তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'ঘুমুচ্ছিলি ?'

'না,' মহাশ্বেতা অস্বীকার করলো। শাদা, সরু হাত দুটি

ঢুকিয়ে দিলো মিশকালো ব্লাউজে, পেটিকোট ঢিলে ক'রে. ব্লাউজের তলার কাপড়টা ভিতরে ঢুকিয়ে দড়ি বাঁধতে-বাঁধতে বললো, 'শুয়ে ছিলাম একটু। বর এসে গেছে, না?'

'হ্যাঁ—চল। তোর মাথা ধরা কেমন?'

মহাশ্বেতা খুশি গলায় বললো, 'ধরলো না শেষ পর্যন্ত!' খাটের উপর থেকে তুলে নিলো শাড়িটা, যেটা দশ দোকান ঘুরে ক-দিন আগে কিনেছে।

ক্রীমরঙের বেনারসির সাচ্চারুপোর আঁচলটা দেখতে-দেখতে সরস্বতী বললো, 'এ-সব মিটে গেলে তোর শরীরটা সারিয়ে নে ভালো ক'রে। অ্যানেমিয়ার খুব ভালো একটা চিকিৎসা বেরিয়েছে নতুন।'

'আর চিকিৎসা!' মহাশ্বেতা ভাঁজ ফেলে-ফেলে কোঁচা গুঁজলো। 'ছেলেপুলে হ'তে-হ'তে মেয়েদের শরীরের আর থাকে কী!' ব'লে ঝলমলে আঁচলটা কাঁধের উপর দিয়ে নামিয়ে দিলো।

'ও-সব বাজে কথা!' অরুণ ডাক্তারের হালের মতটা উদ্ধৃত করলো সরস্বতী।

'কাজে তো বেশি কিছু দেখাওনি বাপু।' কচ্ছপের ডিমের মতো বড়ো-বড়ো মুক্তোর একটি ফাঁস গলায় এঁটে নিলো মহাশ্বেতা। 'তুটির পরেই তো চুপচাপ।'

'তোমারই বা কী? মোটে তো চারজন!' সরস্বতী পিঠ-চাপড়ানো হাসলো।

'পাঁচজন, সরস্বতী!' শুকনো গলায় জবাব দিলো মহাশ্বেতা, মুক্তোর ঝুমকো ঝুলিয়ে দিলো তুই কানে।

সরস্বতীর মুখের ভাব বদলে গেলো। সত্যি মহাশ্বেতার প্রথম মেয়েটা যে আট মাসের হ'য়ে মরেছিলো সে-কথা তার মনেই থাকে না। তাড়াতাড়ি কিছু বলবার জন্যই বললো, 'বড়দিরও পাঁচজন।' ব'লেই বুঝলো এটা আরো ভুল হ'লো।

অথচ, মহাশ্বেতা ভাবলো, দিদি কী সুন্দর আছে এখনো। থান পরলেই মানুষকে বুড়ো দেখায়, কিন্তু আমি আর দিদি পাশাপাশি দাঁড়ালে আমাকেই দিদি ভাববে লোকে। কেন আমার এ-রকম হ'লো?—দিদির তো হয়নি, অনেকের তো হয় না। কেন আমার রক্ত নেই, মাংস নেই---আর হবেও না কোনোদিন! নেতিয়ে-পড়া বুকের উপর শাড়িতে ছোটো-ছোটো টান দিতে-দিতে বললো, 'কী-কষ্ট এক-একজনকে ধারণ করতে, জন্ম দিতে, বড়ো ক'রে তুলতে! সব শুষে নিয়েছে!' আয়নার দিকে তাকিয়ে, নিচু গলায়, যেন নিজের শাদা, বড্ড শাদা মুখটাকে লক্ষ্য ক'রেই সে কথাগুলি বললো। তারপর সেন্টের ছিপি কয়েকবার ছোঁওয়ালো কাঁধে, বুকে, গলায়।

'সুন্দর গন্ধ। দেখি একটু,' সরস্বতী কথা বদলাবার চেষ্টা করলো।

বোনের হাতে শিশিটা দিয়ে মহাশ্বেতা বললো, 'শাশ্বতীটা বেশ আছে কিন্তু। ওর বিয়ে হয়েছে চার বছর হ'লো না? কী ক'রে পারে?'

সরস্বতী সহজ হ'লো। চোরা হেসে বললো, 'এখন একটা বাচ্চা হওয়াই ওর ভালো। মোটা হ'য়ে যাচ্ছে।'

সরস্বতীর ছিপছিপে, একটু ভারি শরীরের দিকে, আঁটো, একটু

ভারি বুকের দিকে, আর তার তলায় পেটের পাৎলা খাঁজটার দিকে ঈর্ষার চোখে তাকালো মহাশ্বেতা। তা সরস্বতীর তো প্রথম থেকেই জিতের হাত; ওর কপালেই অরুণ ছিলো। হঠাৎ বললো, 'অরুণ নাকি যুদ্ধে যাচ্ছে ? সত্যি ?'

'আমি জানি না !'

'তুই জানিস না ?' মহাশ্বেতা আয়না থেকে স'রে এলো। 'বারণ কর !'

'তুই একবার কথা ব'লে ছাখ না,' সরস্বতী গম্ভীরভাবে বললো।

বোনের মুখের দিকে তাকিয়ে মহাশ্বেতা একটু হাসলো, কিন্তু কথা বললো বিষণ্ণ গলায়। 'পুরুষমানুষ—উন্নতি ছাড়া কিছু বোঝে না !'

'বেশ-তো ! আমি কি ধ'রে রাখছি—না কি কেউ কাউকে ধ'রে রাখতে পারে !'

শেষের কথাটা মহাশ্বেতার মনের তলার কোন-একটা অংশকে সুখী করলো। ভালোমানুষের মতো বললো, 'এটা ঠিক বললি না ! অরুণ সরকারি চাকরি পেয়েও নেয়নি তোর মফস্বল ভালো লাগে না ব'লেই তো ?'

'ওঃ ! তখন !—আর এখন !' আলমারির লম্বা আয়নায় সরস্বতী তাকালো একটু, আর পিছনে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা তাকে আয়নার মধ্যে দেখলো, লক্ষ্য করলো তার গলার প্রবালের মালা, মাথার কাপড়ের তলায় ঝিকিমিকি ফুল, তার ব্রোকেডের ব্লাউজ, ফ্রেঞ্চ সিল্কের শাড়ি। তারপর নিজেকে আর-একবার দেখলো, আর সরস্বতী তখন আবার চোখ ফেরালো আয়নার মধ্যে মহাশ্বেতার

দিকে। হঠাৎ চোখোচোখি হ'লো দু-বোনে; দ্রুত টোকা পড়লো দরজায়।

সরস্বতী দরজা খুলে দিলো। ঘরে এলো শাশ্বতী, ব্যস্ত, গম্ভীর, ঈষৎ হাঁপ-ধরা। 'বে-শ! দরজা বন্ধ ক'রে দিব্যি গল্প করছো তোমরা!'

'কী করতে হবে?' মহাশ্বেতা হাসলো।

'একটু নড়ো-চড়ো! স্বাতীকে সাজানো এখনো আরম্ভই হ'লো না, এদিকে একঘর অচেনা লোকের মধ্যে কী-রকম বেচারা মুখ ক'রে ব'সে আছে সত্যেন!'

'তা থাক না।'

সরস্বতী বললো, 'তুই কী করছিলি?'

'আমি? আমার কি আর সময় আছে! এই আধ ঘণ্টার মধ্যে দশবার শুধু উপর-নিচ করলাম! উঃ!' স্পষ্ট তৃপ্তি ফুটলো শাশ্বতীর গলায়। 'বসি একটু।' ব'সে চারদিকে একবার তাকিয়ে বললো, 'স্বাতীর ফার্নিচার খুব সুন্দর হয়েছে। হেমাঙ্গদা জিনিশ চেনেন!'

'হ্যাঁ—কাঠ, লোহা, সিমেণ্ট, এ-সব খুব চেনেন উনি,' বললো মহাশ্বেতা।

শাশ্বতী জিগেস করলো, 'তোমার রেঙ্গুনের জিনিশপত্রের কী হবে?'

'কী আবার হবে। জাপানিরা ভেঙে-ভেঙে মশাল জ্বালবে।'

'কী-রকম বলো! একটু কষ্ট হয় না তোমার?'

'নাঃ!' কষ্ট কিসের? বর্মা থেকে বেরোতে পেরেছে: আর-কী

চাই? আসবাব, বাসন, রেডিও, গ্রামোফোন, গাড়ি—সব হবে আবার; কিন্তু জীবনের ঐ বছরগুলি কি আর ফিরে পাবে? নষ্ট—জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা নষ্ট হ'লো বর্মায়, নির্বাসনে; আনন্দ ছাড়া, সঙ্গ ছাড়া, জীবন ছাড়া; শুধু স্বামীর ব্যবসার উন্নতিতে সুখী হ'য়ে, শুধু সন্তানধারণে আর সন্তানপালনে। চোদ্দ বছর ধ'রে যে-বাড়িটায় তার স্বাস্থ্য আর যৌবন বাজে-খরচ হ'য়ে গেছে, তার জন্য কষ্ট কিসের!

'সুন্দর ড্রেসিং টেবিলটা,' শাশ্বতী আর-একবার তাকালো।

সরস্বতী বললো, 'তোর নিজেরটা বুঝি আর পছন্দ হচ্ছে না এখন?'

'বাঃ, তা কেন?' আলগা শোনালো শাশ্বতীর কথাটা। 'যাই আমি একবার ওদিকে। কী হচ্ছে দেখি।'

শাশ্বতীর চ'লে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সরস্বতী বললো, 'শাশ্বতী খামকা এত ব্যস্ত হচ্ছে। বড়দি থাকতে আর কাজের ভাবনা!'

'একবার সত্যেনকে দেখে আসি চল,' ব'লে মহাশ্বেতা এগোলো।

ঘর থেকে বেরোলো সরস্বতী মহাশ্বেতা। গলিতে ভিড়, সিঁড়িতে নতুন একদল উঠে আসছে। দু-বোন স'রে দাঁড়ালো, দলটি চ'লে যাবার পর সরস্বতী বললো, 'এরা কারা?'

'আমি চিনলে তুইও চিনতিস,' সিঁড়ি নামতে-নামতে মহাশ্বেতা জবাব দিলো।

'তুই একমাস আগে থেকে আছিস, আর আমি তো মোটে সেদিন এলাম।'

'পাড়ার বোধহয়। হ্যাঁ—ঐ মোটা গিন্নিকে যেন দেখেছি।'

'বাবার কাণ্ড! লোকও বলেছেন!'

'বাবার উপরে বিজু আবার এক কাঠি! স্বাতীর বিয়ে—কেউ যেন বাদ না যায়। সাঁৎরাগাছির নেপাল-পিশেমশাইকে বিজুরই তো মনে পড়লো।'

'বুড়ো মরেনি এখনো!' সরস্বতী হাসলো।

সিঁড়ির শেষ ধাপে ছ-কোণ কাচের চশমা-পড়া একটি মেয়ে তাদের দেখে থামলো। 'আপনারা স্বাতীর দিদি?'

একটু হেসে এই পরিচয় মেনে নিলো দু-বোন।

'আপনি বুঝি মহাশ্বেতা?'

একটুখানি ভুরু বাঁকিয়ে সরস্বতী জবাব দিলো, 'মহাশ্বেতা এঁর নাম।'

'আপনি তবে সরস্বতী?' মেয়েটি ঝকঝকে হাসলো। 'বিজনদার কাছে সব শুনেছি আপনাদের কথা। আমি উর্মিলা, প্রবীর মজুমদার আমার মামা। আমরা এই এলাম।'

সরস্বতী নিপুণ একটি হাসি ফোটালো। 'আচ্ছা, উপরে গিয়ে বোসো তুমি। স্বাতীর বন্ধুরা আছে।'

'খুব স্মার্ট তো মেয়েটি,' বললো মহাশ্বেতা।

'খুব।' সরস্বতী সামনের ঘরের দিকে এগোলো, দু-জন লোক তাদের পাশ দিয়ে চ'লে গেলো এক ঝুড়ি মাটির গেলাস ধরাধরি ক'রে। 'বিজুর খুব দেখি এক বন্ধু জুটেছে এই মজুমদার।'

'আর ঠোঁট দুটোকে কী-রকম রক্তের মতো করেছে!'

'কলকাতায় তো এখনো কম; দিল্লিতে প্রায় সব মেয়েই রং মাখে আজকাল।'

ছ-টি সাতটি বাচ্চা মেয়ে খিলখিল হাসতে-হাসতে সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো।

'তোর ভালো লাগে?'

'আ—র! গীতিটাই ও-সব ধরেছে এর মধ্যে!'

'...হংকং!' সামনের ঘরের দরজার কাছে আসতেই জোরালো গলা শোনা গেলো।

সরস্বতী বললো, 'নাঃ হারীত নন্দীকে নিয়ে আর পারা গেলো না! বোমা বিনে গীত নেই ওর।'

দরজার ধারে দু-বোন দাঁড়ালো।

হারীত বললো, 'হংকং ইভ্যাকুএট-ক'রে ইংরেজরা এখন—'

'ইভ্যাকুএট! পালিয়েছে, বলুন! যমের ডরে পালিয়েছে!' কথাটা বললেন মজবুত চেহারার এক ভদ্রলোক, ঘি-রঙের ফ্ল্যানেলের চুড়িদার পাঞ্জাবি পরা, টেড়িকাটা চুল মাথায় যেন আঠা দিয়ে ল্যাপটানো।

শুনে অনেকে হেসে উঠলো। সরস্বতী এগিয়ে এসে বললো, 'নন্দীর এতক্ষণে সময় হ'লো আসার?' তার গলা শুনে অনেকেই তাকালো।

সত্যেনও তাকালো। তামাশা মন্দ না—ঘরে পা দিয়েই সে ভেবেছে—দরজায় জুতোর স্তূপ, শাদা ফরাশের উপর হলদে কার্পেট, আর সেটার শেষে ছোটো আর-একটা লাল, সেখানে ঘোর-লাল মখমলের তাকিয়া, আরো-লাল, প্রায় কালচে গোলাপের দুটো তোড়া। বসতে যাচ্ছিলো, কিন্তু না—অরুণবাবুরা ঐ লালের

রাজ্যেই তাকে নিয়ে এলেন, ডবল-গালিচায় ছেড়ে দিয়ে উধাও হলেন। বসতেই গন্ধে যেন দম আটকালো হঠাৎ—থোবা-থোবা গোলাপ, লম্বা রজনীগন্ধা—কত!—তা যা-ই হোক, গলার মালাটা এবার খুলতে পেরে হাঁপ ছাড়লো। তাকিয়ে দেখলো নিখিল অখিল জড়োসড়ো, কিরণও চুপ—আর সব অচেনা—একবার শুধু একপলক চোড়দিকে দেখলো—আরো আসছে: লেমনেড, চা, প্লেট ভরা-ভরা পান আর সিগারেট—কালো-কালো মাথার উপর প্যাঁচালো ধোঁয়া, কথা, হাসি, বাইরে হাঁকডাক চলাফেরা—ঘরের তিনটে দরজায় বাচ্চা-বাচ্চা মেয়েদের উঁকিঝুঁকি—যাক, হারীতবাবু এলেন। যুদ্ধের কথা বলছেন ওঁরা, একটু শুনলো—তাই তো, কিছু একটা গোলমাল হ'লে ভারি অসুবিধে হবে লোকেদের—একটা দেয়াল ঘেঁষে বসতে পারলে পিঠটার আরাম হ'তো—এই-যে।

সত্যেন প্রথম দেখলো মহাশ্বেতাকে। অদ্ভুত রোগা, অদ্ভুত ফর্শা, শাদা, প্রায় হলদে—গালের উপর ছোটো একটি নীল শিরা স্পষ্ট—গায়ের রঙে শাড়ির রঙে মিশে আছে, আর কালো ব্লাউজের উপর দিয়ে ঝলমলিয়ে নেমেছে রুপোর পাতের মতো আঁচল। তারপর সরস্বতীকে: সোজা দাঁড়িয়েছে, চোখে হাসি, ঠোঁটে হাসি, কাঁধের উপর মাথাটি চমৎকার বসানো, শাড়িটা নীল—ময়ূরের গায়ে যে-নীল থাকে, সেইরকম—আর কচুরিপানার ফুলের রঙের জামা। তারপর একসঙ্গে দু-জনকে দেখলো।

সরস্বতী বললো, 'সব ঠিক আছে? কিছু চাই?'

কথাটা তাকেই বলা, সেটা বুঝতে পেরে সত্যেন বললো, 'এই তোড়া দুটো কি সরানো যায়?'

'কেন, ফুল ভালোবাসো না ?' বললো মহাশ্বেতা।

'ফুল খুব ভালো, কিন্তু দু-পাশে দুটো তোড়া নিয়ে ব'সে থাকা—

'থাক না, বেশ তো দেখাচ্ছে।'

পিছন থেকে ভাঙা-ভাঙা ভারি গলায় একজন বললো, 'আচ্ছা সরিয়ে দিই।'

সত্যেন ফিরে তাকালো। 'বিজনবাবু!···কী, সর্দি বুঝি ?'

'হ্যাঁ!' বিজন হাসলো, দু-বার কাশলো, নিচু হ'য়ে ফুলদানিতে হাত দিলো।

'বিজু—' মহাশ্বেতা ব'লে উঠলো—'থাক!'

'তাহ'লে আমি কি একটু স'রে বসতে পারি ?' মহাশ্বেতাকে আবেদন জানালো সত্যেন।

'আহা—বসুন না,' বললেন ঘি-রঙের ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি-পরা মজবুত চেহারার ভদ্রলোক। 'আপনি ভাগ্যবান—আপনাকে দেখি আমরা।'

'এই যে—আরাম ক'রে বসুন,' বিজন তাকিয়াটা সত্যেনের গায়ে ঠেকিয়ে দিলো।

'না, না, তাকিয়া না!' ত্রস্তে স'রে এলো সত্যেন।

মহাশ্বেতা নিচু গলায় বললো, 'বিজুর চেহারা বড়ো খারাপ হয়েছে। যা খাটুনি!'

'আর কান্না! ঐ এক দোষ ওর, বড্ড কাঁদে!'

'আবার উপোশ না-ক'রেও ছাড়লো না!'

'সত্যি, বিজুটা—' সরস্বতী হাসতে গেলো, কিন্তু হাসির বদলে খুব ছোটো একটা নিশ্বাস পড়লো তার, সেইসঙ্গে মহাশ্বেতার।

'মেজদি, সেজদি—ইনি প্রবীর মজুমদার।' ঘি-রঙের ফ্ল্যানেলের পাঞ্জাবি-পরা ভদ্রলোক হলদে কার্পেটের উপর উঠে দাঁড়ালেন।

'ইনি সত্যেনবাবুর বন্ধু,' কিরণকে দেখিয়ে বিজন বললো, 'এই আমাদের অখিল আর নিখিলবাবু—আর এঁরা সব—'

'আমরা চেনা লোক!' পিছন থেকে একজন ব'লে উঠলো আর অন্যেরা—বেশির ভাগই দূর সম্পর্কের বিবিধ আত্মীয়—মৃদু মর্মরে সমর্থন জানালো।

সত্যেন বললো, 'আপনার গাড়িতেই এলাম?'

'আমার সৌভাগ্য,' মোটা-মোটা পায়ে আসনপিঁড়ি হ'য়ে মজুমদার আবার বসলো।

'অত বড়ো গাড়ি দিয়ে কী করেন?'

'কিচ্ছু না! ছোটো গাড়িতেই ঘুরি।'

কিরণ বললো, 'ক-টা গাড়ি আপনার?'

মজুমদার জবাব দিলো না, বড়ো-বড়ো দাঁত দেখিয়ে হাসলো।

মজুমদারের হাঁটু ছুঁয়ে হারীত বললো, 'এখনো হাসছেন আপনারা, কিন্তু জাপানিদের মৎলবটা জানেন?'

গায়ে গরম কোট, জাঁদরেল শাদা গোঁফ, শক্তপোক্ত বুড়োমতো একজন বললেন, 'হংকং কি সত্যি গেলো?'

'এইমাত্র শুনে এলাম রেডিওতে সাইগঁ। এদিকে ট্যাভয় ধরো-ধরো! আর রক্ষে নেই!' এই সাংঘাতিক খবরটা বেশ খুশি গলায় ঘোষণা ক'রে হারীত সকলের দিকে তাকালো, কারো-কারো মুখে ভয়ের ভাব দেখতে পেয়ে আরো সুখী হ'লো।

'কলকাতায় বোমা-টোমা পড়বে নাকি সত্যি?' দূর থেকে শ্লেষ্মাভরা গলায় জিগেস করলো একজন।

'তার আগে কি আর বাঙালি বাবুদের টনক নড়বে! কিন্তু কথাটা হচ্ছে—'

ইনি আরো কি বলেন তা শোনার জন্য নিখিল কান খাড়া করলো, কিন্তু সরস্বতী তখনই বললো, 'এখন এ-সব কথা থাক না। আরো তো সময় আছে!'

হারীত চট ক'রে মুখ ফেরালো সরস্বতীর দিকে, ঘোঁক ক'রে হাসলো।

'মা—' ছোট্ট আওয়াজ হ'লো মহাশ্বেতার পিছনে।

ইরুকে দেখে মহাশ্বেতা আবারও যেন অবাক হ'লো। কে বলবে বারো বছরের মেয়ে—আর ঐ টুকটুকে লাল ক্রেপ-বেনারসি প'রে কত বড়োই আজ দেখাচ্ছে! ঐ তো গীতি—ওর দু-মাসের মোটে ছোটো, দেখায় দু-বছরের; আর চোদ্দ বছরের আভাকে ওর সমান-সমানই লাগে। তিনজনকে আর-একবার দেখলো মহাশ্বেতা, হঠাৎ চোখ সরু ক'রে বললো, 'ঠোঁটে রং মেখেছিস নাকি রে তোরা?'

সরস্বতী ফিরে তাকালো।

'আমাদের ঘণ্টা বাজলো এবার,' হারীত নিচু গলায় মজুমদারকে জানালো। '"প্রিন্স অব ওএলস" "রিপালস" যেদিন ডুবলো, সেদিনই বোঝা গেছে—'

সরস্বতী মহাশ্বেতার দিক থেকে চোখ সরিয়ে এনে মজুমদার জোরে একবার মাথা নাড়লো হঠাৎ। আর নিখিল লাল সবুজ

কমলা রঙের মেয়ে তিনটিকে আর-একবার দেখতে গিয়ে হারীতের কথাটা একদম শুনতে পেলো না।

ইরু তাকালো আতার দিকে, আতা গীতির দিকে, তিনজনে ফুটফুটে ঠোঁটে হাসলো। ইরু তার হাতের খাতাটা দেখিয়ে বললো, 'মা, এখন বলি?'

'বল।'

'তুমি বলো, মা।'

মহাশ্বেতা বললো, 'এরা কী বলতে এসেছে তোমাকে, সত্যেন।'

'এক সপ্তাহে থাইল্যাণ্ড, মালয়, ফিলিপাইন···' এবার নিখিল মনস্থির ক'রে হারীতের আরো কাছে স'রে বসলো।

সত্যেন দেখলো তিনটি মেয়ে তার দিকে আসছে, মাথায় প্রায় সমান-সমান, বাচ্চাও না-বড়োও না, হালকা, তিনটি রঙিন পালক ঝরেছে হাওয়ায়, টুকটুকে-লাল, কমলা-লাল, সবুজ।

ইরু বললো, 'এই খাতাটায় আপনি একটু লিখে দিন।'

'এখনই?' বেগনি মলাটের অটোগ্রাফ খাতাটার কয়েকটা হলদে শাদা গোলাপি পাতা উল্টিয়ে সত্যেন বললো, 'কিছু তো লেখা নেই দেখছি।'

গীতি বললো, 'একটা আছে।' হাসির বুড়বুড়ি উঠলো অন্য দুজনের। 'সামনের দিকে—'

সত্যদার কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে অখিল দেখলো খুলে-ধরা শাদা পাতাটায় লেখা আছে, 'স্বাতী মিত্র,' আর তলায় একটু ছোটো ক'রে লেখা, 'স্বাতী রায়।'

সত্যেনের চোখ লেখাটার উপর পড়তেই তিনজনের হাসি

ছলকালো একসঙ্গে। উঃ, কী-মজাই হয়েছিলো ছোটোমাসিকে দিয়ে এটা লেখাবার সময়!

লেখাটার—লেখা দুটোর—দিকে সত্যেন একটু তাকিয়ে থাকলো। 'আপনি এ-পাতাতেই লিখুন,' ব'লে ইরু তার হাতে দিলো পিছল-কালো সরু ছাঁদের কলম। 'না—এ-পাতাতেই।'

সত্যেন নিজের নাম লিখে দিলো।

'তারিখ দিন!'

হাতে কলম নিয়ে সত্যেন একবার ছবিটি দেখলো; তিনটি দাঁড়ানো মেয়ের রঙিন ছবি।

হারীত একটু কথা থামিয়ে সদয় আমোদের চোখে ব্যাপারটা দেখছিলো, তাড়াতাড়ি প্রম্‌ট্ করলো, 'পনেরোই ডিসেম্বর—'

'না, না, বাংলাটা লেখো,' কিরণ ব্যস্ত হ'লো। 'উনতিরিশে অঘ্রান।'

'বলতে হবে না', মজুমদার হাত তুললো। 'দুটোই ওঁর মুখস্থ।'

'হৃদয়স্থ, বলুন!' কিরণ একলাই হাঃ ক'রে হাসলো।

খাতা হাতে নিয়ে ইরু বললো, 'চল।' তিন জোড়া চোখে হাসি ঝলসালো: কী-মজা—সক্কলকে দেখাবে এখন! ছুটে যেতে-যেতে বাপের সঙ্গে কলিশন হ'লো ইরুর—না, আগে ছোটোমাসিকে।

'টোকিও বলছে ক্রিসমাসের মধ্যে…' হারীত আবার গলা নামালো।

মজুমদার দেখলো দরজার ধারে একটি টাক-পড়া মাথা।

দু-বোনের মধ্যে যার কালো ভেলভেটের ব্লাউজ, তাকে কী বললেন ভদ্রলোক। ইনিই স্বামী?—তা-ই হবে, নয়তো কথা

বলতে একটুও কি মুখের ভাব বদলাতো না? কালো-ব্লাউজ-পরা বোন লাল-মালা-গলায় বোনকে কিছু বললো ; দু-জনে ফিরলো, চ'লে গেলো।

হারীত স্বাধীন হ'লো। সত্যেনের দিকে তাকিয়ে বললো, 'খুব সময়মতো বিয়েটা হচ্ছে। একেবারে তোপের মুখে!'

মনে-মনে চটপট একটু হিশেব ক'রে কিরণ বললো, 'অঘ্রানের মাঝামাঝি হ'লেও এ-সব গোলমাল কিছু—'

'দেরিটা আমার জন্যই হ'লো,' হেমাঙ্গ এগিয়ে এলো হলদে কার্পেটে।

'হ্যাঁ—আপনি প্রায় ভাবিয়ে তুলেছিলেন এঁদের!' হারীত এমনভাবে কথাটা বললো যেন 'এঁদের' ভাবনাটা নেহাৎ অর্থহীন।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে বিজনকে দেখতে না-পেয়ে মজুমদার নিজেই আলাপ জুড়লো, 'আপনিই বর্মা থেকে?'

'বর্মার খবর কিছু বলুন!' কিরণ হাঁটু নাচালো, আর উত্তরটা শোনার জন্য নিখিল তাকালো হেমাঙ্গর দিকে।

'আপনার খবর কী?' জিগেস করলো মজুমদার। 'ওখানকার কারবার আপনার?'

হেমাঙ্গ পাৎলা হাসলো। 'আপনি মিস্টর মজুমদার ; পরে একদিন কথা বলবো আপনার সঙ্গে।'

মজুমদার যেন বাধিত হ'য়ে মাথা নোওয়ালো, মু্খ তুলে চওড়া ক'রে হাসলো। চোখে-চোখে জ্ঞাতিত্ব স্থাপিত হ'লো দু-জনের মধ্যে, প্রতিযোগিতাও। হেমাঙ্গ বুঝলো যে দেখতে বোকা-সোকা হ'লেও লোকটা কাজে ওস্তাদ, আর মজুমদার বুঝলো এই মিহি

গলার মেজ-জামাইটি ফতুর হ'য়ে আসেনি, হাতে আছে বেশ, আর কাজেও লেগে যাবে এখানেই, এখনই।

'বর্মার খবর?' হারীত এ-সুযোগে কথার সুতো তুলে নিলো, আর নিখিল চোখ সরালো হেমাঙ্গ থেকে হারীতের মুখে। 'বর্মার যা খবর, তা আমাদেরও খবর হবে দু-দিন পরে, যদি-না আমরা—'

'কিন্তু রেঙ্গুনে কি বোমা পড়েছে?' শ্লেষ্মাভরা গলায় আবার প্রশ্ন হ'লো।

হারীত তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বাঁকালো। এই এক বোমা নিয়েই যত ভাবনা এদের—যেন কোনোরকমে বোমা থেকে বাঁচলেই নিশ্চিন্ত। কী অশিক্ষিত সব! মুখচোখ উদাস ক'রে বললো, 'পড়লেই হ'লো। কলকাতায় পড়তেই বা বাধা কী।'

হঠাৎ যেন শীতে কেঁপে ওঠে কিরণ হাতে হাত ঘ'ষে হি-হি ক'রে হাসলো। 'তাই তো! পড়লেই হ'লো! যদি আজই—যদি, ধরো, আজ রাত্রেই—' বলতে-বলতে সত্যেনের দিকে ফিরলো।

আবছা হাসলো সত্যেন। বোমা পড়বে? জাপানিরা এসে বোমা ফেলবে কলকাতায়? না, না, জাপানিরা কি আর সত্যি অত মন্দ? আর ফ্যালেও যদি, যদি আজই ফ্যালে—তাহ'লেই বা কী? কিচ্ছু হবে না বোমাতে, কেউ মরবে না, একটি বাড়িও ভাঙবে না—আর যদি ভাঙেও, কি আগুন-টাগুন লেগে যায়, তাতে তার—তার কিছু হবে না, আর তারা যে-ক'জনকে ভালোবাসে তাদেরও কিছু হবে না; সব ঠিক থাকবে।

কিরণের হি-হি হাসি শুনে হারীত তার দিকে একটা আগুন-চোখ ছাড়লো, তারপর মজুমদারের দিকে ফিরে একটি পরিপাটি

বক্তৃতা আরম্ভ করলো। 'ব্যাপারটা হচ্ছে এই। ধ'রে নিন জাপান এ-দেশে আসবেই। ধরে নিন ইংরেজ আপাতত আরো হ'টে যাবে। এখন আমরা যদি—'

'চলুন আপনারা!' অরুণ দাঁড়ালো দরজার ধারে। 'চলুন! চলুন।' তার গলা বেশি চড়ে না, বার-বার ব'লে কথাটা ছড়িয়ে দিলো। নাঃ—হারীতের একটা কাঁধ জোরে ন'ড়ে উঠলো—বিয়ে-বাড়িতে কথা বলা!

চশমা-চোখে খুশি-মুখের মানুষটিকে দেখে মজুমদার বুঝলো ইনি আর-এক জামাই—সেই লাল-মালা-গলার?—তা-ই হবে, বড়োজন তো বিধবা? বিজনের কাছে শুনে-শুনে সকলেই তার চেনা হ'য়ে গেছে, কিন্তু সত্যি-তো কাউকেই সে চেনে না, মিসেস নন্দীকে ছাড়া—আর অবশ্য তাঁর স্ক্রু-আলগা-মাথার স্বামীটিকে। হঠাৎ তার মনে হ'লো, না-এলেই পারতাম।

ঘরের মধ্যে মৃদু নড়াচড়া আরম্ভ হ'লো।

'চলুন, চলুন সবাই। নিখিল, অখিল, এসো। কিরণবাবু—আপনি কিন্তু বিয়ে পর্যন্ত থাকবেন।'

'লগ্ন কখন?'

'দশটার পরে।—থাকবেন, চ'লে যাবেন না। হারীতবাবু, আপনিও তো অভ্যাগতর দলেই—দয়া ক'রে উঠুন।'

হারীত ভদ্রতা ক'রে হাসির মতো ভাঁজ ফেললো মুখে, একটু দাঁত দেখালো। যাক, খেতে-খেতে শেষ করবে কথাটা, মজুমদার আবার ফশকে না যায়। হাতে রাখার জন্য খুব মসৃণ ক'রে বললো, 'মিস্টর মজুমদার, চলুন তাহ'লে।'

'ও, আপনিই!' বিজনের বড়ো-গাড়িওয়ালা বন্ধুর দিকে এগিয়ে এলো অরুণ। 'কত সাহায্য করলেন আপনি আমাদের। এখন একটু কষ্ট ক'রে—' অরুণ স'রে গেলো অন্যদের দিকে। 'আপনারা চলুন—হ্যাঁ, তেতলায়—সোজা সিঁড়ি দিয়ে উঠে—হ্যাঁ, হ্যাঁ, জুতো প'রেই যান।'

'বেশ বাড়িটি পেয়েছিস,' আবার দোতলায় উঠতে-উঠতে সরস্বতী বললো।

'ভালো?' মহাশ্বেতা অস্পষ্ট স্বরে বললো। বাড়িটাকে আলাদা ক'রে ভালো ব'লে সে বোঝেনি এখনো; এটা কলকাতা, সে কলকাতায় আছে, থাকবে, আর তাকে কালাপানি পেরোতে হবে না, এইটে বুঝতে-বুঝতেই দিন কেটে যাচ্ছে। ভাগ্যিশ যুদ্ধটা বাধিয়েছিলো জাপানিরা।

'তুই ক-বছর পর এলি রে।' সিঁড়িতে মোড় নিয়ে সে জিগেস করলো।

'বছর তিন হবে। তুই?'

'আমি পাঁচ বছর,' মহাশ্বেতা সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলো। 'বাবা যেবার বাড়ি করলেন এসেছিলাম, তারপর এই।'

'হ্যাঁ, শাশ্বতীর বিয়েতে তোর আসা হয়নি,' সরস্বতীর মনে পড়লো।

'তোর সঙ্গে আমার দেখা হ'লো সাত বছর পরে। সেই যতীন দাস রোডের বাড়িতে—' দোতলায় পৌঁছে মহাশ্বেতা একটু দাঁড়ালো, দম নিলো। 'আর দিদিকে দেখলাম দশ বছর পর।'

'দশ বছর!' সরস্বতী হাসতে গেলো, কিন্তু হাসির বদলে নিশ্বাস পড়লো তার। 'সত্যি, বড়দি—' কথা শেষ করলো না: মহাশ্বেতাও ভাবলো, 'সত্যি—!' দু-জনে দু-জনের চোখ এড়ালেন।

দরজার পরদা কাঁপিয়ে মাঝের বড়ো ঘরটি থেকে হাসতে-হাসতে ছুটে বেরোলো তিনটি ছিপছিপে মেয়ে, একজন টুকটুকে লাল, একজন সবুজ, আর-একজন কমলারঙের। 'মা, ন্যাখো—' কালো চোখে আলো ঝলকিয়ে খাতাটা খুলে ধরলো ইরু।

'হাতের লেখা কার বেশি ভালো, মা?' গীতি জিগেস করলো।

ইরু বললো 'আলবৎ ছোটোমাসির!'

'কক্খনো না! সত্যেনদার,' বললো আভা।

মা-মাসির রায় শুনতে দাঁড়ালো না তারা, রঙের ঢেউ তুলে চ'লে গেলো।

কেমন মজার টান দিয়ে কথা ব'লে ইরু, সরস্বতী ভাবলো, বর্মায় হয় নাকি ও-রকম? আর মহাশ্বেতা ভাবলো, গীতি ও-রকম নেচে-নেচে হাঁটে কেন মেমসাহেবের মতো? দু-বোনে বড়ো ঘরটির দরজার ধারে দাঁড়ালো।

'কী গো, মহাশ্বেতা, সরস্বতী, কোথায় ছিলে এতক্ষণ? এসো—সব ঠিক হচ্ছে কিনা দ্যাখো'সে।'

কথাটা বললেন দূর থেকে তাদের দেখতে পেয়ে এক দিদিমা, তাদের ভূপেশ-দাদুর দ্বিতীয় পক্ষ, গোলগাল আহ্লাদ চেহারার মানুষ, মুখে এক ঢিপি পান, মাত্রই বছর দশ-বারোর বড়ো তাদের।

সরস্বতী চুপি-চুপি বললো, 'বুড়ো স্বামী নিয়ে আছেন বেশ কুন্দ-দিদিমা।' এগিয়ে এলো ঘরের মধ্যে।

মহাশ্বেতা কথাটা শুনলো না, দেখতেই ব্যস্ত ছিলো সে। কিছু আসবাব নেই ঘরটিতে, থাকলে এখন বেশি হ'তো। মানুষেই ভরা। সব মেয়ে; নানা বয়সের কুমারী আর সধবা। ছড়িয়ে-ছড়িয়ে গল্প করছে দু-তিনজন ক'রে, বসবার জায়গা নেই ব'লে নড়াচড়ার একটা স্রোত চলছে চারদিকে; আর মাঝখানটায় ছোটো একটি দল গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে। কারো দিকে চোখ ফেলে, কারো দিকে হাসি ছুঁড়ে সেই গোল দলটিতে ভিড়লো মহাশ্বেতা সরস্বতী।

এবার ভালো ক'রে চারদিকে তাকালো মহাশ্বেতা। আত্মীয় সব; বাপের বাড়ির, মামাবাড়ির দিকের; যারা তাকে ছোটো দেখেছে, যাদের সে ছোটো দেখেছে: তার সমস্ত ছেলেবেলাটা সশরীরে এই ঘরে হাজির, স্মৃতি বেরিয়ে এসেছে মন থেকে চোখের সামনে। জীবনে এদের আর দেখবে ভাবেনি, অনেককেই ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু দেখেই বুঝেছে কাউকেই ভোলেনি, কেউ কাউকে ভোলে না, সকলেই সকলের সঙ্গে কোনো-এক সময়ে আবার দেখা হবার আশায় ব'সে থাকে। সকলের মুখের উপর দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে-আনতে মহাশ্বেতার শোভার চোখে চোখ পড়লো।

শোভা—আগে থেকেই মহাশ্বেতাকে দেখছিলো সে—একটু হেসে চোখ সরালো, আর মহাশ্বেতা মন দিয়ে দেখলো এই সমবয়সী জ্যাঠতুতো বোনটিকে, চেষ্টা করলো তার আগের মুখটা মনে আনতে। নাঃ, বুড়ো হ'য়ে গেছে শোভাটা—কষ্টে থাকে, অবস্থা ভালো না। মনের মধ্যে একটা 'আহা' উঠেই মিলিয়ে গেলো, নিশ্বাস পড়লো অন্য রকম। আমি—আমাকেও কি ঐ রকম দেখায়?

পাশের মেয়েটি শোভার কানে-কানে বললো, 'মহাশ্বেতার কণ্ঠিটা দেখেছো ?'

দেখেছো মানে ? না-দেখে উপায় আছে নাকি ? কণ্ঠার হাড় এমনি তো ঢাকে না, তাই বড়ো-বড়ো মুক্তো দিয়েই— । কিন্তু ঈর্ষা ফণা তুলেই ফিরে গেলো, জিৎলো সুখ। সুখ শোভারই মনে, এ-বাড়িতে যখন পা দিয়েছে কাল সকালে, তখন থেকেই সুখ, আর তারপর বেড়েই চলেছে কেবল ;—আজ রাত্রিটাও সে এখানে, আর আজকের রাত আরম্ভও হয়নি এখনো। দুটো দিন, আস্ত দুটো দিন রাজেন-কাকা তাকে বাঁচালেন নেই-নেই আর আর-পারি-না'র সংসার থেকে : সে না-রেঁধেই খাচ্ছে, কিছু না-ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে, হাসছে, সাজছে, গল্প করছে ইচ্ছেমতো, আর গল্প করার লোকও কত—সকলেই ! এত আত্মীয় তার আছে এই কলকাতাতেই— তা যেন আর ভাবতেও পারে না আজকাল। দেখাও হয় না কারো সঙ্গে, মনেও পড়ে না সাত জন্মে ; কিন্তু এই-তো—কেমন আপন-আপন লাগছে এখানে আবার সকলকে, সকলেরই ; একটা ছোঁয়াচে ভালো লাগা সকলের থেকে সকলের মনে ছড়াচ্ছে— সত্যি, একটা বিয়ের মতো আনন্দের আর কিছু না ! আর এর পরেই সবাই যে যার বাড়ি চ'লে যাবে, যে যার সংসারে ঢুকবে, আবার সবাই তেমনি দূর, তেমনি পর ; আবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত—না, এখন না, এখনো না।

শোভা চোখ নামালো। চোখে পড়লো শাদা সুন্দর মেঝেতে সুন্দর শাদা চিকনপাটির উপর শাদা দুটি পা, শাশ্বতীর হাতের তুলিতে লাল হচ্ছে ধারে-ধারে, আর বাঁকানো পিঠে ছড়ানো

একঢাল কালো—পিছনে হাঁটু ভেঙে ব'সে চিরুনি টানছেন উষা-বৌদি। কেমন ছবির মতো ব'সে আছে স্বাতী, উঁচু-করা হাঁটুতে থুতনি রেখে, হাঁটুর নিচেটা দু-হাতে জড়িয়ে, চোখ নিচু ক'রে চুপ। তা ওর আর নিচু চোখের দরকার কী, নিজেই নিজেরটা ঠিক করলো, আমাদের মতো বোজা-চোখের বিয়ে তো না। চোখেও দেখিনি আগে, কিছুই জানিনি, রাতারাতি সর্বেশ্বর হ'য়ে বসলো একেবারে অচেনা একজন—এই গতানুগতিক চিরাচরিতে শোভা হঠাৎ অবাক হ'লো।—তা ওতেও তো বেশ কেটে যায় জীবন, আর এতেই কি ভালোই হয় সব সময়?

'সরস্বতী, কী-রকম চুলবাঁধা হবে বলো-টলো।'

'আমি তোমাকে বলবো, উষা-বৌদি। তুমি হ'লে চুল-বাঁধার ওস্তাদ!'

'দিল্লির ফ্যাশন বলো দেখি দু-একটা,' উষা-বৌদি খুশি হ'য়ে ফিতে হাতে নিলেন। 'না-হয় মহাশ্বেতাই বলো। বর্মায় তো খুব খোঁপার বাহার।'

'বর্মায় না, জাপানে,' স্বাতীর পা থেকে চোখ না-তুলে শাশ্বতী বললো।

'কী-সব শুনছি রে?' বললেন পান-মুখে টোপলা-গালে কুন্দ-দিদিমা, 'আমাদের নাকি জাপানি রাজা হবে এর পরে? জিনিশপত্র শস্তা হবে তো তাহ'লে?'

'আর চুলবাঁধা!' উষা-বৌদি ঘাড়ের কাছের চুলটা গোল ক'রে চেপে ধরলেন, 'এ-সব পাটই থাকবে না ক-দিন পরে দেশে।'—আঁটো ক'রে বেঁধে ফেললেন ফিতেটা।

'কেন? থাকবে না কেন?' একটি অল্পবয়সী-মেয়ে হাসির সুরে জিগেস করলো।

'সব ববছাঁট হবে!' ঊষা-বৌদি তাঁর চোখ দুটিকে ভাসিয়ে দিলেন উপরদিকে, যেন ভবিষ্যৎ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে। মহাশ্বেতার চোখে চোখ পড়লো।

'তা মন্দ কী—বড়িখোঁপার চেয়ে ববছাঁটই ভালো!' কথাটা ব'লে, নিজের কথা ভেবে নিজেই খুব হাসতে লাগলেন মহাশ্বেতার পাশে দাঁড়িয়ে তাদের লীলা-মাসি। যারা শুনলো, তারাও যে যার চুলের দশা ভাবলো একটু।

ফিতে-বাঁধা মোটা গোছাটায় ঊষা-বৌদি আস্তে দুটো চাপড় দিলেন। সরস্বতীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী চুল ভাই তোমাদের বোনেদের—হিংসে হয় সত্যি!'

'স্বাতী দু-একটা কথা-টথা বল।' হাসি-হাসি চোখে তাক ক'রে কুন্দ-দিদিমা বললেন, 'কাণ্ডটি তো ভালোই ঘটালি—আর লজ্জা কী।'

'স্বাতী এখন কথার বাজে-খরচ করবে না,' কোমর থেকে জড়িয়ে-জড়িয়ে চুলগুলি উপরে তুলতে লাগলেন ঊষা-বৌদি। 'সব জমিয়ে রাখছে।'

'তা বাপু কিছু-তো খরচ হ'য়ে গেছে আগেই,' দিদিমা টেনে-টেনে বললেন, 'তা-ই থেকেই দু-একটা নমুনা শুনি আমরা। কী-এমন কথা বলিস রে তুই, যা দিয়ে অত বড়ো বিদ্বানকে জয় করলি! হ্যাঁ রে, পৃথিবীর সব বই নাকি প'ড়ে ফেলেছে?'

'পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো বইটি পড়তে আরম্ভ করবে এতদিনে,' দু-হাতে পাকিয়ে-পাকিয়ে ঊষা-বৌদি খোঁপা গড়তে লাগলেন।

শোভা কথা শুনে হাসলো, স্বাতীর মুখ দেখার জন্য তাকালো। কিন্তু মুখের বদলে দেখলো একদিকের গালের খানিকটা; একটি চোখের কালো পলক নড়লো। হাতের জড়ানো আঙুলগুলি ছাড়িয়ে নিয়ে স্বাতী যেন চমকে তাকালো। যতবার আওয়াজ হয়েছে ততবার চমকেছে, আর যতবার তাকিয়েছে ততবার অবাক হয়েছে। স্বাতী এবারেও অবাক হ'লো তার হাতের দিকে তাকিয়ে—চুড়ি, কঙ্কণ, কত!—আর ঐ ঝকঝকে চঞ্চল চুড়িগুলির পাশে হলদে-সুতো-জড়ানো শাঁখাটা কী-সুন্দর, কী-শান্ত শাদা। শাঁখা পরানো শক্ত নাকি, টিপে-টিপে অনেকক্ষণ ধ'রে পরাতে হয়, পাছে ভেঙে যায়: কিন্তু ছোট্ট শাঁখাটা যেন নিজে-নিজেই চ'লে এলো তার হাতে, আঙুলের গাঁটে মোটে ঠেকলো না। সুলক্ষণ, সবাই বললো।

স্বাতী আস্তে বললো, 'ছোড়দি, হ'লো তোমার?'

'এই হ'লো।' শাশ্বতী হাত সরালো, মাথাটি একটু দূরে সরিয়ে দেখলো একবার, তারপর হাতে টিপে সরু ক'রে নিলো তুলিটা। 'পা-টা উঁচু কর তো একটু।'

মেঝেতে গোড়ালি রেখে পায়ের আঙুল উঁচু করলো স্বাতী। তুলিটা শুড়শুড়ি দিলো আঙুলের ফাঁকে। স্বাতী ন'ড়ে উঠলো, তুলি স'রে গেলো।

'নড়িস না—হ্যাঁ, এই ঠিক। ঠিক এইভাবে থাক।' শাশ্বতী খুব মন দিয়ে আঙুলের গলিতে তুলি বুলোতে লাগলো, আর স্বাতী তাকিয়ে থাকলো তার পায়ের পাতার হলদেমতো রঙের দিকে। সন্ধেবেলা কাঁচা হলুদে স্নান, তারপর এই মোটা, কোরা লালপাড় শাড়িটা পরতে হ'লো—শাড়িটা ওরা পাঠিয়েছে—ওরা—সে—

শাড়িটা সে পাঠিয়েছে আমার জন্য। পায়ের পাতার একটু উপরে টকটকে লাল পাড়টার দিকে স্বাতী একবার তাকালো। কাকে নাকি দিয়ে দেবে এটা। এটাই ? অন্য শাড়ি দিলে হয় না ?

'কই গো রাজকন্যারা, কোথায় সব ?'

শাশ্বতী মুখ তুললো, স্বাতীও ; দু-বোনে চোখোচোখি হ'লো, দু-জনেই বুঝলো একই কথা মনে হয়েছে দু-জনের। কথাটা, বলার ধরনটা, এমনকি গলার আওয়াজটাও অনেকটা বাবার মতো—সেই আগেকার দিনে যেমন ক'রে বলতেন বাবা— বারে-বারেই ভুল হয়। বাবার কথা মনে হ'তেই স্বাতীর বুকের মধ্যে আঁটো কষ্ট মোচড় দিলো আবার, আর মহাশ্বেতা সরস্বতীর মনে পড়লো ছেলেবেলায় এই বড়োপিসি যখন এসেছেন, তাঁর কাছে শোয়া নিয়ে কত ঝগড়া করেছে তিন বোনে।

'এখন আর রাজকন্যা না,' কুন্দ-দিদিমা হাসলেন, 'সব রাজরানী।'

শাশ্বতী নিচু গলায় বললো, 'পা নামা এবার।' স্বাতী পা পাতলো ; প্রত্যেকটি নখে একটি লালের ফোঁটা দিয়ে শাশ্বতী উঠে দাঁড়ালো।

'বেশ হয়েছে,' লীলা-মাসি তারিফ করলেন।

শাদা চুলে সিঁদুর নিয়ে বড়োপিসি এদিকে তাকালেন, ওদিকে তাকালেন। ভাঙা গালে মিষ্টি হেসে বললেন, 'পঞ্চকন্যা একসঙ্গে আবার। রাজুর অনেক দিনের একটা সাধ মিটলো'

'আমাদেরও,' আলগোছে ব'লে নিয়ে ঊষা-বৌদি মস্ত ঘন কালো খোঁপাটায় কাঁটা বসাতে লাগলেন।

'তা সত্যি ! আমাদের মেয়ে ক-টিও তেমনি তো ! রূপে গুণে

এমন আর দেখলাম না!' বলতে-বলতে নিঃসন্তান বড়োপিসির তোবড়ানো গালের ফোকরে-ফোকরে হাসি ঝরলো।

পিসিমার আর কাণ্ডজ্ঞান হ'লো না, মহাশ্বেতা ভাবলো; একঘর মেয়ের সামনে এ-রকম বলতে হয়! কথাটা চাপা দেবার জন্য একটা জানা কথাই জিগেস করলো, 'পিসিমা শাশ্বতীর বিয়েতে এসেছিলে?'

'ও মা!' গালে হাত দিয়ে বড়োপিসি অবাক হলেন, 'আমার অসুখ না তখন? তোদের পিসে তো ভেবেছিলো আমি ম'রেই যাবো। হুঁঃ, আমার মরা যেন সোজা—কলেরা টাইফোট কতই দেখলাম, আমার কাছে সব ফেলটুশ!'

ঘরে একটা হাসির হাওয়া বইলো; স্বাতী ভাবলো বড়দির কথাও অনেকটা এ-রকম—আর সুখের কুয়াশা আরো ঘন হ'য়ে ঘিরলো শোভাকে, মুখগুলি ঝাপসা দেখলো সে, যেন নাক-চোখ কারোরই স্পষ্ট না, শুধু একটা হাসিতে—একই হাসিতে—প্রত্যেকটি মুখ সেজে আছে। সকলেই স্বাতীদের আত্মীয়, সে ভাবলো, কিন্তু সকলেই সকলের আত্মীয় না; অনেকে অনেককে চেনেও না ভালো ক'রে, অনেকে অনেককে জীবনেও আর দেখবে না; তবু এখন, এখনকার মতো, কেউ কারো দূর নয়, পর নয়, সকলকেই একবাড়ির লোক ক'রে দিয়েছে বিয়েবাড়ি, আর এই সকলের মধ্যে সেও আছে।

স্বাতীর পরবার সোনালি-লাল বেনারসির ভাঁজ খুলতে-খুলতে সরস্বতী বললো, 'যাক, স্বাতীর পয়াতে সকলের সঙ্গে সকলের দেখা হ'লো। কতকাল এ-রকম হয়নি!'

কতকাল কেন, মহাশ্বেতা ভাবলো, কোনোদিন না, কোনোদিন

হয়নি। একসঙ্গে এদের সকলকে কোনোদিন দেখিনি আমি, আর অনেক সব বৌ, জামাই, আর ছোটোদের তো এই প্রথম দেখলাম। আর-একবার সে চোখ ঘুরিয়ে আনলো ঘরের মধ্যে, তারপর বড়োপিসির কুঁকড়োনো মুখে চোখ রেখে ভাবলো, আমরা সকলেই একসঙ্গে বেঁচে আছি, আমিও আছি সকলের সঙ্গে। কথাটা ভেবে অবাক লাগলো তার, ভারি ভালো লাগলো।

'হ্যাঁ, সকলের সঙ্গেই সকলের,' মহাশ্বেতা বললো, 'কেউ বাকি নেই।'

কেউ বাকি নেই?—একটা বোবা চিৎকার উঠলো স্বাতীর মনে—জামাইবাবু! কারো মনে পড়ে না একবার, মানুষটা যে ছিলো তাও মনে পড়ে না? এক ঝাপটে ফিরলো তার মনে ছোড়দির বিয়ে, পরের দিনের সকালবেলা, খাটের উপরে পায়ে পা তুলে সেই হা-হা হাসি, সেই একটুতেই-অবাক-হওয়া গোল-গোল চোখের অফুরন্ত ভালোমানুষি। সব মুছে গেলো? এর মধ্যেই? চাপা কষ্ট ছাড়া পেলো, ছড়ালো, অনেকক্ষণ পর ঠেলে উঠলো গলার কাছে। এখন সে আর সে-মেয়ে নয় যাকে সে চেনে না, যার হাতে শাঁখা, পায়ে আলতা, পরনে 'তার' পাঠানো কোরা শাড়ি, আর যাকে ঘিরে সকলের সুখ, আনন্দ; এখন সে আবার স্বাতী, পাঁচ বছরের, এগারো বছরের, পনেরো বছরের স্বাতী, কোঁকড়া চুলের, আঁকড়ে-ধরা, কেঁদে-কেঁদে না-খেয়ে ঘুমিয়ে-পড়া, বৃষ্টি-পড়া রাত্রে জেগে উঠে ভয়-পাওয়া, লালপাড় শাড়িতে মাঘের সকাল আলো-করা, এখন সে আবার তার মা-র শরীর, এখন সে আবার তার বাবার মেয়ে। স্বাতী হাঁটুতে মুখ লুকোলো।

সোনালি-লাল বেনারসিটা হাতে নিয়ে সরস্বতী কাছে এলো। 'স্বাতী ওঠ। শাড়ি পরবি।'

'স্বাতী.' শাশ্বতী আরো নরম ক'রে ডাকলো। সিঁড়িতে শোনা গেলো জুতোর শব্দ, একসঙ্গে অনেক, আরো, অনেক লোক উপরে উঠছে একসঙ্গে।

স্বাতী মুখ তুলে হাতের পাতায় চোখ মুছলো। মস্ত কালো খোঁপাবাঁধা মাথাটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে লালচে চোখে তাকালো চারদিকে, দেখলো হাসি, শাড়ি, রঙের ছড়াছড়ি, গলার হারে কানের দুলে রেষারেষি, ধবধবে ইলেকট্রিকের আলোয় মস্ত ময়ূর পেখম ছড়ালো, আনন্দ দাঁড়িয়ে আছে তাকে ঘিরে, সকলের আনন্দ। মুখ থেকে মুখে সরলো তার চোখ, কী-যেন খুঁজলো।

শাশ্বতী বললো, 'কিছু চাই, স্বাতী?'

খুব ছোট্ট গলায় স্বাতী বললো, 'বড়দি কোথায়?'

'বড়দি? বড়দিকে চাই? ডেকে দিচ্ছি—' শাশ্বতী দরজার দিকে এগোলো, জুতোর শব্দ মিলোতে লাগলো দোতলা পার হ'য়ে ছাতের দিকে, সত্যেনকে একবার দেখে আসতে হয় এখন।

'এই-যে বড়দি। তোমার খোঁজেই যাচ্ছিলাম। স্বাতী ডাকছে তোমাকে।' শাশ্বতী আর দাঁড়ালো না, সিঁড়ির দিকে এগোলো।

'ঐ-তো বড়দি,' সরস্বতী বললো। 'এসো, তুমি না-এলে স্বাতী শাড়ি পরবে না।'

'তোমরা যাও উপরে,' বলতে-বলতে শ্বেতা কাছে এলো 'লীলা-মাসি, তুমি এঁদের নিয়ে যাও। পিসিমা বলো সকলকে।'

কুন্দ-দিদিমা বললেন, 'পুরুষদের হোক।'

'আজকাল আর ও-সব নেই!' বড়োপিসি হাত নাড়লেন।

'পুরুষের সঙ্গে সমান-সমান স্ত্রীলোক! আসুন আপনি। তোরা সব চল্‌ রে।'

দূর দেয়াল থেকে একটা নড়াচড়ার হাওয়া মাঝের দলটি পর্যন্ত পৌঁছলো। সিল্কে সোনায় ঝিলিক দিলো, পান্না-চুনি চিকচিকোলো। আর ঘরভরা ঐ চপল সোনা আর মুখর জড়োয়া আর সিল্ক সাটিন ব্রোকেডের আশ্চর্য নাচের মধ্যে স্বাতী দেখলো বড়দিকে আরো আশ্চর্য, শাদা, থানপরা, তার হাতের চুড়িগুলির পাশে শাঁখাটার মতোই আশ্চর্য শাদা, আর সেইরকমই শান্ত, সুন্দর।

'কী স্বাতী?' স্বাতী চোখ নামালো, শ্বেতা তার পাশে এসে বসলো। নিচু গলায় বললো, 'কিছু একটু খা, কেমন?'

'না।'

'একটু নেবুর জল ক'রে আনি—ভালো লাগবে। তেষ্টা তো পায়।'

'এখন না। একটু বোসো, বড়দি।'

'স্বাতী—' সরস্বতী তাড়া দিলো।

'আচ্ছা, একটু পরেই পরবে।' স্বাতীর পাশে ব'সে শ্বেতা তাকে এক হাতে জড়ালো, তার হাতে পৌঁছলো স্বাতীর ভিতরকার কাঁপুনি। ঘরের ভিড় কমলো, ক'মে এলো, পাটির উপর প'ড়ে রইলো শাড়ি, জামা, ওড়না, গয়না; ছাতে আরম্ভ হ'লো খেতে বসা।

সিঁড়ির মাঝপথে শাশ্বতী দেখলো হারীতের সঙ্গে উঠে আসছে প্রবীর মজুমদার। শাশ্বতী থামলো, মজুমদারও থামলো তাকে দেখে। আগের মতোই হাত জোড় ক'রে অনেকখানি মাথা

নোওয়ালো, আগের মতোই সমস্ত মুখ ভ'রে হেসে বললো; 'মিসেস নন্দী, ভালো আছেন ?'

শাশ্বতী ঘাড় হেলিয়ে বললো, 'আপনি ভালো ?'

'ভাগ্য আমার,' শাশ্বতীর মুখের উপর চোখ রাখলো মজুমদার, 'আপনারি সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।'

শাশ্বতী হাসলো, কী বলবে ভেবে পেলো না। সেই যেদিন মজুমদার তার মুখে—তাকেই বলতে হয়েছিলো কথাটা—প্রত্যাখ্যানের পাকা খবর নিয়ে ফিরে গিয়েছিলো, তারপর শাশ্বতী আর দ্যাখেনি তাকে, ভাবেনি আর দেখবে। স্বাতীর বিয়েতে মজুমদার আসবে তাও ভাবেনি। আসা তো কম কথাই—মজুমদারের বেশ উৎসাহই যেন; উপহার পাঠিয়েছে একেবারে একটা গ্রামোফোন, গাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে সারাদিনের জন্য, আর দেখাচ্ছে তাকে আগের মতোই খুশি। মানুষটা কী ?—নিঃসাড় ? মহৎ ? না কি তখন একটা উড়ো খেয়াল হয়েছিলো—সত্যিকার কিছু না ?

'আপনার গ্রামোফোনটি খুব সুন্দর,' শাশ্বতীর মনে হ'লো এ-কথাটা বলা যায়, উচিতও বলা।

'আমার তো না !' মজুমদার হাসলো।

হারীত তাড়া দিলো, 'চলুন।' এই কথাবার্তাটা বাজে লাগছিলো তার, কানও দেয়নি, কিন্তু মজুমদার কী-রকম বিগলিত ! আবার বললো, 'চলুন।'

'আচ্ছা, খুব ভালো লাগলো দেখা হ'য়ে,' মজুমদার বিদায় নিলো।

'আমারও,' আবার হাসলো শাশ্বতী, মাথার একটু ভঙ্গি করলো।

শাশ্বতী নামলো, মজুমদার উঠলো, হারীত একবার ফিরে তাকালো, আর শাশ্বতী যেন সেটা আশা ক'রেই যেতে-যেতে চোখ তুললো। নিজের স্ত্রীকে হঠাৎ খুব সুন্দর দেখলো হারীত।

না—মজুমদার ভদ্রলোক; আর-কিছু না, যাকে ভদ্রলোক ব'লে তা-ই। কত ভালো লাগলো মজুমদারের এই—এই অসাধারণ ভদ্রতায়—হ্যাঁ, অসাধারণ বইকি; যা হ'লো না সেটাকে কেমন মেনে নিলো, সুখী হ'লো সকলের সুখে। শাশ্বতীর সুখ এতে বেড়ে গেলো, ভাবলো এটা আমার উপরি-পাওনা, দিদিরা কেউ জানেই না ব্যাপারটা, স্বাতীর বিয়েতে আমার যতটা, ততটা ওদের কারোরই না। ভাবলো, ভুল করেছিলাম তখন, কিন্তু স্বাতী করেনি, সত্যেন ছাড়া কারো সঙ্গেই ওকে মানাতো না—সত্যি!—ঠিক মানুষের সঙ্গে ঠিক মানুষের দেখা হয়েছে, বিয়ে হচ্ছে; সুখী হবে ওরা, কত সুখী হবে, একটু খুঁত থাকবে না কোথাও। শাশ্বতীর মন সুখে ভ'রে গেলো, যেন আর ধরে না, যেন হাওয়ায় ভেসে-ভেসে চ'লে এলো সামনের ঘরটির দরজায়।

মেঝে-জোড়া ফরাশের উপর হলদে কার্পেট প'ড়ে আছে; পানের থালা ছাইয়ের বাটি ছড়ানো, লাল কার্পেট থেকে স'রে এসে মস্ত ঘরে একলা ব'সে আছে সত্যেন। তাড়াতাড়ি কাছে এসে শাশ্বতী বললো, 'বাঃ!'

সত্যেনের চোখে আভা দিলো ম্যাজেন্টা রঙের শাড়ি, হলদে আর সবুজে মেশানো জামা, সবুজ আর লাল পাথরে জাল-বোনা

নেকলেস। প্রথমে সে ঠোঁট দুটির নড়া দেখলো, তারপর কথা শুনলো : 'আপনাকে একা ফেলে চ'লে গেছে সবাই ! বেশ !'

'অরুণবাবু ছিলেন। আসবেন আবার। আর একা আমার ভালোই লাগছিলো।'

সত্যেনের নরম চোখে তাকিয়ে, নরম গলার কথা শুনে শাশ্বতীর মন উচ্ছল হ'লো, এখন ঠিক সুখে না, সুখ-ছাপানো অন্য-কিছু, নতুন বোধ এটা, আর-কোনো মানুষের জন্য তার জাগেনি ; মনে হ'লো, আমি এর জন্য কী করতে পারি ? শাশ্বতী অবাক হ'য়ে ভাবলো : স্বাতীর চেয়েও কি বেশি হ'লো সত্যেন ? অবাক হ'য়ে ভাবলো : একেই স্নেহ বলে ?

'একাই ভালো লাগছিলো ? তাহ'লে আমি না এলেই ভালো হতো ?'

সত্যেন তাড়াতাড়ি বললো, 'না, না, এটা আরো ভালো।'

শাশ্বতী হাসলো। এদিক-ওদিক চোখ ফেলে বললো, 'এখানে ফুল ছিলো না ?'

'আমি সরিয়ে রেখেছি। আর যদি অনুমতি করেন একবার উঠে দাঁড়াই।'

'নিশ্চয়ই !'

সত্যেন উঠলো তার পিছনে ঝলক দিলো লাল গোলাপের তোড়া দুটো।

শাশ্বতী বললো, 'ক্লান্ত লাগছে, না ? চা খেয়েছিলেন এসে ?'

'বোধহয়।'

'বোধহয় মানে ?'

সত্যেন কার্পেটের উপর কয়েক পা হাঁটলো। 'মানে—সকলকে যখন চা দিচ্ছিলো আমাকেও দিয়েছিলো এক পেয়ালা, কিন্তু খেয়েছিলাম কিনা ঠিক মনে পড়ছে না।'

সত্যেনের প্রত্যেকটা কথায় তাকে আরো ভালোবাসলো শাশ্বতী। 'আর-একটু খাবেন এখন ? অবশ্য উপোশের উপর বেশি চা খাওয়া ঠিক না।'

'উপোশ কেন ? আমি-তো খেয়েছি-টেয়েছি।'

'বে-শ ! এদিকে আমাদের মেয়ে কিছু খায়নি সারাদিন।'

'খায়নি ? আমি বলেছিলাম তো খেতে।'

শাশ্বতীর হাসি পেলো কথা শুনে। হাসি চেপে বললো, 'আমরাও বলেছিলাম, কিন্তু খেলো না কিছুতেই। আর, একটা দিন না-খেলেই বা কী। আপনি তাহ'লে—আমি চা নিয়ে আসি, কেমন ? এক্ষুনি আসবো।'

'আমি ভাবছিলাম—'

'কী ?'

'অন্য কোথাও বসা যায় কি ?'

'কেন, এখানে কী-হ'লো ?'

'একটা চেয়ার-টেয়ার যদি থাকে কোথাও—'

'ও !' শাশ্বতী চোখ দিয়ে হাসলো। 'আচ্ছা, আসুন।' সত্যেনকে নিয়ে এলো ভিতরের দরজা দিয়ে ছোটো একটা ঘরে, সেখানে তিন-পীস ড্রয়িংরুমের আসবাব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে রাখা।

সত্যেন একটা চেয়ারে ব'সে পিঠ জিরোলো। শাশ্বতী জিগেস করলো, 'এখন আরাম হচ্ছে ?'

'খুব। একটু বেশিই।'

'নীল রংটা কেমন?'

'এই চেয়ারের? খুব সুন্দর!'

'যাক। আপনার অপছন্দ হয়নি? তাহ'লেই হ'লো।'

কথাটা বুঝতে না-পেরে সত্যেন বললো, 'কেন?'

'বাঃ, আপনার জিনিশ—'

'আমার কেন?' সত্যেন একটু পরে আবার বললো, 'আমি এ-সব দিয়ে করবো কী। আর রাখবোই বা কোথায়?'

'ও-সব ভাববার লোকও তো হ'লো।' হাসির একটা ঝলমলানি রেখে শাশ্বতী চ'লে গেলো, একটু পরে ফিরে এসে ধোঁয়া-ওঠা এক পেয়ালা চা রাখলো সত্যেনের পাশে হলদে-কাচ-বসানো ছোটো টেবিলে।

সত্যেন বললো, 'আপনি একটু বসুন এবার।'

'না, বসবো না। আপনি খান।'

চায়ে চুমুক দিয়ে সত্যেন বললো, 'বাঁচলাম।' এতক্ষণে বুঝলো ভিতরে-ভিতরে চায়ের তেষ্টাই পাচ্ছিলো তার।

'ঠিক হয়েছে? চিনি বেশি হয়নি?'

'ঠিক। চমৎকার।'

শাশ্বতী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটু সত্যেনকে দেখলো, তারপর বললো, 'একটা কথা বলি আপনাকে।'

'বলুন।'

'আমাকে কিন্তু ছোড়দি ডাকতে হবে।'

'ডাকবো।'

'আর আমি কিন্তু কাল থেকে আপনাকে "তুমি" বলবো।'

সত্যেন মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'নিশ্চয়ই।'

'আপনিও আমাকে "তুমি" বলতে পারেন ইচ্ছে করলে।'

'তা-ই বলবো। কাল থেকে তো?'

'হ্যাঁ' কাল থেকে।'

আস্তে হেসে উঠলো দু-জনে একসঙ্গে। অরুণ ব্যস্তভাবে ঘরে এসে বললো, 'বাঃ, সত্যেনকে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছো, শাশ্বতী! এদিকে আমি ভাবছি কী হ'লো।'

'আপনাদের ভাবনা তো দেখলাম। মানুষটাকে একলা ফেলে চ'লে গিয়েছিলেন সব!'

'উপরটা দেখে এলাম একবার। সত্যেন তৈরি তো? বেশি আর দেরি নেই কিন্তু।'

'আমিও যাই। ওঁকে দেখবেন, অরুণদা—হারিয়ে-টারিয়ে না যায়।' শাশ্বতী যেতে-যেতে একবার ফিরে তাকালো সত্যেনের দিকে।

সোজা ছাতে এলো। মেরাপ-বাঁধা শামিয়ানা-খাটানো মস্ত ছাত, ব্ল্যাক-আউটের আর শীতের জন্য টেনিস-লনের মতো মোটা নীল পরদা-ঘেরা, আর-একটা পরদা চ'লে গেছে চিলকোঠার বরাবর ছাতটাকে ছোটো আর বড়ো দুটো অংশ ভাগ ক'রে দিয়ে। ছোটো দিকটায় বিয়ে হবে, আর বড়োটায় খাবার জায়গা—খাওয়া হচ্ছে। সরু-সরু লম্বা টেবিলে মুখোমুখি ডবল সারিতে ব'সে গেছে সব; পাঁচটা টেবিল ভ'রে পুরুষরা, আর

তিনটে ভ'রে মেয়েরা ; দেখাচ্ছে বেশ। দু-সার পিঠের মধ্য দিয়ে সরু পথে এগিয়ে এলো শাশ্বতী, খয়েরি শার্ট দেখে দাঁড়িয়ে বললো, 'ভালো ক'রে খাচ্ছো তো, নিখিল ?'

এক টুকরো ভেটকি-ফ্রাই মুখে তুলতে গিয়ে নিখিল ঘাড় ফেরালো, শাশ্বতীকে দেখতে পেয়ে অনেকখানি লাল হ'লো। শাশ্বতী আবার বললো, 'কী, কিছু চাই ?'

'না, কিচ্ছু না,' নিখিল চোখ নামালো টেবিলে পাতা ঘি-রঙের পাৎলা কাগজে, ছোটো-বড়ো খুরিতে ঘেরা মাটির লাল থালায়। চাইবার কী আছে ? শাক থেকে রসমালাই পর্যন্ত আমিষ নিরামিষ চাটনি মিষ্টি মিলিয়ে আঠারো রকম খাবার—হ্যাঁ, আঠারো, সে গুণে দেখেছে—একই সঙ্গে সাজানো, সুগন্ধি কেওড়া-জল, আলাদা একটি ছোট্ট থালায় লবঙ্গ-বেঁধা একটি পান পর্যন্ত সঙ্গে, পান যারা খায় না বোধহয় তাদের জন্য একটু সুপুরি মৌরি আর আস্ত একটি বড় এলাচ। বিয়ের নেমন্তন্নের যে-ছবি নিখিলের মনে আঁকা আছে, ছেলেবেলায় অনেকবার যা দেখেছে, তার সঙ্গে কিছুই এর মেলে না। সেই কুশাসন কলাপাতার ঘেঁষাঘেঁষি, গায়ের জামার নিচের দিকটা ভিজে যাওয়া, বেগুনভাজা পাতে নিয়ে ডালের জন্য ব'সে থাকা, ঝোলের উপর অম্বল, আর অম্বলের উপর দইয়ের গড়িয়ে যাওয়া, অন্য সব দিয়ে খাওয়া যখন প্রায় শেষ তখন হঠাৎ পোলাও মাংসের জাঁকালো আমদানি—ঘাম, গন্ধ, পরিবেশনের পরিশ্রম, কিছুই না ; আর—সবচেয়ে যা ভালো, আশ্চর্য, নিখিলের কাছে নতুন—চ্যাঁচামেচি হাঁকডাক নেই, চুপচাপ, যারা খাচ্ছে তাদেরই কথাবার্তার গুনগুনানি

শোনা যাচ্ছে শুধু। খাওয়াও যাচ্ছে বেশ বেছে-বেছে, আরামে ব'সে, স্বাধীনভাবে; আর যদিও আঠারো রকম খাবার, তবু সবই বেশ অল্প-অল্প ব'লে কোনোটাই প্রায় ফেলতে হয় না। ভেটকিটা শেষ করতে-করতে নিখিল আশেপাশের কথাবার্তায় কান দিলো।

'...কথাটা হচ্ছে আমরা এখন কী করবো।'

'আমরা?' গলাবন্ধ লম্বা কালো কোট-পরা শৌখিন চেহারার মাঝবয়সী একজন ভদ্রলোক হারীতের দিকে চোখ তুললেন। 'আমরা আর কী করবো। গোলাম আছি, গোলামই থাকবো।'

কেউ-কেউ হাসলো কথাটা শুনে। হারীতের মুখ লাল হ'লো, তার ছোট্ট হাসি ঘক ক'রে উঠলো। শাল-কাঁধে আর-একজন বললো, 'তাই-বা কেন? এই হয়তো আমাদের সুযোগ।'

'সুযোগ নিশ্চয়ই!' তীরের মতো প্রশ্ন ছোটালো হারীত, 'কিন্তু কিসের?'

ছোলার ডালের ছেচকি দিয়ে মটরশুঁটির কচুরি খেতে-খেতে মজুমদার একবার চোখ তুলে দেখলো মিসেস নন্দী সামনে দিয়ে চ'লে যাচ্ছেন। একটু তাকিয়ে থাকলো, কিন্তু চোখোচোখি হ'লো না। শাশ্বতী এগোলো, জলের জগ হাতে দু-জন লোক দু-দিকে চ'লে গেলো, দূরে দাঁড়িয়ে রেঙ্গুনি জামাইটি কাকে দেখে হাসলেন, আর অন্য দিকে, মেয়েরা যেখানে বসেছে সেখানে একবার ঝলক দিলো কালো মখমল-কাঁধের উপর রুপোর মতো আঁচল। না-এলেই পারতাম, আবার ভাবলো মজুমদার, সত্যি, কেন এসেছি? মনে

পড়লো মিসেস নন্দীর কাছে শেষ যেদিন—; অনেক কথাই বলবে ভেবেছিলো, কিন্তু বেশি বলতে হ'লো না ;—হ'লো না। বিজন তারপর এসেছিলো একটা পালক-ঝরা পাখির মতো চেহারা ক'রে, ফোঁশফোঁশ গর্জেছিলো ; তার প্রায় কিছু সে শোনেনি ; তার কানে আওয়াজ দিচ্ছিলো অনেকক্ষণ ধ'রে শুধু ঐ কথাটা—হ'লো না। কষ্ট পেয়েছিলো ? বুক ফেটে গিয়েছিলো ? না তো ! এ-অবস্থার যে-রকম বর্ণনা নভেল-টভেলে লেখে সে-রকম কিছুই তার লাগেনি। কষ্ট কিছু না, আর-কিছু না, শুধু অপমানের বিছের জ্বলুনি, না-পারার ধিক্কার। সে পারলো না, ফেল হ'লো ; সে, প্রবীরচন্দ্র মজুমদার, কুচোকেরানির ডালভাত খেয়ে বড়ো-হওয়া বড়ো ছেলে, আজ দেড়শো লোকের মনিব, বড়ো গাড়ি আর ছোটো গাড়ির মালিক, এই প্রথম সে কিছু চেষ্টা ক'রে পারলো না। না কি তেমন ক'রে চেষ্টা করেনি, তেমন ক'রে ইচ্ছা করেনি—যেমন ক'রে ষোলো বছর আগে মুঠো চেপে বলেছিলো, 'টাকা আমার চাই !'

'...কিছু বোঝে না কেউ ! আপনি কী বলেন ?' হারীত নন্দীর অন্তরঙ্গতা মজুমদারের কান কাড়লো।

'আমি ?—আমি ঠিক...'

'কথাটা খুব সোজা। আপনি কি ফ্যাশিস্টদের জয় চান ?'

হারীতের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থাকলো মজুমদার। গালের ভাঁজে-ভাঁজে বিনয় ঝরিয়ে নরম স্বরে বললো, 'আচ্ছা ফ্যাশিস্ট কাকে বলে ?'

হারীত হাত নেড়ে হেসে উঠলো।

'দয়া ক'রে যদি একটু বুঝিয়ে দেন, মিস্টর নন্দী,' গম্ভীর মুখে আরো নরম গলায় অনুনয় করলো মজুমদার। 'আমি লেখাপড়া শিখিনি, কিচ্ছু বুঝি না।'

'আমি তো কবে থেকেই ছেলেদের বলছি,' শ্লেষ্মা-ভরা চড়া গলায় আওয়াজ হ'লো তাদের পিছনে, 'বেশি আর পাশ-টাশ ক'রে কাজ নেই বাপু, এবার জাপানিটা শেখো!'

লোকটার চেহারা দেখার জন্য হারীত ক্ষিপ্র ঘাড় ফেরালো, আর মজুমদার সেই সুযোগে হাত দিলো শর্ষে দিয়ে ভাপানো চিংড়িতে।···পারলো না, চেষ্টা ক'রে পারলো না; আশা ম'রে গেলো, তবু লোভ তাকে ছাড়লো না। এই সেদিন বিজন যখন এলো কেমন চোর-চোর মুখে বোনের বিয়ের খবর দিতে—নেমন্তন্ন করতে—তাকেই দেখাতে হ'লো খুশি, উৎসাহ,—বিজনের কিন্তু-কিন্তু ভাবটা তাকেই কাটাতে হ'লো—আর দেখাতে গিয়ে সেটাই যেন সত্যি হ'য়ে গেলো। উপহার পাঠালো চারশো টাকার গ্রামোফোন, উপকার পাঠালো সারাদিনের জন্য বড়ো গাড়িটা; আর নিজেও এলো সময়মতো ভাগনিকে নিয়ে মূর্তিমান সৌজন্য সেজে। কেন? কৃতজ্ঞ করতে? মহত্ত্ব দেখাতে? বাজে! যে-কোনো সূত্রে, যে-কোনো শর্তে একটু সম্পর্ক পাতা, সম্বন্ধ রাখা, এই কি সে চায়? এই কি সে চায় না? এত কাঙাল সে?

'···তা পেনশনটা দেবে তো ঠিকমতো?' এক জোড়া জাঁদরেল শাদা গোঁফের ফাঁক দিয়ে সরু একটি প্রশ্ন পড়লো মজুমদারের ঠিক পিছনে, আর তার মুখোমুখি ব'সে কিরণ বক্সি রুইমাছের ফুলকপিটি মুখে তুলতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেলো।

'সত্যি কি এখন কলকাতার বাইরে ফ্যামিলি পাঠানো দরকার ?'

কিরণ বক্সির প্রশ্নটা হারীতকে লক্ষ্য করেছিলো, কিন্তু হারীত মুখ তুলে দু-গালের পেশী একবার একটু নাচালো শুধু ;—হাসতেই চেয়েছিলো, কিন্তু দেখালো ভেংচির মতো।

কিরণের খালি-হওয়া গেলাশে জল ঢেলে দিলো তার পিছনে দাঁড়িয়ে কোঁকড়া চুলের এক নবযুবক। নিখিল ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো, ডালিম এর মধ্যে আবার পোশাক বদলেছে ; ঢোলা পাঞ্জাবির বদলে এখন তার গায়ে ছাইরঙের ডোরা-কাটা সিল্কের শার্ট, আস্তিন-গুটোনো, কব্জিতে আবার সোনার ঘড়ি—ঘড়িটা কেন ?

চোখোচোখি হ'তে নিখিল বললো, 'ক-টা বাজলো, ডালিমবাবু ?'

ঘড়ির দিকে তাকাতে গিয়ে ঠাট্টা বুঝে লাল হ'লো ডালিম, এগিয়ে গেলো টেবিল-ফাঁকের গলি দিয়ে।

'···এখন যাদের পেনশন হবো-হবো তাদের আর ভাবনা কী। চাইলেই এক্সটেনশন !'

'নাকি ?'

'বাঃ, এ. আর. পি. সাপ্লাই—এই-যে, এখানে একটু জল। আঃ, খাশা পোনা !'

কথাটা শুনতে পেয়ে হেমাঙ্গ ছুটে এলো। 'আপনাকে আর-একটু···আর-কিছু···?'

'আচ্ছা জাপানিরা কি সোজা প্লেনে এসেই বোমা ফেলবে কলকাতায়, নাকি এয়ারক্রাফট-কেরিয়ার নিয়ে বে-অব বেঙ্গলে আসবে ?'

কিরণ বক্সির এই সূক্ষ্ম সামরিক প্রশ্নের উত্তরে হারীত মুখ পর্যন্ত তুললো না; যেন চারদিকে নির্বুদ্ধিতার ভারে নুয়ে প'ড়ে পোলাওয়ের পেস্তা-বাদাম খেতে লাগলো খুঁটে-খুঁটে, তারপর হঠাৎ দ্রুত আঙুলে মাংস মেখে নিয়ে চাখলো—মন্দ না-তো, বেশ। একটু খেয়ে নিয়ে খুব নিচু গলায় আরম্ভ করলো, 'শুনুন, ফ্যাশিস্ট হচ্ছে তারাই, যারা···'

'আপনি এক্সটেনশন নিচ্ছেন নাকি?'

'নাঃ, আমি আর···' বক্তার মুখের চর্ব পদার্থে বাকি কথা চাপা পড়লো। 'তবে রাজেন বোধহয়—'

'রাজেনবাবু? তিনি-তো পেনশনের দিন গুনছিলেন।'

'তপাল! তপাল!' এতক্ষণে প্রথম কথা বললেন খুব-বুড়ো একজন, রাজেনবাবুর সাক্ষাৎ ভগ্নীপতি, সেই বড়োপিসির শাদাচুলের লাল সিঁদুর যাঁর বেঁচে থাকার ইস্তাহার। 'বড়ো মেয়েটা বিধবা হ'য়ে···'

ডালিম তাড়াতাড়ি স'রে গেলো অন্যদিকে, শাশ্বতী তাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে ডাকলো; আর হারীতের নাছোড় ঘ্যানঘ্যান শুনতে-শুনতে—মানে, না-শুনতে-শুনতে—হঠাৎ একবার চোখ তুলতেই সেই হাতনাড়াটুকু মজুমদারের চোখে পড়লো।

'তেন রাজেনের তপালে এ-রতম?' দাঁত-পড়া মুখে 'ক' গুলি সব 'ত' শোনালো, তারপর একটু জোর দিয়ে বলতে গিয়ে 'স'টা সুদ্ধু 'ত' হ'য়ে গেলো, 'মানুষটা তৎ, তাই!'

'তা সত্যি!' সঙ্গে-সঙ্গে সায় দিলেন রেবতী সিংহ, রাজেনবাবুর প্রতিবেশী। 'অতি সজ্জন রাজেনবাবু! আমাদের পাড়ার মধ্যে—'

'দে তো আমাকে একটু জল। উঃ, এমন ঢেকেছে চারদিকে—'

'ভাগ্যিশ শীতকাল!' ডালিম গম্ভীর গলায় বললো, 'গরম পড়লে যে এই ব্ল্যাক-আউটে কী-ক'রে—'

'তদ্দিনই থাকবে ব্ল্যাক-আউট?' শাশ্বতীর চিন্তা হ'লো। 'কী-যে হাঙ্গামা, সত্যি! তা তুই যে জল নিয়ে? ওরা সব আছে তো।'

'আমিও তো আছি,' ডালিম মিষ্টি ক'রে হাসলো। তারপর হঠাৎ হাতের জগটা নামিয়ে কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটা খুলে পকেটে রাখলো।

'খুলে রাখলি যে?'

'অসুবিধে লাগে,' ডালিম একটু আবছা ক'রে হাসলো।

'মানিয়েছিলো কিন্তু। জামাইবাবুর ঘড়িটা—না?' হালকা গলায় এ-কথা ব'লে শাশ্বতী চ'লে গেলো মেয়েদের টেবিলের দিকে।

ডালিম একটু দাঁড়ালো, আলগোছে আবার প'রে নিলো ঘড়িটা।

'···স্বাতীটা তার বাপের প্রাণ! তাকে বিয়ে দিয়ে এখন—' কথা শেষ না-ক'রে কুন্দ-দিদিমা পাতের দিকে তাকালেন, বেসনে-ভাজা চাকতি-বেগুনে কামড় দিলেন এতক্ষণে।

'ও সবই স'য়ে যায়, সবই ঠিক হ'য়ে যায়,' হাসি-হাসি লীলামাসি পৌঁছলেন মাছের মুড়ো দিয়ে রাঁধা বাঁধাকপির ডালনায়।

'চিংড়িটা কী-অদ্ভুত ভালো!' শোভার ভরামুখ থেকে উৎসাহ উপচোলো।

'কোনটা না?' তক্ষুনি ব'লে উঠলেন বড়োপিসিমা। 'প্রতাপ ঠাকুরের রান্না—এর উপর কি আর কথা আছে!'

একটু দূর থেকে অনেকটা কমবয়সের একজন মহিলা জিগেস করলেন, 'বিখ্যাত বুঝি প্রতাপ-ঠাকুর ?'

'ও মা !' বড়োপিসি গালে হাত দিয়ে অবাক হলেন। 'প্রতাপ ঠাকুরের নাম শোনেননি আপনি ? তার বাপ ছিলো বিক্রমপুরের শ্রেষ্ঠ ঠাকুর, সারা দেশেও তো তার মতো—'

পিছনে দাঁড়িয়ে মহাশ্বেতা ছোট্ট চিমটি কাটলো বড়োপিসির কাঁধে।

'বাঃ !' জলপাইয়ের টকে এইমাত্র চিকচিকে হওয়া শাদা গোঁফের ফাঁক দিয়ে আওয়াজ বেরোলো। 'রাজেন ব্যবস্থাটি করেছে পরিপাটি, তা বলতেই হয়।'

'হ্যাঁ, উত্তম !'

'তোফা রান্না !'

'শেষ মেয়ের বিয়ে, খরচ করেছে খুব। আর জামাইরাও সব যোগ্য—'

'এটি কিন্তু পয়সায় খাটো হ'লো,' একটু নিচু গলায় মন্তব্য করলেন, সোনার চশমা-পরা, টাক-পড়া প্রৌঢ়, স্বাতীদের 'প্রভাত-মেসোমশাই, লীলামাসির স্বামী।

'তা হোক,' টম্যাটোর চাটনিতে ভেজানো আঙুলটা মুখ থেকে বের ক'রে রেবতীবাবু মত দিলেন, 'ছেলে খুব ভালো ! এতদিন ধরে দেখছি—আমার বাড়িতেই তো—চোখ তুলে তাকায় না কারো দিকে !'

'যেখানে তাকাবার সেখানে ঠিক তাকিয়েছে !' শ্লেষ্মাভরা চড়া গলার আওয়াজ হ'লো।

রুইমাছের লম্বা শাদা কাঁটাটি থালার ধারে সাজিয়ে চিত্রা বললো, 'মনে-মনে স্বাতীর এই ছিলো।'

'আমি তো কবেই বুঝেছিলাম!' অনুপমা হাসলো।

'কবে বুঝেছিলি?' চিত্রা যেন অবিশ্বাস করলো কথাটা।

'অনার্স ক্লাশে তো দেখিসনি। সত্যেনবাবু একবারও তাকান না স্বাতীর দিকে, আর স্বাতীও কক্‌খনো বই থেকে চোখ তোলে না!'

মস্ত, বয়স্ক, অত্যন্ত-সাজা, বিয়ে-না-হ'য়ে-বেমানান ইভা গাঙ্গুলি পুরুষের মতো মোটা গলায় বললো, 'তা তোমরা যে যা-ই বলো, প্রোফেসরের সঙ্গে ছাত্রীর এ-রকম—'

'আস্তে! ঐ-যে স্বাতীর ছোড়দি!'

'আপনি মুগের ডালটা খেলেন না?' একদম অচেনা একজনের দিকে ভুরু কুঁচকোলেন বড়োপিসি।

'কত খাবো!' লাজুক মহিলাটি নিচু গলায় বললেন।

'একটু মুখে দিয়ে দেখুন,' বড়োপিসির হাসিতে স্পষ্ট এই কথাটা ফুটলো যে এমন মুগের ডাল পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম রান্না হ'লো, দ্বিতীয়বার আর হবে না।

'আপনি তো কই খাচ্ছেন না, শুধু কথাই বলছেন,' বললেন লাল-পাড় গরদ-পরা একজন পরিতৃপ্ত প্রৌঢ়া, হারীতের মা।

'এই-যে খাই,' বড়োপিসি পোলাওয়ে হাত দিলেন।

'তা-আ-বেশ!' মুখ খুলে-খুলে সোনা বাঁধানো দাঁতে মাংস চিবোতে-চিবোতে বয়সের পক্ষে বেখাপ্পারকম রংচঙে শাড়ি-পরা এক গিন্নির এইমাত্রই যেন মনে পড়লো নিমন্ত্রণের উপলক্ষ্যটা। 'বে-শ বিয়ে হ'লো। যা দিনকাল, তাতে মেয়ের পাত্র জোটানো—'

'যা বলেছেন!' বড়োপিসি খাওয়া থামিয়ে গম্ভীর মুখে তাকালেন। 'চারদিকেই তা-ই—একটি-দুটি পার করতেই গলদঘর্ম এক-একজন। আর আমাদের পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে—' বড়োপিসির সমস্ত মুখ মধুর একটি হাসিতে উদ্ভাসিত হ'লো, চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, 'পাঁচটিরই যেন উড়াল দিয়ে বিয়ে হ'য়ে গেলো—একটার বেশি কথা না—চোখে দেখলো কি লুফে নিলো। আর জামাইও এক-একটি—'

'আঃ! থামো তো তুমি!' মহাশ্বেতার ফিশফিশে গলা অনেকেই শুনলো, কিন্তু কথাটা যাঁকে বলা তিনিই যেন শুনতে পেলেন না।

'তা দেখুন আমাদের মেয়েরা তো আর নিজেরাই বর ধরতে ছোটে না!' বললেন রেবতী-গিন্নি টেবিলের একধারে ব'সে পাশের চেয়ারের পাশের বাড়ির মেজবৌর কানে-কানে।

মেজবৌ কথা না-ব'লে হাত ওল্টালেন! তাঁর আংটির পাথর থেকে একদানা পোলাও ঝ'রে পড়লো।

'স্বাতী নিশ্চয়ই কলেজ ছেড়ে দেবে?'

'সে-তো দিতেই হবে,' জবাব দিলো ইভা গাঙ্গুলি, তার ভাইস-প্রিন্সিপাল মামার কর্তৃত্বের সুরে।

'বেশ ছিলো স্বাতীটা,' একটু বিষাদ লাগলো অনুপমার গলায়। 'মনে আছে সেই এনশেণ্ট ম্যারিনরের [illegible]?'

'আর সেই-যে একদিন ট্র্যামে ফিরছিলাম, সত্যেন রায় উঠলেন?'

একসঙ্গে ছোটো নিশ্বাস পড়লো অনুপমার, চিত্রার। সে-সব দিন যেন কত দূরে চ'লে গেছে এরই মধ্যে।

'সুপ্রীতির চিঠিপত্র পাস?'

'কই আর? বিয়ে হ'য়ে গেলে আর বন্ধুরা!'

'কে-যে কার মধ্যে কী দেখতে পায়!' ইভা গাঙ্গুলি তার পুরুষের গলা অনেকটা নামালো, কিন্তু তাও বেশ চড়া শোনালো অন্য দু-জনের নিচু গলার পরে। 'সত্যেন রায়ের মতো ব্রিলিয়ান্ট ইয়ং ম্যান—তার আরো, আরো একটু—'

কথা শেষ না-ক'রে ইভা গাঙ্গুলি এখনো-না-ছোঁওয়া খাবার থেকে চোখ দিয়ে বাছতে লাগলো: একটু দূর থেকে তার মুখের উপর পড়লো ছ-কোণ চশমা-পরা তীক্ষ্ণ চোখ, আর এতদিনের মধ্যে এই প্রথম তার মুখে সত্যেন রায় সম্বন্ধে সপ্রশংস কিছু শুনে চিত্রা অনুপমা অবাক হ'য়ে তাকালো।

'—তার আরো অ্যাম্বিশন হওয়া উচিত ছিলো.' টকের খুরি থেকে আলগোছে জলপাইটি তুলে নিয়ে কথা শেষ করলো ইভা। 'মামা তো বলেনই, "কেন যে সত্যেন এখানে প'ড়ে আছে জানি না: কত ভালো চাকরি ওর হ'তে পারে। ঐ ওর দোষ—অ্যাম্বিশন নেই!" '

'কিছু মনে করবেন না,' ঘেঁষাঘেঁষি টেবিলে যতটা সম্ভব এগিয়ে এলো ছ-কোণ-চশমা-পরা রংমাখা মুখটি, 'কিছু মনে করবেন না, আপনাদের কাউকে চিনি না—আপনাদের কথার মধ্যে কথা বলছি—আপনারা স্বাতীর বন্ধু তো? আমিও স্বাতীর বন্ধু—আর আমি এ-কথা নিশ্চয়ই বলবো যে স্বাতী অসাধারণ মেয়ে, এবং সত্যেনবাবু অসাধারণ—ভাগ্যবান।'

এই প্রোচ্চার বক্তৃতাটি শুনে ইভা গাঙ্গুলি সুদ্ধু হকচকালো,

আর চিত্রা যেন এতে জোর পেলো তার আন্তরিক একটি অভিমত ব্যক্ত করার, 'সত্যেনবাবু দেখতে কিন্তু ভালো না।'

'দেখতে ভালো কিনা জানি না, তবে খুব অ্যাট্রাক্‌টিভ!' স্পষ্ট উচ্চারণে কথাটা ব'লে উঠলো ছিপছিপে কালো একটি মেয়ে, মাত্রই একটি ঢাকাই শাড়ি পরা, এবার তাদের সঙ্গে নতুন ভরতি-হওয়া।

'এখন আবার বেশি অ্যাট্রাক্‌টিভ হ'লে বিপদ!' ইভা বাঁকা হাসলো কালো মেয়েটির দিকে তাকিয়ে।

'আপনাদের কারো কিছু, আর কিছু...' শাশ্বতী তাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

ঊর্মিলা বললো, 'একটু জল, ছোড়দি।' বিজনকে বিজুদা বললেও শাশ্বতীকে এর আগে ছোড়দি বলেনি সে, কিন্তু এখন বললো এইজন্য যাতে অন্যেরা বুঝতে পারে তার সঙ্গে এদের কত ঘনিষ্ঠতা।

'জল ? এই-যে—' এদিক-ওদিক তাকালো। শাশ্বতীর চোখোচোখি হ'লো ডালিমের সঙ্গে, চোখ দিয়ে তাকে ডাকলো।

কর্তব্যপরায়ণ ডালিম বাধ্য হ'য়ে এগোলো। এতক্ষণ ঘুরে-ঘুরে অন্য সব টেবিলের অনেক খালি-হওয়া গেলাশেই সে জল দিয়েছে, সযত্নে এড়িয়ে গেছে এই একটি টেবিল। ওখানে যারা ব'সে আছে তাদের দিকে দূর থেকে তাকাতে গেলেও চোখের পাতা যেন ভারি হ'য়ে নেমে আসে। কেন এ-রকম? কেন মেয়েরা এত সুন্দর, আর কিছুতেই কেন তাদের কাছে যাওয়া যায় না ?

শক্ত, গম্ভীর মুখে, প্রাণপণে লাল-না-হবার চেষ্টা করতে-করতে,

উর্মিলার গেলাশে জল ঢালতে লম্বা ডালিম নিচু হ'লো। একটা গন্ধ লাফিয়ে উঠলো তার দিকে—কেমন, কেমন-কেমন, নতুন, অদ্ভুত, আশ্চর্য গন্ধ।

'আমাকে একটু জল দিন তো,' স্পষ্ট গলায় কথাটা যে বললো ডালিম তাকে আগেও একবার দেখেছিলো—বড়োমাসির কী-রকম ননদ যেন—আর খানিক আগে সিঁড়িতে একবার—ঠিক ছাখেনি, ঠিক দেখতে পায়নি, শুধু একটা রূপের আভা, রঙের ঝলক চমকে গিয়েছিলো তার চোখের সামনে। টিপিটিপি কয়েক চেয়ার সরলো ডালিম, আস্তিন-গুটোনো ঘড়ি-বাঁধা ফর্শা হাতে জলের জগ উঁচু করলো, আর ঠিক তখনই, একেবারে অকারণে রূপসীটি মুখ তুললো, ন'ড়ে উঠলো চাকার মতো কানবালা, ঠোঁটের উপর পাৎলা গোঁফে আলো পড়লো। জগটা হঠাৎ ভারি হ'য়ে গেলো ডালিমের হাতে, আর এমন বেয়াড়া হ'য়ে উঠলো যে ডালিম গায়ের জোরে চেপে ধরতে-ধরতেও উপচে পড়লো জল, গেলাশ ছাপিয়ে, টেবিলের পাৎলা কাগজ ভিজিয়ে, ঝ'রে পড়লো ঝলমলে বেনারসিতে, গড়িয়ে নামলো মখমলের জুতোয়, পৌঁছলো আশে-পাশে ছোট্ট ছিটে হ'য়ে। মহাশ্বেতার কী-রকম-যেন ননদটি একবার নিচু হ'য়েই ক্ষিপ্র মুখ তুলে কটমট ক'রে তাকালো ডালিমের দিকে, তার রম্য ঠোঁটের উপর পাৎলা সোনালি গোঁফ আরো স্পষ্ট দেখা গেলো এবার; আশে-পাশে হাসি বইলো ঝিরঝির; শাশ্বতীর মেজো-জা—যিনি শাশুড়ির সান্নিধ্য এড়াবার জন্য তরুণীটেবিলেই বসেছিলেন—অবশ্য নিজেও তরুণী, কিন্তু বিবাহিত আর অবিবাহিত মেয়েতে তো জন্মান্তরের তফাৎ—

শাশ্বতীর মেজো-জা বেদরকারি ছোটো-ছোটো জলের ঢোঁকে হাসি চাপতে চেষ্টা করলেন, আর টেবিলের একধারে ব'সে জলতরঙ্গ বাজনার মতো হেসে উঠলো তিনটি ফুটফুটে পরী, পাশাপাশি একজন লাল, একজন সবুজ, অন্যজন কমলারঙের।

মুখভরা সন্দেশ, খেতে-খেতে গরম লেগেছে ব'লে খয়েরী শার্টের গলার বোতামটা খোলা, নিখিল হাসির শব্দে ঘাড় ফেরালো। হাসতে গিয়ে তিনজনেই পিছনদিকে হেলেছে, তাই তিনজনকেই এবার একটু স্পষ্ট দেখতে পেলো নিখিল, আর খুব স্পষ্ট দেখলো ডালিমকে, ছিমছাম, সুশ্রী, গ্রে স্ট্রাইপের দুরস্ত একটি শার্ট পরা, নিচু মাথায় চুলের ঢেউ দেখিয়ে জলের জগ হাতে সেইখানটাতেই দাঁড়িয়ে। নিখিল কিছু জানলো না, শুধু দেখতে পেলো; তার মনে হ'লো ডালিমের মুখও হাসি-হাসি; হঠাৎ ঈর্ষার একটা ঝাপট দিলো তার মনে, কাঁচা ছানার চমৎকার বরফিটা আটকে গেলো গলায়।

কিরণ বক্সি জিগেস করলো, 'তাহ'লে সত্যি জাপানিরা বোমা ফেলবে কলকাতায়?' কাকে জিগেস করলো নিজেই জানলো না, 'তাহ'লে'টাও অর্থহীন; কেননা এর আগে তার আরো দুটো সূক্ষ্মতর, গুরুতর প্রশ্নের—'কলকাতা ছেড়ে মিনিমম কত মাইল দূরে ঠিক নিশ্চিত বলা যায়?' 'ডিরেক্ট হিট না-হ'লে তো আর কিছু হবে না?'—কোনো তরফ থেকে কোনো জবাব পায়নি; খেতে-খেতে নিজের ভাবনা ভেবেছে, তার শ্বশুরের গোঁ, তার আসন্ন, অনিশ্চিত অনীতাহীন অবস্থা, চিরস্থায়ী কলকাতায় এই কল্পনাতীত অঘটন, আর তারই সুতো ধ'রে-ধ'রে এইমাত্র-পাতে-পড়া

পাঁপরভাজা ভাঙতে গিয়ে এই আদি প্রশ্নটাই আবার খুব জরুরি সুরে বেরিয়ে গেছে তার মুখ দিয়ে।

'না, বোমা ফেলবে না,' মসৃণ জবাব দিলেন লম্বা-কোট-পরা, লম্বা জুলপিওলা শৌখিন ভদ্রলোকটি, 'গোলগাল শহরটিকে আস্ত মুখে পুরবে—এইরকম,' ব'লে মুখ উঁচু ক'রে দু-আঙুলে-ধরা রসগোল্লাটি একটু দূর থেকে আস্ত ফেলে দিলেন জিভের উপর।

ফিফ্‌থ কলাম! সব ফিফ্‌থ কলাম! না—সব না, আমরা আছি! লড়বো, রুখবো, জিতবো আমরা—ছারপোকার মতো টিপে-টিপে মারবো এক-একটাকে! ভাবতে-ভাবতে হারীতের মুখ হিংস্র হ'য়ে উঠলো, আঙুলগুলি দ্রুত নড়তে লাগলো থালার উপর, খামকা কিছু-একটা তুললো থালা থেকে—খাওয়া তার হ'য়ে গিয়েছিলো অনেকক্ষণ, আদ্ধেক জিনিশই ছোঁয়নি - চোখে না-দেখে চিবিয়ে ফেললো টোম্যাটো-চাটনির আদার কুচি। ওঃ—ঝাল!

'আমাকে পাঁপর না!' জিভের ঝাঁঝে মনের ঝালে মিশে কথাটা ক্রুদ্ধ শোনালো, উগ্র ধমকের মতো।

হারীতের শিষ-টানা শুনে মজুমদার তার মোলায়েমতম গলায় বললো, 'কোনটা ঝাল লাগলো, মিস্টর নন্দী?'

উত্তরে হারীত একটু ভালোমানুষি হাসির চেষ্টা করলো।

'একটু মিষ্টি খান—এই এটা বেশ উপাদেয় মনে হচ্ছে!' মজুমদার তার পরিষ্কার পাতে খুরিসুদ্ধু রসমালাই তুললো, একটু-একটু পাঁপর ভেঙে তা-ই দিয়ে তুলে-তুলে খেতে লাগলো। 'দেখছেন তো পাঁপরের সুবিধে—চামচেতে চামচে, খাওয়াতে খাওয়া। কিন্তু আপনি বুঝি পাঁপর ভালোবাসেন না?' ব'লে

সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে হারীতের দিকে তাকাতে গিয়েই হঠাৎ তার মুখের ভাব বদলালো, চোখ স'রে গেলো, মাংসল ঠোঁট কমনীয় হ'লো, চোখে ফুটলো ঠাট্টার বদলে গভীরতা. চোখোচোখি হ'লো সামনে দিয়ে চ'লে যাওয়া শাশ্বতীর সঙ্গে।

'থাকছেন তো ?' ঘাড় হেলিয়ে কথাটা ব'লে শাশ্বতী একটু তাড়াতাড়ি এগোলো। নিচে এখন—এতক্ষণে স্বাতীকে সাজানো বোধহয়—কিন্তু মোড় নিয়ে হঠাৎ থামলো বাবাকে দেখতে পেয়ে। দূরে, কোণে, যেখানে আলো একটু কম, সেখানে জলের জালা আর থালা-গ্লাশের স্তূপের কাছে বাবা দাঁড়িয়ে আছেন হেমাঙ্গ-দার পাশে। শাশ্বতী যেন অনেকক্ষণ পর বাবাকে দেখলো, যেন অন্যরকম দেখলো। বাবার মুখটা যেন ছোটো, মানুষটাই যেন ছোটো হ'য়ে গেছেন আগের চাইতে। রেখা-পড়া মুখ, কুঁকড়োনো চোখ, গলার চামড়া ঢিলে, গায়ে সেই ছাইরঙা আলোয়ানটি কেমন বিষণ্ণতার মতো জড়ানো—দূর থেকে, আর বাবা অন্যদিকে তাকিয়ে ছিলেন ব'লে, সবই যেন খুব স্পষ্ট দেখলো শাশ্বতী। ফিরলো—যদিও নিচে যাবার গরজ তার খুব; টেবিলফাঁকের উজ্জ্বল গলি দিয়ে, যুবকদের চকচকে চুল আর মেয়েদের রংবাহার শাড়ি-গয়নার ধার ঘেঁষে, পাঁপর-পরিবেষকদের ঝুড়ির ধাক্কা বাঁচিয়ে, দূরের কম-আলোর কোণের দিকেই শাশ্বতী যেতে লাগলো। বাবাকে বলার কোনো জরুরি কথা যে তার মনে প'ড়ে গিয়েছিলো তা নয়, বাবাকে বলার কিছু কথা যে তার ছিলো তাও নয় ;—কিছুই না, শুধু মনে হ'লো একবার যাই।

'আমাদের দেশের অসুবিধে হচ্ছে যে কোনো পলিটিকাল

এডুকেশন নেই,' আদার ঝাল সামলে নিয়ে হারীত তার গাম্ভীর্যে ফিরলো।

মজুমদার তখন জল খাচ্ছিলো, কিন্তু জলের গ্লাশ নামিয়েই কথা বললো না। নেবুতে কচলে নিয়ে গ্লাশের বাকি জলে ডুবিয়ে হাত ধুলো, বাঁ হাতে বিলিতি সুতির রুমাল বের ক'রে ঘ'ষে-ঘ'ষে হাত মুছলো; সেটা দুমড়ে বাঁ পকেটে ফিরিয়ে ডান পকেট থেকে বের করলো মস্ত ময়ূরকণ্ঠী সিল্কের রুমাল, সেটি একবার ঠোঁটে বুলিয়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'সিল্কের রুমালের অসুবিধে এই যে তাতে ঠিকমতো হাত মোছা যায় না। সেইজন্য বিয়ের নিমন্ত্রণে আসতে হ'লে আমি দুটো আনতে ভুলি না।' হারীতের দিকে একচোখ তাকিয়ে তখনই আবার বললো, 'কিন্তু আপনার কথা খুব সত্যি! এই দেখুন না—আমি এটা পর্যন্ত জানতাম না যে জাপানিরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জ্যান্ত গোরু কেটে-কেটে খায়! কত শিখলাম আজ আপনার কাছে।

হারীতের নাকের বাঁশি দুটি একটু ফুলে-ফুলে উঠলো, মজুমদারের রেশমি রুমাল তাতে উপহার দিলো ল্যাভেণ্ডরের গন্ধ, হারীত ফোঁশ ক'রে নিশ্বাস ফেললো। না, রাগবে না; রাগলে কিছু হবে না; শত্রুপক্ষকেও কাজে লাগানো চাই, তবে তো! আপাতত লোকটার সঙ্গে জুটতে পারলে এই খেয়ে-টেয়ে আর হাঁটতে হয় না। হারীত অমায়িক তাকালো, যেন ঠাট্টা বোঝেনি, কিংবা সেও যোগ দিচ্ছে ঠাট্টায়; আলগোছে বললো, 'আপনি এখন কোন দিকে?'

'আমি এখন—' মজুমদার থামলো। এখন বাড়ি? এখনই? আর কোথায়? কোথাও সুখ নেই!—সুখ! যারা কিছুই পেলো

না, সুখ নামক বিখ্যাত বস্তুটা তো তাদেরই কনসোলেশন প্রাইজ! সে কী করবে সুখ দিয়ে?

'যদি আপনার পথে পড়ে আমাকে নামিয়ে দিতে পারেন?' হারীত খুলেই বললো কথাটা।

মজুমদার ফিরে তাকালো। 'আপনি থাকছেন না?' অবাক হওয়ার সুর লাগলো তার গলায়।

'আমি ভাবছিলাম—মানে, কথাটা হচ্ছে এই বিয়ে ব্যাপারটা এত বোরিং!'

'কোনটা? অনুষ্ঠানটা না পরের অবস্থাটা?—কিছু মনে করবেন না; আপনি অভিজ্ঞ, আপনার কাছে জেনে নিচ্ছি।'

কথাটা কিরণ বক্সির বিশ্রী লাগলো, কিন্তু সেই জুলপিওলা ভদ্রলোকটি আর আরো দু-জন হাসলেন কথা শুনে, কিন্তু হারীত হাসতে গিয়ে থেমে গেলো, যেন এইমাত্রই তার মনে পড়লো যে এই মজুমদার স্বাতীর জন্য সচেষ্ট হয়েছিলো, আর হঠাৎ, এমন-যে চৌকশ ছেলে হারীত নন্দী, তারও একটু অপ্রতিভ লাগলো যেন, আর সুখী শাশ্বতী বাবার পাশে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে উজ্জ্বল দৃশ্য দেখতে লাগলো। ভাঙবার আগে আসর জমাট; আগের চেয়ে সরব এখন, গলা আরো খোলা; অনেকের খাওয়া শেষ, তারা সোৎসাহে কথা ছিটোচ্ছে আশে-পাশে, আর দূরে-বসা চেনা লোকের দিকে হাত নাড়ছে; কেউ হেলান দিয়ে পান চিবোচ্ছে আরামে, কেউ টেবিলে হাত রেখে ওঠার জন্য তৈরি; অনেকে গ্লাশের জলে হাত ধুচ্ছে। মেয়েদের আর বুড়োদের টেবিলে মিষ্টি চলছে এখনো, ভূপেশ-দাদু চোদ্দটা রসগোল্লা খেলেন, সবাই খুব হাসলো।

'চমৎকার খাওয়া হয়েছে, বাবা। খু—ব ভালো খেয়েছে সবাই,' শাশ্বতী জ্বলজ্বলে মুখে বাবার দিকে তাকালো।

'না, না, আপনি থাকবেন না তা কী হয়?' মজুমদার নিচু গলায় বললো হারীতকে। 'কী মনে করবে সবাই? আর মিসেস নন্দী—'

শাশ্বতী বললো, 'বাবা, চলো এখন। সিঁড়িতে ভিড় আরম্ভ হ'লে আর—'

'...আপনাকে থাকতেই হবে!' মজুমদার হারীতকে পীড়াপীড়ি করলো।

'আপনি থাকছেন?'

থাকবো? মিসেস নন্দী ব'লে গেলেন না? আঃ—ও-রকম তো সকলকেই ব'লে! আর বললেই থাকতে হবে? না—খুব হয়েছে, আর না! নন্দীকেই বা আমি কেন? আমি কে? আমার কী? আর এই হিন্দুবিবাহের পবিত্র পুতুলখেলা দেখার চাইতে আরো অনেক ভালো-ভালো ব্যাপার আছে কলকাতায় শীতের রাত্রে! এই লড়াই-খ্যাপা জগাইটাকে সেখানে ধ'রে নিয়ে গেলে কেমন হয়? মজুমদারের বেজায় হাসি পেলো কথাটা ভেবে, কিন্তু হাসি চেপে গম্ভীর গলায় হারীতের প্রশ্নের জবাব দিলো, 'আমি? আপনি এখানকার যা, আমি কি তা-ই?' কথার শেষে বড়ো-বড়ো দাঁত দেখিয়ে হাসলো।

হারীত মনে-মনে খুব তারিফ করলো লোকটাকে। এ-রকম বলতে, এ-রকম হাসতে সেও পারতো না।

মেয়ের সঙ্গে যেতে-যেতে রাজেনবাবু একবার বয়স্কদের টেবিলে দাঁড়ালেন, শোভা ভাবলো নিচে গিয়েই পেটিকোটের দড়িটা ঢিলে

করতে হবে, নিখিল ভাবলো ডালিমকে আর দেখছি না কেন, ইভা বললো কলকাতার ক্রিসমাসটা এবার মাটি হ'লো, তোমরা কোথায়, লীলা-মাসি ভাবলেন উনি তো এখনই যেতে চাইবেন কিন্তু আমি বিয়ে না-দেখে, কুন্দ-দিদিমা একসঙ্গে চারটে পান মুখে পুরলেন, হারীত ভাবলো আচ্ছা তাহ'লে তামাশাটা, কিন্তু আমরা সব ব'সে আছি কার জন্য, শাশ্বতী বাবার জামা ধ'রে টান দিলো, তার মেজো-জা ভাবলেন বাবলাটা উঠে পড়েনি তো এতক্ষণে, ঊর্মিলা আরো ক-টি এলাচদানা মুখে দিলো, আর মহাশ্বেতা ভাবলো মেয়েটির চুল কি ঐ-রকমই না কলে কোঁকড়ানো। 'আমরা ছুটি হ'লেই জামতাড়া, তারপর কী হয় না হয়—' বলতে-বলতে ইভা উঠলো, হারীত উঠলো, প্রভাত-মেসো আর রেবতী-গিন্নি উঠলেন, সবাই একসঙ্গে উঠলো হু-উ-উশ্ শব্দে, যুবকরা কেউ-কেউ উঠতে-উঠতেই সিগারেট ধরালো, নিখিল ছুটলো একতলায় পকেটের স্টেট এক্সপ্রেসের নিরিবিলি সদ্গতি করতে, চেয়ার-ঠেলা চলাফেরা শুরু হ'লো, দাঁত-পড়া পিসেমশাই কাশলেন, একবাড়ির মেয়ে-পুরুষ পরস্পরকে খুঁজলো, যাক ট্র্যামের সময় আছে এবার তাহ'লে, হেমাঙ্গ স'রে-স'রে এলো কম-আলোর কোণ থেকে বিয়ে হবার দিকটায়, ঊর্মিলা তার মামাকে বললো আর গোঁফওলা মেয়েটি বললো মহাশ্বেতাকে, মহাশ্বেতা এগোলো সিঁড়ির দিকে, আর তার পাশ দিয়ে ঝলকে চ'লে গেলেন লাল কমলা সবুজ তিনজন, হালকা নামলো সিঁড়ি দিয়ে, হাসতে-হাসতে মাঝপথে ছাড়িয়ে গেলো দাদুকে আর মাসিকে, লাফিয়ে নামলো দোতলায় ডুম্।

দোতলায় এসে শাশ্বতী বললো, 'স্বাতী যা উপহার পেয়েছে, সব তুমি দেখছো, বাবা ?'

'সব দেখিনি,' একটু-যেন ভেবে রাজেনবাবু জবাব দিলেন।

'দেখবে ? এসো। এসো না একবার।' শাশ্বতী বাবাকে নিয়ে এলো সেই ঘরে, যেখানে বর আসার সময় মহাশ্বেতা শুয়ে ছিলো। টাটকা নতুন ড্রেসিং-টেবিলে ব'সে ডালিম খুব নিবিষ্ট হ'য়ে চুলে চিরুনি টানছিলো, ঘরে আওয়াজ পেয়ে তড়াক ক'রে উঠলো।

'ডালিম এখানে ?'

'আমি—এই—এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—দেখলাম ঘরটায় কেউ নেই, তাই—অনেক সব জিনিশ-টিনিশ তো আছে, খালি ফেলে রাখা কি ঠিক ?'

'মোটেও ঠিক না!' ঠোঁট গোল ক'রে, চোখ টান ক'রে শাশ্বতী বললো।

'আর সবাই তো প্রায় তেতলায়,' গম্ভীর ডালিম আরো যুক্তি দিলো, 'আমি তাই—'

'তুই বুঝি কোনো কাজে না-লেগে ছাড়বিই না ?'

ডালিম ঘাড় পর্যন্ত রাঙলো। তাকে অত লাল হ'তে দেখে শাশ্বতীর মনে পড়লো সেই জল ঢালার দুর্ঘটনা, যেটা, অবশ্য, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলে গিয়েছিলো সে।

'তবে এক কাজ কর: নিচে তোর নতুন মেসোকে একবার দেখে আয়।'

'না, সেজোমাসি, মেসো না ?'

'আচ্ছা, তবে তোর সত্যেনদাকেই—'

'নিশ্চয়ই !' ডালিম সৈনিকের মতো সোজা হ'লো। 'কিছু বলতে হবে ?'

'এই—একটু কথা-টথা বলবি আরকি। একাই হয়তো আছে এতক্ষণ।'

'আচ্ছা,' নিস্তেজ শোনালো ডালিমের গলা। এর চেয়ে সেজোমাসি তাকে বললেন না কেন এই আলমারিটা ঘাড়ে ক'রে নিচে নিয়ে যেতে ? সত্যেনদার সঙ্গে কী-কথা বলবে সে ? প্রথমে কী বলবে ? না কি ঐ উনিই আগে কিছু বলবেন ? চিন্তিত ডালিম এগোলো, দরজার ধারে থামলো তেতলার সিঁড়িতে পায়ের শব্দে। মুখ ফিরিয়ে হালকা গলায় বললো, 'সেজোমাসি, ঐ-তো নেমে আসছে সব—আমি তাহ'লে—কী বলো ?'

সেজোমাসি জবাব দিলেন না, মনে হ'লো না শুনতে পেয়েছেন। তাঁর আঁচল-ঝরা পিঠের দিকে একবার তাকিয়ে ডালিম স'রে পড়লো।

'...এই টিশু-শাড়িটা দিয়েছেন লীলামাসি, সাচ্চা রুপো বাবা,' থরে-থরে শাড়ি-সাজানো আলনার কাছে দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দ্রষ্টব্যগুলি ছুঁয়ে-ছুঁয়ে শাশ্বতী বলতে লাগলো—'আর তপনদা এই ফ্রেঞ্চ শিফন—স্কাই-ব্লু—রাত্তিরে রংটা ঠিক—পরেশ-কাকা এই মেরুন রঙের মুর্শিদাবাদ সিল্ক, আর এই—এই ঢাকাই জামদানিটা —এটা শোভাদি দিয়েছে—' শেষের কথাটায় শাশ্বতীর গলা নিচু হ'লো, একটু লজ্জিত যেন, যেন বলতে চায় শোভা তার অবস্থার পক্ষে খুব দিয়েছে।

'বেশ জামদানিটা,' রাজেনবাবু মেয়ের দিকে তাকালে একবার।

'হ্যাঁ, খুব ভালো!' একটু-যেন বেশি উৎসাহ শাশ্বতীর গলায়—'ভুটের শাড়ি—টাকা বারো কি দাম না হবে! আর জংলি শাড়িটা ছাখো—এ-রকম তুটো হ'য়ে গেলো—আর জানো বাবা, শোভনা-শাড়ি—ঐ-যে নতুন একরকম ডুরে বেরিয়েছে আজকাল—সে-রকম পাঁচখানা পেয়েছে!'

'আচ্ছা আমি—' রাজেনবাবু নড়তেই শাশ্বতী তাঁকে কাঁধের কাছে ধ'রে বললো, 'এদিকে—এদিকে একটু দেখে যাও, বাবা—' নিয়ে এলো ড্রেসিং-টেবিলের ধারে—'ফুলদানি তুটো বেশ নতুন ধরনের, না বাবা? আর এই গালার কাজ-করা ছোট্ট বাক্সটা কী মিষ্টি—আর এই জয়পুরি মিনেরটা!—আর. ছাখো—' শাশ্বতী দেরাজ ধ'রে টান দিলো—'এই কলমটা—নিউ মডেল লেডিজ পার্কার—স্বাতীর বন্ধুরা মিলে দিয়েছে—আর দেখছো—কতগুলো সিঁতুর-কৌটো!—আমার এই হাতির দাঁতেরটাই সবচেয়ে ভালো লাগে—কিন্তু কী-বা হবে এত দিয়ে! আর এই রুপোর ফ্রেমের আয়নাটা—' শাশ্বতী এক দেরাজ বন্ধ ক'রে আর-এক দেরাজ খুললো, তারপর আরো একটা—কিছু-একটা ছুঁলো, কোনো-একটা তুলে দেখলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে নিজেই নিজের উৎসাহে অনর্গল বলতে লাগলো, 'টয়লেট-সেট···টিংকেট-বক্স···কাশ্মিরি কাজ···'

'কই গো, এ-ঘরে কেউ আছে টাছে নাকি?' দরজার কাছে গিন্নি-গলার ভারি আওয়াজ হ'লো।

রাজেনবাবু তক্ষুনি সরলেন মেয়ের পাশ থেকে।

'দেখি, মেয়ে কী পেলো-টেলো—' বলতে-বলতে রেবতী-

গিন্নি ঘরে এলেন, রাজেনবাবুকে দেখামাত্র ঘোমটা টেনে চওড়া বপুতে ঈষৎ জড়োসড়ো হলেন।

'আসুন—'

শাশ্বতী হেসে এগিয়ে এলো, রাজেনবাবু দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। ঘরে এলেন রেবতী-গিন্নি আর তাঁর পিছনে আরো দু-জন; সিঁড়িতে পায়ের শব্দ প্রায় শেষ হ'লো। রাজেনবাবু বেরিয়ে যেতে-যেতে শুনলেন, 'তোমরা দিদিরা কে কী দিলে সেটা দেখি আগে—'

স্বাতী যে-ঘরে আছে সেদিকে রাজেনবাবু তাকালেন না, কোনোদিকেই তাকালেন না; সোজা এলেন সামনের দিকের বারান্দায়, যার রেলিঙে ঝুঁকে সারি-সারি মেয়েরা বর আসা দেখেছিলো। এসেই থমকালেন। বিজু প'ড়ে আছে তক্তাপোশে হাত ছড়িয়ে উপুড় হ'য়ে, কাঁধ দুটো ফুলে-ফুলে উঠছে, ঘাড় থেকে কোমর পর্যন্ত কাঁপছে, বেড়ালের ফোঁশফোঁশের মতো কেমন-একটা বিশ্রী আওয়াজের ঝাপট দিচ্ছে এক-একবার, আর তার মাথার কাছে ঝুঁকে আছে শ্বেতা, গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে কী বলছে। রাজেনবাবু কাছে গিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে?'

'আর বলো কেন!' শ্বেতার গলা ফিশফিশে শোনালো। 'বিজুটা এমন—!'

রাজেনবাবুর মুখ কঠোর হ'লো, বিরক্তির রেখা ফুটলো কপালে। শ্বেতা ডাকলো, 'বিজু—এই—লক্ষ্মী-তো, ওঠ—আর সময় নেই—'

'আর কেঁদেহ্-কেঁদে কী হবেহ্—এইহ্—সংসারের এইহ্ নিয়ম!'

রাজেনবাবু ফিরে তাকালেন। তাড়াতাড়ি বারান্দার অন্য দিকে এসে বললেন, 'কী রে বেলি, খুব কষ্ট?'

একেবারে ফিকে-হ'য়ে-যাওয়া অস্পষ্ট বয়সের একটি বিধবা মেয়ে বাধো-বাধো গলায় কথা বললো, 'টান উঠলে ফাঁকায় ভালো থাকেন, তাই এই বারান্দায়—'

'বেশ করেছো, বেশ করেছো।—তা আর-কিছু—কোনো ওষুধ-টষুধ—একটু যদি আরাম হয় কিছুতে—'

'নাহ্—কিচ্ছু নাহ্—কিচ্ছুতে কিছু হয় নাহ্—আমিহ্—আমি বিজনকে বলছিলাহ্ম—'

'আর কথা বোলো না দাদা,' ব'লে বিধবা মেয়েটি হাঁটু ভেঙে ব'সে তালপাখা নিয়ে হাওয়া করতে লাগলো।

কিন্তু হাঁপানিতে ধুঁকতে-ধুঁকতেও নেপালবাবু কথা ছাড়লেন না।—'বলছিলাম যে এমন দিনেহ্—এমন দিনে কিহ্—এমন দিনে কী কাঁদতে আছেহ্!—আর কাঁদবাহ্র—'

রাজেনবাবু কথাগুলি ভালো শুনতে পেলেন না, এমন মন দিয়ে তিনি মানুষটাকে দেখছিলেন। মেঝেতে বিছানো কম্বলে নেপালবাবু ব'সে আছেন উব-হাঁটু হ'য়ে, পাশে পিকদানি, কোমরের কাছে কে-জানে-কতকালের বালাপোশটি, চোঙের মতো হাঁটু দুটোর উপর দিয়ে এসে দড়ির মতো হাত দুটো ঝুলছে; ধ্বসা মাটিতে এক-আধটা ঘাসের মতো গর্ত-গালের ফোকরে-ফোকরে দাড়ির কুচি, আর ঘোলা দুটো চোখ যেন তাদের উপরওলা কপালের দিকে তাকাতে সাংঘাতিক সচেষ্ট। রক্তমাংস সব চেটে-পুটে খেয়ে গেছে, তবু জীবন্ত, আর ওরই মধ্যে গলাটা—চামড়ার দেয়ালে ভাগ-করা-করা কামরায় মোটা-মোটা শিরা আর পিণ্ডের মতো একটা কণ্ঠমণি নিয়ে গলাটা

যেন নিশ্বাস নেবার কোনো আশ্চর্য যন্ত্রের মতো আলাদা ক'রে জীবন্ত।

—'কাঁদবার হয়েছে কীহ্—এ-তো সুখের—কত সুখেহ্র—আমিহ্—আমি যখহ্ন—যখন সেইহ্—সেইহ্—' নেপালবাবু হয় আর বলতে পারলেন না, নয় কী বলছিলেন ভুলে গেলেন।

রাজেনবাবু সেখানে আর দাঁড়ালেন না। তাঁর মনে পড়লো যে ইনিও একদিন মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন—একটিই মেয়ে, একমাত্র সন্তান তাঁর—মেয়েটা ম'রে গেলো বিয়ের পরে দু-বছর না-পুরতে, নাৎনিকে এনে রাখলেন দাদা-দিদি, তারপর তারও বিয়ে দিলেন, বিধবা হ'য়ে ফিরে এলো সে, আর এখন সেই নাৎনিকে নিয়েই সাঁৎরাগাছিতে বেঁচে আছেন ছত্রিশ টাকা পেনশন নিয়ে এই জীর্ণ বিপত্নীক। আর ইনি মারা গেলে বেলিটার—কিন্তু ভাবনা কোথাও এসে থামেই।

'...পুরুৎঠাকুর উপরে গেছেন, সত্তোনকে ডাকতে যাচ্ছে, বিজু শিগগির—'

বড়দির এই কথায় বিজু বয়লারের স্টীমের মতো আওয়াজ ছাড়লো।

রাজেনবাবুর উপরের ঠোঁট নিচেরটির উপর চেপে বসলো, কপাল এমন ঘন হ'য়ে কুঁচকোলো যে চোখ দুটি ছোটো দেখালো। ছেলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে ডাকলেন, 'বিজু—ওঠ!'

বিজু সমস্ত শরীরে কাৎরিয়ে উঠলো একবার, তক্তার কর্কশ ধারটা মুঠোয় আঁকড়ে স্তব্ধ হ'লো।

'ওঠ,' ছোটো, ছোট্ট আওয়াজ হ'লো শ্বেতার।

'কী ? ব্যাপার কী ?' বিজুর পায়ের দিকটায় দাঁড়ালো এসে মহাশ্বেতা সরস্বতী।

শ্বেতা বললো, 'কিছু না। ওদিকে কদ্দূর ?'

'প্রায় তৈরি। বিজু উঠছে না কেন ?'

'এই উঠবে এবার। একটু শুয়ে নিলো—যা খাটুনি যাচ্ছে !'

ছোটো দু-বোন বিশ্বাস করেছিলো দিদির কথা, কিন্তু বিজু উঠে বসতে ব্যাপার বুঝলো। চোখ দুটো এমন ফুলেছে যে চেনা যায় না। দু-বোন চোখোচোখি করলো, সরস্বতী ঠোঁট বাঁকালো আর মহাশ্বেতার ঠোঁটে সেই ভঙ্গিটি প্রতিফলিত হ'তে-হ'তে হঠাৎ তার মুখের ভাবই বদলে গেলো, আর সেই বদলানো ভাবটা প্রতিফলিত হ'লো সরস্বতীর মুখে। দু-জনে দু-দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

'বিজহ্‌ন—যাওহ্‌—তোমাহ্‌র কাজ—কত সুখেহ্‌র—কতহ্‌—কতহ্‌—খ্‌খ্‌খ্‌খ্‌ক্‌ !' কোনো পুরোনো কিন্তু শক্ত জিনিশের ফেটে যাওয়ার মতো আওয়াজ হ'লো, নেপালবাবু তাঁর ভিতরকার অফুরন্ত শ্লেষ্মার একটি টুকরো টেনে তুললেন, মাথা ঢ'লে পড়লো, বিধবা বেলি পিকদানি ধরলো মুখের সামনে।

সরস্বতী বাঁকা চোখে একবার সেদিকে তাকালো, তারপর বাবার কাছে এসে বললো, 'বাবা স্বাতীকে একবার দেখবে চলো। সাজানো বোধহয় ভালোই হয়েছে।' ওতে তার নিজের কারিগরি অনেকটা ব'লে বিনয় ক'রে বললো।

'ওঠ না !' হঠাৎ যেন ধমক দিলেন রাজেনবাবু, অস্বাভাবিক শোনালো তাঁর গলা।

কুঁকড়ে-ব'সে থাকা বিজু বাবার দিকে মুখ তুললো, তার ঠোঁট

নড়লো, কিছু বলতে গেলো বোধহয়, কিন্তু দুটো নাকই বন্ধ আর গলায় একদম আওয়াজ নেই। মুখ দিয়ে জোরে একবার নিশ্বাস ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে চ'লে গেলো, কারো দিকে তাকালো না।

'বাবা স্বাতীকে একবার—'

কিন্তু এবারেও সরস্বতীর কথাটা বাবার যেন কানেই গেলো না। 'এখানে বিছানা ক'রে দিক ভালো ক'রে,' একটু ব্যস্তভাবেই তিনি বলতে লাগলেন, 'বালিশ দিয়ে উঁচু ক'রে দিক, আর নেপালবাবুকে এখানে—অসুস্থ মানুষ—কী-যে সব—' 'সব' মানে কারা, আর নির্দেশগুলোই-বা কাকে দিচ্ছেন তা ঠিক বোঝা গেলো না।

একটি শীর্ণ হাত নিষেধ জানিয়ে ন্যাতার মতো নড়লো, আর বেলি মৃদুস্বরে বললো, 'এ-ই বেশ আছে, আপনারা মিছিমিছি—'

'না—না—তা কী হয়—হেলান দিয়ে উঁচু ক'রে বসাতে হয়—আর একটু নিরিবিলি—' কেমন অসহায়ের মতো রাজেনবাবু এদিক-ওদিক তাকালেন।

সরস্বতী সক্ষমভাবে বললো, 'আমি দেখছি।'

লোক ডেকে আনলো সে, তারা তক্তাপোশে পুরু ক'রে বিছানা পাতলো, গোটাপাঁচেক বালিশ দিলো; বেলির সঙ্গে ধরাধরি ক'রে রাজেনবাবু রোগীকে এনে বসিয়ে দিলেন, পিঠে ঘাড়ে বালিশগুলি অকারণেই নেড়ে-চেড়ে বললেন, 'কেমন? ঠিক আছে? এখন ঠিক আছে?'

বেলি বিব্রত হ'য়ে বললো, 'আপনি কেন—আমি—আমি দিচ্ছি সব ঠিক ক'রে।'

'এই-যে রামের মা—তোমাকে এখন আর-কিছু করতে হবে না—এখানে ব'সে থাকো—যদি কিছু লাগে-টাগে—'

'কিঁচ্ছু লাগবে না রাজেন-দাদু—মিছিমিছি—এমনিতেই কত—' মোছা-মোছা বেলির কুণ্ঠিত কথা এর বেশি এগোলো না, ঝলমলে দুই বোনের দিকে আদ্ধেক পিঠ ফিরিয়ে দাদার গা ঘেঁষে এমন ক'রে সে বসলো যে দেখা যায় কি না যায়। নেপালবাবু আর কথা বলার চেষ্টা করলেন না, কী হচ্ছে তাও যেন বুঝলেন না: তাঁর গোল-গোল ঘোলা চোখ উপরদিকে তাকিয়ে কেমন স্থির হ'লো, ছেঁড়া জুতোর হাঁ-করা চামড়ার মতো ঠোঁট দুটো খুলে থাকলো, মুখের কালো গর্তটা ভ'রে-ভ'রে হাঁপরের মতো তিনি হাওয়া টানতে লাগলেন, হাওয়া, শুধু হাওয়া, নিশ্বাস। হয়তো নরম বিছানায় পাঁচ বালিশে হেলান দিয়ে একটু আরাম তাঁর হয়েছিলো, কিংবা হয়তো তখনকার মতো ডুবে ছিলেন সেই নির্বোধ উদাসীনতায়, যা রোগযন্ত্রণার সবশেষের আশান।

মহাশ্বেতা সরস্বতী দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যটি দেখলো: সরস্বতী চেষ্টা করলো বাবাকে চোখে ডাকতে, কিন্তু চোখে চোখ ফেলতেই পারলো না। ফিরে যেতে-যেতে ফিশফিশিয়ে বললো, 'বাবার সবটাই বাড়াবাড়ি!'

'বুড়ো এখানেই মরবে-টরবে না তো?' একটু উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করলো মহাশ্বেতা।

'আরে না! হাঁপানিতে কেউ মরে না।'

এ-কথা শুনে মহাশ্বেতার চিন্তা হ'লো নেপাল-পিসে তাহ'লে কিসে মরবেন। কিন্তু সেটা প্রকাশ না-ক'রে বললো, 'এঁকে বিজু না-আনলেই পারতো।'

'বিজুর বুদ্ধি!' সরস্বতী থামলো কনে-সাজানো ঘরের দরজায় ; নেপালবাবু একটি পা টান করলেন, আর-একটা উঁচু হ'য়েই থাকলো, বেলি আস্তে সেটিও টান ক'রে বালাপোশে ঢাকলো, আর রাজেনবাবু দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানেই। তাঁর মুখে চিন্তা, প্রায় দুশ্চিন্তা। কী-যেন একটা জরুরি কথা তিনি ভুলে গেছেন ; কিছু-একটা তাঁর করা উচিত, এখনই করা উচিত, কিন্তু সেটা-যে কী তা কিছুতেই মনে পড়ছে না। বেলির দিকে, নেপালবাবুর দিকে চোখ ফেললেন ; হঠাৎ মনে হ'লো—এরা কে? এদিক-ওদিক তাকিয়ে আর-কাউকে দেখতে পেলেন না।—কোথায় সব? রাজেনবাবু বারান্দা পার হলেন, মুখোমুখি ঘরগুলির মাঝখানের গলি দিয়ে যেতে-যেতে হঠাৎ ডাক শুনলেন, 'বাবা!'

—কিছু না ; মেয়েলি গলায় ঐ ডাক জীবনে লক্ষবার তিনি শুনেছেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁর যেন দম বন্ধ হ'লো। একটু পরে বুঝলেন, পরদা-ঢাকা দরজার সামনে শাশ্বতী।

'বাবা!' শাশ্বতী হাসলো, 'তুমি যেন আমাদের চেনোই না আজকাল?'

রাজেনবাবু কথা বললেন না, হাসির কোনো চেষ্টা করলেন না।

'এসো একটু এ-ঘরে- ' শাশ্বতী নিচে যাচ্ছিলো বিয়ে আরম্ভ হবার আগে সত্যেনকে আর-একবার দেখতে, বাবাকে দেখে থেমেছিলো, বাবাকে নিয়ে ফিরলো। ভিড় নেই এখন, ঘরের

চারদিকটা ফাঁকা, কিন্তু মাঝের গোল দলটি আগের চেয়ে বড়ো, আর আগের চেয়ে নীরব, নিবিষ্ট। সকলেই যেন মন দিয়ে একজনকে দেখছে, কেউ বেশি কিছু বলছে না।

'বাবা, এসো!' শাশ্বতী ঘরে এসে আবার ডাকলো, 'ছাখো—কী-সুন্দর দেখাচ্ছে স্বাতীকে!'

তার গলা পেয়ে কেউ-কেউ ফিরে তাকালো। সরস্বতী এগিয়ে এলো, ঊষা-বৌদি মাথায় কাপড় টানলেন, বড়োপিসির মুখটা একটু করুণ হ'লো। গোল-দাঁড়ানো মেয়েরা ছুটো অংশে ভাগ হ'য়ে জায়গা ক'রে দিলো, শাশ্বতী আর সরস্বতী বাবাকে নিয়ে এলো ঠিক মাঝখানটায়, মুখোমুখি। স্বাতী। শাদা সুন্দর মেঝেতে সুন্দর শাদা চিকনপাটির উপর স্বাতী দাঁড়ানো। পায়ের পাতা সোনালি পাড়ে ঢাকা, শুধু আঙুলের ডগাটুকু ফুটে আছে। মাথার চুলও সোনালি পাড়ে ঢাকা, শুধু সিঁথির সরু রেখাটি যেন নতুন ফুটে আছে। স্বাতী। সোনার তারা-জ্বলা শাড়ি লাল উঠে গেছে ঝিলিক তুলে-তুলে, আবার নেমেছে সোনালি, কালো চুলের উপর দিয়ে সাঁকোর মতো, তরুণ ঝিনুকের মতো যে-কান ছুটি এইমাত্র পান্নার তলে ভারি হ'লো, তার পাশ দিয়ে অন্তরঙ্গ, পদ্ম-লাল জামার কাঁধে উজ্জ্বল, পান্না-চুনি-মেশানো নেকলেসটিকে পাশ-কাটানো, এখনকার মতো স্বাধীন-শক্তিহীন বাহুটির কম-ফর্শা বাইরের দিকটাকে ছুঁয়ে-না-ছুঁয়ে পড়ন্ত। স্বাতী। তার কপালে, যেখানে একটি-না-একটি চুলের গোছা প্রায় সব সময় অবাধ্য লোটাতো, টান-ক'রে-বাঁধা চুলের তলায় সেই কপালটি এখন নতুন চাঁদের মতো মসৃণ, আর চাঁদের গায়ে দাগের মতো ফোঁটা-ফোঁটা

শাদা চন্দনে সাজানো। আর সেই চুলের গোছা, তুলে দিতে যে-হাত বারে-বারেই উঁচু হ'তো, সে-হাত দুটি এখন বেকার ঝুলছে পাশে, বাঁ হাতের আংটি-পড়া আঙুলটি বোধহয় অনভ্যাসে বেঁকে আছে, গোলাপি নখটি বোধহয় না-জেনেই সোনালি পাড়টিতে পড়েছে। স্বাতী। তার মুখ—সুখদুঃখের ব্যস্ত সেই রঙ্গমঞ্চ—এতদিন পরে একটু যেন বিরতি পেলো; আলো জ্ব'লে আছে, দৃশ্যপট সাজানো, কিন্তু কুশীলব নেই, ফাঁকা, চুপ, চোখের উপর ভারি হ'য়ে নেমেছে একটু ফোলা-ফোলা গোলাপি দুটি পাতা, ভরা-ভরা সজল ঠোঁট দুটি বোজা, নাকের একটি বাঁশির চোখে-না-পড়ার মতো ঈষৎ স্পন্দন ছাড়া সমস্ত মুখে আর ভাষা নেই।

রাজেনবাবু এসে দাঁড়াবার পর মিনিটখানেক স্তব্ধ থাকলো ঘর, তারপর নতুন ক'রে গুঞ্জন উঠলো. 'সুন্দর···কী-সুন্দর দেখাচ্ছে···সুন্দরী সত্যি ?'

শাশ্বতী নিচু গলায় বললো, 'শাড়িটায় খুব মানিয়েছে, না বাবা ?'

কিন্তু রাজেনবাবু শাড়ি দেখছিলেন না। সোনালি-লাল উজ্জ্বল সেই শাড়ি, পদ্ম-লাল জামা, পান্নার দুল আর পান্না-চুনির হার, হাতের শাদা শাঁখার পাশে ঝকঝকে নতুন চুড়ি আর কঙ্কণ—এ-সব কিছুই তাঁর চোখে পড়ছিলো না; যাকে ঘিরে এত লোক এখন দাঁড়িয়ে, এত জোড়া চোখ যার দিকে এখন নিবিষ্ট, সেই মানুষকে যেন চোখেই দেখছিলেন না তিনি, কিন্তু তাকেই দেখছিলেন। রাজেনবাবু স্বাতীকেই দেখছিলেন, ফ্রক-পরা ছোট্ট দুরন্ত অস্থির স্বাতীকে, ছোড়দির সঙ্গে হুলুস্থুল ঝগড়া-করা, মা-র

কাছে ধমক খেয়ে কেঁদে-কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া, কোঁকড়া মাথাটা বাবার কাঁধে রেখে না-খেয়ে ঘুমিয়ে-পড়া। হঠাৎ রাজেনবাবুর চোখের সামনে কুয়াশা নামলো; মস্ত ঘর, আলো, লোকজন মিলিয়ে গেলো; স্বাতীকে শান্ত ক'রে ঘুম পাড়িয়ে এইমাত্র শুইয়ে দিলেন তার মা-র কাছে, আর বিছানায় হাঁটু উঁচু ক'রে ব'সে রোগা মুখের বড়ো-বড়ো চোখে ঘুমন্ত মেয়েকে দেখতে লাগলেন মা। রাজেনবাবু মেয়েকে ভুলে মাকেই দেখতে লাগলেন; মুখ তুলবে, কিছু বলবে এখনই। কিন্তু রোগা মুখের ক্লান্ত চোখ দুটি নড়লো না, শুধু চুপ ক'রে মেয়ের দিকেই তাকিয়ে থাকলো।

'শোনো—'

রাজেনবাবু কেঁপে উঠলেন। কে কথা বললো?

বাবার কানের কাছে সরস্বতী বললো, 'গয়না সব পরাইনি, বাবা। জবড়জং হ'য়ে যায়।'

রাজেনবাবু নিশ্বাস ছাড়লেন। আবার সব স্পষ্ট হ'লো, বাস্তব হ'লো; দেখলেন চোখের সামনে উজ্জ্বল, সুন্দরী, সুদূর স্বাতীকে। কবে বড়ো হ'লো? এত বড়ো হ'লো কবে? রাজেনবাবু অবাক হ'লেন।

'স্বাতী, একটু তাকাও তো এদিকে।' একটু দূরে দাঁড়িয়ে উষা-বৌদি সূক্ষ্ম চোখে সন্দেহ করছিলেন যে সিঁথির ঠিক পাশেই একটা ছোট্ট চুল এর মধ্যেই দলছুট, তাই আবার বললেন, 'দেখি একটু—আহা, মুখটা আবার নামালে কেন?'

কিন্তু স্বাতীর মুখ আরো নিচু হ'লো। মনে-মনে বললো: বাবা। আজ সারাদিন বাবাকে সে চোখে ছাখেনি। আজ কতদিন বাবা

তার মুখের দিকে তাকান না---তাকাতে পারেন না। সেও যায় না বাবার কাছে, কাছে গিয়ে দাঁড়ায় না, কিছু বলে না। আবার মনে-মনে বললো : বাবা। বাবার আলোয়ানের ফ্যাকাশে রং দেখলো, জামার হাতা, একটি হাত, তারপর সে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই হাতটি নিচু হ'লো, তারপর দেখলো ধুতির ভাঁজ, কোঁচা, চটি। বাবার মুখের দিকে তাকাতে পারলো না স্বাতী, মেয়ে হ'য়ে জন্মাবার লজ্জায়, গৌরবে, দায়িত্বে তার চোখ আরো নিচু হ'লো।

নিচে তখন অতিথিরা চ'লে যাচ্ছে, রাস্তা পর্যন্ত সরগরম। বিদায় ব্যাপারে খামকা দেরি না-ক'রে বেশির ভাগ চটপট ছুটেছে ট্র্যাম ধরতে ; ছোটো-বড়ো দলে ভাগ হ'য়ে, ছুঁচোলো আর ভারি জুতোর শব্দে, সরু আর মোটা গলার কথায়, আলো-নেবানো ডর-লাগা কলকাতার শীত-রাতের চুপচাপ রাস্তায় হঠাৎ একটা চঞ্চলতার ঢেউ তুলেছে তারা : এদিকে দূরে-দাঁড়ানো খানদশেক গাড়ি ঘন-ঘন শিঙে ফুঁকতে-ফুঁকতে পিছু হ'টে-হ'টে একে-একে বিয়েবাড়ির ফটকে দাঁড়াচ্ছে ; কেউ রাস্তায় এসে ট্যাক্সি খুঁজছে কি রিকশ নিচ্ছে, কেউ বলছে হেঁটেই যাই চলো, আর পথ-চলা কেউ-কেউ ভিড় বাঁচাতে থামছে, বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে বোমাবিব্রত চিত্তে ভাবছে বাঃ, আবার বিয়ে!

ফটকের কাছে দু-জন লোক পিছু-হটা গাড়ির তদারকে ব্যস্ত, আর বারান্দায় যেখান দিয়ে সবাই বেরোচ্ছে তার দু-দিকে ইরু আর গীতি রুপোর থালায় পান নিয়ে দাঁড়ানো—যদি যাবার সময় আর-একটার ইচ্ছে হয় কারো—আর সিঁড়ির প্রথম ধাপটায়।

হেমাঙ্গ দাঁড়িয়ে অতিথিদের বিদায় দিচ্ছে। বয়স বুঝে, সম্পর্ক বুঝে, চেনার মাত্রা বুঝে প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে একটি ক'রে কথা বলছে সে, আর যারা একেবারেই অচেনা তাদের বলছে, 'আচ্ছা—নমস্কার।' তার এই অভিবাদন অনেকে লক্ষ্যই করছে না; নিজেদের মধ্যে কথা বলতে-বলতে কিংবা ট্র্যাম পাবে কিনা ভাবতে-ভাবতে বেরিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু হেমাঙ্গ যখনই আবার অচেনা কাউকে দেখছে, তেমনি মাথা হেলিয়ে ঠিক তেমনি ক'রেই আবার বলছে, 'আচ্ছা, নমস্কার।'

ভিড় যখন অনেক হালকা, থলথলে গিন্নি আর ভর-বয়সী কুমারী দুটি মেয়েকে নিয়ে রেবতীবাবু বেরোলেন। হেমাঙ্গ এঁকে আগে একবারই একটুখানি দেখেছিলো কিন্তু দেখেই চিনলো—মানুষের মুখ তার খুব মনে থাকে। হাতে হাত ঘ'ষে বললো, 'আপনারা এখনই—'

'হ্যাঁ, যাই—' হেমাঙ্গর কথাটা শেষ হবার আগেই রেবতীবাবু জবাব দিলেন। 'থাকবার তো ইচ্ছে ছিল খুব—এঁদের তো খুবই—' স্ত্রীর দিকে মাথা নোওয়ালেন তিনি, আবার মহিলাটি যেন এই চপলতায় ক্ষুব্ধ হ'য়ে শক্ত মুখ ফিরিয়ে নিলেন—'তবে আমার শরীরটা তেমন—আবার না ঠাণ্ডা-ফাণ্ডা লেগে—'

হেমাঙ্গ তাড়াতাড়ি বললো, 'তাহ'লে আপনাকে একটা গাড়ি—'

'কিছু না!' রেবতীবাবু হাত তুললেন। 'আরে এইটুকু তো পথ, এর জন্য আবার—আচ্ছা, খুব ভালো হ'লো, চমৎকা-র!' বলতে-বলতে সপরিবারে সিঁড়ি ক-টা নামলেন।

এর পরে দেখা গেলো ভাগনির সঙ্গে মজুমদারকে। তাকে দেখে হেমাঙ্গর মুখ প্রথমে হাসি-হাসি হ'লো, তারপর নিরাশ হ'লো। 'আপনিও যাচ্ছেন?'

আপনিও! কেন, আমি কি বিশেষ কেউ? মজুমদার সংক্ষেপে বললো, 'যাচ্ছি!'

'আমরা খুব আশা করেছিলাম আপনি—' ঊর্মিলার দিকে তাকিয়ে হেমাঙ্গ তাড়াতাড়ি নিজেকে শোধরালো—'আপনারা থাকবেন।'

'খুব বেশি আশা করাটা কিছু না।' মজুমদার হাসলো না, এমন ক'রে কথাটা বললো যে প্রায় রূঢ় শোনালো। তারপরেই যেন নিজেই সেটা বুঝে চওড়া হেসে আবার বললো, 'আজ চলি। আবার দেখা হবে। আপনি তো এখানেই—এই বাড়িতেই?'

ঊর্মিলা এই সুযোগে তার মনের ইচ্ছাটা আর-একবার ব্যক্ত করলো, 'একটু থাকি না, মামা।'

মজুমদারের মুখের ভাব মুহূর্তে বদলে গেলো, কঠোর চোখে ভাগনির দিকে তাকালো। মামার এই দৃষ্টি তার চেনা, এটার মানে হচ্ছে যে আমার কথামতো ঠিক-ঠিক চলো তো সব পাবে, আর তা যদি তোমার পছন্দ না হয় তোমাকে অবিলম্বে ফেরৎ পাঠাচ্ছি তোমার মা-র কাছে নাথুরামপুরে। ঊর্মিলা কুঁকড়ে চুপ করলো।

আবার হাসিমুখে মজুমদার হেমাঙ্গকে বললো—'আপনাদের যদি অসুবিধে না হয়, পন্টিয়াকটা নিয়ে যাই। মানে—অস্টিনটা আবার ড্রাইভর ফিরিয়ে নিয়ে গেলো কিনা।' এমন ক'রে বললো

যেন ড্রাইভর নিজের বুদ্ধিতেই এটা করেছে, কর্তার কোনো হাত ছিলো না।

হেমাঙ্গ মনে-মনে করুণায় হাসলো। ছেলেমানুষ—নতুন গাড়ি কিনেছে।—'নিশ্চয়ই! আপনার গাড়ি আপনি নিয়ে যাবেন তাতে আর কথা কী। আর আমাদের কাজ তো সব হ'য়েই গেছে। সত্যি, কত উপকার করলেন আপনি আমাদের!' হেমাঙ্গ বুঝলো যে মজুমদার এটা আরো একবার শুনতে চাচ্ছে, সেইজন্য শেষের কথাটা বললো।

মজুমদারের শুনতে ভালো লাগলো, কিন্তু সেই সঙ্গে চিড়িক ক'রে উঠলো মাথার মধ্যে রাগ। উপকার! পরোপকার কি তার পেশা? মনে পড়লো হারীত নন্দী তার সঙ্গেই উপর থেকে নামছিলো—উঃ, বকতেও পারে লোকটা!—দোতলায় আসতেই সেই লাল-মালা-গলায় বোন কোত্থেকে বেরিয়ে এসে বললো, 'নন্দী যাচ্ছো কোথায়? আরে শোনো—এদিকে এসো!' মুহূর্তে যেন ঘোড়ার মতো মানুষটাকে ভেড়া বানিয়ে টেনে নিয়ে গেলো, আর ওরই মধ্যে তার দিকে একবার মাথা হেলিয়ে, মিলুর দিকে একটু হাসলো। নন্দীর হাত থেকে এতক্ষণে রেহাই পেয়ে তখন মজুমদার হাঁফ ছেড়েছিলো, কিন্তু মাত্রই কয়েক মিনিট পরে ঘটনাটা মনে ক'রে অপমান লাগলো তার; নিজের মনে যতই বুঝলো যে অপমানের কোনো কথাই এতে নেই, ততই মাথা আরো গরম হ'লো, ইচ্ছে করলো কোনো-একটা কড়া কথা শোনাতে, বেশ বিঁধবে এমন কথা, কিন্তু ভদ্রতা বাঁচিয়ে কী-এমন বলা যায় তাও ভেবে পেলো না, আর তাকিয়ে দেখলো

মেজো-জামাইটি এইমাত্র-বেরোনো অন্য এক দলের দিকে মন দিয়েছে, বড়ো দল, পানের-থালা-হাতে লাল আর কমলা শাড়ি-পরা মেয়ে দুটির সঙ্গে কথা বলছেন ময়লামতো সুশ্রী এক আধ-বুড়ো, বয়স কম হ'লে নন্দীর মতো দেখাতো।

'ফাইন গার্লস! ফাইন ইয়ং উইমেন!' ব'লে হারীতের উৎসাহী বাবা অস্বাভাবিক-শাদা নকল দাঁতে হাসলেন।

নিজেদের সম্বন্ধে 'ইয়ং উইমেন' আখ্যা শুনে ইরু আর গীতি সারামুখে চাপা হাসলো, তারপর স'রে এসে চোখোচোখি ক'রে খামকা হেসে উঠলো শব্দ ক'রে, আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় সিগারেটটি নিঃশেষে টেনে ফিরে আসতে-আসতে সেই শব্দের শেষ তরঙ্গটি পৌঁছলো খয়েরি ফ্ল্যানেলের পুরোনো শার্ট-পরা নিখিলের কানে।

'আপনি একটা পান?' হেমাঙ্গ ফিরে তাকালো মজুমদারের দিকে। ইরু তাড়াতাড়ি সামনে এসে থালা বাড়ালো। টুকটুকে লাল শাড়ি-পরা ফুটফুটে মেয়েটির দিকে মজুমদার একবার চোখ রাখলো, একটু হাসলো, একটি পান তুলে নিলো।

একটু-যেন হেমাঙ্গ ব্যস্তভাবে বললো, 'আমার মেয়ে।'

হেমাঙ্গর ব্যস্ততা মজুমদার লক্ষ্য করলো না, রাগ ভুলে গেলো; ঠিক সেখানে সেই মুহূর্তে হালকা ছিপছিপে সুশ্রী কিশোরীটির কাছে এসে দাঁড়ানোয় তার মনের কোন-একটা নরম জায়গায় যেন চাপ পড়লো, হঠাৎ একটি লাবণ্যের রেখা বেরোলো তার ঠোঁটের কোণে যখন সে বললো, 'বুঝেছি। নয়তো কি আর এমন রূপ!'

এ-কথা শুনে চাঁদির ছোট্ট টাকে হাত বুলিয়ে হেমাঙ্গ বর্ধন

সবিনয়ে হাসলো, যেন কন্যার এই রূপের কৃতিত্বটা একান্তই তার : আর তারপরেই আবার এগোলো শাশ্বতীর শ্বশুরবাড়ির দলটির দিকে, তারা তখন সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে।

পিছনে সরতে গিয়ে মজুমদার শুনলো মিলুর নম্র গলা, 'মামা, চলো আমরাও—'

মিলুর দিকে অর্ধেক ফিরে মজুমদার বললো, 'আচ্ছা, তুই থাক।'

তৎক্ষণাৎ উজ্জ্বল হ'লো ছ-কোণ-চশমা-পরা রঙিন মুখ। ঊর্মিলা অবাক হ'লো না, মামার এই হঠাৎ-হঠাৎ মতিবদলে সে অভ্যস্ত। বোকা নয় সে, বুঝে নিয়েছে মামা তার অধীনদের নাচাতে ভালোবাসেন, নিজের কর্তৃত্ব নানারকম ক'রে চাখতে ভালোবাসেন। ঊর্মিলা তখনই একটু চাটনি যোগাতে যাচ্ছিলো মামার পছন্দমতো কিছু কথা ব'লে, কিন্তু সময় পেলো না।

'সুবীরকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে দেবো ঘণ্টাখানেক বাদে।' মজুমদার ভাগনির দিকে দ্বিতীয়বার দৃষ্টিপাত করলো না, হেমাঙ্গকে সামনে দেখে মাথা নুইয়ে 'আচ্ছা চলি,' ব'লেই টপকে সিঁড়ি নামলো, নন্দী পরিবারকে ছাড়িয়ে প্রায় দৌড়ে বেরোলো রাস্তায়, অন্ধকারে মিশে-থাকা কালো পন্টিয়াকটায় উঠে ব'সে যেন বন্ধুকে ফিরে পেলো।

কোথায় ?···এখন কোথায় ?···কোথায় আর—বাড়িতেই, সেই বাড়িতেই, সেই বাড়িতে, যেখানে গলা পর্যন্ত আরাম কিন্তু সুখ নেই। সুখ না থাক ঘুম তো আছে ; আর তারপরেই আবার দিন, আবার কাজ। কিন্তু এখনই ঘুম ? শোওয়ামাত্রই টুপ ক'রে,

তবে তো! তাই ক্লান্তি চাই, আরো ক্লান্তি। মজুমদার গিয়ার বদলালো—কোথায়? ডন জুয়ানের হুল্লোড়? গীতালি? না, কি আজ—? না কি বাড়ি ফিরে আপিশের ম্যানেজারকে তলব ক'রে পাঠাবে, লেপের তলা ছেড়ে কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে আসবে বুড়ো মানুষটা! না, কোথাও না, কোথাও কিছু নেই। কেবল খোশামোদ। বাবা সুদ্ধু হাত কচলে কথা বলেন—ঘেন্না করে। টাকা না-থাকলে কী-জঘন্য, আবার টাকা থাকলেও জীবন কী-জঘন্য। মা যদি ম'রে না-যেতেন—শ্‌শ্‌শ্‌—

মজুমদার খিস্তি ক'রে ব্রেক কষলো। সামনে ওটা—গোরু? দ্যাখো কাণ্ড, সাধে কি আর গোরু বলে! মজুমদার লম্বা হর্ন দিলো, কিন্তু মানুষের পিলে-চমকানো সেই নিউ মডেল ইলেকট্রিক হর্নের আওয়াজে গোরুটা একটুও বিচলিত হ'লো না, প্রকাণ্ড দামি পন্টিয়াক গাড়িটা তার জন্যই-যে থেমে আছে তা বুঝলোই না মোটে, দিব্যি নিশ্চিন্তে এক-পা দু-পা সরলো, নড়লো কি নড়লো না, যেন কায়ক্লেশে কিঞ্চিৎ পাশে স'রে ঠিক গাড়ি যাবার মতো জায়গাটুকু ক'রে দিয়ে ওখান থেকেই গলা বাড়িয়ে সাদার্ন এভিনিউর মাঝখানের জমির শুকনো ঘাস ছিঁড়তে লাগলো, আর মজুমদার তার ল্যাজ ঘেঁষে একটা বদমেজাজি মোড় নিয়ে ল্যান্সডাউন রোডে বেঁকলো। এই এক ফ্যাকড়া হয়েছে ব্ল্যাক-আউট—গাড়ি চালিয়েও সুখ নেই!

ততক্ষণে বিয়েবাড়ির একতলার কার্পেট-মোড়া বড়ো ঘরটির ভিড় ক'মে-ক'মে মাত্রই জনপনেরো পুরুষে ঠেকেছে, নিকট

আত্মীয়, কি যারা স্ত্রীর কথা ঠেলতে পারেনি, কিংবা যাদের নিজেদেরই উৎসাহ কি কৌতূহল বেশি। বরের কাছাকাছি স'রে বসেছে তারা; সংখ্যায় কম, প্রায় সকলেই সকলের চেনা, সকলেই এইমাত্র খুব ভালো খেয়েছে; একটু বেশি বয়স্ক যাদের এখনই চোখ ঘুম-ঘুম, তাদের বাদ দিয়ে সকলের মুখেই কথার আগ্রহ।

এখন আর যুদ্ধের কথা বলছে না কেউ—; কিরণ বক্সি সুদ্ধু আপাতত বোমা ভুলেছে, হারীতও ওখানে নেই যে মনে করিয়ে দেবে। আজ রাত্রির ঘটনা নিয়েই কথা হচ্ছে এখন, সামনে উপস্থিত নায়কটিকে লক্ষ্য ক'রেও মন্তব্য পড়ছে মাঝে-মাঝে।

'...এইটুকু থেকে দেখে আসছি তো,' গোল মুখে সোনার সরু চশমা-পরা প্রভাত-মেসো বলছিলেন, 'চমৎকার মেয়ে, চমৎকার বুদ্ধিমতী। রাজেনবাবুর ভারি ভাবনা ছিলো এ-মেয়েকে কার হাতে দেবেন—' অবশ্য রাজেনবাবুর মুখে এ-বিষয়ে কোনো দুর্ভাবনার কথা কখনো তিনি শোনেননি, কিন্তু বলতে দোষ কী—'তা মেয়ে নিজেই বাপের ভাবনা ঘোচালো। বেশ, বেশ!' ব'লে সপ্রশংস কৌতুকের কটাক্ষ করলেন সত্যেনের দিকে।

'আজকাল তো এ-রকম বিয়েই বেশি হচ্ছে,' বললেন তপনদা, টাটকা বিলেতফেরৎ ঝকঝকে ব্যারিস্টর।

'বেশি? বেশি কী হে? সমস্ত দেশের মধ্যে ক-টা হয় এ-রকম?' চোদ্দটা রসগোল্লা খাবার পরেও অকাতরে তর্কে নামলেন ষাট-পেরোনো ভুপেশ-দাদু।

'না হয় তো হওয়া উচিত!' জোরগলায় ঘোষণা করলেন।

তপনদা, কেননা বিয়ের যোগ্য ছেলেমেয়ে থাকা দূরের কথা, তিনি নিজেই অবিবাহিত ; রূপ গুণ আর বাপের পয়সা-প্রতিপত্তির হিশেব মিলিয়ে-মিলিয়ে দুটি তরুণীর সঙ্গে কিছুদিন ধ'রে পূর্বরাগ চালাচ্ছেন, এখনো মনস্থির করতে পারছেন না।

'উচিত কেন?' এঞ্জিনিয়র পরেশ-কাকা ভূপেশ-দাদুর পক্ষ নিলেন।

'আমাদের এই কনে-দেখা বিয়েটা একটা বর্বরতা।'

'অ্যাঁ! বর্বরতা!' থুতনি উঁচু ক'রে প্রভাত-মেসো হা-হা হাসলেন। 'দেশসুদ্ধ লোককে বর্বর ব'লে দিলে!'

'দেশসুদ্ধ কেন, পৃথিবী ভ'রেই এই নিয়ম,' একাটা কথা যে বলে তার গলা যেমন নিচু হয়, তেমনি নিচু গলায় পরেশ-কাকা বললেন। 'সব দেশেই বেশির ভাগ মা-বাবাই সব ঠিক ক'রে দেয়, তারপর ঐ একটা নিয়মরক্ষা আরকি।'

'নাকি?' তপনদা বাঁকা চোখে তাকালেন।

'অবশ্য ভালো-ভালো ঘরের কথা বলছি। সেখানে বিলেত-টিলেতেও কড়াক্কড়।' পরম প্রত্যয় ফুটলো পরেশ-কাকার কথায়, কেননা ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড আর জর্মনির কল-কারখানার এলাকায় প্রায় নির্বিঘ্নেই যৌবন কাটিয়ে এসে গ্লাসগোতে একবার তাঁকে বিয়ে করতেই হয়েছিলো। মেয়েটি, তাঁর নিজেরই মত-মাফিক, 'ভালো ঘরে'র অবশ্য ছিলো না, কিন্তু ছাড়ান পেতে বেজায় নাজেহাল হয়েছিলেন ; আর এখন তাঁর কুড়ি-বছর-আগের বিয়ে-করা কিছু-লেখাপড়া-না-জানা বাঙালি স্ত্রী সুদ্ধ সাহেব-স্বামীর সাবেকি মতে এক-এক সময় চমকায়। ছোকরা-ব্যারিস্টরের

চোখের ঠাট্টা লক্ষ্য ক'রে এঞ্জিনিয়র আবার বললেন, 'দশ বছর ছিলাম ও-সব দেশে, আমি জানি।'

'সে কোন জন্মের কথা!' ঠোঁটের ভঙ্গিতে অবজ্ঞা ফোটালেন তপনদা। 'এখন বদলে গেছে সব।'

'বদলে গেছে? এই সেদিন-না এডওঅর্ড দি এইট্থ্‌কে রাজ্যপাট ছাড়তে হ'লো?'

'ও, সে-কথা! তার কারণ অন্য। কিন্তু—'

'এ নিয়ে এত বলার কী আছে?' প্রভাত-মেসো চড়া গলায় বাধা দিলেন—'আরে আমাদের সব মা-বাবাই তো বিয়ে দিয়েছিলেন —তা মন্দ কী—জীবনটা তো কেটে গেলো একরকম—হাঃ!' মোজা-পরা পায়ের পাতায় হাত বুলিয়ে কোমর থেকে কাঁধ পর্যন্ত শরীরটি একটু দোলালেন তিনি, সমস্ত গোল মুখটি ভ'রে নিঃশব্দে হেসে আবার একটু লালও হলেন হঠাৎ।

কিন্তু অন্য দু-জন লক্ষ্যই করলেন না তাঁর কথা। অন্য সকলকে বাদ দিয়ে—প্রায় ভুলে গিয়ে—শুধু নিজেদের মধ্যে তখন কথা বলছেন পরেশ-কাকা আর তপনদা; ইওরোপ বিষয়ে কে বেশি সবজান্তা তা-ই নিয়ে একটা প্রতিযোগিতা দাঁড়িয়ে গেছে দু-জনের মধ্যে। পরেশ-কাকার যুক্তি এই যে তিনি ছিলেনও বহুদিন, ঘুরেছেনও বিস্তর, অতএব তাঁর কথার উপর কথা বলার এখানে অন্তত কেউ নেই; আর তপনদা বলতে চাচ্ছেন যে যেহেতু তিনি সদ্য গিয়েছিলেন, তাই বিলেত বিষয়ে তিনিই ঠিক ওয়াকিবহাল।

প্রভাত-মেসো একটুক্ষণ তর্কটা শুনলেন, কিছুই সুবিধে করতে

না-পেরে ফিরে তাকাতেই গলা-বাড়ানো কিরণ বক্সির সঙ্গে চোখোচোখি হ'লো।

কিরণ বক্সি অনেকক্ষণ ধ'রে কিছু বলি-বলি করছিলো। খুব মন দিয়েই কথাবার্তা শুনছিলো সে, শুনে অস্বস্তি হচ্ছিলো, খারাপ লাগছিলো রীতিমতো। কী-রকম বলছে সব বিয়ের বিষয়ে, যেন ওর উপর কোনো জন্মে কোনো মানুষের হাত আছে। ওটা একটা —একটা—কী, তা কিরণ ভেবে পেলো না, কথা খুঁজে পেলো না, কিন্তু নিজের মনে গভীরভাবে বুঝলো। এই-তো অনীতা— ক-দিন বা বিয়ে হয়েছে, এই সেদিনও তার কথা কিছুই জানতাম না—কিন্তু মনে হয় কত কালের, কত জন্মের—এই রকম আরকি। আগে তো কত খোঁজাখুঁজি, কত মেয়েই দেখেছেন মা, আমিও মাঝে-মাঝে—কিন্তু এখন কি আর অনীতা ছাড়া আর-কাউকে কল্পনা করতেও পারি আমি? তেমনি সত্যেনও—আর এই সত্যেনের সামনেই এঁরা কিনা—কী-যে সব! কিরণ মনে-মনে এ-সব ভাবছিলো, আর গলা বাড়িয়ে-বাড়িয়ে একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলো; প্রভাত-মেসোর চোখে চোখ পড়তে সে আর দেরি করলো না।

'আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত,' ব'লে কথা আরম্ভ করলো কিরণ, 'আমি'টায় জোর দিয়ে বললো।

মেসোটি অবাক হলেন, বিব্রতও। ভেবেই পেলেন না, কখন তিনি এমন-কী বললেন যার সঙ্গে একমত হ'য়ে ব'সে আছে— আর-কেউ না, একেবারে জামাইয়ের বন্ধু!

'ঐ আপনি বিয়ের বিষয়ে যেটা বলছিলেন,' কিরণ তাঁকে

মনে করিয়ে দিলো। 'সত্যি তো! বিয়েটাই আসল, কেমন ক'রে ঘটলো সেটা কিছু না।'

বক্তা-যে তাঁর মতেরই সমর্থক সেটা ভুলে গিয়ে প্রভাত-মেসো তৎক্ষণাৎ মাথা নেড়ে সায় দিলেন, 'ঠিক!'

'এঁদের কথার কোনো মানে হয় না,' কিরণ চোখ দিয়ে অন্যদের দেখালো। 'আসলে—' 'আসল' কথাটাকে হঠাৎ খুঁজে পেয়ে যেন আঁকড়ে ধরলো সে—'আসলে বিয়ে হচ্ছে একটা—একটা—' কিরণ কথা খুঁজতে থামলো, কিন্তু তখনই প্রভাত-মেসো আবার বলে উঠলেন, 'ঠিক! ঠিক কথা!' ব'লে আরো মাথা নাড়লেন, তারপর জামাইয়ের দিকে ফিরে মোলায়েম মিহি স্বরে বললেন, 'তুমি না কোন কলেজে প্রোফেসর?'

সত্যেন হঠাৎ বুঝলো যে তাকে কিছু বলা হচ্ছে। কিন্তু—কী? কী বললেন উনি? তার দেরি দেখে কিরণই জবাব দিলো তার হ'য়ে, তার কলেজের নামটা জানিয়ে দিলো।

'বেশ, বেশ,' সত্যেনের দিকে তাকিয়েই প্রভাত-মেসো আবার বললেন। 'তা বিলেতটা ঘুরে এসো একবার। দেখছো তো, বিদ্যে তোমার যতই থাক, বিলেতি ছাপ না-থাকলে কিছু না।'

উত্তরে সত্যেন অমায়িক হাসলো।

'আমাদের হারীত কেমন বেশ—আর চাকরিতেও নাকি উন্নতি করেছে।'

এই প্রফুল্ল, সদয়, চশমা-চোখে, চমৎকার ভদ্রলোকের আগের কথার সঙ্গে পরের কথার সম্বন্ধ বুঝতে না-পেরে সত্যেন আবারও হাসলো, এবার একটু বোকার মতোই।

'বেশ, বেশ!' কার বা কোনটার তিনি তারিফ করছেন সেটা প্রভাত-মেসো স্পষ্ট করলেন না, অনুমোদনের সুখী চোখে চারদিকেই তাকিয়ে বললেন, 'তা হারীতকে দেখছি না এখানে? কোথায় সে?'

তখন দোতলায় সিঁড়ির চত্বরে দাঁড়িয়ে সরস্বতী অরুণকে বলছে, 'নন্দীকেও নিয়ে যাও।'

নিজের নামটা কানে যেতে হারীত একবার উদাস চোখে তাকালো। তার এখনকার দুরদৃষ্ট বীরের মতো মেনে নিয়েছিলো সে; দেয়াল ঘেঁষে ঢিলে দাঁড়িয়ে ছিলো এমন ভঙ্গিতে, যাতে স্ত্রীলোকের আর অনুষ্ঠানের এই বোকা জগৎটার উপর তার মহৎ অবজ্ঞা সারা শরীরে স্পষ্ট ফোটে। তবু আটকে ছিলো ওখানেই, নড়তে পারেনি, কেননা হয় সরস্বতী নয় মহাশ্বেতা, নয় একসঙ্গে দু-জনে তাকে ফাঁকে-ফাঁকেই আলাপে টেনেছে—বাজে কথা সব!—কিন্তু—আচ্ছা, এঁরা যখন না-ব'লেই ছাড়বেন না, তখন শোনাই যাক। সরস্বতীকে ইংরেজিতে একবার এ-কথাও বলেছিলো, আপনার বয়স কিন্তু একদিনও বাড়েনি, আর সে-কথা শুনে সরস্বতী যখন হেসেছিলো, সেও হেসেছিলো সঙ্গে।

'আর দেরি করো না,' স্বামীকে তাড়া দিলো সরস্বতী।

অরুণ তার উড়ু-উড়ু চুলে হাত বুলিয়ে হারীতের সামনে এসে দাঁড়ালো। 'চলুন নন্দী-সাহেব।'

'কোথায়?'

অন্য কার কী-একটা কথা শুনতে-শুনতে সরস্বতী চট ক'রে মুখ ফিরিয়ে বললো, 'নন্দী যাও। বর নিয়ে এসো।'

'বর আনবো মানে? সে তো কখন এসে বসে আছে।'

কথাটা শুনে একসঙ্গে গমক দিয়ে হেসে উঠলো সরস্বতী, মহাশ্বেতা আর যাবার আগে আর-একবার দাঁড়ানো মহাশ্বেতার পাৎলা-গোঁফ-ওলা রূপসী ননদটি। হারীত লাল হ'লো; ভেবেই পেলো না কথাটায় এত হাসির কী আছে।

'আরে চলুন, চলুন,' অরুণ আস্তে হাত ছোঁওয়ালো হারীতের কাঁধে; চপলমতি মহিলাদের হাত থেকে তাকে উদ্ধার ক'রে নিচে নিয়ে এলো।

পরেশ-কাকা আর তপনদার তর্ক তখনো চলছে। এঞ্জিনিয়র একবার তাঁর বয়সের সুবিধে নিয়ে বললেন, 'তুমি কিচ্ছু জানো না হে!' ব্যারিস্টর আইনমাফিক জবাব দিলেন, 'অনেক ভুল না-জেনে অল্প ঠিক জানা ভালো।' পরেশ-কাকা আর ফিরে জবাব দিলেন না, তপনদাও আর-কিছু বললেন না; দু-জনেই বুঝলেন ঠিক সেই সময়টায় ঘরের অন্যেরাও কেউ কিছু বলছে না; তাই তাঁরাও কথা থামালেন। কোনো-একটা ঘটনার অপেক্ষায় লোকেরা যখন ব'সে থাকে, তখন যেমন মাঝে-মাঝেই হয়, তেমনি হঠাৎ একসঙ্গে সবাই চুপ হ'য়ে গেলো।

ঘরে এলো অরুণ আর হারীত, সকলের চোখ তাদের দিকে ফিরলো। অরুণ এর মধ্যে মুখে প্রায় ডাক্তারি গাম্ভীর্য এনে ফেলেছে, আর মুখে যেন অনুগ্রহের হাসি ফুটিয়ে পিছনে আসতে-আসতে হারীতের চকিতে মনে পড়লো তার নিজের বিয়ের রাত্রিটি।

অরুণ এসে সতোনের পাশে দাঁড়ালো আগে তাকে 'তুমি' বলেছে সে-কথা ভুলে গিয়ে বললো, 'চলুন।'

সত্যেনের পাশে-রাখা মালাটি দু-হাতে তুলে কিরণ বললো 'নাও।'

এবার আর সত্যেন বিদ্রোহের চেষ্টা করলো না, মালা হাতে নিলো।

'আলোয়ানটা আর কেন?' ব'লে কিরণ সত্যেনের কাঁধ থেকে নিজেই সেটা তুলে নিয়ে কাছে-দাঁড়ানো নিখিলকে রাখতে দিলো। 'নাও, পরো এবার।'

সত্যেন মালা প'রে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে উপস্থিতরা প্রায় সকলেই উঠলেন, শুধু ঘুমোচোখ বুড়োরা কেউ কেউ ব'সে থাকলেন। কিন্তু বর চলতে গিয়ে থপ্ ক'রে ব্যাঙের মতো লাফ দিলো।

অরুণের ডাক্তারি গাম্ভীর্য টিকলো না, হেসে ফেলে বললো, 'কী হ'লো?'

'ঝিঁঝিঁ ধরেছে।'

'ঝিঁঝিঁ?' হারীত হাসি চাপলো। 'তা ঝিঁঝিঁর দোষ কী— এতক্ষণ একভাবে ধ'সে থাকা!'

'আমার হাত ধরো না-হয়,' কিরণ হাত বাড়ালো।

'না, না—ঠিক আছে!' ব'লে একপায়ে আর-একটা লাফ দিলো সত্যেন।

কিরণ ফিশফিশ ক'রে বললো, 'পা-টা জোরে-স ঝেঁকে নাও একবার!'

'কিছু লাগবে না।' লাফের বদলে আড় ক'রে পা পেতে-পেতে সত্যেন খুঁড়িয়ে এগোলো, তার প্রত্যেক পা-ফেলার তালে মালাটা লাফিয়ে উঠলো গলায়। ওরই মধ্যে মুখের ভাবে যথাসম্ভব মান

বজায় রাখলো সে, কিন্তু কষ্ট আর কষ্ট লুকোবার চেষ্টায় মিশে তার মুখটা দেখালো যেন দুষ্টু ছেলে মাস্টারের কাছে শাস্তি নিতে যাচ্ছে, কিন্তু ক্লাশের সকলকে দেখাতে চাচ্ছে থোড়াই পরোয়া।

সেই মুখ দেখে সত্যেনকে হঠাৎ কেমন ভালো লেগে গেলো হারীতের। ঘরের বাইরে এসে বললো, 'কী, কমলো?'

'কমেছে,' ব'লে সত্যেন জুতো পরতে গেলো, কিন্তু অরুণ ব'লে উঠলো, 'জুতোটা থাক না,।'

'প'রেই নিই,' পা বাড়ালো সত্যেন, কিন্তু তখনো ফুলে-থাকা বাঁ পা-টা জুতোয় ঢুকলো না। দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে কসরৎ করলো, কিন্তু পা ঢুকলো না।

কিরণ ব'লে উঠলো, 'কী-মুশকিল! জুতো প'রে বিয়ে করবে নাকি!'

'আচ্ছা, থাক।' যেন নিরাশ, দুঃখিত, হ'য়ে সত্যেন খালিপায়েই চললো। তার দু-পাশে অরুণ আর হারীত. ঠিক পিছনে কিরণ, কিরণের পরে নিখিল, আর তারপর কন্যাপক্ষের লম্বা বাঁকা লাইন।

সিঁড়ির গোড়ায় তার কাঁধে চাপ দিলো কিরণ। সে ফিরে তাকাতে চাপা গলায় বললো, 'কী? কেমন লাগছে?'

'কিচ্ছু লাগছে না!' সকলের শোনবার মতো খোলা গলায় তখনই জবাব দিলো সত্যেন।

'হ্যাঃ!' কিরণ ঘাড় নেড়ে উড়িয়ে দিলো কথাটা, কিন্তু সত্যেন নিছক সত্যই বলেছিলো। সত্যি তখন তার কিছুই লাগছিলো না, কোনো শিহরণ, কোনো নূতনত্বের শিহরণও না। সবই যেন জানা, যেন সে কত আগে থেকেই জেনে রেখেছে ঠিক

এই সময়ে ঠিক এ-রকম-এ-রকম হবেই। ঠিক আজকের তারিখের এই মুহূর্তে এই বাড়ির এই লাল সিঁড়িটায় সে পা রাখবে, তারপর এটাতে। আবেগ আজ সকাল থেকেই নেই, কিন্তু নেই ব'লে অভাবের আবছা চেতনা ছিলো এতক্ষণ; এখন তাও নেই। সেই অভাবের চেতনায় দিনটা ঝাপসা হ'য়ে ছিলো সকাল থেকে; এখন আর ঝাপসাও নেই। এখন সব পরিষ্কার—অর্থাৎ সাধারণ। সাধারণ লাগছে তার, একেবারেই সুস্থ, মাথা-ঠাণ্ডা। মনে কোনো কম্পন, কোনো অনুকম্পনও নেই। না আশা, না ভয়; না সন্দেহ, না আনন্দ। যেমন ছাত্রজীবনে কোনো পরীক্ষার আগের রাত্রে উৎকণ্ঠায় সে ঘুমোতে পারেনি, কিন্তু পরের দিন পরীক্ষা দিতে যেই বসেছে, প্রশ্ন বিলোবার খশখশে আওয়াজ থেমে গিয়ে যেই স্তব্ধ হয়েছে মস্ত হল, তখনই নিরুৎসুক, নিরুদ্বেগ, স্থির হ'য়ে গেছে তার মন, তেমনি এখনো তার কাছে সব পরিষ্কার, সহজ, এত সহজ যে সাধারণ। নিজেই এতে অবাক হ'লো, কোনো অনুভূতির চেষ্টা করলো, এমনকি ;—কিন্তু কিছুই অনুভব করলো না, পা-টা এইমাত্র পুরোপুরি ছেড়ে যাবার আরাম ছাড়া। সত্যেন স্বচ্ছন্দে উঠলো সিঁড়ি দিয়ে, দোতলা পার হ'য়ে তেতলার দিকে; শেষ ধাপটার আগে অরুণ আর হারীতকে হঠাৎ ছাড়িয়ে সকলের আগে একলা এগোলো; সহজ, স্বাধীন, নিশ্চিত দাঁড়ালো আলো-জ্বলা ছাতের দরজায়।

ছাতের বড়ো অংশে, যেখানে খাওয়া হয়েছিলো, সেখানে এখন চুপচাপ। চেয়ারগুলি এর মধ্যেই তুলে ফেলেছে, সারি-সারি শূন্য

টেবিল শুধু প'ড়ে আছে। আর আগে যেখানে দু-চারজনের শুধু চলাফেরা ছিলো, সেই ছোটো অংশ এখন ব্যস্ত, গুনগুন-ব্যস্ত, হাসি-হাসি রঙিন, আবার গম্ভীরও।

আতা এতক্ষণ মুগ্ধ হ'য়ে বিয়ের সাজে ছোটোমাসিকে দেখছিলো, হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে সখী দু-জনকে দেখতে না-পেয়ে ছুটে ছাতে এলো। কই ? কিন্তু ইরু গীতির খোঁজে ঘুরে না-বেড়িয়ে আতা সেখানেই একটা সুবিধেমতো জায়গা বেছে দাঁড়ালো, বিয়েটা প্রথম থেকে দেখা চাই তো ! এখন ওরা এসে পড়লেই হয়।

দেরি হ'লো না, একটু পরেই ছোট্ট চড় পড়লো তার পিঠে। 'এই তো !—আমি বলছি না নিশ্চয়ই ছাতে !'

চকচকে সুখী চোখে তাকিয়ে আতা বললো, 'কোথায় ছিলি তোরা ?'

'আমরা ?' গীতি এমন ক'রে তাকালো যেন এর মধ্যে কতই রহস্য লুকোনো। ইরুর দিকে ফিরে বললো, 'তুই ক-টা খেয়েছিস রে ?'

'ছাব্বিশটা।'

'চালিয়াৎ !'

ইরু বললো, 'তা দশটা-বারোটা তো হবে।'

'আমি সঙ্গে থেকে গুনে-গুনে ঠিক আঠারোটা,' বললো গীতি।

'পান তো ?' আতা ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ বাঁকালো। 'ও ! তোমরা এই করছিলে এতক্ষণ ! লুকিয়ে পান খাচ্ছিলে ?'

'লুকিয়ে কেন ?' ইরুও ভঙ্গি করলো চোখের। 'প্রকাশ্যে।

সর্বসমক্ষে। আমরা সকলকে পান দিচ্ছিলাম, আর সকলকে দিতে-দিতে নিজেদের মুখে টপাটপ—'

'আমার জন্য আনিসনি?' অভিমানের ঢেউ দিলো আতার গলায়।

ইরু কথা না-ব'লে আতার ডান হাতটি নিজের বাঁ হাতে ধরলো, তারপর ডান হাতের বদ্ধ মুঠি খুলে সেখানে রাখলো তার হাতের তাপে গরম-হওয়া একটি লবঙ্গ-ফোঁড়া ছোট্ট খিলি।

তখন আতা বললো, 'আমিও ঢের পান খেয়েছি। কত, তার অন্ত নেই।—তা তুই এনেছিস এটাও খাই।' পান মুখে দিয়ে চোখে হেসে ইরুকে বললো, 'তোর ঠোঁট বেজায় লাল হয়েছে রে!'

গীতি তাড়াতাড়ি জিগেস করলো, 'আমার?'

ইরু বললো, 'তোর ঠোঁট আবার লাল হবে কী—এমনিই তো চিঠির বাক্স ক'রে রেখেছিস!'

আতার এই মন্তব্য মিথ্যা প্রমাণ ক'রে গীতির রং-বোলানো গাল আরো লাল হ'লো। 'আ-হা—ইরু বুঝি আর রং মাখেনি?' ব'লে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিলো ইরুকে।

'একটু স'রে দাঁড়াও মা-লক্ষ্মীরা,' তামার থালায় কী-সব সাজাতে-সাজাতে রোগা পুরুৎঠাকুর আশাতীত মোটা গলায় বললেন।

ঢেউয়ের মতো স'রে গেলো লাল সবুজ কমলা শাড়ি। 'মা-লক্ষ্মী' শুনে ইরু গীতির বড্ড হাসি পেলো, চাপতে গিয়ে গপগপ উপচোলো। 'হাসছিস কেন?' হাসির কারণ বুঝে ভুরু বাঁকালো আতা।

'পুরুতের গায়ে ওটা কী রে?' গীতি জিগেস করলো কানে-কানে।

আতা হাসলো এবার। 'এও জানিস না? ওটা তো নামাবলী।'

'ও! একেই নামাবলী বলে?' গীতি গম্ভীর হ'লো, কিন্তু তখনই আবার খুক্ ক'রে হেসে ফেললো। 'টিকিটা দেখেছিস?'

ইরু বললো, 'টিক-টিকি!'

এ-কথা শুনে আতারও হাসি পেলো, সামলে নিয়ে হাসিতে শাসন মেশানো গলায় বললো, 'কী বাজে—! জানিস, ইনি আজে-বাজে পুরুৎ না, কোন স্কুলের হেড-পণ্ডিত!'

'যাঃ! পুরুৎ বুঝি আবার পণ্ডিত হয়!' বললো গীতি।

'বা, আমি জানি যে! আচ্ছা, মামাকে জিগেস করিস—'

আতার কাঁধে টোকা দিয়ে ইরু বললো, 'চুপ! ঐ মামা এলেন। আরম্ভ হবে এবার।'

তিনজনে আর-একটু ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়ালো।

গরদের চাদর-জড়ানো বিজন একটু অস্বাভাবিকরকম তাড়াতাড়ি হেঁটে পুরুতের সামনে এসেই ধপ ক'রে ব'সে পড়ছিলো, পুরুৎ হাত তুলে বাধা দিলেন। 'ঐ আসন তোমার। উত্তর দিকে মুখ।'

বিজন উত্তর দিকে মুখ ক'রে কুশাসনে বসলো। ব'সেই কেঁপে উঠলো। পুরুৎ বললেন, 'স্থির হ'য়ে বোসো।'

বিজন স্থির হ'লো। তাকে একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলো অনেক জোড়া চোখ—ততক্ষণে আরো অনেকে হাজির হয়েছে সেখানে, মেয়েই বেশি। ইভা গাঙ্গুলি চিত্রাকে জিগেস করলো, 'ইনি কে?'

'মনে হচ্ছে ইনি সম্প্রদান করবেন?'

'নাকি? ঐটুকু ছেলে সম্প্রদান করবে?'

কাছে দাঁড়িয়ে ঊর্মিলা শুনলো কথাটা। চোখের কোণ থেকে একটা দৃষ্টিপাত ক'রে বললো, 'ইনি স্বাতীর দাদা।'

কোণকাটা চশমাটা ইভা চিনলো, খেতে ব'সে লক্ষ্য না-ক'রে উপায় ছিলো না। এখন আরো একটু ভালো ক'রে তাকালো মুখের দিকে, একটু চেনা-চেনা হাসলো। ঊর্মিলা তখনই ফিরে হেসে কাছে ঘেঁষলো। ইভা জিগেস করলো, 'আপনি বুঝি বাড়ির কেউ?'

'না, না, বাড়ির কেউ না। বললাম না তখন আমিও বন্ধু? তবে—' এক দমকে অনেক কথা ব'লে ফেললো ঊর্মিলা। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার সঙ্গে ইভা গাঙ্গুলির সেই বন্ধুতা জন্মালো, যা রেলগাড়িতে আর বিয়েবাড়িতে দু-জন মেয়ের মধ্যেই শুধু সম্ভব, আর-কোথাও আর-কারো মধ্যে না।

পরস্পরের বিষয়ে প্রধান তথ্যগুলি জেনে নেবার পরে ঊর্মিলা বললো, 'বিজনদাকে কী-রকম বেচারা দেখাচ্ছে ওখানে ব'সে! স্বাতীর দাদার কথা বলছি।'

ইভা বললো, 'উনি তো কিছু করছেন না, শুধু ব'সেই আছেন।'

'না, না, ঠোঁট নড়ছে দেখতে পাচ্ছেন না?'

'হ্যাঃ!' ইভা হাসলো। 'মন্ত্র-টন্ত্র পুরুৎই যা-লোক বিড়বিড় করে, অন্যদের ঠোঁট নাড়াই কাজ।'

ঊর্মিলাও হাসলো। 'হাঙ্গামাও! সংক্ষেপে সারতে পারে না?'

'দেখতে কিন্তু মন্দ না,' মৃদু মন্তব্য করলো অনুপমা।

'হ্যাঁ, অন্যদের পক্ষে খুব ভালো,' ইভার পুরুষ-গলায় আশে-

পাশে কেউ-কেউ ফিরে তাকালো। 'কিন্তু যাদের বিয়ে, তাদের কী-কষ্ট!'

'খুব কি কষ্ট?' চিত্রা ব'লে উঠলো ফশ ক'রে। হাসির হাওয়া দুলিয়ে গেলো অনুপমা থেকে ঊর্মিলা পর্যন্ত চারটি পাশাপাশি তরুণীকে।

চিত্রার আঁচলে টান পড়লো এমন সময়। বছর দশেকের একটি মেয়ে ফিশফিশে গলায় ডাকলো, 'দিদি—'

ফিরে তাকিয়ে মা-কে দেখতে পেয়ে চিত্রার হাসিমাখা মুখটা নিমেষে করুণ হ'লো। 'এখন যাবে, মা?'

'হ্যাঁ—চল। রাত হ'লো—আবার ব্ল্যাক আউট। তুমিও তো আমাদের সঙ্গে?' ব'লে চিত্রার মা অনুপমার দিকে তাকালেন।

'এখনই যাবেন?' অনুপমার কথাটা কাকুতির মতো শোনালো।

ইভা বললো, 'একটু থাকুন না। আমিও যাবো একটু পরে, একসঙ্গেই যাবো সবাই। কাছেই তো—আর এখান থেকে একজন লোক নিয়ে নিলেই হবে।'

কিন্তু স্বামী-সংসার নিয়ে বিব্রত চিত্রার মা আর থাকতে রাজি হলেন না। হঠাৎ তাঁর দিকে গলা বাড়িয়ে ঊর্মিলা বললো, 'একটা কথা বলি—কিছু মনে করবেন না। আমাকে নিতে গাড়ি আসবে খানিক পরে, আপনাদের সকলকেই নামিয়ে দিতে পারবো।'—কিন্তু ছোটো গাড়ি আসে যদি? তাহ'লে দু'-বারে যাওয়া যাবে—এমন আর মুশকিল কী। ঊর্মিলা নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার ভদ্রমহিলার দিকে তাকালো। 'সুবিধে হবে?'

ঝকঝকে মুখের অচেনা এই মেয়েটির আমন্ত্রণের উপরে চিত্রার

মা তখনই কিছু বলতে পারলেন না। থাকবার ইচ্ছে অবশ্য মনে-মনে তাঁরও, কিন্তু ইচ্ছেমতো আর কতটুকু হয় সংসারে। তাঁর দ্বিধার সুযোগ নিয়ে চিত্রা আবার বললো, 'থাকো না, মা।'

'আচ্ছা—। তোর ঘুম পায়নি তো, টুন্টি?'

'না তো! একটুও ঘুম পায়নি!' দশ বছরের মেয়েটি খুব বড়ো ক'রে চোখ খুলে তার কথার চাক্ষুষ প্রমাণ দিলো। তারপরেই ন'ড়ে উঠে ত্রস্ত গলায় বললো, 'মা! ঐ তো বর!'

ছোটো মেয়েটির কথাটা যেন হাওয়ায় ছড়ালো, চঞ্চল হ'লো সবাই। বরের সঙ্গে-সঙ্গে, পিছনে, আরো অনেকে এলো, সবাই পুরুষ, আর তাদের পিছনে এলো পাঁচ থেকে দশ পর্যন্ত বয়সের এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। তাদের মধ্যে দু-চারজন সাহসী অনেকটা কাছে এগিয়ে ব'সেই পড়লো, আর তাদের কেউ কিছু বললো না দেখে অন্য বাচ্চারাও টিপটিপ ব'সে পড়তে লাগলো।

সত্যেন আলপনা-আঁকা পিঁড়িতে পুব দিকে মুখ ক'রে বসলো; তার পাশে খালি থাকলো আর-একটা পিঁড়ি, একটু ছোটো আলপনাও তার অন্য রকম। ব'সে চারদিকে একবার তাকালো সত্যেন; প্রথমেই চোখ পড়লো লেপটে-বসা বাচ্চাদের দলটিতে। ঐ-তো—আহা, কী না নাম দিল্লির দিদির ছেলের—হ্যাঁ, দীপু;—আর বর্মার দিদির মাথায় প্রায় সমান-সমান তিন ছেলে পাশাপাশি—আর ছোটন তো সক্কলের সামনে—আসনপিঁড়ি হ'য়ে কেমন বসেছে ছাখো না ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ফুলবাবু। ওদিকে তাতাও তার দলবল নিয়ে;—সব ঝলমলে শাড়ি আজ, সব ঠোঁট পান খেয়ে লাল—আর বাচ্চা হ'লে কী হবে, মেয়ের

দলে আর ছেলের দলে স্পষ্ট আলাদা ভাব। সত্যেন চোখ সরালো সেখান থেকে, হঠাৎ অখিলকে দেখতে পেলো তার কাছেই। রোগা মুখে উপলক্ষ্যের উপযোগী গাম্ভীর্য এনেছে অখিল, বুকের উপর হাত ভাঁজ ক'রে দাঁড়িয়েছে।

সত্যেন আস্তে বললো, 'অখিল বোসো না।'

সতুদা বিয়ে করতে ব'সে তার সঙ্গে কথা বলবেন এত বড়ো সৌভাগ্য অখিল কল্পনাও করেনি; মুহূর্তে তার গাম্ভীর্য ঝ'রে আঁকাবাঁকা দাঁতের সারি হাসিতে বেরিয়ে পড়লো।

সত্যেনের কথাটা শুনতে পেয়ে অখিলের কাঁধে হাত রাখলো অরুণ। 'তুমি এখানেই বোসো,' ব'লে তার সতুদার প্রায় গা ঘেঁষে বসিয়ে দিলো তাকে। অখিলের আরাম হ'লো—এর আগে অনেকক্ষণ সে বসেনি; কিন্তু সতুদার অত কাছে বসা কি উচিত? খানিকটা স'রে বসলো সে, কিন্তু বাচ্চাদের দিকে ঘেঁষলো না—ছি! ঐ পুঁচকেদের সঙ্গে!

'বেশ! আসল জিনিশই ফেলে এসেছিলে!' ব'লে হেমাঙ্গ পিছন থেকে নিচু হ'য়ে বরের টোপরটা সত্যেনের একেবারে কোলের উপর নামালো। সত্যেন ভুরু কুঁচকে তাকালো; শোলায় আর রাংতায় বানানো চিকচিকে বিশ্রী বস্তুটাকে আস্তে দু-আঙুলে সরিয়ে কাতর মুখে বললো, 'এটা পরতে হবে?'

পুরুৎ বললেন, 'মস্তকে স্থাপন করো।'

'এখনই?'

বরের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে পুরুৎ বললেন, 'আচ্ছা, পরে হবে।'

'আর-এক কথা। আমি কিন্তু এই জামা-টামা প'রেই থাকবো,' ব'লে সত্যেন পুরুতের কাঁচাপাকা ঘন ভুরুর তলায় নিষ্প্রভ চোখে চোখ রাখলো।

ভেবেছিলো এ-কথা শুনে পুরুতের তাক লাগবে, কিন্তু সে-রকম কোনো লক্ষণই টিকিওলা বামুনের পরিষ্কার-কামানো শীর্ণ মুখে ফুটলো না। ঈষৎ ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'যথাসময়ে উত্তরীয়ের আচ্ছাদন হ'লেই চলবে।'

সত্যেন খুশি হ'লো; কিন্তু এত সহজ সমাধানে তত যেন খুশি হ'লো না, তেমন-যেন জিৎ-জিৎ লাগলো না তার।

বিয়ে আরম্ভ হ'লো। বিজনের সামনে একটি তামার থালা ধ'রে পুরুৎ বললেন, 'ডান হাতে এক মুঠো তণ্ডুল তোলো।'

বিজন ডান হাতে এক মুঠো আতপ চাল তুললো।

'এবার বাঁ হাতটি ডান হাতের উপর ন্যস্ত করো।'

বিজন তা-ই করলো।

বিজনের বাঁ হাতটি ঠিকভাবে বসিয়ে দিয়ে পুরুৎ বললেন, 'এবার ডান হাতে জামাতার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করো।'

শরীরের কোন অংশকে 'জানু' বলে বিজনের তা হঠাৎ মনে পড়লো না, পুরুতের মুখের দিকে তাকালো।

পুরুৎ নিজেই সম্প্রদাতার ডান হাতের একটি আঙুল জামাতার ডান হাঁটুতে ঠেকিয়ে দিলেন। বিজনকে সত্যেনের দিকে অনেকটা হেলতে হ'লো, তার চাদর স'রে গিয়ে ভিতরকার খোলা গায়ের এক চিলতে চামড়া সত্যেনের চোখে পড়লো। পুরুৎ থেমে-থেমে

সস্মিত বললেন, আর অস্ফুট, ফিশফিশে, ব'সে-যাওয়া গলায় খানিকটা ঐ-রকমই কিছু-একটা আউড়িয়ে চললো বিজন। সত্যেনের আঙুল-ঠেকানো হাঁটু শুড়শুড় ক'রে উঠলো, একটু পরে ঠোঁটচাপা হাসি ফুটলো মুখে।

সেটা লক্ষ্য ক'রে ঊষা-বৌদি বললেন, 'বর বেশ সপ্রতিভ তো। হাসছে।'

ঘটনাস্থল থেকে চোখ না-সরিয়ে শোভা বললো, 'হ্যাঁ, খুব! আর কেনই-বা হবে না!' ভাবতে চেষ্টা করলো আগেই খুব চেনাশোনা থাকলে ঠিক বিয়ের সময়টায় কেমন লাগে, কিন্তু মুহূর্তেই ভাবনা ছেড়ে আবার দেখতেই নিবিষ্ট হ'লো তার মন।

বরের হাঁটু থেকে আঙুল সরিয়ে বিজু সোজা হ'লো, পুরুৎঠাকুর ঘাড় ফিরিয়ে হেমাঙ্গবাবুকে কী বললেন, হেমাঙ্গবাবু ইশারা করলেন অরুণবাবুকে, অরুণবাবু ব্যস্ত হ'য়ে ছুটলেন, কাছে-বসা বাচ্চারা ঘাড় বেঁকিয়ে দেখতে লাগলো। তাদের মধ্যে নিজের দুই মেয়েকে চকিতে দেখলো শোভা, চকিতেই তার চোখ স'রে গেলো ;—কতকাল পরে পাওয়া এই আনন্দের কাছে, তার পক্ষে এই শেষ আনন্দের রাত্রিটিতে, সন্তানকেও তার তুচ্ছ লাগলো।

পিছনে ঠানদি-গলায় কে বললেন, 'বর-যে ব'সেই রইলো! জোড় পরবে না?'

'কনে আনতে গেলো?' অনেকটা কাঁচা গলার আওয়াজ হ'লো সঙ্গে-সঙ্গে।

'কনে আনতে?···কনে আসছে?' মেয়েদের গুনগুন রব রাস্তার দিকের কার্নিশ থেকে ছড়িয়ে সিঁড়ির চিলকোঠায় চুপ করলো।

দোতলাও চুপ ; কনে-সাজানো ঘরে আর ভিড় নেই ; যে-ক'জন আছে তাদের মুখেও কথা নেই।

উশকোখুশকো অরুণ হঠাৎ আবির্ভূত হ'য়ে বললো, 'স্বাতী, চলো !'

কথাটা পড়লো মেঝের উপর শিষের টুকরো। বড়োপিসিমা আর কুন্দ-দিদিমা চোখোচোখি করলেন, তারপর কুন্দ-দিদিমা ডাকলেন, 'স্বাতী, আয়। পিঁড়িতে বোস।'

স্বাতী নড়লো না। তেমনি দাঁড়িয়ে ছিলো সে, মুখ নিচু, হাত দুটি নিঃসাড়, যেমন তাকে রাজেনবাবু দেখেছিলেন, তবে সাজসজ্জায় তফাৎ হয়েছে। একটি গোলাপি রঙের স্বচ্ছ রেশমি ওড়নায় তার মুখ এখন অর্ধেক ঢাকা, সিঁথিতে বাঁধা শোলার মুকুট, আর পান্না-চুনি-সোনালি-লালের উপর দিয়ে নেমে এসেছে গলা থেকে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত মস্ত মোটা ধবধবে শাদা সুগন্ধি মালা।

লীলামাসি আস্তে বললেন, 'হেঁটেই যাক না।'

'হেঁটে !' শান্ত, একটু বিষণ্ণ চোখে বড়োপিসি স্বাতীকে দেখছিলেন এতক্ষণ, কিন্তু কথাটা শোনামাত্র সারা শরীরে তাঁর ব্যস্ততা জাগলো। 'বিয়ের কনে হেঁটে যাবে ? কী-যে সব বলে আজকাল—হেসে বাঁচিনে !' চোখের ঝলকে কুন্দ-দিদিমার মুখ থেকে সমর্থন কাড়লেন তিনি, তারপর আড়চোখের দ্রুত দৃষ্টিতে লীলামাসিকে যেন ভস্ম ক'রে দিয়ে একটু ভাঙা-ভাঙা গলায় হাঁক দিলেন, 'কই, কে-কে পিঁড়ি ধরবে এসো।'

ডোরাকাটা শার্টের আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে এলো ডালিম।

'আর ?'

'আমি আছি', অরুণ বললো পিছন থেকে।

'আয়, স্বাতী। বোস।' বড়োপিসির গলার আওয়াজ বদলে গেলো হঠাৎ; নরম হ'লো, ভিজে এলো।

স্বাতী নড়লো; হলদে, শাদা আর লাল রঙে আঁকা পিঁড়িটায় উঠে দাঁড়ালো; বসলো পিঁড়িতে আসনপিঁড়ি হ'য়ে, রজনীগন্ধার মালার প্রায় অর্ধেকটা গোল হ'য়ে কোলে পড়লো লাল বেনারসির উপর শাদা। দিদিরা তাকে ঘিরে দাঁড়ালো; মহাশ্বেতা আর সরস্বতীর মাঝখানে শ্বেতাকে দেখালো স্বাতীর গলার মালার মতোই শাদা।

শাশ্বতী হাঁটু ভেঙে ব'সে পড়লো স্বাতীর পিছনে। পিঠে হাত রেখে কত আস্তে যে ডাকলো, 'স্বাতী!' হঠাৎ কান্না পাচ্ছিলো তার, নিশ্বাস নিতে পারছিলো না, তাই অত আস্তে।

স্বাতী কেঁপে উঠলো। ওড়না-ঢাকা মুখ তুললো, মুখ ফেরালো, সব ঝাপসা দেখলো, ঝাপসা চোখে বড়দিকে দেখলো।

'বোকা মেয়ে!' হাসি, হাসির ছায়া শ্বেতার ঠোঁটের উপর ভেসে গেলো। 'কই, অরুণ—'

শাশ্বতী উঠলো, দিদিরা স'রে দাঁড়ালো, অরুণ আর ডালিম দু-দিকে নিচু হ'য়ে পিঁড়ি ধ'রে তুললো। খানিকটা শূন্যে হ'তেই স্বাতী ন'ড়ে উঠলো, তাড়াতাড়ি দু-হাত বাড়িয়ে গলা জড়ালো দু-জনের।

সোজা হ'য়ে অরুণ বললো, 'পারবে, ডালিম?'

ডালিম বুক টান ক'রে বললো, 'খুব!'

'না, না, দু-জনে হবে না। দাঁড়াও!' বলে শ্বেতা তাড়াতাড়ি

এলো দরজার কাছে, পরদা ধ'রে দাঁড়িয়ে ডাকলো, 'পরেশ-কাকা আসুন। পিঁড়ি ধরবেন।'

'পিঁড়ি ধরবো? অল রাইট!' হাতের সিগারেট ফেলে পরেশ-কাকা প্রথমেই দরজার পরদা ধ'রে টান দিলেন। সরাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আলগা-বসানো পরদা পিতলের রডসুদ্ধু প'ড়ে গেলো। তুলে নিয়ে সরিয়ে রাখলো শ্বেতা।

'এসো হে ব্যারিস্টর-সাহেব!' বেঁটে কিন্তু গাঁট্টা জোয়ান পরেশ-কাকা পা ফেললেন।

'আমিও? আচ্ছা।' তপনদা, বাবু মানুষ, আস্তে এগোলেন। তর্কের ঝাঁজটা তখনো ভুলতে না-পেরে ঈষৎ ঠেশ দিয়ে বললেন, 'আপনি আর কেন, পরেশদা?'

'কী? ভাবছো পরেশদার বয়েস হয়েছে? আরে এখনো তোমাদের মতো আধ-ডজনকে—ধরো!'

চার জোয়ান চারদিকে পিঁড়ি ধরলো: স্বাতী শূন্যে চ'ড়ে যাত্রা করলো জীবনের দিকে। শাঁখের ফুঁ উঠলো উলুধ্বনি ছাপিয়ে, মেয়ের দল পিছনে এলো, বারান্দায় তন্দ্রা-লাগা নেপাল-পিসে চমকে কেঁপে উঠলেন, বেলি তাঁকে ফেলেই একটু উঠে এলো দেখতে, গলিতে রাজেনবাবুর ছাইরঙের আলোয়ানটা চকিতে দেখা গেলো।

সিঁড়ির কাছে এসে পরেশ-কাকা বললেন, 'সাবধান এবার।'

ডালিম বললো, 'ঠিক আছে!'

স্বাতী সিঁড়ি উঠলো, দু-পাশে অরুণ আর ডালিম, পিছনে পরেশ-কাকা, আর সামনে, তার মুখোমুখি, তপনদা। তপনদার

কষ্ট কম, কিন্তু অসুবিধে বেশি, কেননা তাঁকে পিছু হেঁটে সিঁড়ি উঠতে হচ্ছে। অর্ধেক সিঁড়িতে মোড় নেবার সময় কোঁচায় পা বেধে তিনি হোঁচট খেলেন।

পিঁড়িটা সামনের দিকে ঝুঁকলো, বিষম টান পড়লো অরুণ ডালিমের গলায়, পরেশ-কাকা দেখলেন স্বাতীর পিঠটা সাঁতারুর মতো বেঁকছে। চট ক'রে এক হাতে তাকে ধ'রে ফেলে বললেন, 'থাক। তুমি ছেড়ে দাও, তপন।'

'আপনি বরং এদিকে আসুন,' জবাব দিলেন তপনদা।

পরেশ-কাকা আর তপনদা জায়গা-বদল করলেন, কিন্তু এর পরেও ছাতের দরজায় এসে পিঁড়ি একবার ঠেকে গেলো। পিঁড়ি আড় ক'রে, নিজেরা কাৎ হ'য়ে, মুখঢাকা নিচুমাথা সোনালি-লাল নতুন স্বাতীকে নিয়ে চারজনে যেই ছাতে পৌঁছলো, অমনি আরো জোরে ছড়ালো মেয়েলি গলার গুনগুন, 'ঐ-যে!··· কনে এলো!···স্বাতী!···বাঃ, সুন্দর!···'

পায়রার ঝাঁক হাওয়ায় উঠলো, পাখার শব্দ ক'রে নানা দিকে উড়লো। যেমন নাটকের বড়ো দৃশ্য আরম্ভ হবার আগে এদিক-ওদিক তাকানো ছেড়ে, ঘরোয়া ভাবনা থামিয়ে, প্রোগ্রামের ভাঁজ মুড়ে, সবাই ঠিকঠাক ব'সে নিয়ে সামনে তাকায়, তেমনি ঝিরঝির-চঞ্চলতার গায়ে-গায়ে-ছোঁয়া কয়েকটা ঢেউয়ের মিলিয়ে যাবার পরে সকলে আরো স্থির হ'য়ে তাকালো। কেউ সরলো, কেউ এগোলো, সতুদার বেকার আলোয়ান নিয়ে ঈষৎ-বিব্রত নিখিল শরীরের ভার এক পা থেকে আর-এক পায়ে বদলি করলো। অনুপমা হাত রাখলো চিত্রার কাঁধে, কিরণ বক্সির

ভাঁজ-না-ভাঙা শাল বাঁ থেকে ডান কাঁধে ঝুললো, নিখিল, মনে-মনে বললো এখন আর কোনোদিকে তাকাবো না, বাচ্চাদের কয়েকজন ভালো ক'রে দেখার জন্য আসনপিঁড়ি ছেড়ে হাঁটু ভেঙে বসলো, শরীরটাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে ঘুম তাড়ালো ছোকন। সত্যেন তাকিয়ে দেখলো আরো অনেক লোক—হাসিমুখ শাশ্বতী সামনেই দাঁড়িয়ে—জায়গাটা ভ'রে গিয়ে কেমন অন্য রকম দেখাচ্ছে।

পিঁড়ি নামানো হ'লো; হলদে, শাদা আর লাল রঙে আঁকা পিঁড়ি ছেড়ে স্বাতী এবার বিয়ের পিঁড়িতে বসলো সত্যেনের বাঁ পাশে। পুরুৎ জিগেস করলেন, 'কন্যা কি হেঁটে প্রদক্ষিণ করবেন?'

'না, ঘোরানো হবে,' বলে হেমাঙ্গ চচ্চড় শব্দে পাটরঙের পাটকাপড়ের কড়কড়ে উড়নিটার ভাঁজ খুলে ফেললো। সত্যেনের কাঁধের উপর সেটা ফেলে বললো, 'জড়িয়ে নাও।'

সঙ্গে-সঙ্গে শাশ্বতী নিচু হ'য়ে টোপর পরিয়ে দিলো বরের মাথায়। লজ্জায় অধোবদন, সত্যেন হাসির শব্দের অপেক্ষা করলো, কিন্তু না—কেউ হাসলো না, সত্যেন রায়কে বিয়ের সময় টোপর পরতে দেখে ওখানে উপস্থিত অতগুলি মানুষের মধ্যে একজনও হাসলো না। সত্যেন রায় একটু অবাক হলেন।

পুরুৎ বললেন, 'জামাতা দণ্ডায়মান।'

টোপর-মাথায় মালা-গলায় সত্যেন উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে উড়নিটা জড়িয়ে নিলো। নেহাৎ মন্দ লাগলো না: একটু যেন শীত-শীত। বিজনবাবুর গায়ে তো জামাও নেই; শীত করছে না তো?

বিয়ের পিঁড়ি ধ'রে আবার স্বাতীকে উঁচু করলো ডালিম, অরুণ, পরেশ-কাকা—চারজনের বদলে তিনজনেই সুবিধে। বাদ

প'ড়ে তপনদা মুষড়ে গেলেন না, বরং খুশি হ'য়ে স'রে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

স্বাতীকে শূন্যে ক'রে সাত পাক ঘোরাতে-ঘোরাতে ডালিমের ফর্শা হাতের শির ফুলে উঠলো, অরুণের উপরের ঠোঁটটা মুখের মধ্যে ঢুকে গেলো, পরেশ-কাকারও চোখমুখ বেশ শক্ত হ'লো। তিনজোড়া হাতের উপর স্পষ্ট আরো ভারি হ'তে লাগলো স্বাতী, আর যেন ও-তিনজনকে উৎসাহ দিয়ে হেমাঙ্গ চেঁচিয়ে গুনতে লাগলো, 'এক···দুই···চার···'

'ভুল হ'লো! এই তিনবার!' ব'লে উঠলো চিত্রা।

অনুপমা বললো, 'না ঠিক আছে!'

'ঈশ, স্বাতীর মুখটা দেখাই যাচ্ছে না!'

'দেখা যাবে কী-রে? মুকুটটা সুতো দিয়ে বেঁধে দেয় তো ঘোমটা যাতে স'রে না যায় সেইজন্যই।'

'মুখ তো বরেরও ঢাকা। সামনে একটা কাপড় ধরেছে আবার! রাবিশ!' ইভা কটাক্ষ হানলো ঊর্মিলাকে।

'বাঃ!' বাঁকা হাসলো ঊর্মিলা। 'শুভদৃষ্টির আগে মুখ দেখতে নেই যে!'

'ও, শুভদৃষ্টির আগে মুখ দেখতে নেই বুঝি?' ইভা তার পুরুষগলায় এমন হেসে উঠলো যে আশে-পাশে অনেকে চমকে তাকালো।

'···পাঁচ।'

পিঁড়ি থেমে গেলো। সরু-গলায় আরো চেঁচিয়ে হেমাঙ্গ আবার বললো, 'পাঁচ—পাঁচ—আর দু-বার!'

পরেশ-কাকা বললেন, 'ডালিমের কষ্ট হচ্ছে ?'

'নাঃ!' ফোঁশ করে নিশ্বাস ফেললো ডালিম।

'চলো!'

পিঁড়ি আবার চললো। অরুণের উপরের ঠোঁট খুলে গেলো, নিচেরটির উপর জিভ বুলিয়ে খুব নিচু গলায় বললো, 'স্বাতী, আস্তে।' কিন্তু স্বাতী বোধহয় কথাটা শুনলো না, কি বুঝলো না, তেমনি শক্ত ক'রেই গলা আঁকড়ে থাকলো।

পিঁড়ি এবার ঘুরতেই ইভা গাঙ্গুলির চোখে পড়লো লম্বা ডালিমকে, কোঁকড়া চুলের তলায় এখন অন্য কারণে লাল-হওয়া তার কিশোর মুখটা। ঊর্মিলার কাঁধে টোকা দিয়ে জিগেস করলো, 'স্বাতীকে ঘোরাচ্ছে কারা জানেন ?'

'ঐ চশমা-পরা-জন তো জামাইবাবু।' অরুণকে আজই প্রথম দেখেছিলো ঊর্মিলা, এ-বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্কটা দেখামাত্রই ঠাউরেছিলো, কিন্তু কথাটা বললো এমন ক'রে যেন জামাইবাবুটি তার কতই চেনা।

'আর অন্যজন ? ঐ ফর্শা ছেলেটি ?' বেঁটেমতো বুড়োমতো তৃতীয়জনের অস্তিত্বটাই মানলো না ইভা।

ফর্শা ছেলেটিকেও ঊর্মিলা আগে দ্যাখেনি, কিন্তু খেতে ব'সে শাশ্বতীকে শুনেছিলো তাকে ডালিম ব'লে ডাকতে, আর তাদের বাড়িতে অবিরতই যাওয়া-আসা-রাখা বিজনের মুখে কবে একবার শুনেছিলো এই ভাগনেটির কথা। কোনো খবর, যে-কোনো খবর—যতই যেমন-তেমন ক'রে বলা হোক—একবার কানে ঢুকলে ঊর্মিলা ভোলে না ; তাই স্বচ্ছন্দে জবাব দিলো, 'ও-তো ডালিম।

স্বাতীর বড়দির ছেলে। কী-কাণ্ড তখন জল ঢালতে গিয়ে বেচারা!' ঊর্মিলা হাসলো।

ঘটনাটা ইভারও মনে পড়লো, কিন্তু হাসি পেলো না। বললো, 'যারা ঘোরাচ্ছে তাদের কী কষ্ট!'

'এমন আর কী', বললো অনুপমা।

'কষ্ট না? সব বড়ো-বড়ো মেয়ে আজকাল—তাদের কি আর—'

'স্বাতীকে কিন্তু ছোট্ট দেখাচ্ছে!'

'বিয়ের সময় সব মেয়েকেই ছোটো দেখায়।' মা-র মুখে শোনা এই কথাটার সঙ্গে চিত্রা স্বাধীন একটু মন্তব্য জুড়লো, 'তাই ব'লে ইভাকে দেখাবে না।'

'ভাগ্যিশ!' ইভা হাসলো, বড্ড জোরে। আবার কেউ-কেউ ফিরে তাকালো তার দিকে।

চিত্রার দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে ঊর্মিলা কোন-কাগজে-পড়া একটা বোল ঝাড়লো, 'মেয়েরা আজকাল স্বাধীন ব'লে লম্বাতেও বাড়ছে। আগে—'

'সাত!' হেমাঙ্গর মিহি গলা তীক্ষ্ণ বেজে উঠলো।

ঢেউয়ের মতো এগিয়ে এলো মেয়ের দল, বাচ্চারা উঠেই দাঁড়ালো অনেকে, হেমাঙ্গর কাঁধের উপর দিয়ে গলা বাড়ালো কিরণ বক্সি, হেমাঙ্গ স'রে গিয়ে বরযাত্রীকে খাতির করলো, তার পাশে এসে দাঁড়ালো শাশ্বতী, অগত্যা-উপস্থিত হারীত নেহাৎ কৌতূহলের চোখেই স্বাতীর দিকে তাকালো।

পিঁড়ি দাঁড়ালো বরের মুখোমুখি। হেমাঙ্গ বললো, 'অত উঁচুতে না।'

পিঁড়ি নামলো।

'আর-একটু উঁচু। চোখে-চোখে ঠিক লেভেল হওয়া চাই।'

পিঁড়ি নিচু হ'লো আবার। পরেশ-কাকা চোখ কুঁচকে হেমাঙ্গর দিকে তাকালেন। 'ছাখো হে, লেভেল হয়েছে?'

হেমাঙ্গ তাকিয়ে বললো, 'এই—আর-একটু কাছে—হ্যাঁ—ঠিক!'

পিঁড়ি স্থির হ'লো, বরের মুখের সামনে এতক্ষণ ধ'রে-রাখা কাপড়টা স'রে গেলো, স্বাতীর দু-দিকে দাঁড়িয়ে ঘোমটা সরিয়ে দিলে। মহাশ্বেতা আর সরস্বতী। কিন্তু স্বাতী চোখ তুলতে পারলো না।

সরস্বতী বললো, 'স্বাতী, তাকা!'

ওদিকে কিরণ বললো, 'তাকাও, সত্যেন।'

কিন্তু সত্যেন তাকিয়েই ছিলো। এই স্বাতী? চোখে পড়লো নিচু চোখের লম্বা কালো পলক। এই স্বাতী।

চোখে চোখ পড়লো, শাঁখ বাজলো। কী-কারণে কেউ জানে না, কিন্তু উপস্থিত মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো প্রত্যেকের মন বিশেষ-একটু সুখী লাগলো সেই মুহূর্তে। পিঁড়ি মেঝেতে নামলো, বরের পিঁড়ির মুখোমুখি স্বাতীকে বসিয়ে এতক্ষণে ছাড়া পেলো ডালিম, অরুণ, পরেশ-কাকা। অরুণ প্রথমেই গলায় হাত বুলোলো, ডালিম হাতে হাত ঘষলো, পরেশ-কাকা শুধু তাঁর চওড়া, ব্যায়ামী বুক ভ'রে নিশ্বাস নিলেন একবার। হেমাঙ্গ বললো, 'এখন মালাবদল। স্বাতী, দাঁড়াও।'

সাত পাক ঘোরার পর দাঁড়াতে পেরে আরাম হ'লো স্বাতীর শরীরে। কিন্তু সেই আরামের বোধ পলকে মুছে গেলো; তার

সামনে, কাছে, মুখোমুখি দাঁড়ানো সত্যেনকে ছাড়া আর-কিছুই সে অনুভব করতে পারলো না সেই মুহূর্তে। সে জানলো না যে সারাদিনের উপোশে তার পা এখন কাঁপছে; বুঝলো না শাড়ি-গয়নায় জড়ানো তার শরীরের অস্বাচ্ছন্দ্য; ভুলে গেলো বাবাকে ছেড়ে যাবার অসহ্য কষ্ট; মুহূর্তের জন্য অন্য কোনো বোধ তার থাকলো না, শুধু সত্যেনকে অনুভব করলো—দেখলো না, শুধু অনুভব করলো।

মালা-হাতে, মুখোমুখি, দাঁড়ালো দু-জনে। টোপর-পরা মাথা নিচু হ'লো; সত্যেনের গলা বেয়ে বুকের উপর নামলো স্বাতীর গলার শাদা ফুলের মালা। ওড়না-ঢাকা মাথা নিচু হ'লো; স্বাতীর বুকের উপর পড়লো সত্যেনের গলার একটু ছোটো, একটু-মলিন-হওয়া মালা। কোনো কারণ নেই, কোনো অর্থ নেই এ-সবের; লক্ষ অনুষ্ঠান ব্যর্থ, হৃদয়ে যদি সত্য না থাকে; কিন্তু তখনকার মতো সুখের, আনন্দের, কল্যাণের হাওয়া দিলো ঝিরঝির, দিকে-দিকে ছড়ালো, শোভার বিহ্বল চোখ থেকে হারীতের কৌতুকে বাঁকানো ঠোঁট পর্যন্ত পৌঁছলো। কৌতুকটা যেন মন্দ লাগলো না হারীতের।

শাশ্বতী মৃদুস্বরে বললো, 'স্বাতী, বোস এখন।'

সত্যেনও বসবার জন্য নিচু হ'লো, কিন্তু হঠাৎ গোলগাল বর্ষীয়সী কালো একজন মহিলা তার কাছে এসে বললেন, 'আগে একবার নিচে চলো তো বাপু।'

'নিচে। কেন?'

'আছে, আছে; চলো।' কালো মহিলাটি চোখ টিপে হাসলেন।

সত্যেন কেমন-কেমন চোখে চারদিকে তাকালো, কিন্তু কেউ তাকে কিছু বললো না, কেউ বুঝিয়ে দিলো না ব্যাপারটা কী।

'চলো কুন্দ-দিদিমা, আমিও যাই,' ব'লে শাশ্বতী এগোলো।

সত্যেন অসহায়ভাবে বললো, 'আমাকেও আসতে হবে?'

'এসো,' গম্ভীর মুখে কাছে এলো সরস্বতী। 'ভয় নেই কিছু।'

'আমি একাই?' সত্যেন ঈষৎ মুখ ফেরালো স্বাতীর দিকে।

ফুরফুর হাসি বইলো তার প্রশ্নের উত্তরে, তারপর মহাশ্বেতা চোখ টান ক'রে বললো, 'না, না, না, একা তোমাকে ছেড়ে দেবো না; আমরা নিয়ে যাচ্ছি পাহারা দিয়ে। চলো।'

তিন দিদি আর কুন্দ-দিদিমা সত্যেনকে এমনভাবে ঘিরে দোতলায় নিয়ে এলো যেন শত্রুপক্ষের খোদকর্তাকেই পাকড়েছে। এলো সেই ঘরে, যে-ঘরে মহাশ্বেতা শুয়ে ছিলো সন্ধেবেলা, যে-ঘরে বাসর হবে। বড়োপিসি অপেক্ষা করছিলেন সেখানে।

সত্যেন ঘরে আসতেই বড়োপিসি একটা লাঠি নিয়ে তাকে তাড়া করলেন। সত্যেন একটু অবাক হ'লো, কিন্তু শাদাচুলের মহিলাটি তাকে মারলেন না, লাঠি দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার মাপলেন শুধু। তারপর একবার তাকে দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে দাঁড়াতে হ'লো, একবার মেঝেতে কয়েক পা হাঁটতে হ'লো, একবার কালো মহিলাটি কী বিড়বিড় করতে-করতে তিন-তিন টোকা দিলেন তার মাথায়। এর পর অবাক হওয়া ছেড়ে দিলো সত্যেন।

কী-সব দিয়ে সাজানো একটি তামার থালা হাতে ক'রে তার সামনে দাঁড়ালেন শাদাচুলের মহিলা। জিগেস করলেন, 'আমার হাতে এটা কী বলো তো?'

সত্যেন, অবোধ, জবাব দিলো, 'থালা।'

'স্বাতী তোমার গলার মালা।'

সত্যেনের কান পর্যন্ত গরম হ'লো, সারা মুখে পিন ফুটলো। আর তার ঐ অবস্থাটা—শুধু বড়োপিসি আর কুন্দ-দিদিমা না, দিদিরাও নিঃশব্দে সহাস্যে উপভোগ করলেন—শাশ্বতী সুদ্ধ, যদিও শাশ্বতীর সত্যেনের জন্যও খারাপ লাগছিলো, আর এ-সব সেকেলে কাণ্ড তারও ঘোর অপছন্দ।

'আচ্ছা, এবার বলো তো এটা কী?' কুন্দ-দিদিমা থালায় রাখা পানের পাতাটি আঙুলে ছুঁলেন।

'ওটা?' সত্যেন থামলো। পান? তার মানেই—'প্রাণ'! অতএব—'ওটা তাম্বুল,' ব'লে বিজয়ী সত্যেন কুন্দ-দিদিমাকে চোখে বিঁধলো।

'কেমন!' শাশ্বতী হাতে তালি দিয়ে হাসলো। 'এবার!'

কিন্তু একটু—মাত্র একটুখানি দেরি ক'রে কুন্দ-দিদিমা সগৌরবে বললেন, 'স্বাতীর যে নিন্দে করে তোমার সে চক্ষুশূল।'

'বাঃ! বাঃ!' তিন দিদি একসঙ্গে হেসে উঠলো দিদিমাকে তারিফ ক'রে, সত্যেনের মুখেও হাসি ফুটলো। বেশ বলেছে কিন্তু চট ক'রে!

'এখন যেতে পারি?' সত্যেন, সপ্রতিভ, পাকাচুলের মহিলার দিকে তাকালো।

'বড্ড ব্যস্ত যে ! আচ্ছা, এদিকে এসো।'

মহিলারা তাকে নিয়ে এলেন ঘরের এক কোণে, সেখানে কুলোয় জ্বলছে প্রদীপ। মামিমার কুলোর মতোই; তবে চিত্রি-বিচিত্রি বেশি, জিনিশও আরো বেশি সাজানো, তার কোনো-কোনোটা সত্যেনকে ছুঁতে হ'লো, তারপর সেই পানের পাতাটি ঘটে ডুবিয়ে তার গায়ে জল ছিটোলেন কালো মহিলা। এখন কপালে কুলো ঠেকানো হবে ভেবে সত্যেন আগে থেকেই ঘাড় বাড়ালো, কিন্তু কোনো-এক রহস্যময় কারণে সেটা বাদ পড়লো; মহিলারা উঠলেন, পুরো দলটি ছাতে ফিরলো তাকে নিয়ে, পাকাচুলের মহিলা সুদ্ধ।

ছোটনের পিঠে পিছন থেকে খোঁচা দিয়ে তাতা ডাকলো, 'এই—! ঘুমোচ্ছিস নাকি ?'

'না তো!' ঢুলে-পড়া মাথাটা একটানে সোজা করলো ছোটন।

'শুয়ে থাক না নিচে গিয়ে!' এটুকু দিদিগিরি ফলিয়েই তাতা ফিরলো বিজলীর দিকে। শোভার বড়ো মেয়ে বিজলী, এই দু-দিনেই জমাট ভাব হ'য়ে গেছে দু-জনে।

এই মাত্র ফিরে-আসা বরের দিকে তাকিয়ে বিজলী বললো, 'বিয়েতে কিন্তু মেয়েদেরই জিৎ।'

'জিৎ কেন ?'

'কত্ত শাড়ি-গয়না পায়! কী-মজা, না রে!'

'মজা না হাতি! এদিকে মা-কে ছেড়ে থাকতে হয় যে! বাব্বা রে বাবা!'

'কিন্তু স্বাতী-মাসির তো মা নেই,' মনে পড়লো বিজলীর।

'মা না থাক বাবা তো আছে! ও একই হ'লো।' তাতার চকিতে মনে পড়লো তার নিজের বাবাকে, কিন্তু তখনই আবার বললো, 'মজা তো ছেলেদেরই। বলতেই বলে জামাই-আদর! আর শ্বশুরবাড়িতে মেয়েদের?'

'ছেলেরা তো আর শ্বশুরবাড়িতে থাকে না,' ব'লে উঠলো পাশ থেকে আর-একটি মেয়ে। 'জামাই-আদর ক-দিন আর!'

এই কথাবার্তা শুনতে পেলো বুলন, মহাশ্বেতার মেজ ছেলে। ভাবলো: চ্ছোঃ! ব'য়ে গেছে ছেলেদের শ্বশুরবাড়িতে থাকতে! মেয়েগুলো কী যে! খালি বিয়ে-বিয়ে মন! তা ওরা বিয়ে করে করুক—তা ছাড়া আর হবেই বা কী মেয়েগুলোকে দিয়ে—কিন্তু ছেলেরা কেন যে—! 'আচ্ছা দাদা', মনের কথাটা সে না-ব'লে আর পারলো না, 'ছেলেরা কেন বিয়ে করে?'

'কী বোকার মতো কথা!' অমল, তার দেড় বছরের বড়ো, ছোটো ভাইয়ের অজ্ঞতায় হাসলো।

'বোকার মতো কেন—'

'বা রে!' বুলনের কথায় বাধা দিলো ওটু, তার দু-বছরের ছোটো। 'বিয়ে করে ব'লেই তো লোকেদের ছেলেপুলে হয়!'

'ওটু!' তাতা ধমক দিলো পিছন থেকে।—কী-যে অসভ্য ছেলেগুলো! সত্যি!

তাতাদির দিকে একটা কঠোর দৃষ্টি ছুঁড়ে ওটু চুপ করলো, আর বুলন ভাবলো ছেলেপুলে? ছেলেপুলেও তো মেয়েদেরই হয়!

তাহ'লে—? আর ঐ ওঁয়াও-ওঁয়াও বাচ্চাগুলো যেন হ'তেই হবে! কিচ্ছু বোঝে না ওটুটা! বুলন আরো খানিকটা ভাবলো, কিন্তু কিছুই ভেবে পেলো না; আবার মন দিলো পুরুষ হ'য়েও বিয়ে করতে রাজি-হওয়া নতুন মানুষটিকে দেখতে।

ততক্ষণে সম্প্রদান আরম্ভ হয়েছে। মুখোমুখি বসেছে বর-কনে, আর তাদের মাঝখানে মঙ্গলঘট রেখে তার উপর লম্বা ক'রে কুশ সাজাচ্ছেন পুরুৎঠাকুর। হঠাৎ অরুণকে পাশে দেখে কিরণ বক্সি জিগেস করলো, 'বরপক্ষের পুরুৎ আসেনি?'

'আবার বরপক্ষের?' অরুণ আবছা হাসলো।

'হ্যাঃ!' কিরণও হাসলো। 'আর সত্যেন যে-রকম—' কথা শেষ না-ক'রে চোখ নামালো।

পুরুৎ বললেন, 'বরের দক্ষিণ হস্ত এখানে স্থাপন করো।'

সত্যেন ঘটের উপর উপুড় ক'রে হাত রাখলো।

'হস্ত উত্তান করো।'

সত্যেন পুরুতের দিকে তাকালো, পুরুৎ তার হাতটি হাতে ধ'রে ঘটের উপর চিৎ ক'রে দিলেন। উত্তান মানে চিৎ?—বাঃ! সুন্দর একটা নতুন কথা শিখে সত্যেন খুশি হ'লো, আর একটু পরেই স্বাতীর ডান হাতটি আস্তে নামলো আকাশের তলায় মেলে-ধরা তার হাতের উপর। উত্তান হাত, মৃদু, অসীম মৃদু তার, প্রায় স্পর্শহীন। পুরুৎ এক গাছা কুশ দিয়ে দুই হাত বেঁধে দিলেন, তারপর বিজনের মুখোমুখি ব'সে পুঁথি খুললেন।

বিজন এতক্ষণ একভাবে ব'সে ছিলো, নিচু মাথায়, থুতনি প্রায়

বুকে ছুঁইয়ে ; আবার মন্ত্র শুনে ভিতু চোখে তাকালো। পুরুতের মুখের উপর চোখ রেখে অস্ফুট স্বরে ঠোঁট নাড়লো সে ; আর সতোদ্ম একটু চেষ্টাই করলো মন দিয়ে সবটা শুনে নিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলতে, যেন এখানেও তার শিক্ষার মানরক্ষা চাই।

পুরুৎ বললেন, 'এনাং কন্যাং সালংকারাং—'

বিজন আওড়ালো, 'এনাং কন্যাং শঙ্করালাং—'

'সবস্ত্রাচ্ছাদনাং—'

'শস্ত্রচ্ছেদনাং—'

'প্রজাপতিদেবতাকাং—'

'প্রজাপতিদেবতাতাং—'

'তুভ্যমহং সম্প্রদদে।'

'তুমবভয়ং সম্প্রদদে।'

'বরের হাতে ওটা কী দিলো রে?' জিগেস করলো অনুপমা।

'কে জানে!' চিত্রা ফিরলো ইভার দিকে। 'ঐ মেয়েটিকে ঢাখ!'

'কোন—?'

'ঐ বেগনি শাড়ি। নেকলেসটা নতুন রকমের, না?'

'নতুন আর কী। ঐ তো রেডিও-মালা।'

'এভিঃ কন্যা ময়া দত্তা রক্ষণং পোষণং কুরু,' পুরুতের মোটা গলা ইভার কানে বাজলো। হেসে বললো, 'রক্ষণং পোষণং কুরু! কেন, মেয়েরা বুঝি আর নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে না?' ব'লে ঈষৎ তাকালো উর্মিলার দিকে, কিন্তু এমন একটা মনঃপূত

কথার পিঠেও তার নতুন বান্ধবী শুধু চোখের পাতা নেড়ে সায় দিলো, কিছু বললো না।

বললো না, যেহেতু ঊর্মিলা তখন একটু বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিলো। ব্যস্ত ছিলো বিজনকে দেখতে। বিজনের মুখটা যেন মার-খাওয়া, ভয়-পাওয়া, আর সেইসঙ্গে দারুণ গম্ভীর। কিছুই মেলে না তার বিজনদার সঙ্গে, যাকে সে চেনে, খুব চেনে, যাকে সে মনে-মনে জানে তার দেখন-হাসির এক নম্বর বাজিমাৎ। সেই বোকা, ভালো, সুশ্রী, মজার, সব মিলিয়ে ইচ্ছে-করা মুখটার কোনো চিহ্ন, কোনো-একটু ঝিলিক ঊর্মিলা তাকিয়ে-তাকিয়ে খুঁজলো:—কিছুই পেলো না। এমন একটি মুহূর্ত পেলো না, বিজনের মুখের ভাব যখন বদলালো; এমন একটি মুহূর্ত পেলো না যখন বিজন মুখ তুলে চারিদিকে দেখলো, তাকে দেখতে পেলো। অতক্ষণ ধ'রে তাকিয়ে থেকে, আর তার পরে ঘন-ঘন তাকিয়েও, তার বিজনদার সঙ্গে একবার চোখোচোখি করতে পারলো না ঊর্মিলা।

শুধু ঊর্মিলাকে না, তখনকার মতো অন্য সবই ভুলে ছিলো বিজন। স্বাতীর সম্প্রদানের ভার যে তারই উপর পড়লো, এর গুরুত্বে সে আজ সকাল থেকে অভিভূত। আচারে-অনুষ্ঠানে একটু ফাঁক সে থাকতে দেবে না; সারাটা দিন ঠায় উপোশ ক'রে আছে বেচারা। বিকেলের দিকে বড়োপিসি বুঝি একবার বলেছিলেন, 'স্বাতী একটু ফল-মিষ্টি খেয়ে নিক না—ওতে কী আছে?'—বিজন শোনামাত্র ব্যাকুল বাধা দিলো। কী আছে? কে জানে কী আছে। কিন্তু আমরা জানি না ব'লে যে কিছুই নেই তা-ই

বা কে জানে। কিছু না-থাকলে নিয়ম থাকবে কেন? আর বোনের বিয়ে দিতে ব'সে এই অবাক-হওয়া কে-জানে-কী ভাবটা তাকে ছাড়ছিলো না, বরং বেড়েই চলছিলো। স্বাতীকে সত্যেনকে ঠিক সত্যিকার মানুষের মতো আর লাগছিলো না; ওরা যেন দূরে চ'লে গেছে, গল্পের মানুষ হ'য়ে গেছে;—দীনবন্ধু হাই-স্কুলের যাট টাকা মাইনের হেড-পণ্ডিতের তোবড়ানো মুখটা দেখতে-দেখতে মনে হচ্ছিলো মহাপুরুষ, আর সেই-মহাপুরুষের কথামতো এই-যে সে কোশার জলে হাত ডোবালো, ডান হাতে ত্রিপত্র ধরলো, আবার সেই ডান হাতের উপর বাঁ হাতটি উপুড় করলো, আর তারপর এইমাত্র-যে সামনের শক্ত, শূন্য মেঝেটায় মাথা ঠেকালো, এর প্রত্যেকটাই খুব আশ্চর্য লাগছিলো বিজনের, আশ্চর্য, রহস্যময়, প্রায় অলৌকিক।

পুরুৎ একবার পিঠ সোজা করলেন, গায়ের নামাবলীর ভাঁজ বদলালেন। তারপর অন্য কয়েকটা কোশাকুশি ঠিকঠাক ক'রে সাজিয়ে আবার পুঁথি খুলে বরের দিকে তাকালেন: 'ওঁ যা অকৃন্তন্নবয়ন্…'

হারীত হঠাৎ বললো, 'আশ্চর্য! সব মন্ত্রই বরের? কন্যার কিছু নেই?'

'আবার কী?' মৃদু টিপ্পনি করলেন তপনদা। 'মেয়েদের তো শুধু রাজি হওয়ার পার্ট।'

'তাতে তাদের সুবিধেই!' অরুণ একচোখ তাকালো ব্যারিস্টরের দিকে। 'স্বামীদের দিয়ে সাংঘাতিক সব প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিজেরা দিব্যি নিশ্চিন্ত!'

অরুণের কথাটা উপভোগ ক'রে কিরণ বক্সি বললো, 'আর বরের মন্ত্রগুলো? খালি তো খোশামোদ!'

পুরুৎ হঠাৎ থামলেন। স্কুলের ক্লাশে খুব বেশি গোলমাল হ'লে যেমন ক'রে তাকান, সেইরকম ক্লান্ত, অনিচ্ছুক, মাছের মতো জোলো চোখ তুলে কন্যাকর্তাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কন্যার মন্ত্র কি জামাতা ব'লে দেবেন?'

হেমাঙ্গ তৎক্ষণাৎ বললো, 'বেশ।'

'কেন? কন্যাই বলুন না,' ব'লে উঠলো অরুণ।

পুরুৎ সত্যেনের দিকে তাকালেন। সত্যেন বললো, 'নিশ্চয়ই। কন্যাই বলবেন।' পুরুষদের গলার মৃদু হাসি উঠলো।

হাসির শব্দ মিলোবার পর পুরুৎ কন্যার দিকে তাকিয়ে আগের চেয়েও আস্তে-আস্তে বললেন, 'ওঁ প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।'

পুরুতের মোটা গলা, আর সংস্কৃতের ছন্দ, স্বাতীর বুকের মধ্যে হঠাৎ যেন গুমগুম আওয়াজ তুললো; স্বাতী বলতে পারলো না।

খুব নিচু গলায় বিজন বললো, 'স্বাতী, বল।'

স্বাতী দাদার দিকে চোখ ফেরালো, যেন এতক্ষণে দাদার অস্তিত্ব অনুভব করলো তার কাছে, অত কাছে; এতক্ষণে দাদার মুখটা স্পষ্ট দেখলো। কিন্তু যে-দাদাকে সে চেনে জন্ম থেকে যে তার একসঙ্গে, আর জন্ম থেকেই তার সঙ্গে যার আড়ি, সেই গোঁয়ার বদরাগি ঝগড়াটে স্যাঁৎসেঁতে কাঁদুনি হিংসুক নিষ্কর্মা অসভ্য দাদাকে একেবারেই দেখতে পেলো না। এ যেন অন্য কেউ অন্য মানুষ;—একে সে আগে কোনোদিন ছাখেনি।

পুরুৎ আবার বললেন, 'ওঁ প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ—'

স্বাতী বিসর্গ বাদ দিয়ে আস্তে-আস্তে বললো, 'ওঁ প্র মে পতিযান পন্থা কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।' পুরুষের মোটা গলার পাশে-পাশে তার উপোশ-করা মেয়েলি ক্ষীণ স্বর অদ্ভুত শুনলো সত্যেন, অদ্ভুত, অস্বাভাবিক, স্নিগ্ধ, অসীম তার স্নিগ্ধতা।

পুরুৎ পুঁথি বন্ধ ক'রে দুই হাতের কুশের বাঁধন খুলে দিলেন। —যাক, হ'লো। সত্যেন পিঠ টান করলো প্রথমে, তারপরেই বাঁ হাতে আলগোছে ধ'রে ঐ বিশ্রী বস্তুটাকে নামালো মাথা থেকে।

'ও কী!' মহাশ্বেতা ব'লে উঠলো, 'টোপর খুললে কেন?'

'আর কী হবে?' নিশ্চিন্ত মোলায়েম জবাব দিলো সত্যেন।

সরস্বতী সংক্ষেপে বললো, 'আরো আছে।—বাচ্চারা স'রে বোসো তো এবার।'

ছোটন চোখ টান ক'রে তাকালো, বাচ্চারা এই ফাঁকে একটু সোরগোল ক'রে নিয়ে স'রে বসলো, বিজন আসন ছেড়ে উঠে হেমাঙ্গর পাশে দাঁড়ালো, সামনের ফাঁকা-হওয়া জায়গাটুকুতে পুরুৎ হোমের আগুন জ্বাললেন, স্বাতী উঠলো পিঁড়ি ছেড়ে, পিঁড়িটা সরিয়ে আনলো শাশ্বতী, স্বাতী আবার বসলো সত্যেনের পাশে। কাঁধের কাছে হালকা ছোঁওয়া পেয়ে সত্যেন ফিরে তাকালো। 'কী?'

'কিছু না,' ব'লে সরস্বতী তার পাটরঙের উড়নিটার একটা

কোণ তুলে ধরলো, স্বাতীর গোলাপি ওড়নার প্রান্তটা এগিয়ে দিলো মহাশ্বেতা, ক্ষিপ্র আঙুলে তুটোয় বেঁধে দিয়ে সরস্বতী আবার বললো, 'কিছু না।'

'এইরকম থাকবে?' সত্যেনের চোখ বড়ো হ'লো, এত-কিছুর পরেও এটা যেন অবিশ্বাস্য লাগলো।

'হ্যাঁ, এইরকমও,' ব'লে সরস্বতী টোপরটা তুলে আবার চাপিয়ে দিলো তার মাথায়। সত্যেনের মাথা হেঁট হ'লো, শোলার ফুল শুড়শুড়ি দিলো কানে।

শোভা ব'লে উঠলো, 'এখনই যজ্ঞ যে?'

'হ'লেই হয়,' জবাব দিলেন লীলা-মাসি।

'না, না, পরের দিন সকালে তো?'

ঊষা-বৌদি বললেন, 'সে ভাই এক-এক দেশের এক-এক আচার—আমার বাপের বাড়িতেই তো বিয়ের রাত্রেই সব সেরে দেয়!'

'ভালোও তা-ই। যা কষ্ট আবার পরের দিন বেলা তুপুর অবধি—ধোঁয়ায় যা চোখ জ্বলেছিলো এখনো মনে আছে!' ব'লে লীলা-মাসি একটু হাসলেন।

নীলচে ধোঁয়া উঠলো সত্যেনের চোখের সামনে। রঘুবংশ মনে পড়লো তার: যজ্ঞের ধোঁয়ায় লাল-হওয়া সীতার চোখ; স্বাতীর চোখও—? তাকাতে যাচ্ছিলো, কিন্তু পুরুৎ তখনই তার হাতে বাচ্চাদের ঝিনুকের মতো কী-একটা দিয়ে বললেন, 'অগ্নিতে অর্পণ করো।'

সত্যেন প্রথমে ভেবেছিলো ঐ ঝিনুকটাকেই বুঝি আগুনে

ফেলতে হবে, তারপর দেখলো—না, ওতে ঘি আছে। আগুনে ঘি দিলো সে, ছ-বার দিতে হ'লো ও-রকম। ঘি-খাওয়া আগুন আরো লাল হ'লো, নীল ধোঁয়া ফিকে হ'লো। তারপর মন্ত্র।

চললো মন্ত্র পড়া। ঠিকমতো বলার চেষ্টা করতে-করতে সন্তোন হঠাৎ একবার ভাবলো: কত? কখন ফুরোবে? জায়গাটা যেন আগের চেয়ে চুপচাপ, পুরুতের পেশাদার গলা আরো ভারি শোনাচ্ছে। মাঝে-মাঝে এদিক-ওদিক তাকালো সন্তোন: লাল মালা, রুপোলি আঁচল, ছোড়দির হাসিমুখ এখন গম্ভীর—ছোড়দি ডাকবে কাল থেকে?—একবার বড়দিকে দেখলো লোটনকে কোলে নিয়ে, একবার রাজেনবাবুর ছাইরঙা আলোয়ানটা আবছা চোখে পড়লো। আরে! ছোটন যে ঘুমিয়ে পড়লো এদিকে।

ছোটনকে চট ক'রে তুলে নিয়ে গেলো ডালিম, রাত বাড়লো, কিরণের পিছন থেকে স'রে নিখিল এসে বিজনের কাছে দাঁড়ালো, শীত বাড়লো, সতুদার আলোয়ানটার ভাঁজ খুলে বিজনের পিঠের উপর ছড়িয়ে দিলো নিখিল, বিজন সেটা জড়িয়ে নিতে-নিতে কিছু না-ব'লে নিখিলের দিকে তাকালো, খানিকটা সময় কেউ যেন কিছু বললো না, চারদিকের চাপা কথার গুনগুনানি থামলো, শুধু জাগিয়ে-রাখা আগুন পটপট শব্দে সংস্কৃত বলতে লাগলো, অন্য সব চুপ-ক'রে-থাকার উপর দিয়ে স্মৃতির মতো ভাসতে লাগলো সংস্কৃত ছন্দ, প্রতিশ্রুতির মতো মাথা তুলেই ডুবে গেলো।

মহাশ্বেতা সরস্বতীর মনে পড়লো সেই রাতটির কথা, যখন তারা একই সঙ্গে একই ছাতের দুটো অংশে এইরকম সেজে এইরকম পিঁড়িতে ঠিক এমনি ক'রেই বসেছিলো ; দু-বোনে চোখোচোখি করলো, সরস্বতী তাকালো অরুণের দিকে, মহাশ্বেতা হেমাঙ্গর দিকে, তারপর মহাশ্বেতা অরুণের দিকে তাকালো। অনুপমা চিত্রা ভাবলো যে তারাও একদিন এমনি পিঁড়িতে বসবে—কবে ? কার সামনে ? কে ?—ভাবতেই লাল হ'লো দু-জনে, আর ঠিক তখনই দু-জনের চোখোচোখি হ'লো। ঊর্মিলার হঠাৎ তার মা-কে মনে পড়লো, তার ছেলেবেলা, নাথুরামপুর, চোদ্দ বছর বয়সে তার সেই বিয়ের সম্বন্ধ—ছেলেটা লুকিয়ে চ'লে এসেছিলো আড়ে-ঠারে তাকে একটু চোখে দেখবে ব'লে—প্রায় হ'য়েই যাচ্ছিলো, কিন্তু বাবা হঠাৎ—। যদি বাবা হঠাৎ ম'রে না-যেতেন, যদি চোদ্দ বছর বয়সে লুকিয়ে-চোখে-দেখতে-আসা সেই ইন্দু নাগের সঙ্গেই—নামটা মনে আছে এখনো—তার বিয়ে হ'য়ে যেতো, তাহ'লে এতদিনে কেমন হ'তো, ঊর্মিলা সেই কথাটা ভাবলো একটু, আর ইভ্‌া গাঙ্গুলির চোখ কাকে যেন, কী যেন খুঁজে-খুঁজে ঘুরতে-ঘুরতে হঠাৎ ডালিমের কোঁকড়া চুলের তলায় ফর্শা মুখের উপর স্থির হ'লো। আহা, বড্ড ছেলেমানুষ !

ডালিমকে ঠেলে কুন্দ-দিদিমা সামনে এলেন হাতে একটা মাটির ভাঁড় নিয়ে। এসেই নিচু হ'য়ে সেই ভাঁড়ে আঙুল ডুবিয়ে-ডুবিয়ে বর-কনের সামনে কোণাকুণি ক'রে সাতটা গোল-গোল পিটুলির দাগ এঁকে ফেললেন মেঝের উপর।

'এটা কী রে ?' জিগেস করলো ইরু।

আত্রা জবাব দিলো, 'সপ্তপদী।'

'সপ্তপদী মানে?'

'দেখবিই।' আত্রা গম্ভীর মুখে আরো একটু খবর দিলো, এটাই তো আসল বিয়ে।'

বর-কনে উঠলো, নড়তে গিয়ে টান পড়লো সত্যেনের পিঠে। ও, সেই বাঁধা আছে এখনো! কতক্ষণ থাকবে?

'এবার নামো গো পিঁড়ি থেকে,' কাছে এলেন বড়োপিসি।

গাঁটছড়া নিয়ে সন্তর্পণে পা ফেললো দু-জনে, সেই গোল-গোল দাগের সামনে পাশাপাশি দাঁড়ালো। পিসি বললেন, 'স্বাতী সামনে আয়।'

স্বাতীর এগোবার টানে এবার সত্যেনের উড়নিটা প্রায় খ'সেই পড়লো কাঁধ থেকে, সরস্বতী পিছন থেকে সেটা ঘুরিয়ে ঠিক ক'রে দিলো। স্বাতী সামনে এলো, সত্যেন পিছনে থাকলো, স্বাতীর দু-পাশ দিয়ে বাড়িয়ে দু-হাত অঞ্জলি ক'রে মেলে ধরলো সত্যেন, আর সেই হাতের উপর স্বাতী তার দু-হাত অঞ্জলি ক'রে পাতলো। তাদের দু-পাশে চট ক'রে দাঁড়িয়ে গেলো মহাশ্বেতা আর সরস্বতী, আর শাশ্বতী হাজির থাকলো খইয়ের থালা হাতে নিয়ে। বড়োপিসি গুনগুন ক'রে বুঝিয়ে দিলেন কী করতে হবে।

'প্রথমে ডান পা, তারপর বাঁ পা···এক-একবারে এক-একটা গোল দাগে···আর তুমি স্বাতীর হাত দিয়ে এক-একবার এক-এক মুঠো খই—ঠিক ঈশান কোণে এঁকেছেন তো?' পিসি ফিরে তাকালেন ভাঁড়-হাতে কুন্দ-দিদিমার দিকে।

কুন্দ-দিদিমা জবাবের বদলে মুচকি হাসলেন। হ্যাঃ—এর অণুকোটি তাঁর মুখস্থ, তাঁর ভুল হবে?

প্রথমে ডান পা, তারপর বাঁ পা, উত্তর-পুব কোণের প্রথম মণ্ডলে পা পড়লো।

'বাঃ, ঠিক পড়েছে!' শাশ্বতী স্বাতীর মুঠো ভ'রে খই দিলো, সত্যেন চোখ দিয়ে একটু তাক ক'রে নিজের হাতটা ঠেলে দিলো উপরদিকে। স্বাতীর হাত থেকে খই ছিটোলো, মাত্র কয়েকটা আগুনে পড়লো, বেশির ভাগই বাইরে।

'ওঁ সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যন্তে গমেয়ং,' পুরুতের গলা উঠলো আবার। 'সখ্যন্তে মা যোষাঃ, সখ্যন্তে মা যোষ্ঠাঃ।'

হঠাৎ একটু ঝিমুনি এসেছিলো হেমাঙ্গর, তার রেঙ্গুনের আপিশের কাঠের সিঁড়িতে উঠতে-উঠতে হোঁচট খেলো। বিয়ে: কলকাতা। ভালো—মহাশ্বেতার এতকালের ইচ্ছে মিটলো,—এখন ওর শরীরটা সারলেই—ওর মা যে-রকম ভুগে-ভুগে শেষটায়—কী বাজে কথা ভাবছি! মুখে একবার হাত বুলিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো হেমাঙ্গ, সামনে দেখতে পেলো অরুণকে। অরুণ হাসলো, কিন্তু হেমাঙ্গর জন্য না, হাসলো সেই দিনটির কথা ভেবে, যেদিন দামি চকোলেট এনেছিলো ব'লে শিশিরকণা তাকে বকেছিলেন। ভাগ্যিশ বকেছিলেন, তাই তো সে জানতে পেলো ওখানেই তার মন বাঁধা, আর তারপরে ছুটিতে যখন দেশে যাচ্ছে তখন ট্রেনে শুয়ে-শুয়ে কেমন ক'রে যেন জানলো যে মহাশ্বেতা খুব ভালো হ'লেও সরস্বতীর কাছে—কী-সব ভাবছে! আর এতকাল পরে মনেই-বা পড়লো কেন।

'ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ, সমাপো হৃদয়ানি নৌ। সম্মাতরিশ্বা সং ধাতা, সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।'

ঘি পড়লো আগুনে, খই পড়লো আগুনে, মেয়েরা শূন্যে খই ছিটোলো; সামনের দিকের এর মধ্যেই ফিকে-হওয়া দাগে নতুন ক'রে পিটুলি টানলেন কুন্দ-দিদিমা। শোভা ভাবলো : শেষ, প্রায় শেষ। ছুটি ফুরোলো, নটে মুড়োলো, আবার সেই—হঠাৎ ভাবলো : সে! ও হ্যাঁ, চ'লে গেছে। কখন গেলো? ব'লে গেলো না একবার? বলাবলির আর কী আছে—আর যা মুখচোরা মানুষ—আর যা ভিড়—আর যা খাটুনি সারাদিন—আমিও তো দু-দিন ধ'রে এখানেই—না কি রাগ করলো? এমনি তো সাত চড়ে রা ফোটে না, কিন্তু আমার উপর রাগ আছে ঠিক!

'ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনু চিত্তং তে অস্তু।'

সামনে স্বাতী, পিছনে সত্যেন, হাতে-হাতে অঞ্জলি পাতা—সুন্দর, কী-সুন্দর মানিয়েছে। বড়োপিসির চোখে জল এলো। স্বাতীর পিসে দেখলো না? ঘুমুচ্ছে নিচে। ঘুমুচ্ছে তো? ঘুম ভাঙলেই তো জল চাই, পান চাই, পান আবার ছেঁচে দিতে হবে—ফোকলা বুড়োকে নিয়ে জ্বালাতন কি কম! আর এই মানুষই কী ছিলো দেখতে, যখন—বড়োপিসির হাসি পেলো।

'ওঁ অন্নপ্রাশেন মণিনা প্রাণসূত্রেণ পৃশ্নিনা,' শেষের কাছাকাছি এসে পুরুতের যেন উৎসাহ বাড়লো, গলা চড়লো, 'বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা, মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।'

মানে কী কথাগুলির?—ঊষা-বৌদি ভাবলেন—শুনতে কিন্তু সুন্দর। উনি নাকি সংস্কৃত পড়েছিলেন কলেজে। তা কী-বা

হ'লো ও-সব প'ড়ে-ট'ড়ে—জন্ম ভ'রে তো রেলের চাকরি, আর চাকরিও বাবা, বারো মাসে চোদ্দ টুর লেগেই আছে। আসবার কথা তো শুক্কুরবারে—এখন কে জানে!—আর এই বিয়ের জন্য ছুটো দিন আগে এলেই হ'তো। না! তেমন মানুষই না! চাকরিই প্রাণ!

'যদেতদ্ধৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব।'

হৃদয়! কথাটা হঠাৎ কানে গেলো টরু, গীতি, আভার, একটু কেঁপে উঠলো লাল কমলা সবুজ শাড়ি। হৃদয়! ওটা এখনো মজার কথা তাদের কাছে, ঠাট্টার কথা, কোনো ছাপা বইয়ে চোখে পড়লে হাসির শুড়শুড়ি লাগে;—কিন্তু এখন তারা কাঁপলো কৌতুকে না, কৌতূহলেও না, কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য রোমাঞ্চ হ'লো তাদের। যে-যৌবন তাদের ঠিক জাগেনি, কিন্তু জাগলো ব'লে, তারই একটু বিদ্যুৎ চকিতে ব'য়ে গেলো তাদের শরীরে, আর নিখিলের হঠাৎ মনে হ'লো কারখানায় পেরেক ঠোকে তাতে কী, কষ্টে আছে তাতে কী, কোনো ভয় নেই, কোনো দুঃখ নেই, সে সব পারে, তার সব আছে, আর কিরণ বক্সি বুঝলো—স্পষ্ট বুঝলো—যা এর আগে এমন নিশ্চিত বোঝেনি—যে অনীতাকে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে অসম্ভব, অসম্ভব। না, দেবে না যেতে; শ্বশুর রাগ করে করুক, মা-বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয় তো হোক; বোমার ভয়ে কলকাতা-সুদ্ধু লোক ভাগলেও অনীতা যাবে না, সেও যাবে না—নয়তো দু-জনেই একসঙ্গে যাবে। সেই মালাটা তখন রেখেছিলো না পকেটে?—হ্যাঁ, আছে।

শেষের গোল দাগটিতে পা পড়লো, আবার খই পড়লো আগুনে, আরো খই, আরো মন্ত্র, শাঁখ, সেই কেমন-কেমন চুপচাপের বেড়া ভেঙে গিয়ে আবার কথা, হাসি চলাফেরা: সংখ্যায় ক'মে-যাওয়া বাচ্চার দল উঠে পড়লো, প্রভাত-মেসো ভাবলেন লীলা কি আরো থাকতে চাইবে, বিজনের কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে হেমাঙ্গ বললো তুমি এবার, আর ডালিম নিখিলকে বললো আপনি কি, আর শাশ্বতীর মুখ থেকে চোখ সরিয়ে ভিড় থেকে স'রে দাঁড়ালো হারীত।—ঈশ! কত সময় নষ্ট হ'লো, এতক্ষণে সে ইস্তাহারটা লিখে ফেলতে পারতো! আবার সব তার মনে পড়লো: জাপানের কুচক্র, রাশিয়ার বিপদ, নির্বোধ বাঙালি বাবুরা, মনে পড়লো তাদের প্রতিরোধ সংঘের প্রকাণ্ড দায়িত্ব। কী-কাণ্ড, ভুলেই ছিলাম এতক্ষণ! সাধে কি আর আফিং বলেছে! নাঃ, এই মুহূর্তে বাড়ি, হেঁটেই, গিয়েই ঘুম, তারপর কাল সকালেই—। হারীত গোঁ নিয়ে নেমে গেলো সকলের আগে, কিন্তু দোতলায় এসেই থামলো। শাশ্বতী কি—? না সে-তো থাকছে, সে-তো বলতে গেলে আজকাল বাপের বাড়িতেই—বাঙালি মেয়েদের এই বাপের বাড়ি এক ব্যাপার! আজ থেকে স্বাতীরও বাপের বাড়ি। দোতলা থেকে একতলায় একটু ধীরে নামলো হারীত, নামতে-নামতে কেন-যে মনে পড়লো সেই যতীন দাস রোডের বাড়ি, এদিকে গাঁটছড়া-বাঁধা স্বাতী-সত্যেনকে মেয়ের দল ঘিরে ফেললো, স্বাতীর জন্মদিনের গানের আসর, সেই প্রথম ও-বাড়িতে, এ-বাড়িতে, হাঁটি-হাঁটি-পা-পা বর-কন্যা চললেন, খুব কিন্তু শুনিয়েছিলো স্বাতী সেই গাইয়েটিকে, পিছন-পিছন সবাই চললো, বাজে ছোকরা!

আর শাশ্বতী সেদিন আর শাশ্বতী স্বাতীর পিঠে হাত রাখলো, বিজন শীতে কেঁপে উঠলো একবার, ছাতের দূরের অর্ধেকটা খালি হ'লো, আর মহাশ্বেতা, স্বাতীর ঠিক পিছনে, প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েই মহাশ্বেতার কেমন ভয় হ'লো যে এখনই তার মাথা ধরবে।

কিন্তু বাসরঘরে এসেই মাথা ধরার কথা ভুলে গেলো। এই ঘরেই সন্ধেবেলা শুয়ে ছিলো সে? তার মনে হ'লো আলো এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল, ঘরটাকে আরো বড়ো লাগলো, সজীব লাগলো, যেন প্রাণ পেয়েছে এতক্ষণে; যেন তাদের সকলের অচেনা এই হঠাৎ-ভাড়া-করা বাড়ির এই ঘর ঠিক এরই জন্য তৈরি হয়েছিলো, আর তৈরি হবার পর থেকে ঠিক এই মুহূর্তটিরই অপেক্ষায় ছিলো। আলনায় সাজানো শাড়ির রং-বেরঙে আলোর চোখোচোখি দেখলো মহাশ্বেতা; চোখে-চোখে বলছে: 'এসেছো? এসেছে?' আলো-ভরা আয়না থেকে পিছল বার্নিশে জবাব ঝরলো 'এই-তো!' 'এই-তো! এসেছে!' ঘরের প্রত্যেকটা জিনিশ হেসে-হেসে এ-কথা বললো, চারটে শাদা দেয়ালও তা-ই বললো। চারদিক থেকে ফিরলো মহাশ্বেতার চোখ, স্বাতী-সত্যেনের দিকে ফিরলো, মেঝের বিছানায় বসলো ওরা, বসতে গিয়ে ভুল করলো।—'স্বাতী এদিকে আয়।' স্বাতী এলো সত্যেনের বাঁ দিকে, আমিও একদিন ঐ রকম—কেমন লেগেছিলো?—কে জানে কেমন।...কিছু মনে পড়ে না, কিন্তু এই গন্ধটা যেন চেনা-চেনা —কিসের? কোনো-কিছুর না, বাসরঘরেরই গন্ধ এটা, নতুন,

নতুনের, নতুনের সূক্ষ্ম সুন্দর অদ্ভুত সুবাস। মহাশ্বেতা বুক ভ'রে সুবাস নিলো—মাথাটা হঠাৎ? না।

না, মাথা ধরলো না মহাশ্বেতার, কি ধ'রে থাকলেও সে বুঝলো না: শেষ পর্যন্ত ঠিক থাকলো, ফুর্তির একটি ফোঁটাও হারালো না; সব দেখলো, চাল খেলা, জলে শোলা ভাসানো, শাশ্বতীর বেশি-বেশি ব্যস্ততা—ভাবটা যেন ও না-থাকলে কিছুই হ'তো না—; সব শুনলো, ভাঙা গলায় এক-কথা-দশবার-বলা বড়োপিসি, সরস্বতীর টিপ্পনি, কুন্দ-দিদিমার মশকরা—কতবার-যে কারণে-অকারণে হাসলো। তারপর প্রভাত-মেসো হঠাৎ কোত্থেকে এসে বললেন আমরা তাহ'লে, লীলা-মাসি নড়লেন, উষা-বৌদি বললেন আমিও তাহ'লে, আরো কেউ-কেউ নড়লো, উনি এসে বললেন চলুন—গলায় আবার মাফলারটা কেন?—আপনি আর কেন, চলুন, যাই তাহ'লে, আচ্ছা, যাই, যাচ্ছি, ভিড় কমলো, গীতির মাথা আভার কাঁধে ঢুললো, কথা কমলো, চোখে হঠাৎ ঝাপসা দেখলো মহাশ্বেতা, হাসির শব্দ থেমে গিয়ে হাওয়ায় শুধু রেশ থাকলো, রেশ কাঁপলো, থামলো, তারপর হঠাৎ সব চুপ।

ছোট্ট হাই চেপে সরস্বতী বললো, 'এবার ওদের ছুটি দাও, কুন্দ-দিদিমা। ঘুমোক।'

'সত্যেনের বুঝি ঘুম পেয়েছে?' কুন্দ-দিদিমা কটাক্ষ হানলেন।

'তোদের বিয়েতে, মহাশ্বেতা?' বড়োপিসির মনে পড়লো। 'দুটোয় লগ্ন, তায় আষাঢ় মাস, বাসরেই—'

'হ্যাঁ, বাসরেই ভোর!' মুখের কথা কেড়ে নিলেন কুন্দ-দিদিমা 'মজাই হয়েছিলো।'

'আর কেমন বৃষ্টি নামলো বিয়ের মধ্যে! আর ঠিক ত কিনা বড়োবৌ—' বড়োপিসি বলতে-বলতে থামলেন।

বড়োবৌ? মা? মহাশ্বেতা সরস্বতীর দিকে তাকালো, মা-ে মনে পড়লো দু-বোনের। মনে পড়লো তাদের বিয়ের মধ্যে ম হঠাৎ এমন অস্থির হ'য়ে পড়েছিলেন যে ঐ রাত্তিরে আর ঐ বৃষ্টিতে তখনই ডাক্তার ডেকে ইঞ্জেকশন দিতে হয়েছিলো—তার শুনেছিলো পরের দিন। ঈষৎ বিমর্ষ লাগলো তাদের।

সেটা বুঝতে পেরে বড়োপিসি কথা বদলালেন, 'আর পরের দিন বিয়ে দেখলো না ব'লে স্বাতীর কী কান্না!'

'মেজদি সেজদির বিয়েতে স্বাতী অন্য কারণেও কেঁদেছিলো,' শাশ্বতী মুখ টিপে হাসলো, চোখোচোখি করলো মেজদি সেজদির সঙ্গে। দু-বোনের মনে পড়লো 'আমি অরুণদাকে বিয়ে করবো' ব'লে পাঁচ বছরের স্বাতীর খুনোখুনি, তিন বোনের চোখে-চোখে ব'য়ে গেলো অন্যদের না-জানা নিঃশব্দ কৌতুক, কিন্তু মহাশ্বেতাকে এই কৌতুকটা কোথায় একটু খোঁচাও দিলো।

স্বাতীর দিকে ফিরে শাশ্বতী শাসালো, 'ব'লে দেবো নাকি?'

অরুণ কাশলো।

শ্বেতা ঘরে এসে কাছে দাঁড়ালো। 'স্বাতী, আমি এখ যাই রে—'

'যাচ্ছো, দিদি?' মহাশ্বেতা তাকালো। 'থাকো না।'

'না, যাই।' স্বাতীর দিকে, সত্যেনের দিকে ফিরে, যেন তাদের সম্মতিটাই আসল, এমনি সুরে শ্বেতা বললো, 'কাল সকালেই চ'লে আসবো। কেমন?'

'তুমি করলে কী এতক্ষণ?' জিগেস করলো সরস্বতী।

'এই বাচ্চাগুলোকে একটু ঠিকঠাক ক'রে—রণক্ষেত্রের মতো প'ড়ে ছিলো তো সব! আতা গীতি এবার শুয়ে থাক না গিয়ে—ঘুমে ঢুলছিস তো!'

'ইরু—?' মেয়েকে হঠাৎ মনে পড়লো মহাশ্বেতার।

'তোর মেয়ে বেনারসি প'রেই ঘুমুচ্ছে রে,' শ্বেতা হাসলো।

ঘুমুচ্ছে? গীতির কানে গেলো কথাটা। কে? আমি? না, আমি তো জেগে আছি—এই তো! কিন্তু চোখ তখনই আবার জড়ালো, ট্রেনের দোলা লাগলো শরীরে, ট্রেন, এই টুণ্ডলা এলো, মা।

'শোভা কালই যাবি?' শোভার মুখ দেখতে মাথা একটু কাৎ করলো শ্বেতা।

শোভা তখন মহাশ্বেতার পিছনে ব'সে মহাশ্বেতার গলার কচ্ছপের ডিমের মতো মুক্তো খুঁটছিলো, চকিতে হাত সরিয়ে সলজ্জ বললো, 'হ্যাঁ শ্বেতাদি, কালই যাবো।'

'তোর শাশুড়িকে একটা—আচ্ছা কাল বলবো।' শ্বেতা স'রে এলো স্বাতীর কাছে, নিচু হ'য়ে তার ঘোমটা-ঢাকা মাথায় হাত রাখলো, সত্যেনের চোখে চোখ ফেললো একবার। সোজা হ'তে-হ'তে বললো, 'বেশি আর জাগিয়ে রেখো না, পিসিমা, ওদের আবার না শরীর-টরীর খারাপ হয়।'

'স্বাতীরও তা-ই মত নাকি?' এবার স্বাতীকে ডাক করে অক্লান্ত কুন্দ-দিদিমা।

'আচ্ছা—' স্বাতী-সত্যেনের কাছে আর-একবার চোখে বিদায় নিয়ে শ্বেতা ঘরের বাইরে এলো। এসেই ডালিমের সঙ্গে দেখা। ডোরাকাটা সিল্কের শার্টের উপর এখন একটা খয়েরি পুল-ওভর তার গায়ে।

ডালিম বললো, 'রিকশ এনেছি, মা।'

'বেশ।' শ্বেতা চ'লে যাচ্ছিলো, ডালিম তাড়াতাড়ি আবার বললো, 'আমি—আমি আর না গেলাম, মা।'

'না, না, তুই যাবি কেন। থাক। আর কিন্তু রাত জাগিস না।'

মুখোমুখি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বিজু। এমন ক'রে আলোয়ান মোড়া যে হাত দুটো সুদ্ধু ঢাকা।

শ্বেতা বললো, 'বিজু ঘুমোসনি?'

বিজন ফ্যাশফেশে গলায় জবাব দিলো, 'ঘুমোবো কেন? তুমি যাচ্ছো?'

'হ্যাঁ রে—'

'ট্যাক্সি এনেছে?'

ডালিম বললো, 'কোনো ট্যাক্সি আসতে চাইলো না, মামা। রিকশ আনলাম।'

'ভারি নবাব হয়েছে তো ট্যাক্সিওলারা! দেখো বড়দি, লোটনকে ভালো ক'রে ঢেকে-ঢুকে নিয়ো, আবার ঠাণ্ডা না লাগে।'

'হয়েছে, হয়েছে!' বিজনের গালে ছোট্ট চড় দিলো শ্বেতা।
র গায়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'কার আলোয়ান
ওটা?'

'ওটা? এটা, সত্যেনের।'

'ও, সত্যেনের আলোয়ান বুঝি বেশি গরম?'

বিজন যেন শুনতেই পেলো না কথাটা। বাসরঘরের দরজার
ক তাকিয়ে বললো, 'ও-সব আর কতক্ষণ?'

'এই শেষ হবে এবার।'

'কত রাত হ'লো! নাঃ, পিসিমাকে বলি এখন—' বলতে-বলতে
ন এলো বাসরঘরের দরজায়, ডালিম তার সঙ্গে এলো, মামা-
নে বাসরঘরে ঢুকলো, দু-সার ঘরের মাঝের গলি দিয়ে শ্বেতা
লো, এলো সামনের বারান্দায়, যেখানে দাঁড়িয়ে সন্ধেবেলা
আসা দেখেছিলো মেয়েরা। ঠাণ্ডার জন্য একদিকের চিক ফেলে
ছে এখন; তক্তাপোশের বিছানায় নেপাল-পিসেমশাই, চোখ
-বোজা, স্থির, হাঁ খোলা, ঠোঁট বাঁকা, হঠাৎ দেখলে—না,
পোশের তলায় ফাঁপা বুকটা উঠছে পড়ছে—আহা ঘুমোক—
ও ঘুমোচ্ছে মেঝেতে কম্বলমুড়ি—খেয়েছিলো কিছু? হ্যাঁ।—
সরলো, বারান্দার অন্য দিকে দেয়ালঘেঁষা ইজিচেয়ার,
ওা আলোয়ান, বাইরে চোখ, বাবা।

বাবা,' শ্বেতা আস্তে ডাকলো।

াজেনবাবু মুখ ফেরালেন।

রিকশ এসেছে, বাবা।'

চল।'

রাজেনবাবু উঠলেন, মেয়ের একটা কাঁধ চোখে পড়লো, মে
লংক্লথের জামা। 'তোর গায়ের গরম কিছু—'

'আছে। চলো।'

রাজেনবাবু চলতে-চলতে বললেন, 'হেমাঙ্গ ফিরেছে?'

'ফেরেনি এখনো। অনেককে নামাতে হবে তো।'

'দেরি হচ্ছে না?'

'দেরি হবে কেন। এই-তো খানিক আগে— তোমার ভা
হচ্ছে নাকি?'

'না, না—রাত হ'লো তো, আবার ব্ল্যাক-আউট—'

'কিচ্ছু না! একটু দাঁড়াও, বাবা।'

দোতলায় সবচেয়ে বড়ো যে-ঘরটিতে স্বাতীকে তখন সাজা
হয়েছিলো, সেই ঘর থেকে ঘুমোনো লোটনকে কোলে ক
নিয়ে এলো শ্বেতা। লোটনকে জড়িয়ে নিয়েছে গোলাপি উলে
স্কার্ফে, নিজের পিঠের উপর শাদা একটি স্কার্ফ ফেলা।

একটু পরে শ্বেতা আবার থামলো। 'বাবা একবার দে
যাবে নাকি?'

বাসরঘরের দরজায় রাজেনবাবু থামলেন। সামনে দাঁড়া
বিজু আর ডালিমের ফাঁক দিয়ে একবার স্বাতীকে দেখলেন ডালি
আর অরুণের ফাঁকে একবার সত্যেনকে। আভা গীতি
ধাক্কা দিয়ে বললো ওঠ না, সরস্বতী বললো সত্যেন তাহ'
উজ্জ্বল আলোর সিঁড়ি দিয়ে নামলো দু-জনে, উজ্জ্বল একত
পেরোলো, কেউ নেই, চুপ, শাশ্বতী বললো স্বাতী কি, শো
ভাবলো ঘুম; অন্ধকার, কলকাতা কালো, রিকশর দুই চো